

CUIC-H01848-2-147871
(2)

পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ত	পূর্ণ আদর্শ	১৬৯
২৮৩	প্রকাশের চিঠি	২২৬
১৭৭, ১৯৯, ২৭৪,	প্রবর্তকের আদর্শ	৩৭৬
৪১৮, ৪৪৫	প্রবর্তকের বক্তব্য	৩৪৯
৩৯৪	প্রশস্তি	৫৫২
জন্মোৎসব	প্রশ্ন	৫৩৪
৩৩২	প্রাপ্তি-স্বীকার	২৪০, ৫৪৮
দ	ভ	
২১৭	ভাগবত আদর্শ	৩৮৫
৩৮৮	ভারতের ভাগ্যান্বিত	৫৩৯
৪৭৯	ভ্রমণ চিত্র	৫৬৩
১৩৬	ম	
ধ	মনঃ স্থৈর্য	১১৬
৪৪১	মর্ষ ব্যথা	৩৩৭
৩৪০	মহাত্মা গান্ধীর বিদায় বাণী	১৪২
২২০	মা ভৈঃ	১৭৩
ন	মিলন সঙ্ঘ	২৪৪
ও বিদ্যালয়	মুক্তি-সংবাদ	৫৫৩
৩৩৬	য	
২১০	যথা নিযুক্তোহস্মি	২৮
৫৪	যুগ সাধনা	৩২১
৭৭	যোগ কি ?	৬১
২৫	র	
১৮৫	রথ যাত্রা	২৯৩
প	রবীন্দ্রনাথের পত্র	২১৫
১৯২	রাউলট-আইন	২২৮
৪৩৮	রাউলট বিল	৪১
১৪৯	রিফর্ম বিল	২৪১
৪৫০	ব	
৫৪৯	বন্ধন	৪২

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়
বর্ধার প্রলাপ	২৫৪	সাধকের পত্র
বৃহত্তের পূজা	৫৫৪	সাধন পথ
ব্রহ্ম দৃষ্টি	৪৬৫	সাধনা
শাসন-সংস্কার	৫৪৯	সাধনার কথা
শিক্ষা-সমস্যা	৩৯৯	সিদ্ধ-মন্ত্র
শৃঙ্খল	৫৩	সিদ্ধ-মার্গ
শ্রম-সমস্যা	১৩০	সিদ্ধ-যজ্ঞ
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উৎসব	৭০	সিদ্ধ-সম্পদ
স		সেবা-ধর্ম
সত্যগ্রহ	৭৩	স্বজন-শক্তি
সত্যগ্রহের জের	১৬৩	স্পষ্টতা
সৎ-কথামৃত	১০০	স্বর্গ-মর্ত্য
সন্ধি	২৬৫	স্বদেশী
সমস্যা	৬৫	স্বদেশী ও বিদেশী
সমাজ-কথা	১৪৫	স্বামী শর্কানন্দের কর্মশীলত
সমালোচনা	৪৭, ১২০, ২৪০, ৪০৭, ৪৫৫, ৪৭৮, ৫০২, ৫৪৭	স্বামী শুদ্ধানন্দের আদর্শ
সহজ সাধন	৩৬৮	স্ত্রী-শিক্ষা
সাধকের ডায়েরী	৩২৭, ৩৭১	ই
		হাট্টার কমিশন

প্রবর্তক—৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

৩০এ পৌষ, ১৩২৫

14757

৪ ৪ - ১ ৮২ -

৪ ৪ - ২৪ ৮২ -

৩০ মে ১৩২৫ -

১৫ মে ১৩২৭

নব বর্ষ

প্রবর্তকের শুভ জন্মদিনে আমরা আমাদের ভ্রাতৃবৃন্দকে লাদরে
জন করিতেছি, তাঁহারাও সকলে যেন অকুণ্ঠিতচিত্তে হৃদয়
দিয়া আমাদের আলিঙ্গন করেন। আমাদের পরস্পরের
পরস্পরে মিলিয়া যেন সেই মহাশক্তিকে জাগরিত করে, বাহার
কায় আমরা বসিয়া আছি, বাহার সাধনায় এই জিন বৎসর যথা-
চেষ্টা করিয়াছি। যে মহাসাগরবক্ষে আমাদের ক্ষুদ্র তরীখানি
গাইয়া দিয়াছি, কুল নাই কিনারা নাই, কেবলই অসীম বীচিবিক্ষোভ-
হারা উদ্দেশ্যে ছুটিয়া চলিয়াছে, সেখানে আমাদের আছে একটা
আরা, তাহাকেই জানি তাহাকেই চিনি, সেই আমাদের গতিনির্দেশক।
ভ্রাতৃবৃন্দ, তোমাদের মত নিপুণ নাবিকের সহায়ে এ অকূল পাথার
হইব এ ভরণা রাখি, পথভ্রষ্ট হইব না, তুফানে আবর্তে আমা-
নৌকাখানি মারা যাইবে না, এ বিশ্বাসও অটল। কিন্তু কতখানি আছে ?
কতদূর ? নিজেকেই নিজে জিজ্ঞাসা কর। এস, আমরা প্রত্যেকেই
আপন হৃদয়ের মণিকোটায় খুঁজিয়া দেখি, কোন্ পর্ধ্যন্ত আসিয়াছি,
কোথায় পড়িয়া আছে ? তারপর দিগুণ উৎসাহে আবার দাঁড় বাহিয়া
প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কখন কখন হয়ত থানিয়াছি, ঘুরিয়াছি,
গাইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু তাতে কি আসে যায় ? দেখি মোটের উপর
কত হইয়াছি কি না, দেখি আরও অনিপুণ সিদ্ধহস্ত নাবিক হইয়া
ছি কি না ?
আই আজ ভাল করিয়া দেখিব বুঝিব চিনিব সেই লক্ষ্যটি। তাই আজ
বলিব আমাদের জীবনদেবতার কথা। আমরা কোথায়, কি
কি চলিয়াছি ? আমাদের উদ্দেশ্য কি ? আমাদের উদ্দেশ্য, আমাদের
গণবত সত্তা আছে তাহাকে সর্বতোভাবে পূর্ণরূপে নিজের ভিতরে
করিব, নিজের জীবনে প্রকট করিব, তারপর সেই জ্ঞান সেই



এই স্বর্গরাজ্য কি? ইহা হইতেছে দিব্য বা ভাগবত জীবন। জীবনের মধ্যে ভগবানের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা—ইহাই আমাদের লক্ষ্য। ভগবান হইতেছেন পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ শক্তি, পূর্ণ আনন্দ—এই জ্ঞানে, এই শক্তিতে, এই আনন্দেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিধৃত, পরিচালিত; এই জ্ঞানের এই শক্তির এই আনন্দেরই মূর্ত রূপ হইতেছে এই মাহা কিছু আছে যাহা কিছু দেখিতেছি। এই পূর্ণ জ্ঞান, এই পূর্ণ শক্তি, এই পূর্ণ আনন্দই আমার অন্তর্যামী দেবতা, আমারই অন্তরাত্মা, আমিই। কিন্তু এ জ্ঞান, এ শক্তি, এ আনন্দ আছে লুকাইয়া আমার ভিতরে, আমার বাহিরে সে শুধু ছায়াটি প্রসারিত করিয়া দিয়াছে—লক্ষ্য উহাদিগকে প্রকট করা, দীপ্ত করিয়া ধরা। জীবন-বাহৃতঃ বর্তমানে হইতেছে খণ্ড-জ্ঞান, খণ্ড-শক্তি, খণ্ড আনন্দ অর্থাৎ ভুল-সত্য, দুর্বলতা-সবলতা, সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্ব এই দ্বন্দ্ব দূর করিতে হইবে, খণ্ডকে সম্পূর্ণ করিতে হইবে। শরীর-রোগ-মৃত্যুর দাস, প্রাণ-শাস্তি-অসামর্থ্যের দাস, হৃদয়-ভবিচাক্ষুণ্যে কোহ্যলানাম অনবুজ্জি কল্পনার মায়ামরীচিকার বাদবিচারের শুষ্ক জালজঞ্জালে অন্ধ শরীরকে অমৃতময় করিয়া ধরিতে হইবে, প্রাণে অটুট শাস্তি অব্যর্থ কর্মসামর্থ্য থাকিবে, হৃদয় স্বচ্ছ প্রশান্ত প্রেমে ভরপুর হইবে, মন সরল দিব্যদৃষ্টির ক্ষেত্র হইবে; পূর্ণ জ্ঞানের দৃষ্টি দিয়া সব দেখিব, বুঝিব, পূর্ণ শক্তির প্রেরণায় জীবনের কর্ম করিব, পূর্ণ আনন্দের প্রতিষ্ঠিত থাকিব—ইহাই ভাগবত জীবন। মানবসত্ত্বের মধ্যে নত ভাব শরীরী হইবে, ভূতলে স্বর্গরাজ্যের প্রসারও ততই বাড়িয়া যাইবে। মানবের ব্যক্তিগত জীবনে এই স্বর্গের প্রতিষ্ঠা হইলে, তাহাকে সামগ্রিক জীবনে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, নতবা—তাহা পূর্ণ হইবে না—সমস্ত

অর্থাৎ পরস্পরের সকল রকম আদানপ্রদানে, সামাজিক জীবনে তাহাই নয়, সমাজের সহিত সমাজের, জাতির সহিত জাতির, দেশের সহিত দেশের সম্বন্ধেও ইহাকেই প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

লক্ষ্য ত এই, কিন্তু উপায়? উপায় হইতেছে যোগসাধনা। এই যোগসাধনার কথা আমরা বহুবার বলিয়াছি, ভবিষ্যতেও বলিব—এখানে আজ সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা সম্ভব নয়। সে উপায় যাহাই হউক, সে উপায়ের সার্থকতার জন্ত আগে যাহা দরকার সেই জিনিষটির কথাই আজ বলিব। লক্ষ্য দেখিলাম, উপায়ও আছে কিন্তু সে জন্য চাই শ্রদ্ধা, অটুট অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা চাই ভগবানে, শ্রদ্ধা চাই ভাগবত জীবনে, শ্রদ্ধা চাই নিজের উপর। এই শ্রদ্ধা থাকিলে সব হইবার আশা থাকে, এই শ্রদ্ধা না থাকিলে কিছুই হয় না—স্মরণ কর গীতার বাণী, যো যৎ-কৃতঃ স এব সং—যাহার যে শ্রদ্ধা সে তাহাই হয়।

ভগবানে শ্রদ্ধা অর্থ তাঁহার ও তাঁহার শক্তি সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট বর্ণনামাত্র নয়—একটা মানসিক বিশ্বাস, আন্তরিক্য বুদ্ধি (credo) বা চিত্তের বেগ নয়। সে রকম ভাব প্রায় সকল মানুষেরই আছে, ঠিক বিপদের সম্পদের সময়টিতে তাহা হঠাৎ জাগিয়া উঠে কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সাগর-ফেউএর মত তেমনি সহজে অবলীলাক্রমে মিলাইয়া যায়। ভগবানে শ্রদ্ধা অর্থ যে শ্রদ্ধা জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, যে শ্রদ্ধার ভরে আমরা আমাদের সমস্ত সম্ভাব্যানি দিয়া ভগবানে বিশ্বাস করি, তাঁহাকে আঁকড়িয়া ধরি, কোন কিছু না রাখিয়া সম্পূর্ণভাবে তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করি। ভগবানে শ্রদ্ধা অর্থ সেই শ্রদ্ধা যাহা একবার প্রতিষ্ঠিত হইলে আর টলে না—তাঁহা যদিও দেখি আমাদের ভাব আমাদের উদ্দেশ্য যাহাকে আশ্রয় করিয়া নবজীবন পাইতে চলিয়াছি সে সব বিফল হইয়া যাইতেছে তবুও শ্রদ্ধা থাকিবে অটুট অচল। অপ্রত্যাশিত সিদ্ধির বিজয়ের সময়ে যখন, পরম অসিদ্ধি সম্পূর্ণ পরাজয়ের সময়েও একই ভাবে সেই শ্রদ্ধা বিকৃত থাকিবে।

তারপর চাই ভাগবতজীবনে শ্রদ্ধা। জীবনের মধ্যে ভগবানকে, পৃথিবীর মৃত্তিকা দিয়া স্বর্গের দেবতাকে গড়া, এ আদর্শকে পূর্ণ করিতে চাই, চাই ইহাতে একনিষ্ঠ হইয়া থাকা। সেই সাধকের মত হইলে চলিবে না, যে বলিয়াছিল ব্রহ্মসাধনার জন্য আমি পাঁচ বৎসর দিলাম, এই

পাঁচ বৎসর সন্মাসী হইয়া পাহাড়ে থাকিব, ইহার মধ্যে যদি ব্রহ্ম মিলে, নতুবা ফিরিয়া আসিয়া সংসার করিব। এ রকম অশ্রদ্ধাভরে, সন্দেহে স্নায়িত চিত্তে সে আদর্শকে অনুসরণ করে, সে কখন কৃতকার্য হইবে না। ভাগবত-জীবনে আমাদের যে বিশ্বাস হয় না তাহার কারণ আর কিছু নয়, সে হইতেছে আমাদের পূর্ব শিক্ষা, আমাদের প্রাচীন অভ্যাস, আমাদের সংস্কার—সেই জিনিষটি যাহা নূতন কিছু দেখিলেই কেমন অস্বস্তি বোধ করে। তাই শ্রদ্ধার জোরে আধারের মধ্যে এই নূতন সংস্কারের বীজ রোপন করিতে হইবে, নূতন অভ্যাসে নূতন শিক্ষায় তাহাকে সহজ স্বাভাবিক করিয়া আনিতে হইবে। এই শ্রদ্ধার জোরেই জ্ঞান আসিয়া দেখা দিবে, চোখে আব্দুল দিয়া নির্দেশ করিবে যে এ আদর্শ ভগবানে নূতন সৃষ্টির ইচ্ছা, জগৎকে নূতনরূপে গড়িবার প্রেরণা।

তারপর চাই নিজের উপর শ্রদ্ধা। নিজের শক্তিতে চাই অহং আস্থা। মানুষ যে দুর্বল অশক্ত, তাহার কারণ শক্তির উপর অশ্রদ্ধা আর দুর্বলতার উপর শ্রদ্ধা। মানুষের সামর্থ্য যে এত অল্প তাহার কারণ প্রথমতঃ সে মনে করে এ সামর্থ্যকে বিপুল অসীম করা অসম্ভব দ্বিতীয়তঃ সে জানে না কি করিয়া সামর্থ্যকে বাড়ান যায়। ফলস্বরূপ জীবনে প্রতি মুহূর্তে যে সরল সত্যটি প্রমাণিত হইতেছে, আমাদের নিজেদের প্রত্যেকেরই পরিচিত যে অভিজ্ঞা তাহাকে ভুলিয়া বাইতেছি—তাহা এই, অসম্ভবের জন্ত চেষ্টা করিলেই তাহা সম্ভব হইয়া আসে। বাস্তবিকপক্ষে জগতে যে দুঃখ দৈন্য সেটা মানুষের করা কাজ—সেটি কুদ্বি-জিনিষ, কৃত্রিম কেননা তাহা না থাকিলেও চলে, তাহার অবশ্রুতাবি কিছু নাই। নিজের শক্তির শ্রদ্ধার উপর একবার দাঁড়াও, দেখিবে তোমার শক্তি কত বাড়িয়া গিয়াছে, পথ কত সহজ হইয়া আসিয়াছে, লক্ষ্য অদূরপর্যন্ত নয়। কিন্তু একটি বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত, এই নিজের উপর শ্রদ্ধা ইহা আত্মরিক অহংকার বা আত্মসত্তারিতা নয়। প্রজ্ঞার উপরই প্রতিষ্ঠিত—জ্ঞান বলিয়া দিতেছে আমরা সকল জীবই এক, এক মহাশক্তি এক ভগবান এই বিভিন্ন আধারে বাস করিতেছেন—ঈশা বাস্তবিক সর্বং—এং প্রতি আধার প্রতি কেন্দ্র তাহারই পূর্ণতার পূর্ণ। এই পূর্ণতা পূর্ণ তাহার প্রকৃত অন্তরাত্মার প্রতি জীব যখন জগৎ রিত হয় তখন তাহার পক্ষে সবই সম্ভব।

এই কর্মে তৎপর হওয়া আমাদের উচিত। তাই
এই শ্রদ্ধা, সেই তপশ্চিন্তা যাহা লক্ষ্যের দিকে
স্থিরভাবে, সেখানে মত্ত আকাঙ্ক্ষার জবরদস্তি নাই,
নাই। আমাদের সাধনা এত দিন যদি শিথিল
কারণ এইখানে। আদর্শকে আমরা সকলেই
স্বীকার লইয়াছি কিন্তু এই স্বীকার করার মধ্যে
ও তর্কবুদ্ধির বিশ্বাস, কোথাও অন্ধ চিত্তাবেগের
হইতে চলিয়াছে। এই দুইটিকে কাটাইয়া জ্ঞানদীপ্ত
উষ্ণতা দাঁড়াইতে হইবে।

এই জাগ্রতভাবে পাই নাই বলিয়াই এ যাবৎ আমাদের সাধনা
একমন পক্ষ হইয়া রহিয়াছে। এবার যেখানে যতটুকু বাকী ছিল সব
শ্রমবশত, কালীশক্তিতে চালিয়া দিয়া, মুক্ত শুধু নয় সিদ্ধ হইয়া উঠিতে
হইবে। অনন্তকাল সম্মুখে পড়িয়া আছে—সাধনার প্রথম অবস্থায় এ ভাব
ধাক্কি প্রয়োজনীয় হউক না, আজ সে রকম তামসিক ভাবকে আশ্রয়
আলো চলিবে না। সিদ্ধি আজই এইখানেই হইবে এই সঙ্কল্প এই শ্রদ্ধা
বাহী অগ্নিশক্তি নববর্ষে আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হউক। নববর্ষের-নবীন
বর্ষাকে ডাকিয়া আজ আমরা সমস্ত প্রাণ মন দিয়া বৈদিক ঋষির অগ্নি-
শ্রদ্ধা বলিব, হে স্বর্গের হুহিতা উদ্ভিত হও, আমাদের কর্মকে কেবলই
পাইয়া বিনাইয়া সুদীর্ঘ করিও না, আর বুঝা কালক্ষেপ করিও না
হাকে সংহত সংযত অব্যর্থ আশুফলদায়ী করিয়া তুল।

বুদ্ধা হুহিতর্দীবো মা চিরং তমুথা অপঃ।

চতুর্থ অধ্যায়

ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ—এই চারিটি জিনিষের উপরই
জীবন। এই চারিটি জিনিষের চরিতার্থতায় মানুষের
চতুষ্টয়কে এক সঙ্গে ধরিয়া চলিতে হইবে; কোনটি
একটিকে আর একটি হইতে পৃথক করিয়া নয়, যুগপৎ
করিতে হইবে, যুগপৎ ইহাদের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।
যে উচ্চ আর কোনটি যে নীচ, কোনটি যে শুধু ঐহিক
যে শুধু পারত্রিক, তাহা নয়। সকলেরই সমান মূল্য, সমান
পরিধায়ে—ঐহিক পারত্রিক নয়, সকলে মিলিয়া অধ্যাত্ম জীবনেরই বি
টিকে গড়িয়া ধরিয়াছে।

প্রথমে ধর্ম। চাই সর্বোত্তম জীবনের একটা বিধান, যথানির্দিষ্ট ব্যবস্থা
একটা নিয়মপ্রণালী যাহা অনুসরণ করিয়া জীবনকে সজ্জাইতে হইবে
গড়িয়া তুলিতে হইবে। আকাশে যেমন দেখি কি এক বিপুল অ
শুভালা পাতা রহিয়াছে যাহার জোরে স্বর্গা উঠিতেছে ভুবিতেছে, চন্দ্র ভূ
তেছে উঠিতেছে, নক্ষত্রমণ্ডলী অব্যাহতভাবে ঘুরিয়া চলিয়াছে; সমস্ত
বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই যেমন এক উদার নিবিড় মহা এক্যতানকে খেলাইয়া চ
য়াছে—সেইরকম মানুষের ভিতরে বাহিরে, তাহার সমস্ত জীবনে
ভরিয়া ঘুরিয়া থাকিবে একটা গভীর নিয়ম, বিপুল শুভালা, বির
এক্যতান। ধর্ম হইতেছে মানুষের জীবনের মূল নকসা, তাহার রেখা
চিত্র—এইটিকে আশ্রয় করিয়া, ইহারই নির্দেশ অনুসারে আলোচ্য
ফেলিতে হইবে, রঙ চড়াইতে হইবে। ধর্ম অর্থাৎ পাইতে হইবে একটা
মূল সূত্র যাহার উপর জীবনের মালাটি গাঁথিয়া ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে।

তারপর অর্থ—বিষয়, উপকরণ, ঐশ্বর্য্য। ধর্ম দিয়াছে জীবনের কাঠাম,
মোট রেখায় টানিয়া দিয়াছে জীবনের ধারাগুলি। এখন চাই কাঠামকে
ভরিয়া তুলিবার জন্ত মালামসলা, যাহাকে আশ্রয় করিয়া সে ধারা স
পরিপূর্ণ, উজ্জ্বল, বহুভঙ্গিমকল্পিত হইবে সেই বস্তুসম্ভার। কল্যাণ

স কি হইবে, সেই স্রুতার মধ্যে গাঁথিবার জ্ঞান ফুলরাজী
 দিগ্বিদিক চাই। নিয়ম, শাস্ত্র পাইয়াছি, কিন্তু সে নিয়মকে সে
 যোগ করিতে হইবে, তাই চাই বাস্তব জিনিষের সমাহার।
 বস্তুসংগ্রহে কোন দীনতা, কোন কার্পণ্য, কোন কুণ্ঠা থাকিবে
 যথানে যত ভাল জিনিষ পাওয়া যায় সব খুঁজিয়া বুড়াইয়া আনিতে
 কোথা হইতে ফিরিলে চলিবে না। সর্পের মাথায় যে মণি, সাগ-
 তলে যে মুক্তা, পর্বতগর্ভে যে হীরা সে সকলেরই আবেষণে
 তোড়রে চলিতে হইবে। নন্দনের পারিজাত হইতে পাতালের কোথায়
 ফুল ফুটিয়াছে—তাহারও ফুলের সুষমাসৌন্দর্যটুকু আহরণ করিতে
 হইবে। সপ্তভুবন হইতে সপ্তস্বরকে ডাকিয়া আনিতে হইবে, শুধু সপ্ত-
 কেন অজানা অচেনা সংখ্যাহীন স্বরকে স্বরকে এই জীবন-বীণায় বদ্ধ করিয়া
 তুলিতে হইবে। সকল রকম অশন ভূষণ সকল অলঙ্কার সৌন্দর্য থাকিবে
 এই জীবন-দেবীর জন্ত। জীবন হইবে মহান, বিপুল, বিশাল, ভরাট।

* * *

তারপর কাম—চাই ভোগ। জিনিষের রসগ্রহণ করিতে হইবে,
 আনন্দে ভরপুর হইতে হইবে। শুধু জিনিষ থাকিলে হয় না, তাহা
 ভোগ করার ক্ষমতা চাই। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ত অজস্র অফুরন্ত ভোগের
 সামগ্রী পড়িয়া আছে, কিন্তু কয়জনের তেমন সামর্থ্য, তেমন সাহস আছে
 যে তাহার কোটা অংশের এক অংশও কিছু ভোগ করে? সাহসেও
 আবার শুধু হয় না, সামর্থ্যও সব হয় না, সেই সঙ্গে চাই কৌশল।
 কৈজরের সাহসও ছিল, সামর্থ্যেরও বোধ হয় অভাব ছিল না—কিন্তু
 তাহার আজ এ অবস্থা কেন? হাঁ, নীটশের মত বলা চাই, আমরা
 ভোগ করিব—the best food, the purest sky, the strongest
 thought and the fairest woman—কিন্তু সেজন্ত আগে নিজেকে
 প্রস্তুত করিতে হইবে, ভিতরে আপন সত্তাকে নতুনভাবে গড়িয়া তুলিতে
 হইবে। অর্থাৎ প্রাণশক্তির পরিপূর্ণতা—ধারণসামর্থ্যের সঙ্গে যোগ করিতে
 হইবে জ্ঞানশক্তি, তপশ্শক্তি। অল্প কথা, ভোগ্য দ্রব্য আহরণ করিতে
 হইবে, সাজাইয়া ধরিতে হইবে ধর্মের ব্যবস্থা অমুসারে, ধর্ম যে দ্বারা টানিয়া
 দিয়াছে সেই অমুসারে চলিয়াই আমরা পাইব অর্থের, পাইব কামের চরিতার্থতা
 কিন্তু এই ধর্ম, এই অর্থ, এই কামকে তুলিয়া ধরিত্ত হইবে মোক্ষের মধ্যে।

তাই সকলের উপরে চাই মোক্ষ। মুক্তিই ধরিয়া থাকিবে, করিবে আমাদের ধর্ম, আমাদের অর্থ, আমাদের কাম। মুক্তি জ্ঞানশক্তি তপশ্শক্তি, মুক্তির মধ্যেই বস্তুসংগ্রহের প্রতিভা, ভোগের বদ্ধ যে, প্রকৃতির দাস যে সেই অন্ধ, অসহায়—সেই খুঁজিয়া মরিতেছে ধরিয়া জীবনকে স্ফূর্তভাবে চালাইবে, আজ জীবনকে সাজাইতে চলিয়াছে সুখস্বস্তির উপর নির্ভর করিয়া, কাল আবার প্রাণের আবেগ আকাঙ্ক্ষা একমাত্র করিয়া ধরিয়াছে, পরশু বিচার বিতর্ক করিয়া একটা মনগড়া ব্যবস্থা স্থাপন করিতেছে—আজ বলিতেছে সমাজই বিশ্বজীবনের কেন্দ্র, কাল বলিতেছে রাষ্ট্র সমাজেরও উপরে, আজ বলিতেছে স্বদেশ, কাল বলিতেছে সমস্ত জগৎ। প্রকৃতির দাস সে, তাই প্রকৃতি তাহাকে যতটুকু দিতেছেন, সেই-টুকুই সে পাইতেছে—জোর জবরদস্তির ফলে নিজেকে আহত রক্তাক্ত করিয়া তুলিতেছে মাত্র। ভোগের জিনিষ সব অসভ্য বর্বরদের মত একাকার শুপোকত করিয়াছে, দুই হাতে দলিয়া, সমস্ত সঙ্গে লেপিয়া গ্রাসে গ্রাসে গলাধঃকরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। ভোগের জিনিষ যে কি, প্রকৃত ঐশ্বর্য কি রকম তাহা সে জানে না, তাহার রসাস্বাদন করিবার কৌশলও সে জানে না। কিন্তু মুক্তপুরুষের কাছে প্রকৃতি হইতেছে দাসী অথবা বৈদিক ঋষির কথার, বধু যেমন সকল সাজসজ্জা করিয়া আপনার পূর্ণ আপীন যৌবনখানি ধরিয়া দিবার জন্য আপনা হইতেই উদগীৰ্ব হইয়া চলিয়াছে স্বামীসকাশে সেই রকম এই প্রকৃতি তাহার সমস্ত ঐশ্বর্য সমস্ত সৌন্দর্য্য চালিয়া দিয়াছে মুক্তপুরুষের চরণতলে, প্রকৃতি যে কি নিপুণ কলাবতী, কি অতুলনীয় রসিকরাণী তাহা জানে, অনুভব করে একমাত্র মুক্তপুরুষ। মুক্তির মধ্যে অনাবিল অক্ষত আনন্দ, মুক্তির মধ্যে আনন্দের বিপুল বৈচিত্র্য, বিশ্ব ঐশ্বর্য্য। মুক্তির মধ্যেই বিদ্যত এই বৈচিত্র্যময় আনন্দের অটুট সামঞ্জস্য।

কর্ম-সাধনা

করিবার ত অনেক রহিয়াছে, তুমি কতখানি করিতে পারিয়াছ? আজ না হয় আত্মসমর্পণ মন্ত্রটি তোমার কানে গিয়া বাজিয়াছে, ভগবানের করা না হইলে কিছুই করিতে নাই। শুনিয়া চীৎকার করিয়া বলিতেছ, এইবার আমরা পঙ্গু হইয়া যাইব, জড় হইয়া পড়িব। বলি এতদিন ত এ তত্ত্ব এমন সজোরে দেশের হাওয়ায় উড়িয়া বেড়ায় নাই, তোমরা করিয়াছ কি?

“বন্দেমাतरम्” মন্ত্র-উচ্চারণ করিয়া স্বদেশসেবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলে, দেশের অগাধ দুঃখ কতটুকু কমাইয়াছ, জীবনপণ চেষ্টায় দেশকে কতটুকু উন্নত করিয়া তুলিয়াছ? অক্লান্ত কৃষীর দল, আজও তোমার অবাধ ক্ষেত্র, কর্ম হইতে নিবৃত্ত হইতে কেহ ত বলিতেছে না, অসীম কর্মক্ষেত্রে আগাইয়া যাও, সিদ্ধি পাইলে দেশই ত উহা ভোগ করিবে, নানা জনে নানা কথা কহিতেছে, উহাতে কর্মপাত করিও না, তোমার কর্মনিষ্ঠা যেন কোন মতেই ভঙ্গ না হয়।

জগতে কেহ কাহাকেও বাধা দিতে পারে না, ভগবানের সিদ্ধি প্রতি-জনের ভিতর দিয়াই প্রকাশ হইতে চাহিতেছে। বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে বিচিত্র কর্ম চিরদিন থাকিবে, বিচিত্র সাধন পদ্ধতিও লোপ পাইবে না, যে যে পথ দিয়া পার, জগৎকে আজ স্বর্গে পরিণত করিয়া তোল। এই পৃথিবীর জন্তই রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু আজও পৃথিবীর আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি হয় নাই। যুরোপের মনীষীবৃন্দ জগতে চিরশান্তি প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ, এদিকে আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া সব সিদ্ধি গুলিয়া পড়িতেছে, অলক্ষ্যে বিধাতার বিকট বিজ্ঞপ বজ্রগর্জনে অলিয়া উঠিতেছে—কোন সাধকের চরম সাফল্য আজ জগতকে ধন্য করিয়া তুলিবে তাহার স্থিরতা কি? হে মানব! সম্মুখে তোমার অনন্তবিস্তৃত পথ, তুমি নিরাশ হইও না, বিপরীত হউক অল্পকাল হউক, অসংখ্য নূতনের আবির্ভাবে আত্মপ্রদর্শিত নির্দেশ অমাত্র করিয়া যোগদ্রষ্ট হইও না।

আমরা মানুষের কর্মপ্রেরণাকে ত কোন দিনই স্বত্ব করি নাই,

ভাষার সব ইন্দ্রিয়ের দরজাগুলি নিত্য খুলিয়া রাখিবারই উৎসাহ দিয়াছি,
“গহনা কর্মণো গতিঃ” কর্মের গতি কেহ স্থির করিয়া দিবে না।

যেখানে বিশ্বাস নাই, আত্মপ্রতিষ্ঠা নাই, গডলিকাপ্রবাহের মত
মানুষ যেখানে ভাসিয়া চলিয়াছে, তাহারই স্রোতঃবেগ প্রবলশক্তিতে রুদ্ধ
করিয়া তাহাদিগকে উজান পথে ঠেলিয়া ধরিব, ইহাই আমাদের ব্রত,
ইহাই আমাদের তপস্যা, আমরা জাতির নিম্নমুখী প্রবৃত্তিকে উর্দ্ধের বিজ্ঞান-
ময় মন্দিরের পথে পরিচালিত করিব। জ্ঞানি কর্ম দুঃসাধ্য কিন্তু কালীর
করুণা অপরিসীম, শক্তি অসাধারণ—বিশ্বাস হইয়াছে এ কার্য আমরাই
করিব।

আমরা কাহারও প্রতিষ্ঠানক্ষেত্র ভাসিয়া দিব না, কোনও বিরোধ
করিব না, বিদ্বেষ আমাদের নাই। আমাদের যিনি চালাইয়াছেন, তিনি
সর্বস্বত্ব এবং সর্বশক্তিমান, জগতের প্রতি কীটাপুণ্ড তাঁরই চালনার নড়িয়া
বেড়াইতেছে, কি জড়, কি চৈতন্য সমস্তই তাঁর সৃষ্টি—সকলের মধ্যেই
তিনি পূর্ণভাবে অবস্থিত, স্তবরাং বিরোধ করিব কি, ধ্বংস করিব
কাহাকে? তবে আজ লীলার আনন্দে বিভোর হইয়াছি, সৃষ্টির আড়াল
হইতে তাঁহাকে টানিয়া বাহির করিব, তাঁহারই দিব্য জ্যোতিঃতে জগতের
সকল বস্তুই আলোকিত হইয়া উঠিবে।

এই নূতন খেলার আরম্ভ কেন্দ্র অন্বেষণ করিতেছ, দল বাঁধিয়া একটা
গতির চিত্র ছকিয়া লইবার প্রচেষ্টা করিতেছ? আমি বলিব তোমায় ভূতে
পাইয়াছে, ভগবানে পায় নাই, ভগবানের আবার আরম্ভ কি, শেষ কি,
তিনি অনাদি, আরম্ভ ত হইয়াই আছে, তুমি সবখানি উৎসর্গ করিলেই
তাহা বুঝিতে পারিবে।

তোমার চোখ দেখিয়া বুঝিতেছি, তুমি আমার কথা হেঁয়ালির মত
অবাক হইয়া শুনিতেছ, তলাইয়া বুঝিতেছ না; রহস্য ত তেমন গভীর
নয়, জটিল নয়, খুব সরল এবং স্পষ্ট। আপনাকে হারাইয়া, নিজের নয়
পরের উৎকৃষ্ট বুদ্ধিগ্রহত পছাগুলির স্ফূর্ত চিত্রপটে তুমি বিমুগ্ধ। বৃহৎ
কর্মানুষ্ঠানের সকল সম্ভাবনা তোমার মধ্যে রহিয়াছে, তাহা তুমি জান না
বলিয়াই অতি ক্ষুদ্র অন্তর্যানেও দশজনের মুখ চাহিয়া মর, আর দশজনের
সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কার্য করিবার জন্ত, কাজটাকে দশজনের মনের মত
করিতে গিয়া তাহাকে কাটিয়া ছাটিয়া বিরূপ করিয়া তোলা। কাজের-নেশায়

অভীষ্ট মূর্তির বিকৃত রূপ চক্ষে পড়ে না, খুব কাজ করিয়া চল, শেষে অগাধ পরিশ্রমের পর আত্মতৃপ্তির অভাব বুঝিয়া দারুণ অবসাদে ভাসিয়া পড়। এইরূপ কাজ আর তোমাদের করিলে চলিবে না, ভগবানের দেওয়া জীবন লইয়া, আর যথেষ্টাচার করিতে পারিবে না। আজ আদেশ আসিয়াছে তাঁরই নির্দেশ অনুসারে আমাদের চলিতে হইবে, তাই জীবন-রথ সহসা থামিয়া গিয়াছে, ইহা এইখানে দাঁড়াইয়া চিরদিন অচল হইয়া রহিবে না, দ্বিগুণ বেগে সত্য পথটী ধরিয়া ছুটিয়া চলিবে।

যুরোপ যেমন বাহিরের কার্যগুলির এক একটা স্বল্পভাগ বিশ্লেষণ করিয়া তাহার নিদান অথবা প্রতীকার নির্ধারণ করে, তোমরাও সেইরূপ বাহির হইতে ভিতরে আসিবার উপায়টিকেই একমাত্র উপায় বলিয়া মানিয়া লইয়াছ, একেবারেই নিদান হইতে স্থলে নামিবার বিজ্ঞানটী অসম্ভব বলিয়াই তোমাদের ধারণা জন্মিয়াছে, ভারতের যোগশক্তি তোমাদের এই হীন পন্থা অবলম্বন করিতে দিবে না, ইহা প্রব জানিও।

তোমরা বলিবে যুরোপের কর্মপন্থা যদি উৎকৃষ্টই না হইবে, তবে উহার এতটা উন্নতি করিল কি প্রকারে? এই কথাটার উত্তর এক কথা দিলে বড়ই রুঢ় হইবে, তাহাতে তোমরা উপেক্ষার হাসি হাসিয়া উঠিবে, কিন্তু উহাদের উন্নতি যে বালুর উপর গৃহনির্মাণ, উহা যে তাদের ঘর দেখিলে না, রুম সম্রাটের বিরাট সৌধ একদিনে কেমন ভূমিশায়ী হইল, মধ্যযুরোপের সর্বপ্রধান শক্তিকেই কাইজার এক মুহূর্তে কিরূপ মাটিতে ম্লুটাইয়া পড়িল? ক্ষুদ্র পরমায়ু—তাই অনন্তকালের অতি ক্ষুদ্র অংশকে তোমরা অতি দীর্ঘ করিয়াই দেখ, সেইজন্য বুঝিতে পারিবে না, যুরোপের দর্শন অচিরেই ভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত হইবে। ভারতের গগনে নূতন সূর্য উঠিতেছে, এই নূতন আলোকে নূতন দৃষ্টি দিয়া দেখ—কোথা হইতে তোমার কর্মারম্ভ।

প্রতি সাধকের হৃদয়ে আজ যে অমর ভাব স্থান পাইয়াছে, উহাকেই কর্মরূপে প্রকাশ হইতে দাও। একজনের কর্ম অপরজনকে পাইয়া বসিলে তাহার স্বতন্ত্র স্বাধীন ভাবকে থর্ক করা হয়, হয়ত উহা আর প্রকাশও না হইতে পারে, ইহাতে সৃষ্টির পূর্ণতা আসিতে বিলম্ব ঘটিবে। এইজন্য সাধকমণ্ডলী পরস্পর মিলিত হইবেন, কিন্তু কোন কার্যপ্রণালী দ্বারা কাহাকেও আবদ্ধ করিবেন না। সংঘ চাই, নতুবা ব্যাপ্তি আসিবে না, কিন্তু

শাসনকেজে কাহারও স্বাধীন জীবনবিকাশ যেন নিয়ন্ত্রিত না হয়।

এত কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সাধনার পথে চলিলেও সাধক পূর্বপ্রভাব হইতে একেবারে মুক্ত নয়, স্বযোগ ঘটিলেই দশজনে মিলিয়া একটি নির্দিষ্ট কর্মকেজে স্থাপন করিয়া বসে, এবং সেই কেন্দ্রের নিয়মেই সকলের কার্য নিয়ন্ত্রিত হয়। এরূপ করিলে, ভারতের যে তপঃশক্তি তাহা সাধকমণ্ডলীর ভিতর সহজে জাগ্রত হইয়া উঠিবে না।

সত্য বটে এইরূপ না করিলে, মনে হয়, প্রত্যেক সাধক যথেষ্টাচার করিবে, এবং ব্যষ্টির এই উদ্যোগ গতিটী কেন্দ্রস্থ না হইলে বৃহৎ কর্ম সংসিদ্ধ হইবে কেমন করিয়া? যিনি সিদ্ধি পাইয়াছেন, তিনি জানেন কোন সাধকই আত্মাকে অতিক্রম করিতে পারিবে না, এবং আত্মার আত্মা সেই পরাংপর পুরুষের ইচ্ছাটী নিশ্চয় পরিপূর্ণ হইবে। সেইজন্ত তাঁহার অদৃষ্ট তপঃশক্তি এমন এক অভাবনীয় ভাবে কার্য্য করিতে থাকে, যে তাঁহার পরিচিত এবং অপরিচিত সকলের কার্য্যই কোন এক দৈবী নিয়মে শৃঙ্খলিত হইয়া বৃহৎ স্থষ্টির সহায়তা করে।

আমরা আজ আত্মসমর্পণ যোগীদিগকে এই কর্মপদ্ধতিটী ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে বলি, তাহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই বাহিরের কর্ম সাধিত হইতে থাকিবে, স্বতরাং প্রকৃত উৎসর্গীকৃত সাধক, তাহার জীবন গতিহীন হইয়া পড়িতেছে, এরূপ ধারণা করিতেই পারে না। যেখানে এমন অনুভূতি রহিয়াছে নিশ্চয় বৃদ্ধিতে হইবে, সাধনার পথে কোথাও ত্রুটি ঘটয়াছে। এ অবস্থায় যে চারটী সহায়ের কথা আমরা বার বার বলিয়া আসিতেছি, যথা গুরু, শাস্ত্র, কাল এবং উৎসাহ, ইহাদের সাহায্যেই আবার যোগপদ্ধতি সরল ও সহজ করিয়া লইবে। এ যোগে প্রত্যাবার নাই, পথভ্রষ্ট হইবারও ভয় কম আছে। সাধক, অগ্রসর হও।

কি শিখিলাম ?

যুদ্ধ থামিয়াছে। এত বড় যে একটা প্রলয়কাণ্ড, ইতিহাসে যাহার তুলনা পাই না, তাহার শেষ হইল। কিন্তু ইহা হইতে শিখিলাম কি ? কোন সত্য আশুপের রঙে আমাদের প্রাণে দাগ কাটিয়া দিয়া গেল, আমাদের চোখের পর্দা ছিড়িয়া কোন নূতন ভাব বাহিরে ছুটিয়া আসিল ?

সকলের আগে শিখিলাম অদৃশ্য এক শক্তির অস্তিত্ব। জানিলাম তোমার আমার শক্তি, কিছুই নয়, জন্মগত শক্তি বলিয়া কিছু নাই, ইংরাজ বা ফরাসী বা মার্কিন শক্তি বলিয়া কিছু নাই। সকল শক্তিই আর এক শক্তির হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিকা। মানববুদ্ধি বলিয়া কিছু নাই, কেহ বিচার করিয়া মাথা ফাটাইয়া যাহা ভাবিতেছে সে করিবে বা যাহা হইবে তাহা ঠিক সে করে না, তাহা হয় না। আর একজনের তপঃদৃষ্টি তোমার আমার সকল গণনা সকল প্রয়াস কোথাও এতটুকু আশ্রয় করিয়া মাত্র, বেশীর ভাগই বিধবস্ত বিপর্যস্ত করিয়া আপনাদের লক্ষ্যের দিকে ছুটিয়াছে। জন্মগত মহাশক্তি তাসের ঘরের মত কোথায় এক মুহূর্তে মিলাইয়া গেল, জন্মগত সে আশঙ্কা কখন করে নাই, ইংরাজও সে ভরসা করে নাই। ইংরাজের প্রতাপ এমন বিপুল বিরাট হইয়া উঠিবে, ইংরাজের শত্রু তাহা ভাবিতেও পারে নাই, ইংরাজ নিজেও তাহা ঘণাক্ষরেও টের পায় নাই। যুদ্ধ যে এমনভাবে শেষ হইবে কোন রাজনীতিক তাহা দেখিতে পাইয়াছিলেন ? এ কি অস্টন নয় ? বলিবে, মিত্রশক্তিসঙ্ঘের ছিল বুদ্ধিবল, শক্তিবল—তাই তাঁহাদের জয় হইয়াছে। ইহাতে আশ্চর্যের কি আছে ? কিন্তু জন্মগত বুদ্ধি ছিল না, শক্তি ছিল না ? সে বুদ্ধি সে শক্তি লইয়া জন্মগত কি করিল ? তোমরাই না দুই দিন আগে জন্মগত বুদ্ধি, জন্মগত শক্তি দেখিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলে ? তবে কেন এমন হইল ? আমরা বলি সেনাপতি ফোকের ফৌশল আর আমেরিকার সৈন্য ও দ্রব্য-সম্ভার হইতেছে ছুতামাত্র, এ সকল আর একজনের হাতের বস্ত্র। বিচার বুদ্ধি আর বাহুবলই যদি জয়ের নিয়ন্তা হইত তবে সেই যুদ্ধের প্রারম্ভেই পারসনগরীর একেবারে উপকণ্ঠ হইতে জন্মগত মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইত না—যুদ্ধ বহুদিন পূর্বেই শেষ হইয়া যাইত। আমরা বলি, তুমি তোমার

পথে চলিতেছ না, আমিও আমার পথে চলিতেছি না, আমরা দুইজনেই চলিয়াছি মুরারীর তৃতীয় পন্থায়। ইহাকেই বলি অঘটন, ইহাকেই বলি miracle—নূতন শক্তির আবির্ভাব। মানি, সকল শক্তির যদি হিসাব রাখিতে পার, হাতের মুঠিতে তাহাদিগকে ধরিয়া রাখিতে পার তবে নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিতে পার, সকল ভবিষ্যৎকে তোমার নখদর্পণে বাঁধিতে পার। কিন্তু কথা এই, তুমি তাহা পার না, আমিও পারি না, সেটি মানুষী বুদ্ধির কাজ নয়। পারেন যিনি তিনি মানুষ নহেন, তিনিই ভগবান্। জগতে কত শক্তি আছে, এই শক্তিরাজী স্তরে স্তরে সাজান, কতক গুপ্ত কতক ব্যক্ত—ব্যক্ত বাহ্য তাহারই একটা অংশ এই স্থল জগতের ঘটনা পরস্পরকে সাক্ষাৎভাবে চালাইয়া লইয়াছে, এই অংশেরও একটি ভাসাভাসা অংশ মানুষের বুদ্ধিতে, মানুষের অহংকারমিশ্রিত চেষ্টার মধ্যে প্রতিকলিত। শক্তির যে মূল, কেন্দ্র, উৎস—dynamo—তাহা লোকচকুর অন্তরালে, সেখান হইতেই শক্তির শতধারা বহিয়া আসিতেছে—এই ধারা আবার সমানভাবে একই পদ্ধতি ধরিয়া চলে না, dynamo ঘুরিতেছে আর প্রতি মুহূর্তেই নূতন শক্তিকে জন্ম দিতেছে, dynamo'র জোর আবার কখন কখন বাড়িয়া যায় শক্তিও তাই উপছাইয়া চলে, পদ্ধতিকে ভাঙ্গিয়া, গতানুগতিককে উল্টাইয়া মানববুদ্ধিকে বিমূঢ় করিয়া নূতন কিছু করিয়া চলে। জগতে এই মহাপ্রলয়ে আজ দেখিলাম এই রকম এক নূতন অভূতপূর্ব অদৃশ্যপূর্ব এক মহাশক্তির আবেগ।

দ্বিতীয় শিখিলাম জগতের মধ্যে প্রলয়ের সম্ভাবনা। আমাদের সহজ-বুদ্ধির ধারণা এই জগৎ চলে ধীরে মন্থরগতিতে, ধাপের পর ধাপ আস্তে আস্তে পার হইয়া। প্রকৃতির অব্যর্থ নিয়ম হইতেছে ক্রমবিবর্তন evolution অর্থাৎ পা টিপিয়া চলা। কোন একটা বিপুল আকস্মিক পরিবর্তন যেন প্রকৃতির বাতুতে নাই—Revolution হইতেছে প্রকৃতির অধর্ম। এমন কি, এ ধারণাও আমাদের অন্তরে বেশ লুকাইয়া আছে যে বিবর্তন বা পরিবর্তনও বোধ হয় কিছু নাই। স্বর্ঘ্য আজ যেমন উঠিতেছে ডুবিয়া ঝাইতেছে, চিরকাল তেমনি উঠিয়াছে ডুবিয়াছে, চিরকাল তেমনি উঠিবে ডুবিবে। গোলাপ ফুলটি যুগের পর যুগ একই ভাবে ফুটিতেছে, ঝরিতেছে। মান্বাতার সময়ে মানুষ যে রকমে প্রেম করিত, আজও সে সেইভাবেই করিতেছে। মানুষের সুখ দুঃখ হাসি কান্না অভাব অভিযোগ

আশান্তরণ তথাকথিত সত্যযুগেও যেমন, এই ঘোর কলিযুগেও ঠিক ভেমন। জগৎটা অতি পরিচিত, অতি পুরাতন স্তরায় vanity of vanities! সাহিত্যে ইতিহাসে আমরা যতই পড়ি না কেন, আমাদের নিজেদেরও স্বপ্নে কল্পনায় যতই আকাশ-কুসুম দেখি না, তবুও বিশ্বাস হয় না, শ্রদ্ধা হয় না, অন্তরে কোন এক অবিশ্বাসী সবজানতা পুরুষ বসিয়া বসিয়া হাসিতেছে আর টাটকারী দিতেছে। কিন্তু আজ সে জীবটির স্থূলত হাসি কাষ্ঠহাসিতে কি পরিণত হইতে চলে নাই? আজ চোখে আঙ্গুল দিয়া কে দেখাইয়া দিল যে জগতে নূতনও সম্ভব হয়, জগৎ যে গড্ডলিকা প্রবাহেই চলে তাহা নয়, সেখানে বিপুল তোলপাড়, যাহাকে সম্ভব মনে করিতেও ভয় হয়, এমন জিনিষও ঘটে? - আজ আমরা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছি যে জগতের গতি, সৃষ্টির বিবর্তন কেবল মন্থর গতি নয়—এমন সময়ও আসিয়া থাকে যখন তাহা অধীর বাস্তব হইয়া উঠে, যুগের যুগের কাজ যখন সে এক মুহূর্তেই শেষ করিয়া ফেলে।

কলতঃ প্রলয় বিবর্তনের এক অব্যর্থ অঙ্গ। প্রলয় ব্যতিরেকে জগতের গতি নাই, উন্নতি নাই। ধীরে চলা যখন সৃষ্টির অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, ধীরে চলা হইতে যখন সে বসিয়াই পড়িতে চায়, ঘোর তামসিকতা যখন মানুষকে মুহমান করিয়া ফেলিতেছে, পুরাতন যখন অচল কঠিন নিরেট হইয়া পড়িয়াছে, বাহিরের খোলস এত স্থূল হইয়া উঠিয়াছে যে ভিতরের মনের চলাচল প্রায় বন্ধ তখনই কালপুরুষ, প্রকৃতির অন্তর্ঘাতী শক্তি রুদ্ধমূর্তি লইয়া অবতীর্ণ হন, সকল বাধা সকল বাধা ঠেলিয়া ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া ছুটিয়া চলে। ধর্ম যখন জড়বস্ত, পাপের ভারে পৃথিবী যখন ক্লিষ্ট তখনই বাস্তুকী মাথা ঝাঁকিয়া উঠেন, তখনই প্রকট হয় কালীর তাণ্ডব নৃত্য, পুরাতনকে বিসর্জন দিবার জ্ঞা, নূতনের প্রতিষ্ঠা করিবার জ্ঞা—পরিভ্রাণায় সাধুগণ—বিনাশায় চ হস্ততাং—আবিভূত হয় ধুমকেতুমিব কিম্পিকরাল মহাশক্তি। সে শক্তির কাছে দেশ কাল পাত্রের প্রতিবন্ধক নাই। চোখের নিমিষেই সে শক্তি দূরকে নিকটে, স্বপ্নকে জাগ্রত সত্যে পরিণত করে। মুকং করোতি বাচালং, পশুগ্ লজ্জয়তে গিরিং।

আজ শিখিলাম অন্তর সে অহংকারী যে জ্ঞাতাচারী যে নিজের ধ্বংসকেই সে কেমন নিজেই ডাকিয়া আনিতেছে। যে যত বড় অন্তর তাহার

ধ্বংস ততই অনিবার্য ততই আস্ত। অথবা যে-অস্তুরকে ভগবান ধ্বংস করিতে চাহেন, যে শক্তি সৃষ্টির উন্নতির অন্তরায় সে শক্তিকে আমূল বিনাশ করিবার জন্তই যেন এক মহাশক্তি এমন বিপুল দুর্জয় করিয়া তুলেন—তাহাকে নির্বংশ করিবার জন্তই যেন ব্রহ্মদেব তাহাকে রক্তবীজ করিয়া তুলেন। যাহার মাথা যত উঁচু তাহার পতন ততই সম্ভব, আপনার ভারেই সে আপনি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ধুলিসাৎ হয়—সে যখন একবার পড়ে তখন পুনরুত্থানের কোন সম্ভাবনাই তাহার থাকে না। কোরবের কেন অতি মান হইয়াছিল, লঙ্কেশ্বরের কেন অতি দর্প হইয়াছিল? জম্বীর এমন আত্মভরিতা কেন হইয়াছিল? অদৃশ্যশক্তি তাই আমাদেরকে আজ ডাকিয়া বলিতেছেন—সার্বধান! বাহিরের ঠাট, অদ্যকার বিজয় দেখিয়া মত্ত হইও না; সকলের আগে দেখ কোন শক্তি তোমার মধ্যে কার্য্য করিতেছে, কোন পক্ষে তুমি—দেবপক্ষে না অস্তুরপক্ষে?

আজ শিখিলাম বর্তমানে ক্ষুদ্র হই, নগণ্য হই, অধঃপতিত হই—তাহাতে নিরাশ হইবার কিছু নাই কিন্তু থাকি যদি দেবতার ধর্ম লইয়া—স্বল্পমপি অস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। কারণ অস্তুরের ধর্ম হইতেছে সমস্তের বিরুদ্ধে একের, অসীমের বিরুদ্ধে খণ্ডের ধর্ম। অস্তুরের ধর্ম হইতেছে জগৎধর্মের প্রতিকূল ধর্ম—প্রকৃতপক্ষে ইহা ধর্ম নয়, ধর্মের অভাব মাত্র; কারণ, অস্তুরের ধর্ম জগৎকে ধারণ করে না, সৃষ্টির মহাশৃঙ্খলাকে অটুট অব্যাহত রাখিয়া ফলাইয়া তুলে না, বহুকে মুক্ত একপ্রাণ করিয়া ধরে না, তাহার প্রয়াস ভাঙ্গিয়া ফেলা, বিশৃঙ্খলাকে ডাকিয়া আনা। অস্তুর তাহার অস্তুরত্ব বজায় রাখিবার জন্ত চার দাস অর্থাৎ যাহার উপর অকাতরে সে আপন প্রতাপ দেখাইতে পারে, যে পদতলে থাকিয়া আপন কপালের ঘাম হৃদয়ের রক্ত দিয়া তাহারই মহিমাকে ওজঃপূর্ণ উজ্জ্বল করিয়া ধরিবে। কিন্তু আজ দেখিলাম দাসের, উৎপীড়িতের পতিতের মধ্যেও কি ভাগবত শক্তি লুকাইয়া আছে, অগ্নির মধ্যে আছে এক মহান, মাথার উপরে পর্বতপ্রমাণ ভারকেও সে উটাইয়া ফেলিতে পারে, আপনার স্বমহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। জগৎ একটিনাত্র বিশেষ আশ্রয়কে ধরিয়া চলিতেছে না, তাহার আছে বহু কেন্দ্র, প্রত্যেক কেন্দ্রের মধ্যেই অনন্তশক্তি নিহিত—যে কেন্দ্র অতিকায় হইতে চলে সে ফলতঃ চার অস্তুর শক্তি চুরি করিতে অথবা ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহৎকে ধারণ

করিতে, ফলে হস্তীর মত বিপুলকায় হইতে চাহিয়াছিল যে-ভেকপ্রবর তাহারই মতন সে কাটিয়া পড়ে।

অম্মর হইতে যে চাহি না সে কেবল ফলের দিক দিয়াও নয়। অম্মর যে, শুধু অম্মরকে তাহার নিজেরও মার্থকর্তা নাই—অম্মরেরও যে আত্মা আছে তাহার বিফলতা এই অম্মরকেই। অম্মরকেও অম্মরকে কাটাইয়া উঠিতে হইবে—তবেই হইবে তাহার নিজের অন্তরাত্মার সে অন্তরতম গভীরতম তৃপ্তি পরিপূর্ণতা। জন্মগীর যে অম্মরকে দিক, অর্থাৎ প্রশিয়ার প্রভাব, টাইটস্ক, বের্গহার্ডি বা জিঙ্গেদিগের শিক্ষা সেটা জন্মগীর যতই প্রাণের জিনিষ হউক না কেন, তাহারও নীচে আছে জন্মগীর প্রকৃত জন্মগন্ধ। সেটি জন্মগীর মধ্যে ভাগবত ইচ্ছা, দেবতাব—তাহার ছায়া কিছু পাই কাটের মধ্যে, গোতে'র মধ্যে—সেই দেবতাবকে, আপন ভগবানকে যতদিন জন্মগী পাইতেছে না ততদিন অম্মরতাব লইয়া সে ভুলপথে, মিথ্যার দিকেই চলিয়াছে। অম্মরের ধর্ম অম্মরের পক্ষেও চিরদিনই পরধর্ম। তাই জগৎ আজ তাহার শত কাইজারকে অবহেলে মাথার উপর হইতে তেলিয়া ফেলিয়া দিতেছে।

অম্মরের ধ্বংস হইবে। কিন্তু যে অম্মর আত্মরিক ভাবও মূর্তি লইয়া আসে সেই একমাত্র অম্মর নয়। দেবতাব লইয়াও অম্মর দেখা দেয়, দেবতার চক্ষে ধূলি দিবার জন্ত, আপনাকে আপনি ভুলাইবার জন্ত। বর্তমানে মানুষের মধ্যে দেবতাব, অম্মরতাব দুইই আছে। সম্মুখ যুদ্ধে অম্মর যখন পরাস্ত হয় তখন সে আক্রমণ করে পশ্চাৎদিক হইতে। মানুষের মধ্যে দেবতাব এখনও ভাবলোকে, অম্মরতাবই হইতেছে প্রকাশে বাস্তবে—এই অম্মরতাবের দিকেই তাহার সত্তার কেন্দ্রভার ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। আমি, আমার, আমার জন্ত—এই বোধ এই আবেগই তাহার মধ্যে জাগ্রত। এই বোধ এই আবেগ অতি স্থূল অতি প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল, জন্মগী অজ্ঞানে তাহার চরিতার্থতার ছুটিয়াছিল, তাই প্রকৃতি তাহার ভীষণ লণ্ডাঘাতে বুঝাইয়া দিলেন—“না, আমার এ নিয়ম এ উদ্দেশ্য নয়—তোমারও এ লক্ষ্য, এ পথ নয়”। ভোগের দ্রব্যসম্ভার সম্মুখ হইতেই কাড়িয়া লইয়া কালী অট্টহাসে হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, “কর ভোগ এখন!” জগৎ তাই আজ বলিতেছে “আমি নয়, আমার জন্ত নয়”। কিন্তু বাহিরের ঠাট না থাকিলে কি হইবে, ভিতরে যে ভরপুর

কুখা আছে—তবুও বন খুলিয়া বলিতে পারিতেছে না, যে শিক্ষা এখনই পাইল তাহা এত শীঘ্রই ভুলিতে পারিতেছে না, তাই আপনাকে চাকিয়া লুকাইয়া ইতস্ততঃ করিয়া বলিতেছে “তুমি, তোমারই বটে—তবে আমিও আছি, আমি আছি তোমারই জন্তে—তোমার কিছু ভাবিতে দেখিতে হইবে না, আমিই সব দেখিব”—একথা হইতে “তুমি আমার জন্ত” এক-পদমাত্র। এই রকমে পরাহত অমর দেবতার মুখোস পড়িয়া দেখা দেয়। তখন আবার আর এক বিপ্লব, আর এক প্রলয়ের সূচনা।

ইহার দ্বারা প্রকৃতি—অথবা অদৃশ্যশক্তি বা ভগবান্—মার্কসকে বুঝাইয়া দিতেছেন গীতার সেই কথা—কর্মেদ্বিগ্নাণি সংযম্য যে আস্তে মনসা স্মরন্—ভোগের বস্তু, এমনি ভোগের জন্ত ইন্দ্রিয়কেও সংযম করিলে হয় না, চাই মনকে সংযম করা। ভিতরের যতদিন পরিবর্তন হইতেছে না বাহিরের পরিবর্তন ততদিন সত্য বাঁচি হইয়া উঠিবে না। মনে যতদিন ভোগশ্রুতির ঢেউ খেলিতেছে, সে ঢেউ শরীরের তটে আসিয়া আছাড়িয়া পড়িবেই, অন্তরে যতদিন বীজ রহিয়াছে বাহিরে সে একদিন না একদিন, একভাবে না আর একভাবে মহীৰুহ হইয়া উঠিবেই। ভিতরের বাসনা চিরদিনই আপনার অনুযায়ী মাল মশলা বাহিরে গড়িয়া লইবেই।

ইউরোপে আজ ইহাই দেখিতেছি। ইউরোপ অতিমাত্র স্থূল তাই প্রথমে স্থূলেই আঘাত পড়িয়াছে। মূর্খের মতন পশুরও হইতেছে একমাত্র লাঠোষধ। আত্মহার্য্য যে, ভোগে মাৎসর্য্য যে অতিমাত্র মত্ত, আত্মরী বা রাক্ষসী বৃত্তি ছাড়া বাহির ছাড়া যাহার অস্ত কোন জিনিষের চেতনা নাই, থাকিলেও অতি ক্ষীণ অতি দুর্বল—তাহাকে সচেতন করিতে হইলে চাই প্রথমে এই বাহিরের উপর আঘাত। ঔদয়িক যে তাহাকে শিক্ষা দিবার প্রথম পদ্য হইতেছে ভোজনের পাত্র তাহার সম্মুখ হইতে বার বার কাড়িয়া লওয়া, প্রাণে এই রকমে দাগ কষিয়া দেওয়া তারপর মনের, ভাবের দ্বিক হইতে যে চেষ্টা হইবে তাহা অধিকতর ফলপ্রসূ হইবে। ইউরোপের সমস্ত প্রাণ যে জিনিষের উপর পড়িয়া ছিল—স্থূলের উপর, ইহের উপর অটুট আস্থা, কল্পদেব ঠিক সেইখানেই সর্বপ্রাণে আগুণ জ্বলাইয়া পুড়াইয়া দিয়াছেন, তাহার প্রাণকে এমন ভাবে আলোড়িত করিয়া দিয়াছেন যে সেখানে নতন কিছু বীজ পড়িবার অবকাশ এখন পাইয়াছে। ইহার পূর্বে তাহার কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

কিন্তু আমরা যেমন বলিতেছিলাম, অসুস্থের অসুস্থিক দেহ গিয়াছে বা যাইতে বসিয়াছে কিন্তু অসুস্থিক প্রাণ এখনও তাহার আছে—সে প্রাণ শিথিল টলমল হইয়াছে বটে কিন্তু তাহার এখনও যথেষ্ট শক্তি আছে। সে শক্তি একত্র করিয়া সংহত করিয়া আবার সে এক নূতন দেহ গড়িয়া লইতে চেষ্টা করিবে। সে শক্তির সহিত যুদ্ধ করিবে, তাহাকেও পরাহত করিবে—এমন শক্তি চাই, আসিবেও। জগতের রাজসিক ভাব ক্ষয় করিবার ভার ইউরোপ লইয়াছে—তাই ইউরোপে দেখি রাজসিক ভাবের এমন অতিমাত্রা। এই যে ইউরোপে প্রলয় গেল তাহা হইতেছে রাজসিক ভাবের উপর রাজসিক ভাবের প্রতিক্রিয়া, হিরণ্যকশিপুর জ্ঞাত নৃসিংহের আবির্ভাব কিন্তু বিষের দ্বারা বিষের কুফলকে নষ্ট করা হইলেও, আধারের উপর সে বিষের প্রভাব কিছু থাকিয়া যায়ই। এটুকুও বিদূরিত করিতে হইলে চাই আর এক রকম জিনিষ—বিষকে যে নির্বিষ করে তাহা নয় কিন্তু তাহাকে অমৃতই করিয়া ধরে। তখন প্রয়োজন এমন শক্তি যাহা রাজসিক নহে, কিন্তু যাহা রজঃকে আত্মসাৎ করিয়া শুদ্ধতর মহত্তর, আরও শক্তিমান কিছু হইয়া উঠিয়াছে। দেবতা হইয়া গিয়াছে যে অসুস্থ, শুদ্ধস্বপ্নে পরিণত হইয়া গিয়াছে যে রজঃ। নৃসিংহ বা পরশুরাম নহে, তখন চাই শ্রীরামচন্দ্র।

ইহাই হইতেছে অধ্যাত্মশক্তি—অন্তরাঙ্গার ভাগবত শক্তি। ইউরোপে এই শক্তি কুটিয়া যে উঠিবে তাহা খুবই অসম্ভব বোধ হয়—ইউরোপের যদি সে বীজ থাকিত তবে এভাবে সে গড়িয়া উঠিত না, এ রকম পথে প্রকৃতি তাহাকে চালাইয়া লইত না। ফলতঃ সে জিনিষটি আসিতেছে দেখি অন্যত্র হইতে। আমেরিকা যে বর্তমান মহাযুদ্ধে শেষে প্রধান স্থান লইয়াছিল তাহার কারণও এই। আমেরিকার অফুরন্ত লোকবল অর্থবল গোণ কারণমাত্র—মুখ্য কারণ আমেরিকা দিয়াছিল, অন্ততঃ দিতে চেষ্টা করিয়াছিল এই অধ্যাত্মশক্তির কিছু। কিন্তু আমেরিকা, ইউরোপেরই অংশ বলিলে অতুক্তি হয় না। আমেরিকার যে অধ্যাত্মশক্তি সেটী বেশীরভাগ হইতেছে ভাবগত, কল্পনাগত, কবি কল্পনার মত। আমেরিকা সে অধ্যাত্মশক্তিকে উপলব্ধি করে নাই, তাহাতে ভরাট হইয়া উঠিতে পারে নাই, তাহার মধ্যে সে অনাহত বাণী গর্জিয়া উঠিতে পারে নাই, আমাদের প্রাচীন ঋষির কথায়—বেদাহম্ এতৎ পুরুষম্ আদিত্যবর্ণম্।

এ শক্তি হইতেছে প্রাচ্যের, এসিয়ার—ভারতবর্ষের। ক্ষাত্রশক্তি যতই প্রয়োজনীয় হউক না কেন, যে শক্তি জগৎকে অমৃতময় করিয়া তুলিবে তাহা ক্ষাত্রশক্তি নয়। এই ক্ষাত্রশক্তির সম্মুখে যে দাঁড়াইতে পারিবে, তাহাকে ভাদ্রিয়া-চুরিয়া-পুড়াইয়া নূতন তেজে নূতন রূপে পরিবর্তিত করিতে পারিবে তাহা হইতেছে একমাত্র ভারতের অধ্যাত্মশক্তি। সেই ভারত যে একদিন বলিতে পারিয়াছিল—ধিক ক্ষাত্রবল, ব্রহ্মবলই একমাত্র বল, সেই দেবোপম ভারতশক্তিই জগতের প্রকৃত নবজীবন দিবে। ইউরোপ জগৎকে যে নবীন-মূর্তি দিতে চাহিতেছে, কঠোর শিক্ষার ফলে যে একটা নূতন বিধান নূতন সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে চলিয়াছে—পুরাতন অপেক্ষা একটা গভীরতর-মহত্তর স্থায়ী সংহতির মধ্যে মানবসম্প্রদায়কে জাতিসকলকে বান্ধিয়া রাখিতে চাহিতেছে তাহা বিশেষ ফলদায়ী হইবে এমন চিহ্ন কিছু পাই না—বরং বিপরীত চিহ্নই পাইতেছি। কারণ, ইউরোপ কাঠামটা দিতে চাহিতেছে ধর্মরাজ্যের কিন্তু প্রতিষ্ঠায় রাখিয়াছে সেই প্রাচীন ক্ষাত্রশক্তি। ইউরোপ জোর দিতেছে দেহের যন্ত্রের উপর কিন্তু প্রাণের খোঁজ সে পায় নাই—খুঁজিতে চেষ্টা করিয়াছিল বোধ হয় কিন্তু স্বভাবো মুক্তি বর্ততে। এ শিক্ষারও প্রয়োজন ছিল—ইউরোপ চিনিবে ভারতবর্ষকে, পাশ্চাত্য চিনিবে প্রাচ্যকে, পৃথিবী আসিয়া স্বর্গকে আলিঙ্গন করিবে, দেহ পাইবে তাহার ভাগবত সত্তা—নতুবা পূর্ণ সামঞ্জস্য নাই, মানবের পূর্ণ বিকাশ নাই।

এই অধ্যাত্ম বিজয়ের জয় ভারত তুমি প্রস্তুত হও—যুদ্ধের এই শেষ শিক্ষা। হে ভারতশক্তির সাধকবৃন্দ, তোমাদের দিন আসিয়াছে, নিজের গৃহ হইতে গিরিগহ্বর হইতে তোমাদিগকে বাহিরে আজ আসিতে হইবে, জগতের সম্মুখে দাঁড়াইতে হইবে। যে প্রলয়টি হইয়া গেল তাহা হইতেছে বিশেষভাবে স্থলেরই প্রলয়, তাহাতে স্বপ্নেরও এক স্তর ধসিয়া পড়িয়াছে। বটে কিন্তু সেই স্বপ্নের আর একটি প্রলয় ব্যাপার ইহাতে একট হইয়া উঠিয়াছে। ইহার সাথেও স্থল জগতে স্থলভূতে যে লণ্ডভণ্ড হইবে না, তাহা নয়—হইবে, বিপুল আমূল পরিবর্তন। কিন্তু তাহার স্বরূপ তাহার প্রকৃতি অন্য রকমের। আজ আত্মরিক শক্তিকে আশ্রয় করিয়াই দেবশক্তি জয়লাভ করিয়াছে। কাল কিন্তু দেবশক্তি দিব্যশক্তির সহায়ে জয়ী হইবে। কোথায় কোন্ সাধক আজ দিব্যশক্তির সাধনা করিতেছে—প্রকট হও

তুমি তোমার হিরণ্ময় মূর্তিতে, তোমার হিরণ্ময় বর্ষে হিরণ্ময় আয়ুধে,
তোমার হিরণ্ময় রথখানিতে।

টাইউনহল সভা

(প্রাপ্ত)

শ্রী“প্রবর্তক” সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

“প্রবর্তকের” মূল্যবান পৃষ্ঠা সভাসমিতির সংবাদে পূর্ণ থাকিবে এরূপ ইচ্ছা কোন পাঠকেরই নাই, আমার এই ক্ষুদ্র বিবরণও যে আপনারা আপনাদের বিখ্যাত পত্রিকায় স্থান দিবেন এমন হ্রাশাও করি না, কিন্তু তত্রাট সেদিনের টাইউনহল সিডিসন-প্রতিবাদ সভায় হৃদয়ে যে অভিনব আনন্দ অনুভব করিয়াছি তাহা ব্যক্ত করিবার বলবতী ইচ্ছা রোধ করিতে অসমর্থ হইলাম। ক্রটি মার্জনা করিবেন।

ঢের ঢের সভা দেখিয়াছি, এমন বিপুল উৎসাহ এমন বিরাট লোক-সমাগম আর কোথাও দেখি নাই। স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা নাকি এই টাইউন হলেই আরম্ভ হয়, সেদিনও শুনিতে পাই এইরূপ উত্তেজনা দেখা গিয়াছিল, কিন্তু এই সভায় আমি একটা নূতন জিনিষ অনুভব করিয়াছি।

নরম গরম দেশের সকল নেতাই এইক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন; সংবাদ-পত্রে জানা যায়, নরম দলের অনেক নেতাও অনুপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের অভাব কেহই অনুভব করেন নাই, নরমই হউক আর গরমই হউক, দেশ বাহাদের চায়, তাঁহারা সকলেই সভাক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া নূতন বিলের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কেবল স্বরেন্দ্রবাবুর অভাবই বোধ হইতেছিল, তা তিনি অনিবার্য কারণেই বাংলা ছাড়া, নতুবা তাঁর ভৈরব বিষণ এক্ষেত্রেও গর্জিয়া উঠিত।

সভায় যে অসাধারণ জনতা হইয়াছিল, একথা সকলেই শুনিয়াছেন, টাইউন হলের বহিঃপ্রাঙ্গণে আর একটা সভা বসিয়াছিল, আমি হুগে ছিলাম,

বাহিরের সংবাদ জানি না। মিঃ যোমকেশ চক্রবর্তী সভাপতি ছিলেন। তাঁহার অভিভাষণ শেষ হইলে, একে একে মেসার্স জে এন্ড সন্স, জে চৌধুরী, মাছুবর শ্রীকামিনীকুমার চন্দ মহাশয় বক্তৃতা করেন। তারপর মিঃ বি সি চ্যাটার্জি বক্তৃতা করিতে উঠেন। ঠিক এই সময় শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে কেমন একটু নতন উত্তেজনার সাড়া পাওয়া গেল, আমার হৃদয়টাও এমনি কার অদৃশ্যস্পর্শে নাচিয়া নাচিয়া উঠিতে লাগিল, যেন কিছু নতন, কিছু অভূতপূর্ব সংবাদ পাওয়া যাইবে এইরূপ একটা আশা হইতে লাগিল। অনেকেই মনে করিবেন, আমি কিছু বাড়াইয়া বলিতেছি, কিন্তু আমার হৃদয়ে যেরূপ অহুভূতি জাগিয়াছিল তাহাই ব্যক্ত করিতেছি।

তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা অমৃতবাজার পত্রিকায় বাহির হইয়াছে, সে কথার আর পুনরুক্তি করিব না। তাঁর বক্তৃতা শেষ হইলে, তিনি একথানা চটি কাগজ বাহির করিয়া আবেগকম্পিতকণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিলেন—“এই কাগজখানির নাম ‘প্রবর্তক’—বাংলায় এমন কাগজ আর একখানিও নাই—আমি ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।” তার পর কাগজখানি খুলিতে লাগিলেন, এই সময় সভায় এমন একটা নীরব আগ্রহ প্রকাশ পাইতেছিল যে যাহারা তাহা না দেখিয়াছেন তাঁহারা ইহার আশ্বাদ পাইবেন না। তিনি একটা প্রবন্ধ বাহির করিয়া বলিলেন “আমাদের কথা”, এই প্রবন্ধের কিয়দংশ তিনি পাঠ করিতে চান। “আমার বিশ্বাস, দৃঢ় বিশ্বাস এ লেখা আর কাহারও কলম দিয়া বাহির হয় নাই, এ লেখা শ্রীঅরবিন্দ যোষের।” বস, যেন ডিনামো হইতে সমস্ত হলে বিদ্যুৎ-বৃষ্টি হইয়া গেল। সে কি ‘cheers’! সংবাদ পত্রে দেখি “On the mention of Aurobindo’s name, there was loud and prolonged cheers which lasted for minutes together.” না সে cheers নয়, সে এক অফুট সহস্র সহস্র নবীন হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা-স্বচক মহাসঙ্গীত, সে যে কি ভাব তাহা প্রকাশ করা যায় না, প্রায় চার মিনিট আমার মনে হয়, আপনারা যে জাগ্রতে সমাধির কথা বলেন, এ তাই, এই দীর্ঘ চার মিনিট সভায় যে কি হইল তা কে বলিবে? যেন কোন অশরীরী আত্মা সকলকে আনন্দস্পর্শে অভিভূত করিয়া গ্রহণ করিলেন। সমস্ত লোক মুগ্ধ কর্ণে শুনিতে লাগিল—দূরে ছই একজন স্বক স্বপ্নবিজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন “what paper, sir,” কিন্তু

সে শব্দ অতি ক্রীণ, অতি অস্পষ্ট, মিঃ চ্যাটার্জি পুনরিত উচ্চকণ্ঠে পড়িয়া যাইতে লাগিলেন—

“দেশের সম্মুখে আজ বড় বড় কাজ আসিয়া পড়িয়াছে, সেগুলি করিতে কত হাজার হাজার দেশভক্তের যে প্রয়োজন তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না, এবং দেশের উন্নতি ঘটলে রাজশক্তিরও যথেষ্ট সহায়তা করা হইবে, এইজন্য অতঃপর যুবকগণ যাহা করিবেন, খুব সম্ভব তাহাতে প্রতিষ্ঠিত রাজবিধির সহিত কোনই সংঘর্ষ হইবে না। এই অবস্থায় আমরা আশা করি, দেশের হাওয়া বুঝিয়া গবর্ণমেন্ট যদি সাধারণভাবে একটু অনুরোধ প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে দেশের মধ্যে গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ পুঞ্জীভূত হইয়া বিবেচ্য প্রচার হইতেছে, তাহা অচিরে দূরীভূত হইয়া যাইবে।

যুদ্ধকাল এবং তাহার পর ছয় মাস এই ভারতরক্ষা আইন প্রচলিত থাকিবে। এক্ষণে রাউলাট রিপোর্ট পড়িয়া আমরা বুঝিয়াছি যে শীঘ্রই এই আইন অন্তভাবে চিরস্থায়ী করিয়া তোলা হইবে। গবর্ণমেন্টের শাসন-পদ্ধতির বিরুদ্ধে আমরা কোন কথায় বলিব না, যে নীতি রাজা ও প্রজাবর্গ স্বীকার করিয়া লইবেন, তাহা সমগ্র দেশবাসীকেই মানিয়া চলিতে হইবে। রাউলাট রিপোর্ট অনুসারে নূতন আইন দেশ যদি গ্রাহ্য করিয়া লয়, সেই ভাবেই দেশকে চলিতে হইবে। কিন্তু যে সকল উদ্দেশ্যসাধনের জন্য দেশের যুবকগণ পাশ্চাত্য মোহে উদ্ভ্রান্ত হইয়া বিকৃত পথ অবলম্বন করিয়াছিল, সেই সকল উদ্দেশ্যই সিদ্ধ করিয়া তুলিতে আজ ব্রিটিশ-জাতিও যখন নূতনভাবে কার্য্য করিতে উন্মুখ হইয়াছেন, এবং এই আশায় ভারতবর্ষকে উদ্ধৃত্ত করিয়া তুলিয়াছেন, তখন রাজনৈতিক বন্দী ও অপরাধীদের ছাড়িয়া দিতে দোষ কি? তাহারা ফিরিয়া আসিয়া যখন নূতন কর্মক্ষেত্র পাইবে, নূতন আশায় নূতন পথে চলিতে পাইবে, তখন হিন্দু-চরিত্রের বিরোধী কর্ম্মে তাহারা আর আপনাদিগকে কখনই লিপ্ত করিবে না, একথা আমরা বড় জোর করিয়া বলিতে পারি।

এতখানি অনুরোধও যদি ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট দেখাইতে কৃপণতা করেন, তাহা হইলে সমগ্র দেশকে পরিতুষ্ট করিবার জন্য অন্যায়কারীকে প্রচলিত আইনে দণ্ড দেওয়া হউক। যাহারা নির্দোষী বলিয়া প্রমাণিত হইবে, তাহারা তাহা হইলে মুক্তি পাইতে পারে। কিন্তু দেশের এই নূতন

প্রভাতে, যদি মৃত্যু আইনই প্রবর্তিত করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের মনে হয়, একবার সমস্ত রাজনীতিক বন্দী ও অপরাধীদের ছাড়িয়া দেওয়া উচিত, সাধারণ চোয় ডাকাত হত্যাকারীর মত ইহারা পশুপ্রকৃতির নহে। বিদ্যায়, চরিত্রে, বুদ্ধিমত্তায় ইহাদের অনেকেই প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নগরবাসী অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ, তবে যদি কেহ কেহ তাহাদের পূর্ব-স্বভাবের পরিচয় দেয়, রাজশক্তি ত দুর্বল নহে, শাসনদণ্ড ত নিরন্ত থাকিবে না, শেষে না হয় গবর্ণমেন্ট তাহাদিগকে গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত করিবে।

এইটুকু পড়িয়া মিঃ চ্যাটার্জি বসিয়া পড়িলেন। একজন হাজার হাজার টাকা যেন নিঃস্বাস বন্ধ করিয়া শুনিতেছিল, পড়া শেষ হইলে, চতুর্দিকে করতালিঙ্কনি হইতে লাগিল। কাগজখানা টেবিলে রাখিলে মাননীয় চন্দ্র মহাশয় একবার এপিট ওপিট করিয়া রাখিয়া দিলেন—অনেক যুবক ব্যারিষ্টার সাগ্রহে কাগজখানা দেখিতে লাগিলেন। সভাকার্য শেষ হইয়া গেল—এখনও কানে বাজিতেছে—“অরবিন্দ”—আর এখনও অসংখ্য যুবকের সঙ্গে তালে তালে হৃদয় নাচিয়া উঠিতেছে কি এক আশায়, কি এক অভিনব আনন্দে। ভাষা জানিনা, প্রাণের কথা লিখিলাম।

বিনীত—

শ্রী—

কলিকাতা।

নূতনের পথে

জগতে সমরবলি নির্ধাপিত প্রায়। স্থূল চক্ষে একটা স্থায়ী শান্তির বিমোহন
হবি প্রতিভাত হইলেও আমরা ভিতরের দৃষ্টি দিয়া দেখিতেছি, জগৎ মহা-
বিপ্লবের দিকেই চলিয়াছে। এই মহাকুরুক্ষেত্র আজ আমাদের আরম্ভ বলি-
য়াই মনে হইতেছে, বাহিরের দিক হইতে আনন্দধামে উপনীত হইবার ইহাই
উপায়, সংবর্ষের ভিতর দিয়াই পৃথিবীকে চলিতে হইবে।

যুরোপ পাইয়াছে একটা আদর্শ, একটা দর্শন। এইগুলিই মানব-জীব-
নের সবখানি নয়, তাই যুক্তরাজ্যের কর্ণধার উইলসন সাহেবের স্বরজিত
আদর্শ চিত্রখানি প্রতিদিনই মলিন হইয়া পড়িতেছে। শান্তিসভায় উহা
কতখানি সার্থক হইবে, তাহা স্থবী-সমাজ অবশ্যই বুঝিতেছেন।

বুদ্ধিগ্রাহ আদর্শটা যতই বৃহৎ হউক মহৎ হউক, তাহা কল্পনামাত্র,
কার্যে তাহাকে পরিণত করিতে হইলে যে বিজ্ঞানের প্রয়োজন, যুরোপের
তাহা জানা নাই। বড়ই স্পর্ধার কথা—অষ্টপাশবদ্ধ বিপন্ন জাতির মুখে
ইহা শোভা পায় না। কিন্তু সত্যদৃষ্টি হুটাইয়া তুলিবার যে প্রেরণা, তাহা
মিথ্যা নয়; এই সত্যের শক্তিতেই উদ্ধৃত হইয়া এ হেন দুঃস্বপ্নের মধ্যেই
সোণার স্বপ্ন সার্থক করিতে প্রযুক্ত হইয়াছি।

দীর্ঘদিনের শাসন ও পোষণে আয়র্লণ্ড ইংলণ্ডের অঙ্গীভূত হইল না,
হয় ইংলণ্ডের বৃহত্তর মধ্যে আয়র্লণ্ডকে আত্মোৎসর্গ করিয়া সাফল্য লাভ
করিতে হইবে, অথবা ইংলণ্ডের হৃদয়খানিকে এতখানি বিস্তৃত করিতে
হইবে বাহার মধ্যে আয়র্লণ্ডের সকল সার্থকতা সম্ভবপর হয়। আয়র্লণ্ডের
এই ভাগ্যনির্ণয়পথায় লক্ষ্য করিয়া চলিবে ভারতের গতিস্থির অনায়াসেই
করা যাইবে। আয়র্লণ্ডের সুমহান আশার পথটা মুক্ত করিতে ইংল-
ণ্ডের যে সাধনা, ভারতের অসংখ্য কোটি প্রজার অন্তরে চিরশান্তি প্রদান
করিতে ইংলণ্ডকে তদপেক্ষা অধিক কঠোর সাধনা করিতে হইবে। উপর দিক
হইতে এইরূপ দৈবদৃষ্টি উপস্থিত ইংলণ্ডের পক্ষে কতটা সম্ভবপর হইবে,

তাহা না বলিলেও চলে।

ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য প্রতিভার উদ্ভূত হইয়া, জাতীয়জীবনটিকে সুস্থ ও সবল করিবার একটা উপায় আবিষ্কার করিয়াছে। উহা রাজনীতি—(Politics). এই রাজনৈতিক আন্দোলন-বেগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, উদ্দেশ্য রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভ—তাঁহা সেই স্বাধীনতা ইংলণ্ড ধীরে ধীরে ভারতবর্ষকে দান করুক, অথবা একেবারেই ভারতের হস্তে উহা প্রত্যাপিত হউক। মনে রাখিতে হইবে, এক্ষেত্রে বলপ্রকাশের কোন কথা নাই, অজগতে স্বাধীনতার হাওয়া বহিয়াছে, সকল সভ্যজাতিই মানুষ্যের স্বাধীনতার মূল্য বুঝিয়াছে, এই কর্তব্যবুদ্ধিই অধীন জাতিকে মুক্তি দিবে—কেবল অধিকারী হইলেই চলিবে। রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে ভারতবর্ষ আপনাদের যোগ্যতার পরিচয় প্রদানে খুবই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

যে চক্ষে আধুনিক ভারতবর্ষ তাহাদের উদ্দেশ্যটি দেখিয়া গতি-নির্দেশ করিয়াছে, আমরা সে চক্ষু দিয়া উহা দেখিতেছি না; আমরা দর্শনের অতীত হইয়া, বিজ্ঞানময় কল্পলোকের দিব্যদৃষ্টিতে ভারতের ভবিষ্যৎ দেখিতেছি। ভারতের মুক্তি অবশ্যস্বাবী, কিন্তু বর্তমানে মুক্তির যে রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা আমাদের নিকট বিকৃত বলিয়া অনুভূত।

দিন দিন ভারতের উৎকৃষ্ট-আধারগুলি খুব একটা গোণ-ফলেরই আকাঙ্ক্ষা ধাবিত, অবশ্যই যে পথ দিয়া চলিলে যাহার যে জ্ঞান লাভ হইবে, তাহার পরিপন্থী আমরা হইব না, তবে নূতন ভারতকে আমাদের তপোলক বিজ্ঞানটার কথা বলিতে চাই এবং সেই বিজ্ঞানের পথ দিয়াই আমরা জাতির মুক্তিমন্ত্র সংস্কৃত করিব।

তিন বৎসর ধরিয়া আমরা ভাবের কথাই কহিয়া আসিয়াছি, ভাবকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে হইলে যে কল্পবিজ্ঞানের কথা আরম্ভ করিতে হইবে, আমাদের মনে হয়, প্রবর্তকের সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে; কল্পের হুঁচি প্রদান সে করিবে না, কেবল বিজ্ঞানের কথাই বলিবে।

আদেশ আসিয়াছে ভগবানের, যে তিনি নামিয়া আসিবেন মর্ত্ত্যে। মর্ত্ত্যে এ সংবাদ পৌঁছিয়াছে। মর্ত্ত্যেও এক অভূতপূর্ব আকর্ষণ অনুভব করিয়াছে, তাহারও ইচ্ছা হইয়াছে যে সে ভগবৎসম হইবে। উপর দিক হইতে নামিবার এবং নিম্নদিক হইতে উঠিবার যে প্রণালী উহা দৈবী-বিজ্ঞান, এই বিজ্ঞানশক্তিই মিলাইয়া দিবে স্বর্গকে চৈতন্যের সঙ্গে, ভগৎ

চৈতন্যময় সত্তার উদ্বোধিত হইয়া উঠিবে, ইহাই মূলমন্ত্র।

ভাগবত ইচ্ছা তুরীয় লোক হইতে নামিতেছে, এই নামিবার পথেও আধ্যাত্মিক বিপ্লব আছে। সাধকের হৃদয়ে যে সমুদ্রমহন হইতেছে তাহাতেই এই বিজ্ঞান উদ্ভাসিত। আবার এই সৃষ্টি ভগবৎময় হইয়া উঠিবে, কাজেই ইহাও বিপ্লবানলে পরিশুদ্ধ হইয়া উদ্ধিগামী হইতেছে, এই সংঘর্ষের মধ্যেই ইহার বিজ্ঞান লুকাইয়া আছে। ধীরে ধীরে এই মহত্ত্বের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া এই-গুলিকে স্ফুটতর করিয়া তুলিতে হইবে।

আমরা এইজন্ত প্রথমেই দেখিতেছি না আমাদের জাতির রাজনৈতিক স্বাধীনতাটিকে। বর্তমান অবস্থায় ভারতবর্ষ যদি স্বাধীনতা পায়, তবে সে স্বাধীনতা ভোগ করিবার তাহার সামর্থ্য থাকিলেও, ভারতবর্ষের মরণই হইবে, কেননা ভাগবত ইচ্ছাটি দিয়া যে নূতন ভারত গড়িবে, তাহার পূর্বে মানুষের অসিদ্ধ অবস্থা যদি তাহার খণ্ডতাকে শ্রেয়ঃ বলিয়া গ্রহণ করে, মৃত্যু তদপেক্ষা শ্রেয়ঃ।

আমরা ঐ তুরীয় লোক হইতে যে ব্রহ্মশক্তি নামিয়া আসিতেছে, তাহা বরণ করিয়া লইবার সামর্থ্যলাভের সাধনাটিকেই সর্বপ্রথম স্থান দিতেছি। জাতিটিকে সর্বপ্রথমে ব্রহ্মময় করিয়া তুলিতে হইবে, তারপর যে মুক্তি সে শুধু ভারতের জন্ত নয়, সমগ্র মানবজাতির আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটি তাহার মধ্যে নিহিত থাকিবে।

ভারতের আজ যাহা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাকে সর্বপ্রথমে ভগবৎময় করিয়া লইব; ভবিষ্যতে যাহা গড়িয়া উঠিবে তাহা ত ভাগবত তপশ্শক্তি-সংগঠিত, কেননা তাহার ইচ্ছা ত অপূর্ণ রহিবে না।

নূতন ভারতের সমুখে আজ বিরাট কর্মক্ষেত্র। পঙ্গুর গিরিলতন, মুকের বাচালতা অধিক আশ্চর্যের বিষয় নহে। নূতনের দল ছুটিয়া চলিবে দেশের বিপুল কর্ম প্রণালীগুলিকে ভগবৎময় করিয়া তুলিতে; তা সে শিল্প বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাজনীতি, ধর্ম, সমাজ—সমস্তগুলিকে। আর উপর হইতে যে মন্দাকিনীধারা ধরাধামকে স্বর্গে পরিণত করিবার জন্ত পতনোন্মুখী, উহার অসাধারণ বেগ মস্তকে ধারণ করিয়া সে পৃথিবীকে ধ্বংস করিয়া তুলিবে। যার আশীর্বাদ মস্তকে বহিয়া “এবর্তক” বাংলার জটিল কর্মক্ষেত্র অধিকতর সরল করিয়া তুলিয়াছে, তারই আশীর্বাদে উহা এই বর্ষে নূতনকে মুক্ত করিয়া তুলিবে। ও কালী।

যথানিযুক্তোহস্মি

আমারই ভাব, ভাবার তাহাকে অনুবাদ করিব মাত্র। আমি দেখিতেছি নবীন সাধকের সম্মুখে আজ সমস্তাশুভ স্তূপীকৃত হইয়া তাহার ভাবকে-মূর্ত্ত হইতে দিতেছে না। সে সমস্তাগুলি ভাবেরই, বিজ্ঞানের আলোকেই উহা বিদূষিত হইবে।

আধার আত্মসমর্পণ মন্ত্রে দীক্ষিত হইবামাত্র, তাহার বুদ্ধি মন প্রাণ প্রভৃতির সংযোগসম্বৃত কর্মগুলি লুপ্ত হইয়া যায়, যন্ত্রের শুদ্ধি না আসা পর্যন্ত কোন বিরাট কর্ম তাহার ভিতর দিয়া ঘটিয়া উঠিবার সম্ভাবনা থাকে না। বাহিরের দৃষ্টিতে তাহার দিনগুলি ব্যর্থ হইতেছে প্রতীত হইলেও, ভিতরে যে বিপুল কর্ম চলিতেছে তাহার তুলনায় বাহিরের যে কোন আশ্চর্যপূর্ণ কর্ম তুচ্ছ।

নূতন মন্ত্রপ্রভাব যখন প্রবলবেগে জীবনে ছড়াইয়া গড়িতে থাকে, প্রতি কেন্দ্রে অহঙ্কারও আত্মপ্রতিষ্ঠা অটুট রাখিবার জন্য তুমুল যুদ্ধ বাধাইয়া দেয়, এই অন্তর্বিগ্রহে অহঙ্কারের পরাজয়বার্তা যখন অধ্যাত্মরাজ্যে ঘোষিত হয়, তখন সর্বোপায়ে বিজ্ঞানময়কোষেই ভগবানের আসন স্থাপিত হইতে হয়, এবং তাঁহারই শক্তি দিয়া, ক্ষতবিক্ষত ভগ্ন মনোময় প্রাণময় প্রভৃতি কেন্দ্রগুলি নূতন করিয়া গড়িয়া উঠে। ইহাই শুদ্ধি, শুদ্ধ যন্ত্রে যে কর্ম প্রকাশ পায় তাহাই ভগবদসিদ্ধি, অর্থাৎ ভগবানের ইচ্ছাটাই তখন জীবের কর্মরূপে দেখা দেয়।

সাধককে মনে রাখিতে হইবে, এই যে যুদ্ধকাল, এই কালের মধ্যে সে বাহির হইতে মুখ ফিরাইয়া আত্মজর লাভের সাধনা করিলেও, ভগবানের স্থিতি অনাহত, তিনি প্রতিদিনই কত নূতন গড়িয়া তুলিতেছেন। নবীন সাধক আত্মমুক্তির সাধনা করিতেছে না, তাহার তপস্যা মানব-জাতির জ্ঞান, সিদ্ধিলাভ করিয়া সে দেখিবে—তাহার যুদ্ধের বিরাম নাই,

তাহার কৰ্ম তে শুদ্ধ, কিন্তু জগতের অসংখ্য অসিদ্ধ কৰ্মের ধ্বংস অথবা সেগুলিকে শুদ্ধ ও সিদ্ধ করিয়া জগতে তাহাকে শান্তির প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

সমস্যা এইখানেই। শুদ্ধিলাভ করিলেই সবখানি হইল না, সিদ্ধি পাওয়া চাই, আর সে সিদ্ধি তা আপনাকে জ্ঞান নেহে, স্বয়ং শুদ্ধ হইলেও যতক্ষণ না জগতের জ্ঞান সে শুদ্ধির সমর্পণ করিবে, ততক্ষণ উৎসর্গের সিদ্ধি আসিবে কেমন করিয়া? কৰ্মের ও কৰ্মফলের তাহার আসক্তি রাখিলে চলিবে না, নিঃস্বর্গ ও নিঃস্বর্গ হইয়াই তাহাকে জগতের সিদ্ধি আনিয়া দিতে হইবে।

নূতন সাধক! তোমার কি দীক্ষা হইয়াছে? তোমার উন্নত ললাট উজ্জ্বল দিব্য আলোকে উজ্জ্বল, শক্তির সন্ধিরে নতজানু হইয়া উপবেশন কর, ব্রহ্মসিদ্ধির পর তোমায় অভিব্যক্তি হইতে হইবে, দেবীর বাসকরের অনামিকা অঙ্গুলির রক্তরিন্দু ললাটে ধারণ কর, সম্মুখে কুরুক্ষেত্র, ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের ব্রত তোমার, এত শীঘ্র অন্তরে বাহিরে দৈবী সামঞ্জস্যের প্রকাশ্য করিও না। কিন্তু চাই একটা অখণ্ড তৃপ্তি, একটা অশেষ আনন্দ, যেগুলি দিয়া নিজের জীবনকে পূর্ণ করিয়া তুলিতে হইবে—উহা ত হইবেই, যদি তুমি ভরিয়া যাও ভগবানে। ইহার পূর্বে বাহিরের সহিত সংগ্রামপ্রবৃত্তি পতঙ্গের অনল আলিঙ্গনের মত।

যে সাধক তার সমস্তখানিকে ভগবানের চরণে ডালি দিয়া কৃতার্থ হইয়াছে, যার জীবন কুলে কুলে আনন্দ-হিল্লোলে ভরিয়া উঠিয়াছে, জগতের অমঙ্গল অন্তত হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া যে সাধক ভগবানের চাওয়াটির জন্তই আপনাকে যন্ত্রস্বরূপ নিবেদন করিয়াছে, যার জীবনে প্রবৃত্তি নিবৃত্তির বিচারি, ভোগত্যাগের দ্বন্দ্ব, বিদ্যা অবিদ্যার প্রহেলিকা সব সমান হইয়া গিয়াছে, তেমন সাধকের সমষ্টি লইয়াই এক ভাগবতচক্র প্রতিষ্ঠা করিতে চাই। সে চক্রের কৰ্ম হইবে তাহার পরিধিটিকে কোন অনন্তের পথে বিস্তৃত করিয়া চলা—সে গতি হইবে অসীম, কৰ্ম হইবে ছেদহীন, অব-



সাদ ক্লাস্তি থাকিবে না—আনন্দই হইবে ইহার মূল প্রসবন।

আপনাকে যে পাইয়াছে, সহস্র সহস্র মানুষকে সেই ভিতরের পুরুষের সহিত তাহাকে পরিচয় করাইয়া দিতে হইবে। ইচ্ছাশক্তিকেই কেন্দ্র ধরিয়া নামিয়া যাইতে হইবে অসংখ্য কণ্ঠের মাঝে, যে ভিড়ের ভিতর অসংখ্য মানুষ আপনাকে হারাইয়া কেবল কুড়াইয়া লইতেছে নৈরাশ্র হৃৎ অগ্নমানস। তাহাদের উপর দিকে তুলিয়া নুতন চক্ষু ফুটাইয়া দিতে হইবে। হৃৎকের শেরা দিনটি পর্যন্ত। এইরূপ রক্তাক্ত কলেবরে তোমার যে মতোই লীলা করিতে হইবে—তুমি ত চাও নাই মুক্তি, সিদ্ধি, সমাধি—তুমি যে চাহিয়াছ লীলা, জাগ্রতে সমাধির বিপুল আনন্দ।

তোমার প্রতি পরিক্ষেপটাই যে তাঁরই আনন্দের অভিব্যক্তি, এ অমূল্য ভূতি কি জাগে নাই, এ অরসান্বাদ কি কর নাই, গীতার অমরমন্ত্র কি গুরুমুখে জালামালামণ্ডিত হইয়া তোমার অন্তরের সকল আবির্জনা দগ্ধ করিয়া দেয় নাই? কেবল ফলই কি শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলে শেষ হইবে? কর্তৃত্বাভিমান পর্যন্ত পরিত্যাগ কর, কণ্ঠও যে তাঁর, জীবনও যে তাঁর, আমি যে তাঁর লীলার যন্ত্র, তাঁর আদেশ প্রতিপালনও যে আমার আনন্দ—চল চল—যন্ত্রের আবার বিচার বুদ্ধি, সুপথ কুপথ! “যথা নিযুক্তৌহমি তথা করোমি।”

একখানি চিঠি

তোমরা আদর্শের কথা অনেক বলিয়াছ, এবং সাধনার কথাও বহুবাক্য বহুরকমে বিবৃত করিয়াছ। কিন্তু একটি বিষয়ের উপর তোমাদের বিশেষ নজর তেমন পড়িতে দেখি নাই। আজ আমি সেইটির প্রতি তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। তোমরা যখন সাধনার কথা বলিয়াছ তখন ব্যক্তিগত সাধনার উপর জোর দিয়াই সব বলিয়াছ—আজ তোমাদিগকে আমি সমষ্টিগত সাধনার উপর জোর দিতে উপদেশ দিতেছি। সাধনার ব্যক্তিগত ভাবের যেমন প্রয়োজন সমষ্টি বা সম্ব্যভাবেরও তেমন প্রয়ো-

জন। বস্তুতঃ, ব্যক্তিগত সাধনার সাধনার পূর্ণতা হয় না, সমষ্টিগত সাধনাতেই সাধনার পূর্ণতা। আমি আরও বলিতে পারি, তোমাদের ব্যক্তিগত সাধনা নাই, তোমাদের যে সাধনা তাহা সমষ্টিগত সাধনা। তোমাদের যে আদর্শ, সেটিকে কার্যে পরিণত করিতে হইলে চাই নিজের নিজের সাধনার ব্যস্ত থাকা নয়, কিন্তু তোমার সাথীর, অপরের সাধনার দিকে দৃষ্টি রাখা, তাহার মধ্যেই নিজের সাধনাকে ডুবাইয়া দেওয়া। প্রাচীন যে বয়েদ আছে, স্বয়ং অসিদ্ধ পরকে সিদ্ধ করিবে কেমন করিয়া তাহা সম্পূর্ণ সত্য নয়। পরের সিদ্ধির দিকে দৃষ্টি দিলে, চেষ্টা করিলে নিজের সিদ্ধিও যে সরল হইয়া আসে, একথাও খুব সত্য।

কিন্তু আমি ঠিক সে কথা বলিতেছি না—নিজের দিকে না তাকাইয়া, নিজের বিষয় কিছু না ভাবিয়া চিন্তিয়া কেবল অপরের জন্য ব্যস্ত হইতে উপদেশ দিতেছি না। আমি যে সমষ্টিগত সাধনার কথা বলিতেছি তাহা হইতেছে—নিজের মধ্যে পরকে অনুভব করা, পরের মধ্যে আপনাকে মিলাইয়া দেওয়া—এই ভাবে লইয়া সাধনা করা, যে আমার সাধনা আমায়ই জন্য নহে, আমি সাধনা করিতেছি সকলের জন্য, সকলের শক্তি সকলের সমবেত সাধনাই আমার মধ্যে মূর্ত ফুট হইয়া উঠিতেছে। আমি হইতেছি অপরের বিশ্বাসবের প্রতিনিধি মাত্র—আমি যে শক্তি প্রয়োগ করিতেছি, আমি যে বাধাবিপত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছি, আমি যে উচ্চ হইতে উচ্চতরে উঠিয়া চলিতেছি তাহা অপরের পক্ষে শক্তি প্রয়োগের সুবিধা হয়, বাধাবিপত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলা সরল হয়, ক্রমোন্নতি শীঘ্রগতি হয় সেই জন্য। সকলে প্রত্যেকে যদি এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া নিজ নিজ সাধনা করে, তবে পরস্পরের সাধনা পরস্পরের সাধনার সহিত মিলিয়া মিশিয়া বিপুল আরও শক্তিশালী হইয়া উঠে—প্রত্যেকের চেষ্টার পরিমাণ তাহাতে লাঘব হইয়া আসে, বিফলতাও কমিয়া যায় এবং প্রত্যেকে যেমন সিদ্ধির দিকে শীঘ্র শীঘ্র অগ্রসর হয় সমবেত আদর্শটিও তেমনি স্থূলভ নিকটতর হইতে থাকে।

বাস্তবিক পক্ষে অন্যের সাধনার সহিত নিজের সাধনার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অনেক সময়ে আমাদের সাধনার জোর যে কমিয়া আসে—আমরা যে অবসন্ন বা হতাশ হইয়া পড়ি তাহার কারণ নিজের মধ্যে নিজে আমরা অতিমাত্রা বস্তু, নিজের শক্তিচক্রের উপরই অতিমাত্রা আস্থা করিয়া

চলি, কেমন মনে হয় একা একা, বিজন পথের পথিকী, কিন্তু তাহা নয়; জগতে আমি একাই সাধনার পথে চলি নাই, আরও কত শত মানুষ চলিয়াছে সেই একই পথে—একা যদি চলিতাম তবে সে একা চলার ফল কি, জগতের তাহাতে লাভ কি? একটা জীব মুক্তি পাইল বা না পাইল তাহাতে বিশ্বের কি আসে যায়? সাগরবক্ষে একটা চেউ উঠিল মিলিয়া গেল তাহাতে সাগরের কি ক্ষতি-বৃদ্ধি? তাই না মহাপ্রাণ বুদ্ধদেব নির্কারণের উপকণ্ঠে যাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, বলিয়াছেন যতদিন একটি প্রাণীও জগতে বদ্ধ থাকিবে ততদিন তিনি নির্কারণ চান না! ইহাই তবীর সাধকের কথা; যে সাধক সমস্ত মানবজাতিকে লইয়া উঠিতে চায়, জগতের মধ্যে দেবজাতিকে সৃষ্টি করিতে চায়, তাহাকে কেবল নিজের জন্য চেষ্টা করিলে চলিবে না। আপনার সঙ্গে অপর সকলকে লইয়া চলিতে যে চেষ্টা করিবে, সে নিজের যদি মহাশক্তির সাধক হয় তবে সে একা অতিমাত্র অগ্রসর হইয়া চলিয়া যাইতে চাহিবে না, যদিই বা যাইতে চাহে ফিরিয়া আসিবে, প্রতি মুহূর্ত্তে পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিবে, হাত বাড়াইয়া দিবে যাহারা পিছনে পড়িয়াছে তাহাদের সাহায্যের জন্য। সাধারণ সাধকও নিজেরই মধ্যে ভুবিন্ন থাকিবে না, এদিক ওদিক তাহাকে তাকাইতে হইবে, উর্দ্ধে সমুখে যাহারা চলিয়াছে তাহাদের দিকে প্রসারিত করিবে এক হাত, চারিপাশে নীচে যাহারা আসিতেছে তাহাদের দিকে দিবে আর এক হাত। এইরকমে এক মহাশূলবদ্ধ হইয়া সাধকবৃন্দকে চলিতে হইবে। তবে আজ যে আদর্শ সূত্র স্রুতিনি বোধ হইতেছে কাল তাহা নিকটবর্ত্তী সহজ বলিয়াই দেখা দিবে।

সাধনার মূল কথা আপনার গাভীকে কাটা চারিদিকে, অনন্তের মধ্যে আপনাকে ছড়াইয়া দেওয়া। কেবল একটা অনির্দেশ্য অনন্তের ভাবের মধ্যে ভুবিয়া গেলেই যে সে গাভী কাটান হয় এমন নয়। বিশেষ বস্তুর মধ্যে—অপর মানুষের মধ্যে, শুধু মানুষ কেন, জীবের মধ্যে, গাছপালার মধ্যে, মাটি পাথরের মধ্যেও আপনার সত্তাকে অনুভব করিতে হইবে, এই বিশ্বপদার্থের বিশেষ সত্তাকে নিজের মধ্যে পুরিয়া তুলিতে হইবে, তবেই আত্মার সম্প্রসারণ। কেবল সত্তা নয়, স্থিতি নয়—দেখিতে হইবে মানুষের অন্যান্য জীবের সমস্ত সৃষ্টিরই প্রাণ, তাহার গতি; কোন্ দিকে কি উদ্দেশ্য লইয়া সে ছুটিয়াছে। সেই প্রাণ সেই গতি—সেই সাধনাকেই

নিজের মধ্যে ক্ষুদ্র জাগরিত করিতে হইবে এবং নিজের প্রতি সিদ্ধিকেই ছড়াইয়া দিতে হইবে, অনুসৃত করিয়া দিতে হইবে প্রথমতঃ আমাদের সতীর্থ সাধকবৃন্দের প্রাণে ভারপর সকল মাছুবে, সকল জীব, সমস্ত সৃষ্টিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে।

তাই তোমাদিগকে বলি নিজের মধ্যেই একেবারে মজিয়া থাকিও না। আমার সাধনা কিছু হইতেছে না, একথা বলিয়া অবসন্ন হইও না। তোমার কিছু হইতেছে না, কিন্তু আর একজনের নিশ্চয়ই কিছু হইতেছে, তাহার সাধনার ফল তোমাকে স্পর্শ করিবেই, যদি প্রাণের ফুয়ারাটিকে সেদিকে একটু খুলিয়া রাখ। আমার কিছু হইল না, এ সাধনার তামসিক অহঙ্কারভাব। সাধনার আবার রাজসিক অহঙ্কারও আছে—আমার এত খানি হইয়াছে, আর চাই কি কেহ্না কতে—এ ভাবও সাধনার অন্তরায়। আমার সিদ্ধির সাধকতা ততখানিই যতখানি সে আমার চারিদিকের সাধকসকলের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে, বিধমানবই যতখানি তাহার জোরে কিছু উপরে উঠিতে পারিয়াছে। নিজের জন্ত যে সিদ্ধিকে পুষ্টি রাখা, সে তক্ষর যাত্র, বৈদিক ঋষি তাহাকেই দানব পণিরূপে বণিত করিয়াছেন।

একতাই শক্তি এ সহজ কথা আমরা সকলেই জানি। নগণ্য ভূগের সমষ্টি মর্ত্ত হস্তীকেও বাদিতে পারে, ক্ষুদ্র জলধারা সব মিগিয়াই মহানদীকে সৃষ্টি করে—শিশুপাঠ্য পুস্তকে আমরা এসব পড়িয়াছি। শুধু সাধারণ জীবনে এ কথা যে মৃত্য তাহা নয়—ভিতরের সাধনার জীবনেও ইহাই মহাসত্য। তাই তোমাদের সকলকে গীতায় শ্রীভগবানের কথায় বলি—এক নয় সকলে সকলের সাধনা কর—প্রসঙ্গ ভাবসত্তাঃ শ্রেয়ঃ পরমবাস্প্যথ।

দ্বীশিক্ষা

দ্বীশিক্ষা সমিতির উদ্যোগে, কলিকাতায় রামমোহন লাইব্রেরী-হাউসে, সেদিন এক সভা হইয়াছিল। সভার উদ্দেশ্য—কোন পন্থা অবলম্বন করিলে দ্বী-জাতির মধ্যে শিক্ষাবিস্তার হয়। সে সভায় কলিকাতার গণ্যমান্য অনেকেই উপস্থিত ছিলেন, স্যার পি. সি. রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

তার গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতার মধ্যে এই কথাগুলি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে—“..... enabling them to earn independent and honourable living.” অবশ্যই বর্তমান সমাজচিত্র দেখিয়া, তিনি বসিয়াছেন, দেশের প্রকৃৎগণ নারীজাতির যথারীতি ভরণপোষণে অক্ষম। হিন্দু-মুসলমানের বিধবাগণ ক্রিয়াকলাপে শোচনীয় অবস্থায় কালযাপন করে তাহা আমাদের অবদিত নাই, অসচ্ছিন্ন স্বামীর অধীনত কত রমণী অর্ধেক দিন অনাহারে এবং অধিকাংশ দিনই অর্দ্ধাহারে কালযাপন করে, তাহাও আমরা জানি। একটি পুরুষের অত্যন্ত উপার্জনের উপর এক এক সংসারে অনেকগুলি রমণীর জীবন নির্ভর করে বলিয়া সংসারের যে কত কষ্ট তাহাও আমরা প্রতিদিন লক্ষ্য করিতেছি—ইহার প্রতীকার বাহিরের দিক দিয়া করিতে হইলে, নারীজাতিকে যদি আমরা উপার্জনক্ষম করিতে পারি তাহা হইলে অনায়াসেই বাংলার সাধারণ সংসারগুলি কিছু পরিমাণে সুস্থল হইয়া উঠিবে। বাংলার রমণীগণ অশিক্ষিত হইলেও, সাংসারিক দ্রব্যবস্তুর সময়, আপন আপন কুলমর্যাদা যথাসাধ্য রক্ষা করিয়া কিছু কিছু উপার্জনও করে। এখনও গ্রাম্য রমণীগণ, ঘরে বসিয়া সুপারি, কুচান, প্রভি-মার অলঙ্কারনিৰ্ম্মাণ, ধান ভানা প্রভৃতি অল্প বা অধিক পরিশ্রমের কাৰ্য্য করিয়া বেশ ছপয়সা উপার্জন করে, এবং তাহা সংসারের কল্যাণে ব্যয় করিয়া ছুংখের সংসারকে সুখের করিয়া লয়। দ্বীশিক্ষার বিস্তারে যদি বঙ্গীয় রমণীগণ অল্প পরিশ্রমে অধিক উপায়ের শিল্পকলাগুলি শিক্ষা করিতে পারে তাহা খুবই মঙ্গলের কথা—সূতা, উল, পশমের সুন্দর শিল্প, ছবি আঁকা, কাগজের বা মোমের ফুল ও খেলনানিৰ্ম্মাণ, সুগন্ধি তৈল এসেঙ্গ দস্ত-

মজ্জনপ্রস্তুত প্রভৃতি শিল্পগুলি অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে আরম্ভ করিতে পারিলে, জী, কন্যা, ভগ্নীরাপেই গৃহের সকল কার্যের মধ্যেই এগুলি দ্বারা তাহারা সংসারের অনেক অর্থভাব দূর করিয়া দিবে।

কিন্তু শিক্ষার লক্ষ্য (to earn independent and honourable living) স্বাধীনভাবে উপার্জনক্ষম হইয়া সমস্যানে জীবনযাত্রা নির্বাহ করার অর্থ যদি এমন হয়, যে অতঃপর দেশের রমণীগণ টাইপ রাইটিং, কেরানিগিরি, বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা প্রভৃতি কার্যে যাহাতে পারদর্শী হইয়া উঠে তাহাই করা, তাহা হইলে বুঝিব, দেশের মস্তিষ্ক বলিয়া বাহাদিগকে আমরা সম্মান করিয়া থাকি, তাঁহাদের বিকারবোর এখনও কাটে নাই। তাঁহাদের শিষ্য শিষ্য যে রক্তপ্রবাহ তাহা ভারতের এবং ভারতের বিশিষ্টতা রাখিয়া না চলিলে, এই সকল অনুষ্ঠানে যত বিরাট মন্দিরই রচিয়া উঠুক না, তাহার উন্নত চূড়া একদিন যে খসিয়া পড়িবে, তাহার কক্ষে কক্ষে চাম্‌চিকা বাহুর প্রভৃতি নিশাচরের যে বাসা হইবে, তাহা অবধারিত।

স্বপ্নের কথা, এই সভায় স্যার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রাণিধানযোগ্য। বৈদেশিক প্রবল প্রভাবের মধ্যে থাকিয়াও তিনি সম্মোহিত নহেন। বাঙ্গালীর নারীচরিত্র বাঙ্গালীর মত গড়িয়া তুলিবার জন্য তিনি বলিয়াছেন "their girls should be taught in the Bengali language and in Bengali fashion, so that in the long run, they might not turn out to be 'memsahebs' or be imbued with foreign ideas" অর্থাৎ আমাদের বালিকাগণের শিক্ষা বাংলাভাষায় এবং বাংলা ধরণে হওয়া উচিত, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাহারা আর বৈদেশিক আদর্শে আত্মহারা এবং 'মেমসাহেব' হইয়া উঠিবে না।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় ও সাধনায় বাহারা জীবনের অন্ধৈক দিন অতিবাহিত করিয়াছেন, তাঁহাদের সভায় দাঁড়াইয়া স্যার আশুতোষ মহাশয় বলিয়াছেন, "সে কথার প্রশংসা কেমন করিয়া করিতে হয় তাহা আমরা জানি না। 'নিউ ইণ্ডিয়া'র কথাগুলি আমরা তুলিয়াদিলাম "The advice was most opportune, and in speaking this Sir Ashutosh had, no doubt in mind, the deplorable results brought about by foreign educational agencies in this country."

If Indian-managed institutions also follow the same lines, it is because of the ignorance and the glamour thrown by the superficialities of the west. The real spirit of western culture is not imbibed and the result is an imitation of the Anglo-Indian Mem-sahab. It is a mercy that the evil has been recognised before it is too late, for which the enlightened conservatism of the Hindu religion has to be thanked."

অর্থাৎ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে দেশের যে শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াই-
য়াছে, ইহা দেখিয়া স্যার আশুতোষ সময়োচিত উপদেশ দিয়াছেন।
ভারতপরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলি যদি পাশ্চাত্য ধরণে পরিচালিত হয়, তাহা
হইলে ইহা তাহাদের অজ্ঞতা এবং অন্ধতা, পাশ্চাত্যের বহিঃশিক্ষার অনি-
বার্য ফল। যুরোপীয় সভ্যতা সত্যভাবে গৃহীত হয় নাই, ইহাকে গ্রহণ করিতে
গিয়া এ্যাথেনাইজ্জিগান মেসদাহেবকে অনুকরণ মাত্র করা হইয়াছে। খুব মঙ্গলের
কথা, সমর থাকিতে এই ভুল ধরা পড়িয়াছে। হিন্দুধর্ম ও সমাজের
কুসংস্কারবর্জিত রক্ষণশীলতাকে ইহার জন্ত ধন্যবাদ।

বাস্তবিক জীবনে ভগবানের প্রেরণা মুক্ত হইয়া উঠিয়াছে। চারিদিকেই
জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। জাতির জীবন মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ করি-
বার জন্ত নানা ভাবে কার্য আরম্ভ হইয়াছে। খ্রীশিক্ষার জন্ত দেশে
নূতন অনুষ্ঠান আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

শিক্ষাকেন্দ্রগুলি কেমনভাবে পরিচালিত করিলে, দেশের প্রকৃত মঙ্গল
সাধিত হয় অচুস্তাত্ত্বিক তাহার জন্ত ভাবিতে বসিয়াছেন। মানুষের বুদ্ধি
আজ অনেকটা সংস্কারমুক্ত। পুরাতন প্রভাব ও পাশ্চাত্যানুকরণ হইতে
মুক্ত হইয়া নূতন ভাবে কর্ম করিবার জন্ত সকলেই উদ্যোগ করি-
তেছেন—কিন্তু মানুষের মন ও প্রাণ এখনও আবেগ ও বাসনা-
বিরহিত হয় নাই। বুদ্ধিতে যে আদর্শ জাগিয়া উঠে, কর্মে তদনুরূপ
গড়িয়া তুলিতে এখনও আমরা অক্ষম। মনের তৃপ্তি sensationএ
কাজেই আড়ম্বরশূন্য কর্মকে কর্ম বলিয়াই মনে হয় না। তারপর বাসনা
চরিতার্থহেতু আমরা সমস্ত অনুষ্ঠানকে সঙ্গীর্ণ করিয়া তুলি। নূতন

নতুন শক্তিতে উহা প্রতিদিন পূর্ণ হইতে না পারিয়া পুরাতন হইয়া যায়। তারপর যখন দেখি মাহুষের এত উৎসাহ, এত অর্থ, এত পরিশ্রম, খুব অল্প ফলপ্রদান করিয়াছে তখন নৈরাশ্রে আমাদের সকল রচনাই ভাঙ্গিয়া পড়ে।

ভারতের শিক্ষা চিরদিনই বিনা আড়ম্বরে সাধিত হইয়াছে। শিক্ষাযন্ত্র বৃহৎ হইলেই যে অধিক শিক্ষা অর্জন করা যাইবে এমন কোন কথা নাই। শিক্ষা অন্তরের বস্তু, কলের সাহায্যে ব্যবহারিক জব্যারাজি অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু কলের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে মাহুষের হৃদয় কতটা প্রস্তুত হইবে তাহা বলা যায় না।

আমাদের দেশে পুরুষের শিক্ষা যতটা সমস্যাপূর্ণ, দ্বীপিকা তত নহে। পরাজিত দেশ বলিয়া দেশের পুরুষগণ যতটা পরাধীন, আমাদের কুলাজনাগণ তত বাহিরের বন্ধনে আবদ্ধ নহেন। নারীজাতির যে রাজ্য, সেখানে তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। পুরুষদের কর্মক্ষেত্রে বৈদেশিক রাজশক্তির অধীনে বলিয়া, অনেক সময় তাহাদের শিক্ষা তদনুযায়ী করিয়া তুলিতে হয়, কিন্তু দেশের নারীজাতির শিক্ষা সম্পূর্ণ দেশোপযোগী করিয়া তুলিতে হইবে।

এই পর্য্যন্ত সকলেই একমত হইতে পারেন। তারপর ইহা কার্যে পরিণত করিবার পদ্ধতি লইয়াই দেশে ভিন্ন ভিন্ন মতের সৃষ্টি। ইহা অগ্রশস্তাবী—কেননা জাতির ভীতনে যে ঐক্য দেখা দিয়াছে, উহা এখনও ভারতরাজ্য ছাড়াইয়া অন্তর বাহিরকে পূর্ণ করিয়া তুলে নাই। আজ আমরা ভাবের দিক দিয়া এক, কিন্তু উহা নানা ধরণে অনুবাদ করিতে গিয়া কর্মক্ষেত্রে নানা দলে বিভক্ত হইয়া পড়ি। Details লইয়া আজ যেহেতু মূলে মিলন পাইয়াছি বলিয়া উহা তুচ্ছ করিতে হইবে, এবং প্রত্যেকেই তাহাদের প্রেরণানুযায়ী কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন, শক্তি ও সময় একটু বাজে ধরচ হইলেও কেহই আত্মাকে অতিক্রম করিয়া চলিতে পারিবেন না।

আমাদের কর্মধারাটি ধরিয়াই যে দেশ পরিচালিত হইবে, একপক্ষী আমরা করি না, তবে আমাদের সহিত হাতধরাধরি করিয়া চলিতে বাহারা ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহাদিগের জন্ত দ্বীপিকা সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে দুই এক কথা বলিব মাত্র।

আমাদের মনে হয় নারীজাতির শিক্ষা উহাদের রাজ্যমধ্যেই প্রকটন করা

ভাল। কেননা সেখানে নানা ঘটনাসহকারে প্রকৃতি যে শিক্ষা অবিরত প্রদান করিতেছেন, তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়া আমাদের শিক্ষাকারাগারে উহাদিগকে লইয়া আসিলে এবং তথায় অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেও, তাহাদের জীবন অপূর্ণ রহিয়া যাইবে।

কিন্তু এইরূপ অনুষ্ঠান কতটা সম্ভবপর হইতে পারে তাহা ভাবিবার কথা। যাহারা স্বভাবের শিক্ষাপ্রণালীর উৎকর্ষতা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহারা অনায়াসেই এই স্বভাবের আশ্রয়লোভে কল্পসিন্ধি করিয়া লইতে পারিবেন। কিন্তু বাহিরের শিক্ষায়, আমাদের অন্তরের সাধনা অতিশয় বহিষ্কৃত হইয়া পড়িয়াছে, কথায় কথায় আমরা Institution করিয়া বসি। এই বিলাতী ধরণের Institutionগুলি গড়িয়া তুলিতে আমাদের অনেকখানি শক্তি ও সম্পদ খরচ হইয়া যায় এবং এইদিকে বেশ একটু নড়ানি পাই বলিয়া, মনে হয় খুব কার্য হইতেছে, কিন্তু তারপর নিতান্ত প্রসংগহীন যন্ত্রণামত Institutionগুলি বাধ্যতায় নিয়মে চলিতে থাকে, মানবজীবনের অনন্ত সাধকতা সেখানে পোয়া যায় না।

পৌরাণিক যুগ ছাড়িয়া দিলেও, এই কলিযুগেই আমরা লীলাবতী কণা প্রভৃতি বিদুষী রমণীর সন্ধান পাই। ইহারা ঘরে বসিয়াই উচ্চবিদ্যার অধিকারিণী হইয়াছিলেন। এখনও বাংলার সামাজি গৃহস্থসংসারে অনেক রমণী আছেন যাহারা স্কুল কলেজের সংগ্রহে না গিয়া, উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছেন। প্রকৃতির বিকল্প পদক্ষেপে যে শক্তি অপচিত হইতেছে, সাধকের কল্প সেই মহাশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া সম্পূর্ণ নূতন প্রণালীর সৃষ্টি করা।

বাংলার মধ্যবিত্ত গৃহস্থসংসারে নারীজাতির মধ্যে শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা বেশ বলবতী হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সাধারণ জীবনযাপনপ্রণালীর মধ্যেই ইহাদিগকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে—এই সরল ব্যয়বাহ্যবজ্জিত উপায়ে আমরা অধিক ফল লাভ করিব।

লীলাবতী কণার মত বিদুষী রমণী আমাদের সমাজে আজও বেশ বিরল একপন্থেই। সে যুগে শিক্ষা ছিল, কিন্তু উহা জাতির মধ্যে বিস্তৃত করিবার প্রয়োজনী ছিল না, কাজেই সে প্রচেষ্টাও হয় নাই। আজ জাতিগত সাধনার দিনে, আমাদের দেশের শিক্ষিত রমণীগণ যদি একান্ত চিন্তে এই নীরব সাধনাটি গ্রহণ করেন, তবে খুব শীঘ্রই ঘরে ঘরে স্ত্রীশিক্ষার প্রদীপ জলিয়া উঠিবে।

কিন্তু পুরুষের মত নারীজাতির জীবনও বহিঃস্বামী হইয়া পড়িতেছে। বাহারা উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাহারা নিজেদের কৃতিত্ব প্রকাশ করিতে খড়টা বাণ, কোন্ রঙ্গে আপনাকে নিঃশেষে ভরাইয়া, জাতির জীবন অধিক-তর শক্তিশালী করিতে পারেন তাহার দিকে ততটা গভীর দৃষ্টি দেন না। কেবল বাহিরের তরঙ্গাঘাতে কণ্ঠোদাত হইয়া অতীত ও প্রচলিত পন্থার মধ্যে উচ্চ ও মহৎ আদর্শটা নিতান্ত সাধারণ ও সঙ্গীর্ণ করিয়া ফেলেন।

নিষ্কাম না হইলে, এইরূপ কার্যে প্রবৃত্ত হইবার উপায় নাই, কেন না সর্বদাই আপনার শিক্ষা ও সামর্থ্যের পরিচয় গোপন রাখিয়া সমাজের গভীর স্তরে নিজেকে নিয়োজিত রাখা কঠিন। তাই নতুন সাধকই সর্বোপায় জিতেন্দ্রিয় হইয়া, এই নারীশক্তির উদ্বোধনকল্পে সংসারে অতি সহজেই উৎসর্গমন্ত্রে দীক্ষিতা কয়েকটা নারীশক্তির সৃষ্টি করিবেন। তাহারা ই জননী ভগ্নী পত্নীরূপে সমাজের সর্বত্র ছড়াইয়া, সংসার-দুর্গে বসিয়াই, গ্রামে গ্রামে নগরে-নগরে শিক্ষাকেন্দ্ররূপে রমণীসমাজকে সুশিক্ষিতা করিয়া তুলিবেন।

অবশ্য আমরা যে শিক্ষা প্রচারের কথা কহিতেছি—উহা ভাগবতশিক্ষা। হিন্দুচরিত্র বিকৃত, তাই তাহাদের আচরণ অতি কদম্বা বোধ হই-তেছে—নতুবা প্রতি হিন্দুই রমণীজাতিকে জ্ঞান্যপ্রকৃতির অংশসমুভা বলিয়াই বিশ্বাস করে। তাহাদের স্বাধীনভাবে ভরণপোষণ নির্বাহ করিতে হইবে বলিয়া তদনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা আমরা কিছুতেই করিব না। আমাদের পবিত্র স্মৃতিপুস্তকোক্ত দেবীর আসনে অধিষ্ঠিতা হইয়া তাহারা বাহাতে আমাদের জীবনে শক্তি প্রেম আনন্দধারা অবিরত বর্ষণ করিতে পারেন, আমাদের ভগ্ন হতাশ উৎসাহবিহীন প্রাণে নতুন আশ্রয় আলিয়া কক্ষক্ষেত্রে আমাদের বাহাতে সজীব ও প্রফুল্ল রাখিতে পারেন, এইরূপ শিক্ষার তাহাদের উদ্ভব করিয়া তুলিব।

নতুন কর্ম আরম্ভ করিবার সময় যে তপস্যা, যে ধৈর্য্য, যে শক্তির প্রয়োজন, কার্য গতিশীল হইলে আর ততখানি অধ্যবসায় ততখানি জীবন ততখানি সময় ব্যয় করিতে হইবে না, আপনার বেগে আপনি শুখন পরিচালিত হইবে। কেবল এই পথে আমরা একটি অন্তরায় দেখিতেছি—হিন্দুসমাজ মরণোন্মুখী—সে জীবনকে ভয় পায়, এমনই তার দৃঢ় সংস্কার। এইজন্য

কোন ব্যাপ্যকার শিক্ষাসমাপ্তির পূর্বে, সে পিতামাতার সম্মরক্ষার দায়ের পরিণীতা হয়। সাধারণ হিন্দুসমাজে আমরা ভবিষ্যৎজনীর যেটুকু জীবন পাই তাহা অতি অপ্রচুর। তত্রাচ আমরা হতাশ নই, আমরা ত সংসার ছাড়িয়া যাইব না, বৈরাগ্যের হোমাঙ্কন অন্তরেই জালিয়া জাতির বিরূপ ভোগের জন্ত, এই সংসারকে দিব্য করিয়া নির্মাণ করিব। ইহার ভিত্তির প্রত্যেক ইটখানি তপঃশুদ্ধ করিয়া গাঁথিতে থাকিব। আমরা আকাশ হইতে পড়ি নাই, আমাদেরও জ্ঞী আছে, কণ্ঠা আছে, ভয়ী আছে, তাহাদের উপর যে সত্তা অধিকার, তাহাতেই ভর দিয়া আমরা এই অভাবনীর কর্মে হস্তক্ষেপ করিয়াছি।

জীশিক্ষার জন্ত বাহিরে যে সকল মন্দির মহাডগরে আকাশ ছাইয়া মাথা তুলিতেছে, কর্মীর হৃদয় দিয়া সে প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিলেও, কাহাদের হস্তে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রাণশুভলীলিককে অর্পণ করিব? মহাতপস্বিনী মাতাজীর মত করজ্ঞন শিক্ষয়িত্রী সেখানে অবস্থান করিবেন, সাধিকা নিবেদিতার মত করজ্ঞন মেহময়ী দেবী সেখানে জ্ঞানের বীণার স্বাক্ষর দিবেন? কৈ—ভগবানের দিব্য প্রেরণায় উন্মাদিনী সে প্রেমময়ী মাতৃমূর্তির দর্শন ত পাইতেছি না, তবে কাহার জন্ত মন্দির রচনা করিতেছ? বিদ্যার নামে অবিদ্যার প্রচার সমাজে আরও অধিক বিস্তৃতি লাভ করিবে—ভাগবতশক্তি-অল্পপ্রাণিত সাধকের দল! সে মহাঅবিদ্যার সকল শক্তি পরিশুদ্ধ করিয়া তোলা, ধনীর প্রাসাদে আজ যে সানাই বাজিতেছে সেখায় দশভূজার মৃগ্ন মূর্তির পূজার আয়োজন, আজ তোমার পর্ণকুটীরে মঙ্গল শব্দে চিন্ময়ী মাতৃআরাধনা আরম্ভ করিয়া দাও—“জাকজমকে করুলে পূজা অহঙ্কার হয় মনে মনে”—তোমরা শুদ্ধ সমাহিত চিত্তে যে নীরব তপস্যা আরম্ভ করিয়াছ, মন্ত্রপূত গঙ্গাবারিপূর্ণ মদপত্রিকাশোভিত দেবীর যে মঙ্গল ঘট পাতিয়া বসিয়াছ—আমি দেখিতেছি ভারতের নূতন শক্তি উহাতেই আবির্ভূত হইয়া তোমাদের বর প্রদান করিবেন। আশায় নিরাশায়, স্নেহে দুঃখে, সম্পদে বিপদে অধীর না হইয়া, মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীরগতন, সঙ্কল্প করিয়া লাগিয়া যাও, ভারতের নারীশক্তি উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠুক।

রাউলট বিল

ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত রাউলট বিলের প্রতিবাদ আরম্ভ হইয়াছে। নরম গরম রাজতন্ত্র, এমন কি রাজকর্মচারী পর্যন্তও গভর্নমেন্টের এই কঠোর আইনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতেছেন। দিল্লীর লাটসভায় নির্ধাচিত এবং রাজকর্তৃপক্ষগণকর্তৃক মনোনীত সকল ভারতীয় সভাই একবাক্যে এই আইনে অসম্মতি জানাইয়াছেন। এমন কি ইংরাজপরিচালিত ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ পর্যন্ত ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন—

“Another blunder that is coming home to roost is the composition of the Rowlatt Commission. It was objected to by the Indian Press, but instead of listening to the objection it was overruled. The main object ostensibly of the enquiry was to convince the public of the justice of the internments, and one would have thought it desirable under the circumstances to have consulted the opinion of the Indian objectors. But the Commission was appointed in the spirit of Pontius Pilate, when he said—“what I have written I have written”, a spirit which has brought all Governments to grief sooner or later. It was Lord Ronaldshay's first bad blunder. The Rowlatt Bill is Lord Chelmsford's fiftieth blunder. It only means upsetting this country quite unnecessarily, considering how the rest of the world is upset already”.

ভারতীয় কাগজে ইহাপেক্ষা অধিক তীব্রভাবে যে প্রতিবাদ হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

গভর্নমেন্ট যে শাসননীতি প্রবর্তন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, প্রজাসাধারণের তাহাতে মত নাই, এক্ষেত্রে এই নূতন আইন যদি দেশে প্রচলিত হয়, তাহা নিতান্ত জোর করিয়াই চালাইতে হইবে। রাজশক্তি

প্রবল, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে সমস্তই করিতে পারেন। অমৃতভাঙ্গার পত্রিকার নিম্নের কথা কয়েকটি আমাদের বড় ভাল লাগিয়াছে।

“Of course, the Government is powerful enough to force these down our throats. Let them do it. We can not prevent this. But, though they may subjugate our bodies, let our souls remain free. Let our will-power resist the wrong; so far as it can do so, without provoking any physical conflict with the authorities or overstepping the limits of the accepted methods of constitutional resistance. This is our one only weapon against an all-powerful Bureaucracy. Almost every political leader is seriously thinking of having recourse to passive resistance if these bills are passed in the teeth of the unanimous opposition to it, both inside and outside the Legislative Council.”

রাউলাট বিলের বিরুদ্ধে লোকমত প্রবল দেখিয়া গভর্ণমেন্ট চতুষতা-সহকারে এই আইন অস্থায়ীভাবে প্রচলন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। কংগ্রেসের গান্ধী মাদ্রাজে বক্তৃতাকালে বলিয়াছিলেন, “যে গভর্ণমেন্ট সর্বাপেক্ষা কম শাসন করেন তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সর্বাপেক্ষা অল্প শাসন প্রতিষ্ঠিত, ইহা আমি দেখিয়াছি—এই জন্তই আমি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষপাতী।” আজ সহসা জগতের বর্বর জাতির মধ্যেও যে কঠোর শাসন প্রচলিত নাই, প্রতাপশালী ইংরাজ এরূপ বিধানের পক্ষপাতী হইলেন কেন?

স্যার নারায়ণ চন্দ্রভারকার এই আইনের প্রতিবাদ করিয়া সংবাদপত্রে যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে বিলপ্রণয়ের এই তিনটি কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে—

১। যুদ্ধের জন্ত যে ভারতরক্ষা আইন প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহা দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে “.....has proved that such a law is the only effective remedy for successfully coping with the secret and terrorising crimes of revolutionary conspiracies. That is the first necessity.”

২। বাহায়া অন্তরীণে আবদ্ধ আছেন, তাঁহাদিগকে ছই বা ততোধিক

ভাগে বিভক্ত করা যায়। একদল—যাহারা বড়বন্দুককারীদের গোপন মন্ত্রণা প্রকাশ করিয়া এই বিপ্লববাদীদের ধরাইয়া দেওয়ার সুবিধা ঘটাইয়াছে—অপর দল যাহারা অন্তরীণে অন্ততঃ না হইয়া এখনও ভীষণ চরিত্রের পরিচয় দিতেছে, এই সকল যুবকদের যদি যুদ্ধান্তে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে দেশে আবার হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইবে ॥ “.....The men of the first class will be exposed to assassination at the hands of the second class and others inclined to revolutionary crime; and the men of the second class will continue their career of that crime. Hence the necessity of a law on the lines of the Defence of India Act. That is the second necessity.”

৩। ভারতের অসংখ্য লোকের তুলনায়, এনাকিজম খুব অল্পলোকের মধ্যেই বিস্তৃত হইয়াছে, সুতরাং ভারতের শাসনকর্তৃপক্ষগণকে, এই রকম অপরাধের মাত্রা বাহাতে দেশে বাড়িয়া না যায়, তাহার জন্য বিশেষ শাসনাধিকার দেওয়ার প্রয়োজন।

আমরা এই অবশ্যে গভর্ণমেন্টের কক্ষে প্রতিবাদ করিবার প্রচেষ্টা করিব না, আমরা আমাদের পৃথকী সুগম করিয়া লইবার জন্য ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিব, কেননা দেশের বুকে একটা বিভীষিকা চিরস্থায়ী হইয়া থাকিলে, ভয়, ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি মানসিক নানাবিধ বিকৃতির ফলে, দেশের যুবকগণের আবার পথভ্রষ্ট হইবার খুবই সম্ভাবনা। নিতান্ত বিবেক-বুদ্ধির ইঙ্গিতে নীরব না থাকিয়া আমরা দুই এক কথা বলিব মাত্র। আশা করি, দেশের নূতন দল আমাদের কথার সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিবেন।

১। ভারতরক্ষা আইনের দ্বারাই যে বাংলার বিপ্লববাদ ধ্বংস হইয়াছে, এই ধারণা রাজকর্তৃপক্ষগণ ও বহু নেতৃবৃন্দের মনে দৃঢ় হইয়া গিয়াছে—হই-বারই কথা, কাকতালীর মত, এই আইনপ্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গে দেশের অবস্থার পরিবর্তন ঘটয়াছে। কেহ কেহ বলেন ১৯১৭ সালের ২০শে আগষ্ট ভারতসচিব মর্টেন্ড সাহেব যে নূতন আশার কথা বলিয়াছেন, তাহাই বিপ্লববাদীদের মনে শান্তিবারি ঢালিয়া দিয়াছে, মূলতঃ উভয় যুক্তিই নিরর্থক। মানুষের দৃষ্টি সাধারণতঃ বহিষ্কৃত ভিতরের পরিবর্তন কেহই লক্ষ্য করে না। দ্বাদশ বর্ষ ধরিয়া বাংলাদেশ অন্তর্ক রাজস শক্তিতে উত্তে-

জিত হইয়া যে ভুল পথটী অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা পরিহার করা একান্তই প্রয়োজন বোধ হইতেছিল, কিন্তু গতির বেগ যেমন ইচ্ছা না থাকিলেও মানুষকে আরও দুই এক পা আগাইয়া লইয়া যায়, সেইরূপ বাংলার কর্মক্ষেত্রগুলি ইতস্ততঃ করিতেছিল, নূতন আইন তিতরের এই পূর্ণচ্ছেদেরই বহির্বিকাশ মাত্র।

যে সকল পুলিশকর্মচারী আজ পর্যন্ত যড়যন্ত্র ও বিপ্লববাদ সম্পর্কে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা জানেন, ভিতর হইতে স্বভাবের আমূল পরিবর্তন না ঘটিলে কঠোর দণ্ডে অন্যায়কারীর সংখ্যা কমান যায় না। রাজশক্তির লোহকারাগার নির্মাণ ফাঁসিকাঠি কি মানুষকে চৌধ্য-বৃত্তি বা জিৎবাংসাপরায়ণতা হইতে রক্ষা করিতে পারিয়াছে? বাংলার যুবকগণের অন্তরে যদি এক নূতন ভাব প্রতিষ্ঠা লাভ না করিত, তাহা হইলে শাসনের দৃঢ়তার দেশে হত্যা ও ডাকাতির সংখ্যা বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হইত না। আমরা মানবমনের সন্ধান জানি বলিয়াই, অতঃপর দেশে নবীনদের মধ্যে শিব ও সূন্দরের খেলাই লক্ষ্য করিতেছি।

কিন্তু রাজশক্তি ভিতরের খবর না জানিয়া আজ যে কঠোর আইন প্রণয়ন করিতেছেন, ইহাতে নির্দোষিতপ্রায় শেষ বহিষ্টকু আবার জলিয়া উঠিতে পারে। এখনও বাংলায় বহুসংখ্যক শিক্ষিত রাজনীতিক পলাতক যুবক যথাতথ্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, রাজশক্তি কোন দিনই ইহাদের অস্বাভাবিক জীবনযাত্রাটীকে সরল ও সত্য পথে পরিচালিত করিবার জন্য কোন করুণা প্রকাশ করিবে না বুঝিয়াই, আত্মরক্ষা ও আত্মপুষ্টির জন্য নূতন নূতন দল সৃষ্টি ইহাদের পক্ষে অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। পুলিশের চক্ষে আজ যাহারা সন্দেহভাজন, এমনক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া ইহারা একেবারেই নূতন আশ্রয় সৃষ্টি করিয়া লইতেছে। এই আইনের ফলে, গোপনে গোপনে এই দল অধিক শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারে, তখন দেশের ভবিষ্যৎ উজ্জল ও মহৎ করিয়া তুলিবার জন্য যাহারা আজ নূতন মস্তিষ্ক দীক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহাদের কর্মে অযথা বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। শান্তির পরিবর্তে ভিতরে ভিতরে খুব বড় অশান্তিসৃষ্টিরই আয়োজন চলিতে থাকিবে।

২। দ্বিতীয়তঃ গভর্নমেন্ট আশঙ্কা করিতেছেন, রাজনীতিক বন্দীগণ মুক্তি পাইলে দেশে আবার অশান্তি উপদ্রবের বৃদ্ধি পাইবে। আমরা বহুবার বলিয়াছি, যে সকল শিক্ষিত যুবক অনন্তোপায় হইয়া এই অবৈধ উপায়

অবলম্বন করিয়াছিল, তাহার ভিতর হইতে যে নূতন জীবনের আভাস পাইয়াছে, তাহারই প্রভাবে পূর্বের মত এইরূপ অবশ্যক পৈশাচিক হিংসাবৃত্তিতে তাহার আর উন্মাদ হইবে না। ইহার উপর রাজামূল্য প্রদর্শিত হইলে আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি, রাজকর্তৃপক্ষগণের এবিধ আশঙ্কা করিবার কোনই কারণ থাকিবে না।

৩। তারপর এই ঘোরতর যুদ্ধের পর, ইংরাজ বিজয়ী হইয়া যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, সেই দৃঢ় প্রতিষ্ঠার মূলোচ্ছেদ করাই তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না, এবং এমন হীনবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কেহই আর হাস্যাপাদ হইতে সাহসী হইবে না। আত্মমুক্তির নূতন মন্ত্র দেশকে সম্পূর্ণ নূতন পথই নির্দেশ করিবে, এ অবস্থায় গভর্নমেন্ট নিঃসন্দেহে এই নূতন আইন বর্জন করিতে পারেন।

কিন্তু এই আইন লইয়া গভর্নমেন্টও ভীষণ সমস্যায় পড়িয়াছেন। দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থার সহিত বিশেষ পরিচয় না থাকায় গভর্নমেন্ট এই সহজ পথটাই অবলম্বনীয় মনে করিয়াছেন। দেশের দিক হইতে এরূপ একবাক্যে যে ইহার প্রতিবাদ হইতে পারে, একথাও রাজকর্তৃপক্ষগণ হয়ত ধারণা করিতে পারেন নাই। গতবারে থাপার্ডে মহোদয়ের এই বিষয়ক প্রস্তাব যেরূপ উপেক্ষিত হইয়াছিল, তাহাতে সাধারণতঃ গভর্নমেন্ট মনে করিয়াছিলেন, অন্ততঃ দেশের একপক্ষ এই কঠোর আইন প্রচলনে সমর্থন করিবেন। ধীরপন্থীদের অগ্রগণ্য সুরেন্দ্রনাথের হৃদয়তন্ত্রী এই বিলের প্রতিবাদে তেমন জোরে না বাজিলেও উক্ত দলের অন্ততম নেতা শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয় বড় গলা করিয়াই বলিয়াছিলেন—

“We have given our consent to many repressive laws by now—the Press Act, the Defence of India Act during the war. We were hourly on our trial. We have given hundred millions. We have given this, we have given that.....Once bidden to bring the milk of a beast of prey, we have brought a jugful of milk of the tigress. Are you going to throw it aside and say, ‘bring the milk of the male tiger.’ That is not fair,

দেশবাসীর শত অমুবিধাজনক আইনপ্রণয়নে সম্মতি দিয়া বাহিয়া গভর্নমেন্টের চক্ষে রাজভক্ত বলিয়া প্রতীত হইয়াছিলেন, এই বিলের বিরুদ্ধে তাঁহাদেরও দাঁড়াইতে দেখিয়া সম্ভবতঃ লর্ড চেমসফোর্ড বাহাদুর এই আইন অস্থায়ীরূপে প্রবর্তিত-করিতে মানস করিয়াছেন। জানি না সমগ্র দেশের অশ্রদ্ধা মাথায় বহিয়া, দেশের প্রতিনিধিস্বরূপ ধীরপন্থীগণ এই আইন মাত্ত করিয়া লইবেন কিনা?

মালব্য মহাশয়ের বক্তৃতার মধ্য বুরিয়া আমাদের মনে হয়, গভর্নমেন্ট এক প্রকার স্থির করিয়াছিলেন যে ধীরপন্থীগণ রাউলট বিলের পক্ষ সমর্থন করিবেন। ইহাদের অধিকতর স্পষ্টতা ও স্পষ্টতার অভাবে, গভর্নমেন্ট এমন এক ব্যয়গায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, যেখান হইতে সহসা পুনরাবর্তন করা এখন আর সম্ভবপর নহে। কেননা যেতাদ্ধ সম্প্রদায়ের মতবাদ উপেক্ষা করিলে, উক্ত সমাজও বিচলিত হইয়া উঠিতে পারে, ইতিমধ্যেই কলিকাতার যুরোপীয়ান এসোসিয়েশন এই ক্ষুদ্র অল্পগ্রহ প্রদর্শনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। স্মরণ্য সহজে আর এই বিল প্রত্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা নাই বুরিয়া, সম্ভবতঃ ধীরপন্থীগণ গভর্নমেন্টের সহিত একটা আপোষ করিয়া ফেলিবেন।

ধীরপন্থীগণ উপর্যুপরি দেশের স্বার্থসংরক্ষণে উদ্যতীন হওয়ার, দেশবাসীর প্রজ্ঞা-আকর্ষণে অসমর্থ হইয়া পড়িতেছেন; ডেলি নিউজ সভ্যই বলিয়াছেন—

The political joke of the week has been the strange behaviour of the Moderates over the Rowlatt Bills. These Bills were bad, oppressive, tyrannical and harmful, and gave India over to the C. I. D. That was on Monday but on Tuesday they said "If the oppression, tyranny and iniquity of the rule of the C. I. D. are only to last for three or four years or so that is a quite different matter. It alters our views considerably. And Sir Willam Vincent jumped at it and the Moderates jumped at it and another legislative tragedy was enacted for our benefit amid roars of laughter. What is the view of the public of a leader, who refuses with scorn a rupee for something he has to sell, and ten minutes after accepts two eight-anna bits with gratitude and enthusiasm! And then draws elaborate

rate distinctions as to the deal. No wonder the Extremists have the following. They are sincere.

ধীরপন্থীগণের এই আপোষ দেশ মানিয়া লইবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে, ইতিমধ্যেই আমরা চতুর্দিকে আন্দোলনশ্রোত প্রবলরেণেই বহিতে দেখিতেছি। গভর্ণমেন্ট ও দেশনেতৃগণ এই সময়কার সমাধান কেমন করিয়া করেন তাহা দেখিয়াই আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিব।

সমালোচনা

মহাত্মা গান্ধী—শ্রীবোগেশ চল্ল মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য আট আনা মাত্র।
হাওড়া—পাণিগ্রাস হইতে গ্রহকার কর্তৃক প্রকাশিত।

ভারতে অধুনা যে সকল উন্নতমনা দেশভক্ত দেশের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধী তাঁহাদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, বাংলায় তাঁহার অনুরাগী ও ভক্তের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে।

“১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ২রা অক্টোবর শনিবার শ্রীযুক্ত গান্ধী গুজরাটের অন্তর্ভুক্ত পোরবন্দর সহরে এক সম্ভ্রান্ত বণিক বংশে জন্মগ্রহণ করেন”। তার পর তিনি কেমন করিয়া কাথিয়াবাড় হাইস্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন দিয়া বিলাতে ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, কিসের জ্ঞান আপনার সুখ সম্পত্তির সকল আশা বিসর্জন দিয়া দক্ষিণ-আফ্রিকায় জীপুতাদি সহ কঠোর কৃচ্ছসাধন আরম্ভ করিয়াছিলেন, এ সকল বিষয় অতি বিশদভাবে ইহাতে বর্ণিত আছে।

প্রবাসী ভারতবাসী নেটাল গভর্ণমেন্টের কঠোর আইনে বিপন্ন হইলে মহাত্মা গান্ধীই তাহাদিগকে Passive Resistance মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাদের কথঞ্চিৎ দুঃখের লাঘব করিয়াছিলেন এবং এই কার্যে তাঁহাকে যে অশেষ যত্না ভোগ করিতে হইয়াছিল, সেই সকল কথা পাঠ করিতে করিতে, স্বতঃই প্রাণ আত্মত্যাগে উৎসুক হইয়া মহাপ্রাণ গান্ধীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে প্রবৃত্তি যায়।

জানিনা য়ার অঙ্গুলি মন্ধেতে “একদিন রেলের রাজপথে পঙ্গপালের মত শত শত বালক যুবক বৃদ্ধ বনিতা আপনাদের যৎসামান্য জিনিষপত্র স্বন্ধে

লইয়া, কেহ কেহ বা দুষ্কপোষ্য শিশুসন্তানগুলিকে বুকের উপর ফেলিয়া নিউ ক্যাসেলে সমবেত হইবার সময়, প্রবল বর্ষায়, গভীর কর্দমাক্ত পথে দারুণ কষ্টে পড়িয়াও মনের বল হারায় নাই”, তাঁর অসাধারণ তপঃশক্তি ভারতের কতখানি উন্নতিবিধান করিতে পারে!

বাংলার নূতন দল তপস্বী গান্ধীর অসাধারণ চরিত্রে মুগ্ধ—সেদিন বিপিনচন্দ্র রাউলাট-সিডিশন-বিলের—প্রতিবাদ সভায় বড় গলা করিয়াই বলিয়াছিলেন—যে যদি তেমন হয় তবে আমরা গান্ধীকে ডাকিয়া, তাঁহার নিকট হইতে Passive Resistance মন্ত্রে দীক্ষা লইব। সত্যই ভারতের বর্তমান মহাসমস্যার যুগে, ভ্রান্ত দেশবাসীর সম্মুখে তিনি ঐক্য নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল। এরূপ মহাত্মার জীবনচরিত পাঠ করিতে আমরা সকলকেই আব্রুরোধ করি।

বন্ধন

ভিতরের বন্ধনই বাহিরে জটিলতার সৃষ্টি করে। ভিতর যেমন মুক্ত হইবে, বাহিরেও সাধক দেখিবে যে তাহার কর্মক্ষেত্র তেমনিই সরল ও স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। বাহিরের বিষয়গুলিকে লুক্কিত করিতে গিয়া বাহিরের শৃঙ্খলে হস্তপদ আবদ্ধ হইয়া যায়, বন্ধন যতই দৃঢ় হয়, চেষ্টার মাত্রা ততই বাড়িয়া যায়, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এই যুদ্ধই জীবনের উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়।

আমরা জাগরণের প্রথম দিন হইতে এই কর্মই করিয়া আসিতেছি, চক্ষু মেলিয়া বাহিরের ছংখটাকেই বড় করিয়া দেখিয়াছি; এ ছংখের উৎপত্তি কোথায় তাহার নির্দেশ করিতে হইলে যে অন্তঃসাধনার প্রয়োজন তাহা আমরা করি নাই, উপরের স্থূলবন্ধন অসিক্ত হস্তস্পর্শে স্থূলতর হইয়া উঠিতেছে, শিব গড়িতে গিয়া বানর গড়িয়া বসিতেছি—এ ভ্রম কি ভাবিবে না?

আমরা দেখিতেছি, জাতির সমস্ত শক্তিটাই এই ভুল পথটাই অবলম্বন করিয়া ছুটিয়াছে, ঘটনা ধরিয়া তাহার প্রতীকার আকাখাই জীবনের কর্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আমরা যেন ঘটনা (event) এবং অবস্থার (circumstance) দাস—এতদ্ব্যতীত জীবনগতির যেন অস্ত্র কোনও কারণ নাই।

লর্ড কর্জেন বঙ্গ-ভঙ্গ করিয়াছিলেন বলিয়াই যেন আমাদের চৈতন্যোদয়; জামালপুরের প্রতিমাভঙ্গ, বরিশালে নেতৃবৃন্দের লাঞ্ছনা, মৈমনসিংহে রমণী-নিগ্রহ, বিডন স্ট্রীটে দাঙ্গাহাঙ্গামা প্রভৃতি ঘটনা ধরিয়াই আমরা ইহার প্রতীকারপরায়ণ হইয়াছিলাম, আজও অন্তরীণ, নিরপরাধা সিদ্ধুবালা

যায় অবমাননা, রাউলাট বিল প্রভৃতি বিষয়ে উতাক্ত হইয়া রক্তমুখী হইয়া ছুটিয়াছি।

লোকমাত্র বাল গঙ্গাধর তিলক হইতে ভারতের ছোট বড় কর্মবীরগণের জীবন এই একই কারণে উদ্ধৃত, এই অবস্থা এবং ঘটনার দাস হইয়াই ইহারা আপনাদের মহামূল্য জীবন নিঃশেষ করিতে বসিয়াছেন।

এখনও দেখিতেছি দেশপ্রেমিক তিলক তাঁর জীবনের অমূল্য সময় ও অসাধারণ শক্তি এই একই কারণে ব্যথা ব্যয় করিতেছেন। ভগবানের হস্তে যন্ত্রবৎ স্বাধারা পরিচালিত হইবেন তাঁহাদের তিরস্কার পুরস্কারের বিচার ভগবানের উপরই নির্ভর করিতে হইবে, আর ভ্যালেন্টাইন চিরোল তাঁহাকে অথবা রাজক্ৰোধী বলিয়াছেন বলিয়া তিনি আজ ইংলণ্ডের বিচারালয়ে বিচার আশায় গিয়াছিলেন। হায় মর্ত্যজীব, কবে তুমি দেব-আশীর্ব্বাদে নিন্দা প্রণতির পর পারে দাঁড়াইয়া একনিষ্ঠ চিত্তে ভগবদ সাধনায় জীবন উৎসর্গ করিবে?

আঘাত ভিতরের অভাবকেই জাগাইয়া দেয়, উহা হইতে নিকৃতি পাইতে হইলে সেই অভাবই পূরণ করিতে হয়। আঘাতের প্রতিঘাত সর্ব্বাঙ্গে প্রয়োজন হয় না, বরং আঘাতকারীর স্থায়-অন্যায় বিচার করিতে যাওয়াই নিতান্ত কাপুরুষতা। এইরূপ আঘাতের প্রতিক্রিয়ারূপ আমাদের জীবনের যে ক্রমবিকাশ, তাহা ভিতরের সেই অণোরণীয়ান্ মহতো মহীরাণের সত্য বিকাশ নহে, উহা যতই নিবীড় ও ঘন হউক উহা কুজাটিকা মাত্র, শক্তি প্রকাশের সঙ্গে উহার তিরোধান অবশ্যজ্ঞাবী।

আজ আমাদের দেশের যথার্থ কর্মীর দলকে এই পুরাতন পথটি একেবারেই ছাড়িয়া দিতে হইবে, অনলের লাভণ্যহিল্লোলে সম্মোহিত হইয়া ধাবিত হইলে পতঙ্গের মত বিনাশের সম্ভাবনাই অধিক। বহিঃপ্রকৃতির সবেগ সন্তাড়নে জীবনকে বিগল্ন অবস্থায় ইত্যন্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে না দিয়া জীবনগুলিকে ভিতরের শক্তিতেই সংহত ও সংযত করিয়া তুলিতে হইবে। সে শক্তি কি? স্বামীজীর মন্ত্রগুলি কর্ণগোচর কর—“Let the lion of Vedanta roar.”

এই বেদান্তের সাধনাই হউক আমাদের জীবনের কেন্দ্রশক্তি, ভগবানকে আমাদের অন্তরে বাহিরে দেখিবার যে শিক্ষা, তাহাই বেদান্ত; দশআড়া কালের কথা পাজিতে লেখা থাকিলেও তাহা নিঃড়াইয়া যেমন এক ফোঁড়ি

জল বাহির করা যায় না, সেইরূপ বেদান্তের ভাষা ও ভাবগত আলোচনাই যে জীবনের উদ্দেশ্য হইবে এরূপ নহে। মনে রাখিও বেদ উপনিষদ গীতা সাংখ্য পাতঞ্জল প্রভৃতি শাস্ত্রবিদ্যাই সাধনা নহে। যে শক্তি উদ্বোধিত হইলে এই সকলের জ্ঞান জীবনে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, আমরা তাহারই কথা বলিতেছি। ভগবান্কে না জানিলে না পাইলে সকল বিদ্যাই অপরা আর তাহাই সত্যশিক্ষা—পরাবিদ্যা—যদ্বারা “অক্ষরমধিগম্যতে” অর্থাৎ অক্ষর পরমব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ভারতকে বাহির ছাড়িয়া একেবারে এই ভিতরের মণিকোটায় ফিরিয়া আসিতে হইবে, চেষ্টায় যে বিরাট সৌধ রচিয়া উঠিয়াছে উহার মায়া করিও না, ঐ অবিদ্যা মন্দিরের ভিত্তি দৃঢ় নহে—উহা একদিন হুড়মুড় করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবে। আইস আমরা একেবারেই নূতন মন্দির গড়িয়া তুলি।

এই দিব্য প্রাসাদ নির্মাণকল্পে চাই এমন সকল সাধক, যাহারা বাহিরের আশায় উদ্ভ্রান্ত হইবেন না, বাহিরের অমানুষিক অত্যাচার ও নির্যাতনে অবিচল থাকিবেন, যাহারা দিব্যনেত্রে দেখিবেন, উপরের হিরণ্ময় দ্বার মুক্ত করিয়া দেবপুরুষ মনের রাজ্যে নামিয়া আসিতেছেন, যাহারা ভিতরে জাগ্রত—বাহিরে গভীর সমাধিমগ্ন। প্রকৃতির মায়া আবর্তনে বাহির বিধ্বস্ত হউক, কঠোর শৃঙ্খলে উহার আপাদমস্তক আবেষ্টিত হউক, এই অন্তর্দেবতা যে দিন প্রাণের দরজায় উকি মারিবেন, সে দিন বাহিরের জীবনে আজ যত অন্ধকারই ঘনাইয়া আসুক উহা অপসারিত হইবে ভিতরের দীপ্তিই বাহিরকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে।

সাধনা

১। সাধ্যকে লাভ করিবার উপায়ই সাধনা। সাধারণ অর্থে জীবমাত্রেরই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সাধানায় রত। ভগবৎ-সান্নিধ্য, ভগবৎ-উপলব্ধি, অধ্যাত্ম-জীবন-লাভের চেষ্টাই ভারতে যোগসাধনা নামে অভিহিত।

২। আমাদের নিজ নিজ স্বভাবের পরিবর্তন ও পরিবন্ধন আমাদের সাধনার একটি প্রধান অঙ্গ। পশুস্বভাব হইতে মানবস্বভাব, মানব স্বভাব হইতে দেবস্বভাব, কুৎসিৎ হইতে সুন্দর, ব্যাধি হইতে স্বাস্থ্য, দ্বন্দ্ব হইতে মিলন, মৃত্যু হইতে জীবন।

৩। সাধনা আত্ম বিকাশ—গভীর হইতে গভীরতর ভাবে, সুন্দর হইতে সুন্দরতর করিয়া। সঙ্কীর্ণকে বিস্তৃত করিয়া, ক্ষুদ্রকে বিশাল করিয়া, অনিত্যকে নিত্যের মধ্যে ধরিয়া।

৪। সাধনা আত্ম-প্রকাশ—ভগবৎ-ঐশ্বর্য, শক্তি, জ্ঞান, আনন্দ আপ-নার মধ্যে পূর্ণভাবে ধারণ করিয়া প্রকাশ করা।

৫। ভগবৎ-উপলব্ধি সহজ, ভগবানকে প্রকাশ হ্রস্ব। আমরা ত শুধুই ক্ষুদ্র অহংকে, দ্বন্দ্ব কলহকে, জরা মৃত্যু ব্যাধি ও ক্ষুদ্রতাকে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছি। আমাদের জীবন মৃত্যুর কবলিত হইবার জন্ত, আমাদের স্বাস্থ্য সম্পদ যে জীবন-দেবতার পরিহাস মাত্র।

৬। তপস্বী ব্যতিরেকে সিদ্ধি নাই। কশ্মের চাকুলোর মধ্যে, সংসারের কোলাহলের মাঝখানে বাহারা অন্তরের শান্ত, সম, নীরব, গভীর ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে তাহারাই বীরসাধক।

৭। বাহাদের অন্তররাজ্যের দ্বার খোলা নাই, হৃদয়ের শ্রুকুমার ও গভীর বৃত্তিগুলি ফুটিয়া উঠে নাই, তাহাদের সে রাজ্যের তথ্যের কথা ন্যায়-শাস্ত্রের কথায় বুঝাইয়া দেওয়া কঠিন। স্বল্প বিষয় স্বল্প-যজ্ঞসাহায্যেই দেখিতে হয়।

শ্রাবণ

১। নিখিল জগৎ মুক্তির জন্য লাগামিত, জীব-মাত্রের তবুও আপন আপন বন্ধনে মুগ্ধ। ইহাই উত্তম রহস্য,—আমাদের প্রকৃতির অচ্ছেদ্য গ্রন্থী।

২। মানুষ জন্মের বন্ধনে আবদ্ধ হইতে ভালবাসে, তাই জন্মের সহচর মৃত্যুকেও স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হয়। এই বন্ধনের মধ্যেই স্বাধীনতা ও স্বীয় পূর্ণতা-লাভের কর্তৃত্বের সে আকাঙ্ক্ষা রাখে।

৩। মানুষ শক্তি-ভিখারী, সেই হেতু দুর্বলতার দ্বারা সে আক্রান্ত। এ পৃথিবী বিশাল সমুদ্রবৎ, শক্তির বিভিন্ন তরঙ্গমালা প্রতিনিয়তই একটি আর একটির পর ঘাতপ্রতিঘাত করিয়া চলিয়াছে। কোন একটি তরঙ্গের শিরোদেশে আরুঢ় হইতে হইলে, সহস্র বীচিমালার আঘাত বেদনা-সহিবার জন্ত প্রস্তুত হও।

৪। মানব সুখের ভিখারী, তাই দুঃখ বেদনাতার বহন করিতে সে বাধ্য। অবিমিশ্র আনন্দ নিকাম জীবেরই লভ্য। মানুষের মধ্যে যে বৃত্তি সুখাশ্রয়ী উহা স্বভাবতঃই ক্লেশদায়িনী ও চেষ্টাপ্রসূত।

৫। মানব শাস্তি বৃত্তি, কিন্তু সে মানসিক চাপা ও উদ্বেলিত হৃদয়ের ব্যথাও অনুভব করিবার জন্ত তৃপ্ত। ভোগের জন্ত সদা লাগামিত মন স্বৈর্য্য, স্থিতির নামে আতঙ্কিত হইয়া উঠে।

৬। মানুষ তাহার সঙ্কীর্ণ শারীরিক সামর্থ্য লইয়াই তুষ্ট; তবুও অসীম মন-রাজ্যের ও অবিদ্যার আত্মার স্বাধীনতা লাভ করিতেই সে চাহে।

৭। মৃত্যুকে দেখাইয়া প্রকৃতি অবিরত জীবের নিকট প্রশ্ন তুলিতেছেন—বলিয়া দিতেছেন—হে মানব, তুমি তোমার বাস্তব জীবন আজিও লাভ কর নাই। মৃত্যু আসিয়া বিরিয়া না ধরিলে, জীব তাহার নখর জীবনে চির দিনের জন্য বদ্ধ হইয়া রহিত। মৃত্যুকর্তৃক অনুসৃত হইয়া জীব তাহার স্বাস্থ্য ও জীবনের চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে ও পন্থা অনুসন্ধান করিতে থাকে।

নারীর কথা

আমরা সন্ন্যাসী নহি—আমরা চাই জগৎ জীবন, সুতরাং চাই সংসার সমাজ।
কি লইয়া সংসার সমাজ, কিসের উপর দাঁড়াইয়া আছে সংসার সমাজ
নারী। নারীকে কেন্দ্র করিয়াই সংসার সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে, নারীকে
দ্বিরিয়াই জীবন-প্রতিষ্ঠান প্রসারিত হইয়াছে। জীপুরুষের সম্বন্ধই রহিয়াছে
জীবন লীলার মধ্যে। তাই দেখি সন্ন্যাসীর প্রথম কৰ্ম দারাস্থত পরিভ্যাগ
করা অথবা সে দিক হইতে প্রথম হইতেই নিবৃত্ত হওয়া। সেই জন্তই
দেখি বুদ্ধদেব নারীকে সাধনা দিতে, আপন সম্প্রদায়ে অন্তর্ভুক্ত করিতে
এমন অনিচ্ছুক ছিলেন; খৃষ্টীয় ধর্ম নারীকে নরকের দ্বার বলিয়া ব্যাখ্যা
করিয়াছে।

সন্ন্যাসধর্ম নারীকে যে সন্দেহের অবহেলার চক্ষে দেখিবেন তাহা
আশ্চর্যের নয়। কারণ সন্ন্যাস প্রকৃতপক্ষে পুরুষেরই ধর্ম। নারী হইতেছে
প্রকৃতি—মূর্ত জীবন। ইহজগতের যে সত্য, যে সৌন্দর্য্য তাহারই বিগ্রহ হই-
তেছে নারী। পুরুষ স্বভাবতঃই চিন্তাশীল, ধ্যানী—কর্মের জীবনের মধ্যেও
কেমন একটা নিলিখিত তাহার সহজেই ফুটিয়া উঠে। নারী কিন্তু কর্মের
জীবনের তরঙ্গ হইতে আপনাকে তেমন আলাদাও করিয়া দূরে দূরে রাখিতে
পারে না, সে তরঙ্গের সাথে আপনাকে ঢালিয়া মিলাইয়া মাখাইয়া চলিতে থাকে।
পুরুষ হইতেছে মনোমগ্ন, নারী প্রাণমগ্ন। পুরুষের প্রতিষ্ঠা মস্তিষ্কে—
তাহার সহজ ধর্ম জ্ঞান বিবেক বিচার। নারীর প্রতিষ্ঠা প্রাণে বা
হৃদয়ে—তাহার সহজ ধর্ম প্রেম অনুভব ভাবাবেগ।

সন্ন্যাসীরা ভয় করিয়াছিলেন নারীর মধ্যে এই প্রকৃতির শক্তি, নারীকে
আশ্রয় করিয়া জীবনের দিকে পৃথিবীর দিকে যে টান আমাদের কাছে টানিয়া
ধরিতেছে। এই শক্তি এই টান পরম সত্য—মায়া মোহ বলিয়া বতাই
উড়াইয়া দিবার চেষ্টা হউক না তাহা তত সহজে উড়াইবার জিনিষ নহে।
সন্ন্যাসধর্মেও তাই নারী তাহার স্থান করিয়া লইয়াছে। সন্ন্যাসী প্রথমে
তুচ্ছ করিয়া তাড়াইতে চাহিয়াছিলেন, তাহা যখন হইল না তখন তাহাকে
পূজা করিয়া দূরে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। নারী তখন দেখা

দিল মাতৃরূপে, 'মাদোনা'র মূর্তি ধরিয়া। পৃথিবী, জীবন, ইহজগৎ এমন একটা ভাব-লইয়া উপস্থিত হইল-যাহার সহিত পুরুষের অন্তর্গত ধ্যানী, ত্যাগী, পরপারসর্কষ সন্ন্যাসী নিজের স্বধর্মের বিরুদ্ধে না যাইয়া-সহজেই এক রকম সম্বন্ধ সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারে। তাই সন্ন্যাসী বলিলেন পৃথিবীকে যতক্ষণ স্বংস না করিতে পার, ততক্ষণ এটিকে মানিয়া লইয়া চলিতে পার—প্রাক্তনরূপ—মানিয়া নাও কিন্তু কেবল দেব-উষ্টার মত, রসাস্বাদনও করিতে পার কিন্তু কবির মত দূর হইতে ভাবলোকে, কিন্তু সাবধান—ভোগ করিও না।

আমরা নারীকে ভয়ের চক্ষেও দেখি না, কুষ্ঠার চক্ষেও দেখি না। কোন সঙ্কীর্ণ ভাবে নয়, পুরুষের প্রয়োজন বা স্ববিধার হিসাবে নয়, আমরা নারীকে দেখি সহজ স্বাভাবিক দৃষ্টি দিয়া। আমরা চাই নারীর মধ্যে যে সত্য তাহাই সার্থক হউক, নারীর মধ্যে যে ভাগবত প্রেরণা তাহাই আপনাকে বিকশিত করুক আপন পথে আপন ভঙ্গিমায় আপন ইচ্ছামত। নারী যদি হয় পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ জীবনের আবেগ তবে সেই ধর্মই সে-পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হউক। জীবনের পরিপূর্ণতার সার্থকতার জন্য সে যখন যে মূর্তি ধরিয়া আসিবে তাহাকেই স্বীকার করিয়া নইতে হইবে। পৃথিবীর অর্থটিই বুঝাইয়া দিবার জন্য সে হয় কখন বা মাতা, কখন বা কন্যা, কখন বধূ—গৃহিনী সচিবঃ সখী মিথঃ—সেই সব রকম সম্বন্ধেই নারীর সহিত পুরুষের সম্বন্ধ।

পুরুষকে আমরা সন্ন্যাসী হইতে বলি না, নারীকেও সন্ন্যাসিনী হইতে বলি না। জগৎ ছাড়িয়া যাহার সার্থকতা অন্য কোথাও নাই। সন্ন্যাসেরই মধ্যে পুরুষ ও নারী পৃথক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এছই শক্তি যখন পৃথক তখনই না পৃথক বিলোপন পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগেই ত নৃষ্টি—জগতের জীবনের খেলা—তাই মানুষকে আমরা গৃহের মধ্যে সমাজের মধ্যেই রাখিতে চাই, গৃহের সমাজের যথার্থ ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সেইখানেই পরমার্থকে ফুটাইয়া তুলিতে। পুরুষ একা অর্ধেক মাত্র, নারীও একা অর্ধেক মাত্র। পুরুষ ও নারী একত্রিত হইয়াই আপন আপন পূর্ণতা লাভ করিবে, জগৎকেও পরিপূর্ণতার দিকে লাইয়া চলিবে। পুরুষ ও নারী উপনিষদের সেই দুইটি পাখির মত—দ্বাঙ্গপর্ণা সমানা সমজ্ঞা—

স্ত্রী-রাস্তিরেকে ধর্মচরণ হয় না—সজীকো ধর্মমাচরণে, পত্নী হইতেছে সহধর্মিণী এই যে কথাটি আমরা সকলেই জানি ও সদা সর্বদাই বলিয়া

থাকি, ইহার একটি গভীর অর্থ আছে। ধর্ম অর্থ এখানে সাধারণতঃ আমরা বুঝি সাংসারিক কর্তব্যকর্ম, অথবা কিছু ব্রতনিয়মাদি। কিন্তু ধর্ম আরও উচ্চতর বিরাটতর জিনিষ—মানুষের পূর্ণ আধ্যাত্মিক বিকাশ; সাংসারিক কর্ম উহারই একটা দিক, ব্রতনিয়ম উহারই প্রতীক, বাহ্য ঠাট মাত্র। ধর্মের এই প্রকৃত অর্থ লইয়া যদি বুঝিতে চেষ্টা করি “সদ্বীক ধর্মাচরণ করিবে” এ আজ্ঞার মানে কি, তবে দেখিব একটা সম্পূর্ণ নূতন জগৎ আমাদের সম্মুখে খুলিয়া গিয়াছে, পৃথিবী সৃষ্টি দেখা দিয়াছে এক নূতন ভাবে, জীবন ফুটিয়া উঠিতেছে এক নূতন উদ্দেশ্য লইয়া।—

স্ত্রী ও পুরুষকে আমরা সন্ন্যাসের আদর্শ দিতে চাই না বলিয়া যে আবার প্রাকৃতজনের মত কেবল ভোগায়তনের চরিতার্থতাই তাহাদের লক্ষ্য এমনও কিছু নির্দেশ করিতেছি না। ‘পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভাৰ্য্যা’—এ কথাটি সত্য এবং ইহার একটা বিশেষ অর্থও আছে, তাহা আমরা ক্রমশঃ বুঝিব; কিন্তু সে বলে ভাৰ্য্যা হইতেছে শুধু পুত্রোৎপাদনের ক্ষেত্র, স্ত্রী হইতেছে পুরুষের ইঞ্জিয়তৃপ্তির উপকরণ মাত্র সে মানুষকে চিনে না জানে না, সে চিনে ও জানে পশুরই জগৎ। সন্ন্যাস এক দিক আর প্রাকৃত ভোগ আর এক দিক—মানুষকে যে এই দুইটিরই একটি স্বীকার করিতে হইবে, অনুসরণ করিতে হইবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই। আছে এক তৃতীয় পন্থা—যাহার লক্ষ্য জগতের জীবনের মধ্যে অধ্যাত্মকে জাগরিত প্রতিষ্ঠিত করা; ভোগকে ভগবানের মধ্যে তুলিয়া ধরা। এই ভাগবত ভোগের আনন্দেই পুরুষ ও নারীর সার্থকতা; সেই আনন্দটি উপলব্ধি করা, সেই রসে জীবনটি রসাইয়া তুলাই নরনারীর ধর্মসাধনা।

জীবন যাহাতে হয় অন্তরাঙ্গার ভাগবত পুরুষের প্রকাশ, ভোগ যাহাতে হয় এই অন্তর্যামীরই রসানুভূতি সে জন্ত মানুষকে—পুরুষকে নারীকে একটা সাধনার উপর ভর করিয়া চলিতে হইবে। প্রাকৃত ভাবের মধ্যে না পড়িয়া যাহাতে দিব্যভাবের মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারি সে জন্ত খুঁজিতে হইবে পাইতে হইবে একটা পথ। এই সাধনার পথ পুরুষের পক্ষেও বা, নারীর পক্ষেও তাই। কারণ সে পথ গড়া হইয়াছে মানুষ নামক জীব-টির সাধারণ সত্য ও ধর্মের উপরে—সে পথ শুধু পুরুষেরও নয়, শুধু নারীরও নয়; কারণ আমরা চাই পুরুষকে নারীকে এক সাথে লইয়া চলিতে, পরস্পরে মিলিয়া এক সাথে নিজেদের ও জগতের এক

ধর্মকে মহাসময়কে এক নিবিড় পরিপূর্ণতাকে ফুটাইয়া ধরিতে।

আমাদের কেমন একটি ধারণা আছে সাধনা বুঝি একলাই ভাল হয়। এটি আমাদের মধ্যে সন্ন্যাসবাদের সংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। ভবানী-পাঠক দেবী-চৌধুরাণিকে যখন জিজ্ঞাসা করিলেন এত অর্থ লইয়া সে কি করিবে, দেবী তাহাতে উত্তর করিল, “কেন ভোগ করিব”; এ কথা শুনিয়া পাঠক একটু হাসিলেন আর বলিলেন “পাগলী একা একা কি ভোগ হয়?” আমরা বলি একা একা যেমন ভোগ হয় না, তেমনি সাধনা অর্থাৎ পূর্ণসাধনা যে হয় এমনও বোধ হয় না। সন্ন্যাসীদিগের মধ্যেও যে সজ্ব গড়িয়া উঠে, তাহারাও যে একটা প্রতিষ্ঠানই কাঁদিয়া বসেন—তাহাতে প্রমাণ হয় সমাজ-জিনিষটি মানুষের কি একটা গভীর প্রয়োজনেরই ফল। আর সমাজ কি? সমাজ ত দুই-এর সম্বন্ধ। তবে সন্ন্যাসীরা যে দুই-এর সম্বন্ধ চাহিয়াছেন তাহা বিশেষ ভাবে পুরুষেরই মধ্যে, নারীকে তাহার মধ্যে স্থান দিলেও দিয়াছেন নারী যখন আসিয়াছে তাহার নারীত্ব বর্জন করিয়া।

নর ও নারী—পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুই ছাড়া আর কোন দুই নাই। সম্বন্ধ যদি কোথাও থাকে অর্থাৎ দুইটি বিভিন্ন বস্তু, বিভিন্ন হইয়াই যাহারা পরস্পর পরস্পরকে চাহিতেছে একটা মহত্তর সামঞ্জস্য পূর্ণতর সিদ্ধির জন্ত—এমন দুইটি জিনিষের আদান প্রদান সম্ভব পুরুষ আর নারীরই মধ্যে। প্রকৃতপক্ষে ইহারা যেন দুইটি জিনিষ নহে, ইহারা একটি জিনিষেরই দুই দিকের দুই খণ্ড। পুরুষ যখন পুরুষের কাছে অথবা নারী যখন নারীর কাছে যায় তখন যোগ হয় দুইটি অখণ্ড, আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ এমন জিনিষের। এই যোগফল একটা বড় কিছু হয় বটে, কিন্তু তাহাতে খুব নূতন অপ্রত্যাশিত কিছুই হয় না। কিন্তু পুরুষ নারীর মিলনে পাই যেন গুণনের, চক্রবৃদ্ধির ধারা—এ শুধু মিশ্রণ নয়, এ যেন এক অপক্লপ রসায়ন। হরিহর যুক্তি জগতের একটা রহস্য দেখাইতেছে এ কথা সত্য; কিন্তু তার চেয়ে বড় নিগূঢ় রহস্য—উত্তমং রহস্যম—দেখাইতেছে হরগৌরী রাধাকৃষ্ণ মূর্তি।

সাধনায় নারীর সার্থকতা কি? নারী ইহাতেছে দর্পণ, সে যখন পুরুষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় তখনই পুরুষ তাহার মধ্যে প্রতিকলিত দেখে আপনার স্বরূপ আপনার অশুভ লুক্কায়িত প্রতিভা শক্তি সব, তখনই

জাগিয়া উঠিবার, আপনাকে পূর্ণভাবে প্রকট করিবার ছড়াইয়া দিবার প্রেরণা তাহার চঞ্চল হইয়া উঠে। তাই নারী হইতেছে শক্তি—এই নারীশক্তির স্পর্শ বিনা পুরুষের পূর্ণ জাগরণ, অথও আত্মোপলব্ধিই হয় না। সেই জন্যই না আবালব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী শঙ্করকেও সাধনার পূর্ণতার জন্য, এক রাজার ভোগীর দেহ আশ্রয় করিয়া প্রেমের দীক্ষা লইতে হইয়াছিল—আর সে দীক্ষার বীজ দিয়াছিল উভয়ভারতী—একজন নারীই? নারীর স্পর্শ ব্যতিরেকে জীবাত্মাটি যেন তাহার সহস্রদল খুলিয়া বিকশিত হয় না; নারীর ছায়া যে জীবনের উপর পড়ে নাই সে জীবন শত মহত্বপূর্ণ হইলেও তাহাতে মিশিয়া থাকে কি এক পঙ্খতা—মনে হয় যে-বিহঙ্গ সজোরে উড়িতে পারিত ছুই পক্ষ মেলিয়া, সে যেন একটি পক্ষের উপর ভর করিয়া কোন মতে চলিয়াছে। নারী সহধর্মিণী, কারণ নারী যেন পুরুষের এই আর একটি পক্ষ, নারীর সহায়ে সে আপন পূর্ণ জীবন ধর্ম ফুটাইয়া তুলিতে পারিতেছে, আপন বৃহত্তর স্বরূপকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিতেছে।

একলা থাকা, একলা চলাই মানুষ চায়, তাহাতে বঙ্গাট জঞ্জাল কিছু নাই। কিন্তু নিজেকে লইয়াই নিজে অতিমাএ ব্যস্ত থাকা, এত বিরাট অহঙ্কার। দায়িত্ব ভার লইয়াই মানুষ বড় হইয়া উঠে। আপনার খোলসে আপনি ডুবিয়া থাকিয়া মানুষ নিজেকে খর্ব সঙ্কুচিত করিয়াই তোলে। বাহিরে আর একটি সত্তার দিকে যখন তাকাই, তাকে সঙ্গে করিয়া লইতে চাই তখনই আমার প্রাণটি বড় হইয়া উঠে, সেই সাথে আমার শক্তিও বাড়িয়া যাইবার সুবিধা পায়। সাধনার আশ্রয় এই রকম অনেক আছে বটে, কিন্তু নারীই হইতেছে সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়। আপনাতে আপনি মগ্ন, ভিতরে ভিতরে যে নিখর নিজীব হইয়া আছে, নারীর রসায়নে তাহার অন্তরাঙ্গায় কি এক নূতন সাড়া পড়িয়া যায়, মৃত এক জীব সেখানে নূতন প্রাণ পাইয়া উঠে—মৃতং কঞ্চন বোধযন্তী। নারী সহধর্মিণী, শুধু সাধনার সাথী বলিয়া নয় কিন্তু সে ধর্ম উদযাপনের, সিদ্ধিরও প্রতীক, এইজন্তেও। নারী শুধু ও শিষ্য একাধারে। শুধু কে? আমার অন্তরাঙ্গা যে দেখিতে পারে বুঝিতে পারে, এক অগুরু একান্ততার জোরে আমার ভিতরের দেবতাকে জাগাইয়া তোলে, যে আমার প্রতি ভাবপরিবর্তন—আমার ভাব অর্থাৎ

আমার অন্তর্যামী পুরুষের ইচ্ছা সব অব্যর্থভাবে অঙ্কিত করে এবং তাহারই উপর দৃষ্টি রাখিয়া আমাকে পরিচালিত করে। এমন মানুষই না গুরু? জানি না, সহধর্মিণী নারী অপেক্ষা কে এই কাজ এমন সহজে স্বাভাবিকভাবে সম্পাদন করিতে পারে? তারপর সে নারীর মত শিষ্যও ত আর কোথাও পাই না। সে সর্বদা চালিয়া দিয়াছে আমার জন্তে, আমার যেখানে সার্থকতা তাহারও সেখানেই সার্থকতা, আমার অন্তরাত্মা ছন্দে সে তাহার অন্তরাত্মাকে ঢলাইয়া দিয়াছে। আমার প্রতি সাধনা, প্রতি সিদ্ধি সে কেমন আপনা হইতেই, যেন বিনা যত্নে আপনার করিয়া লইতেছে; আমার সাধনা আমার সিদ্ধি এই রকম দ্বিগুণিত হইয়া আরও স্পষ্ট জমাট, অটুট ও বৃহৎ হইয়াই উঠিতেছে।

নারী এক কথায় গৃহলক্ষ্মী। স্বাস্থ্যে স্বস্তিতে, সৌন্দর্য্যে ঐশ্বর্য্যে সে গৃহটা গড়িয়াছে, সাজাইয়াছে, ধরিয়া রাখিয়াছে—অন্তরের গৃহও বাহিরের গৃহ, আমার এই আধাররূপ গৃহ আর আমার জীবন-গৃহ। নারী ব্যতিরেকে গৃহ নাই, গৃহ ছাড়া জীবন নাই, জগৎ নাই। নারীই হইতেছে কেন্দ্র, তাহাকে আশ্রয় করিয়া, তাহার চারিদিকে সমাজ দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। নারী যদি ভিতর হইতে না টানিয়া রাখিত, আপন রাসায়ণী শক্তিতে চারিদিক সংহত সঞ্জীবিত মুঞ্জরিত না করিয়া তুলিত, তবে মানুষের এ লীলাবিতান কেবে শুকাইয়া-ভাঙ্গিয়া পড়িত—এখানে ওখানে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ছই একজন নির্দোষের পথিক বিচরণ করিতেছেন দেখিতে পাইতাম বোধ হয় কিন্তু সে কি জগৎ—আর সেই ছই একজনের অন্তর্দ্বানের পরে?

যুগে যুগে ঐহারা ধর্ম্মের দীক্ষা অধ্যাত্মের আদর্শ জগৎকে দিয়া আসিয়াছেন তাঁহারা আমাদের নমস্কা। কিন্তু সেই জন্তে ঐহারা আরাক্ত বলিয়াছেন নারী এই বিশুদ্ধ ধর্ম্মের এই অধ্যাত্ম-জীবনের অন্তরায় তাঁহাদের মতামুসারে চলিবার বাধাবাধ্যকতা আমরা কিছু দেখি না। এ কথায়, নারীকে তাঁহারা যে হীন চক্ষে দেখিতেছেন, পুরুষের মাথে নারীর কামের সম্বন্ধ ছাড়া আর কোন সম্বন্ধ তাঁহারা সম্ভব মনে করেন না, ইহাই প্রমাণিত হইতেছে। অথচ যে সম্মাসম্বন্ধকে তাঁহারা অধ্যাত্মের চরম পূর্ণবিকাশ বলিয়া মনে করেন, সেই ধর্ম্মেও নারী আপন কৃতিত্ব, যোগ্যতা যে দেখায় নাই এমনও নহে। মৈত্রেয়ী, সেন্ত তেরেসা অপেক্ষা জানি না কয়জন সন্ন্যাসী বড়। শুধু তাহাই নয়, সকল রকম নবধর্ম্ম অভ্যুত্থানে

আধ্যাত্মিক আন্দোলনের প্রসারে প্রতিষ্ঠায় পুরুষ অপেক্ষা নারীর প্রভাবও যে কিছু কম আছে এমনও বোধ হয় না। পুরুষ প্রচারক হইতে পারে; বাক্যের সহায়ে, বুদ্ধির সহায়ে মানুষকে বুঝাইতে ভজাইতে পারে অথবা আপন তপঃশক্তির জোরে লোকসংগ্রহ করিতে পারে। কিন্তু নারীও সে কর্মে কম সহায়ক নহে—তবে তাহার পছন্দ অল্প রকম, সে তাহার জীবনের উদাহরণে, তাহার নীরব অথচ অটুট শ্রদ্ধার বলে যতটুকু গড়িয়া তুলে তাহা পুরুষে সহজে করিতে পারে না। বুদ্ধদেবের ধর্ম্য এত বিপুল হইয়াছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এমন পরাক্রমশালী হইয়াছিল, তাহার কারণ বোধ ভিক্ষুগণ, জাঁহাদের মহাসঙ্গীতি কয়টি—না, সেই দরিদ্রা নারী যে আপনাকে উলঙ্গ করিয়া বুদ্ধের চরণে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিল, সেই দাসী যে আপনার রক্ত দিয়াও বুদ্ধের পূজাকে অব্যাহত রাখিয়াছিল? আমরা জিজ্ঞাসা করিব, খ্রীষ্টের ধর্ম্য প্রথমে কাহার প্রভাবে অটুট হইয়া উঠিল—কে সে—সেন্ট পল, না মাগদেলেনা?

সে বাহা হউক, আমরা বলি ঐহিক হিসাবে নারী যেমন পুরুষের সাথী, পরমাধিহিসাবেও নারী ঠিক তেমনিই পুরুষের সাথী। আমরা চাই সকলের আগে এই অধ্যাত্মের জগতে পুরুষ ও নারীর মিলন হউক। উভয়ের মধ্যে যে ভাগবত সত্তা তাহা পরস্পর পরস্পরের সহায় হইয়া, পরস্পর পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া উপচিত হউক। ব্যক্তিগত নিকরান-লাভ যখন আমাদের লক্ষ্য নয়, আমাদের লক্ষ্য যখন মানবজাতিকে ভাগবত সত্তার বিগ্রহে গড়িয়া তুলি, আমাদের লক্ষ্য যখন সমাজের মধ্যে মানুষকে রাখিয়া এই সমাজকেই ভাগবত লীলানিকেতন করিয়া তুলি তখন নারীকে, সহধর্ম্মিণীকে তুলিলে চলিবে না—পুরুষের সাধনা ও সিদ্ধি নারীর মধ্যে ফুটিয়া ফলিয়া উঠুক, নারীর সাধনা সিদ্ধি পুরুষের মধ্যে ফুটিয়া ফলিয়া উঠুক। সমস্ত সৃষ্টি ভগবান ভগবতী, কালী কৃষ্ণের সৃষ্টি—মানুষের ব্যক্তিগত জীবন, তাহার সামাজিক জীবনও ঐ নিভৃত যুগলমুর্তিরই প্রতিচ্ছবি হউক।

তখন দেখিব ইন্দ্রিয় আর ইন্দ্রিয় নাই, কাম আর কাম নাই—তাহা আর এক নবরূপে পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছে। স্ত্রী আমার অধ্যাত্মসত্তার অন্ধাঙ্গিনী, ঠিক সেই জনাই এই ভৌতিক সত্তারও অন্ধাঙ্গিনী—অধ্যাত্মের আর আধিভূতের মধ্যে, আত্মার ও দেহের, ভগবানের ও আমার মধ্যে

সকল ব্যবধান সকল দ্বন্দ্ব ঘুচিয়া গিয়াছে, উভয়ে মিশিয়া এক অপূর্ণা রসায়নে এক হইয়া গিয়াছে। তখন যাত্যাব্যক্তের কথাটি—পতির জন্য পতি কিছু প্রিয় নয়, পতি আত্মার জন্যেই প্রিয়; পত্নীর জন্য পত্নী কিছু প্রিয় নয়, আত্মার জন্যেই পত্নী প্রিয়; পুত্রের জন্য পুত্র কিছু প্রিয় নয়, আত্মার জন্যেই পুত্র প্রিয়—এক নূতন অর্থ লইয়া আমাদের সম্মুখে দেখা দিবে। পতি পত্নীকে বিসর্জন দিবে না, পত্নীও পতিকে বিদায় দিবে না, আর পুত্র মাতাকেই যে কেবল মানসপুত্র হইতে হইবে এমনও নয়। পতি, পত্নী ও সন্তান হইবে এক অখণ্ড ভাগবত বস্তুর বিভিন্ন দিক, বিভিন্ন ছায়াসম্পাত। এ সকল সম্বন্ধ থাকিবে, এ সকল সম্বন্ধকে সৃষ্টি করিতে হইবে কিন্তু প্রাকৃতভঙ্গের সত্তা নয়, এ সকল হইবে অধ্যাত্মেরই ভৌতিক প্রতিচ্ছবি।

যোগ কি ?

প্রশ্ন। “প্রবর্তকে” আত্মসমর্পণের কথা পড়ি, কিন্তু বেশ বুঝতে পারছি না, ধারাবাহিকভাবে এই তত্ত্ব বুঝিয়ে দেবেন ?

উত্তর। আপত্তি কি। আলোচনার ফলে জ্ঞানবুদ্ধি হবে। আত্মসমর্পণ—

যোগ। যোগ বিষয়ে তোমার ধারণা কি ?

প্রশ্ন। তেমন স্পষ্ট কিছুই নেই। তবে শুনতে পাই যোগ অনেক রকম আছে, যেমন হঠযোগ, রাজযোগ, ভক্তিযোগ প্রভৃতি।

উত্তর। হাঁ ঐগুলি এক একটি যোগসমূহ বটে। মানুষের জীবনে কর্মরূপে যাহা প্রকাশ পায়, তাহা প্রকৃতির খেলা। প্রকৃতি জীবাদ্বারে নিজের পুণ্ড্রা উপলব্ধি করবার জন্য নিত্য নবভাবে প্রকাশ হতে থাকেন। স্বামীজি বলেছিলেন—একই জীবনে অথবা কয়েক বৎসরে, কি কয়েক মাসে, মানুষের একই আধারে, সমস্ত প্রকাশটিকে কুটিয়ে তোলবার যে পদ্ধতি তাকেই যোগ বলে। তা হলে বুঝতে হবে, প্রকৃতি যে খেলা বিলম্বিতভাবে, হেলায় ছেদায় মানুষের জীবন নিয়ে, পেলে চলেছেন, সে খেলাটিকে কিপ্র করে তোলাই যোগ।

প্রশ্ন। তা হলে যোগ বিষয়টি কোন অস্বাভাবিক অথবা দুর্কোধ্য বিষয় নয় ?

উত্তর। তা ত নয়ই, বরং পার্থিব স্বভাবের সঙ্গে তার খুব নিকট সম্বন্ধ,

পৃথিবীর ভিতর দিয়েই ত শক্তি তার দেবতার সঙ্গে যুক্ত হতে চলেছে। প্রকৃতির এই নিত্য ইচ্ছাটাকে এমন কায়দায় আনতে হবে, যাতে করে' খুব শীঘ্র অথবা পরিপূর্ণবেগে উহা সংস্কৃত হয়।

প্রশ্ন। বিষয়টি বড়ই জটিল। একটু ভাল করে' বুঝিয়ে দিন।

উত্তর। শোন। আমাদের জীবন নিয়ে প্রকৃতির ছরকম খেলা দেখতে পাওয়া যায়, একটি অতি সাধারণ—যা সংসারে পনের আনা তিন পাই লোকের ভিতর দেখি, আর একটি অসাধারণ, যা আমাদের কাছে খুব মহৎ এবং দৈবী বলে' প্রতীয়মান হয়। কিন্তু সব খেলাই সেই একের পথেই ছুটে চলেছে এবং এক থেকেই নির্গত হয়েছে। নানা ভাবে, নানা ধরনে, নানা পন্থায় কার্যগুলি ছোটো, খুব বড়-হয়ে' বিরাট সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থায় মিশে যাবার জন্ম। আজ যা সাধারণ, কাল তা অসাধারণ আকার ধারণ করবে।

প্রশ্ন। কিছু বুঝতে পারছি না।

উত্তর। জড় থেকে বৃক্ষ-কাঁট পত্তঙ্গ পশু পক্ষী মানব সকলের ভিতর দিয়ে সেই একই প্রবাহ চলেছে। ধর একটা বৃক্ষ-বীজ। তার ভবিষ্যৎ বিকাশ মৃগ, প্রচ্ছন্ন। সেটা সার্থক হবে কি করে?

প্রশ্ন। তার নিত্য প্রকাশের মধ্য দিয়ে।

উত্তর। উত্তম কথা। এই অনন্ত সৃষ্টির পশ্চাতে যে লীলাময়ী প্রকৃতি আছেন, তিনিও অসীম প্রকাশের ভিতর দিয়ে তাঁর অনন্তর উপলব্ধি করবেন, এবং আপনার দৈবী অস্তিত্বের যে পরাজ্ঞান তাতেই যুক্ত হবেন।

প্রশ্ন। হৃন্দর বুঝছি।

উত্তর। যুদ্ধের যে বিকাশ, এ তাঁর অনন্ত বিকাশের একটা ক্ষুদ্র ক্রম মাত্র। প্রকৃতির প্রতি পদক্ষেপ, জড় ও চৈতন্যে, রূপ ও আকার নিয়ে ঘুটেছে। এই রূপ ও আকার, পরিবর্তনশীল, কেননা প্রকৃতির নব নব গতিভঙ্গীতে এইগুলি প্রতিদিন বৃহৎ হতে বৃহত্তর হয়ে' অসীমের পথে ছুটে চলেছে। পূর্ণ পরিণতির জন্যই আজকের যে পরিণত আকার, কাল তা পুরাতন হয়ে' যায়, পৃথিবীর বুকেই তার আকার ভেঙ্গে চূরে মিলিয়ে যায় আবার নতুন আকারে পাবার জন্য। জগৎ কিন্তু অবিনশ্বর।

প্রশ্ন। পৃথিবীর বুকেই তা হলে, প্রকৃতি উত্তরোত্তর আপনাকে প্রকাশ করে চলেছেন ?

উত্তর। হ্যাঁ তিনি যা হবেন, তা এখনও হন নাই। এই হওয়াটার সীমা কোন্‌খানে, তা কেউ এ পর্য্যন্ত নির্ধারণ করতে পারে নি, সেই জন্য সৃষ্টি অনন্ত। প্রকৃতির চরম বিকাশ মানবের মধ্যে। তাই সাধক রামপ্রসাদ বলেছিলেন “এমন মানব জমিন রইল পড়ে” আবাদ করলে ফলত সোনা।”

প্রশ্ন। প্রকৃতিই যদি মানুষের ভিতর সহজক্রমে, তার সকল বিকাশটিকে সার্থক করে তুলতে উপক্রম করে থাকেন, তাহলে মানুষের আর করবার কি আছে ?

উত্তর। কিছুই নেই। এই প্রকৃতিকেই শক্তিসাধকেরা কালী বলে থাকেন। কালীর সাধন-ক্ষেত্র এই মানব-জীবন, মানুষ যত এই বিধানের নিশ্চেষ্ট হতে থাকবে, ততই কালীর খেলা পূর্ণ হতে পূর্ণ-তর হয়ে উঠবার সম্ভাবনা দেখা দেবে।

প্রশ্ন। তা’ হলে মানুষের চেষ্টাই বা কি, আর নিশ্চেষ্টতাই বা কি ? সবই ত কালীর খেলা।

উত্তর। তা’ত বটেই। মানুষের বুদ্ধি নিয়েই প্রকৃতি চিন্তা করেন। বাহ্য প্রকৃতির আলোক, বাতাস, বিদ্যুৎ ধরে’ বৈজ্ঞানিকেরা তাদের পরীক্ষাগারে (ল্যাবরেটরীতে) বসে যেমন ঐগুলিকে বিশ্লেষণ ও বিভাজন করে’ কত যন্ত্রপাতির সৃষ্টিদ্বারা জগতে বহু বিস্ময়কর কর্ম সম্পাদন করেন, প্রকৃতিও সেই রকম মানুষের অন্তররাজ্যে কত চিন্তা কত কার্য সূচনার দ্বারা তাঁর ভিতরটিকে শীঘ্র শীঘ্র জানুবার সাধনা করেন। বৈজ্ঞানিকের যন্ত্রাদি আবিষ্কারের ফলে জাগতিক বহু কর্ম অসম্ভাব্যে সংসাধন করার পক্ষে যেমন সুবিধা হয়েছে, তেমনি মানব জীবনের স্বভাবশক্তি কলকজার চাপে পড়ে’ কত অসুবিধাও ভোগ করেছে। সেইরূপ প্রকৃতির অন্তর্বিজ্ঞান গবেষণার যে সব যোগক্রিয়া আমাদের জীবনে ফুটে উঠেছে, সেই গুলির দ্বারা আমরা অনেক সুবিধা লাভ করলেও নানা প্রাণালীর মধ্যে আমরা জীবনকে এক মহা সমস্তার ভিতর কেলে দিয়ে হাজার অসুবিধা ভোগ করছি। প্রকৃতি যা করছেন, তা নিঃসংশয়ে

শ্রেয়ঃ, কেন না এই সমস্তা সমাধান করিতে গিয়েই আজ এমন এক উপায় উদ্ভাবন হবে, যা দিয়ে সমস্ত মানবজাতি অভিনব উন্নত জীবন লাভ করবে।

প্রশ্ন। সে উপায়টি কি ?

উত্তর। মানুষের জীবন নিয়ে প্রকৃতি সেই পন্থা আবিষ্কারের উপায় নির্ধারণ করেছেন। উদাহিত যোগ। কিন্তু প্রচলিত রাজবোগ-যা অস্ত্রকরণের গুণগুলিকে সমীকরণ করে, হঠযোগ যে প্রাণশক্তির ধারাগুলিকে সমাহত করে দাঁড়িয়েছে, তা যথেষ্ট উদার ও বৃহৎ নয়। মানবজীবনে প্রকৃতির পূর্ণবিকাশ এইগুলির দ্বারা হওয়া অসম্ভব। যদিও ভক্তি এবং জ্ঞানযোগে ভগবানের অপার আনন্দ এবং অসীম চৈতন্যের আভাস পাওয়া যায়, তবুও এইগুলি মানবের কতিপয় আনুষ্ঠানিক আচরণেই আবদ্ধ হয়ে আছে। ভারতের আবিষ্কৃত যোগপদ্ধতিগুলির এক একটি অনুসরণ করে' সিদ্ধি পেতে হ'লে, বাহিরের জগৎকে ছেড়ে যেতে হয়, যেন ভগবানকে চাহিলে পৃথিবীকে ছাড়তে হবে। ভারতের অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছে, যে যদি সে ভিতরের দিকে যেতে চায়—অবধারিত তাকে বাহিরের সমষ্টিজীবনের আবাদ হতে বঞ্চিত হতে হবে—গিরি গুহা, বিজন অরণ্য, নিতান্ত গঞ্জে বাসবাটার একটি নির্জন কক্ষে তাকে লুকিয়ে পড়তে হবে। যোগ মানুষের জীবনে তখনই মূর্ত হয়ে উঠবে, যখন জীবনের স্বাভাবিক বিকাশকে প্রতিহত না করে' তারই মধ্যে ভগবানের কল্যাণ হস্তখানিকে দেখতে পাওয়া যাবে। যোগ ও জীবন এক, জীবনকে অশ্রদ্ধা করে' আমরা যোগ পেতেই পারি না। প্রকৃতির খেলার মধ্যে যে মহনীয় ইচ্ছাটি অবগাঢ়, প্রচ্ছন্ন-ভাবে যা খেলো'চলেছে, মানুষের জীবনে তাহা ফুট ও বিকশিত হয়ে উঠবে—মানুষের সমস্ত জীবনই যে যোগ।

সমস্যা

দুর্ভাগ্যবানী আজ যেন খুব একটা বড় সমস্যার সাম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। যেন এই সমস্যার সমাধানই খ্রীষ্টের দিব্যরাজ্য ধরার এসে পৌছে যাবে। আমরা আদার ব্যাপারী, এত বড় কথা যে এখনই ঘটতে পারে এতটা ভরসা করি না। তবে যুরোপের মহাসমরে ভারতেরও প্রাণের টান ধরেছিল, সে টানে অসংখ্য ভারতবাসীর জীবনলীলা সাগ হচ্ছিল, তা থেকে তারা পরিত্রাণ পেয়েছে, ধন প্রাণ উভয়ই যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচবার অবস্থার দাঁড়িয়েছে। আরও একটা বড় লাভ, বাঙ্গালীর শিরোমণি স্ত্রীর এস, পি, সিংহ, লড হয়েছেন, ভারত-সচিবের-সিহকারী রূপ বড় পদ পেয়েছেন, তার চেয়েও বড় কথা বাঙ্গালী শুদ্ধে, এইবার তারা স্বায়ত্ত শাসন পাবে। এই বিষয়ে নামা মতবিরোধ থাকলেও আশার বিদ্যুৎ সবারের প্রাণেই অন্ন বিস্তর উঁকি খুঁকি মারছে।

কিন্তু দেশবাসীর এত আশা এত আশঙ্ক এক আঘাতেই চমকে গেছে। যুদ্ধান্তে যে উল্লাসের তরঙ্গহিল্লোল মাসাফাল বিস্তার করে মাছুষের মনকে অধিকার কর্তৃতে ছুটেছিল, তা হঠাৎ মিথ্যা বলে প্রথম মনে হল সেই দিন, যে দিন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার মাননীয় শ্রীঅখিল চন্দ্র দত্ত বেচারী অন্তরীণদিগের মুক্তি প্রার্থনায় অকৃতকার্য হলেন। অনেকেই মনে করেছিল হয়ত মিত্রপক্ষের এত বড় জয়ে গভর্নমেন্টের হৃদয় কিছু নরম হয়েছে, অখিল বাবুর যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাবে গভর্নমেন্ট কর্ণপাত করবেন। ব্যথা আরও বেজে উঠলো, যখন মাননীয় প্রভাস বাবু আবার এই প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করলেন। তাঁর উক্তিগুলি সমীচীন হয় নাই, উদ্ধৃত যুবকগণের তরুণ মস্তিষ্ক তাঁহার কথায় বিচলিত হতে পারে। ভগবানকে ধন্যবাদ, আজ তরুণজাতি আঘাত পেয়ে হুবিস্তর জনের মত জ্ঞানলাভ করেছে, তাদের সে চাপল্য সে অধীরতা আর নাই।

জগতের ঘোরতর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের মানসিক অবস্থার

আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে, প্রভাস বাবুর স্থল দৃষ্টি সে দিকে ঘাবার নয়, কাজেই তিনি সাধারণ মানুষের মতই কথা বলেছেন, একদিন নিজের ভুল ধরে' তিনি অনুতপ্ত হবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু অখিল বাবু অকৃতকার্য হলেও, দেশবাসী তাঁর কার্যে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবে।

এই ব্যাখ্যার পর, আবার রাউলাট সিডিশন বিল। এই কঠোর আইন প্রচলিত হ'লে, বাংলার বুকের ক্ষত বৃদ্ধিই পাবে। অবস্থা সচ্ছন্দ না হয়ে, দিন দিন ভবিষ্যৎ অশুভ ও জটিল হয়ে উঠছে। ইহার উপর বঙ্গ ও খাতদ্রব্যের মূল্য চতুর্গুণ, কাষেই বস্ত্রিতে হয়, "সুখের কথা বলোনা আর, জেনেছি সুখ সকল ফাকি।"

এই অবস্থায়, লর্ড এস, পি, সিংহের মত দুই একজন ভারতবাসী আশাতীত রাজসম্মান লাভ করলেও, বাঙ্গালীর বুকে যে বেদনা দিন দিন পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে, তা দূর হবে না। মর্টেগু-চেমগকোড-রিফর্মও দেশকে কতটা আশাবিত্ত করবে তাও বলা বড় কঠিন হয়ে উঠছে।

আমাদের এই কথাগুলির আলোচনা করার অর্থ হচ্ছে, যে আমরা জানি, বাহিরের ঘটনাগুলি ভিতরের অবস্থারই প্রতিরূপ, ভিতরকে হারিয়ে ফেলে, অনেক সময় বাহিরকে লক্ষ্য করে' ভিতরকে পেতে হয়, আর অন্তর বাহির এক করে' চলতে হ'লে, আমাদের জীবনে যে সকল ঘটনা উপস্থিত হচ্ছে সেগুলিকে ভাল করে চিনে নিতে হয়।

উপরের এই সকল বাসনা ছাড়া আমাদের জীবনে আর একটা বড় বাসনা আছে, সেটা রাজনীতি। সেদিন সবুজপত্র-সম্পাদকের একটা লেখা পড়ে জানলুম, অনেকে বলেন বাংলাদেশ রাজনীতি চর্চায় ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা দিন দিন পেছিয়ে পড়ছে। কথাটা যদি সত্য হয়, তবে সে সুখের কথা। কেননা এই অসার রাজনীতির চর্চায়, আমাদের সময় ও শক্তি ত অযথা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তা ছাড়া আমরা দিন দিন নিতান্তই লঘু হয়ে পড়ছি—স্বার্থ এবং রাজসম্মানের লোভ আমাদের এমনই বেড়ে যাচ্ছে, যে প্রচার নিরীকৃত প্রতিনিধি হয়ে প্রচার মর্মবেদনা রাজদরবারে মানুষের মত স্পষ্ট করে' বলতে আমরা অসমর্থ হয়ে পড়ছি। এর চেয়ে আমাদের কর্মপ্রেরণাটা যদি বাহিরের দিক ছেড়ে ভিতরের দিকে নিয়োজিত হয়, তবে আমাদের চরিত্র খুব শীঘ্রই যথার্থ মানুষের

মত হবে, এবং তখন ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির চেয়ে জাতিগত স্বার্থটাকেই বড় করে' দেখতে শিখবো।

আমাদের নৈতিক বল যে দিন দিন ক্ষীণ হয়ে আসছে, এ কথা আমরা বুঝি, কিন্তু পাশ্চাত্যের কি যে সম্মোহন, কিছুতেই আপাত-মধুর বস্তুটির লোভ সঞ্চরণ করতে পারি না। এই অবস্থায় আর অধিক দিন চললে আমাদের বিশিষ্টতা রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

তরুণ জাতিকে এই সকল বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে' সম্পূর্ণ একটী নতুন পথ অবলম্বন করতে হবে, মানুষ হ'তে হলে ভারতীয় শিক্ষাটিকেই ষোল আনা আয়ত্ত্ব করা চাই,—সে শিক্ষা বেদান্তের শিক্ষা। ধর্মই তার প্রতিষ্ঠা। ব্যবহারিক জগতে যে শিক্ষাই আমাদের অনিবার্য হয়ে উঠুক না, অন্তরে এই প্রকৃষ্ট শিক্ষাকেই অর্জন করতে হবে, এবং এই দিয়েই আমাদের চরিত্রকে নতুন করে' গড়ে' তুলতে হবে। যদি নিখুঁত ভারতীয় ভাবে চরিত্র গড়ে না তুলতে পারি, এই মহা সমস্যার যুগে আমরা আর দাঁড়াতেই পারবো না। সম্মুখে আমাদের সর্ব প্রধান কার্য্য এই, যে দেশকে যুরোপের অন্ধ অমুকরণ-প্রবৃত্তি হ'তে রক্ষা করা।

আমরা আজ যে যুরোপীয় আদর্শে আপনাদিগকে মাতিয়ে ভাসিয়ে দিতে চাই, সেই যুরোপ এখনও তাদের আদর্শটিকে পূর্ণ করে তুলতে পারে নাই। যুরোপ ত নিজেই মোহগ্রস্ত, তাদের ইঙ্গিত অনুসরণ করলে আমাদের পতন ও মৃত্যু অবশ্যস্বাভাবী। শতাব্দিক বর্ষ ধরে' যুরোপ মৈত্রী সাধনার মহান মন্ত্র জপ করে আসছে—এর জন্ত কত রক্তপাত হয়েছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এটা তাদের জীবনে মূর্ত হয়ে উঠে না। বাহিরে তাদের যে ঐশ্বর্য্য, যে সম্পদ দেখতে পাও, সেগুলি অধাবসায় ও পরি-শ্রমের পুরস্কার, কিন্তু যুরোপের অন্তর এখনও অপবিত্র। মৈত্রী মনের সম্পত্তি—এই মনের পরিবর্তন সাধনসাপেক্ষ, সে সাধনায় যুরোপ কতটা অগ্রসর হয়েছে সে কথা আমাদের ভেবে দেখা উচিত।

ধর্মের বার প্রতিষ্ঠা—রাজনীতি ও সমাজশৃঙ্খলার মুখ্য বন্ধনে যুরোপ তারে বাঁধতে চায়। এই অন্ধ প্রচেষ্টার রক্ত-ইতিহাস যুরোপের বুকে গভীর ক্ষত করে' তুলেছে, একদিন তাকে বৃকের অসহ্য জ্বালায় একান্ত নিবৃত্তির জন্য, যদি ভারত সত্যই অধ্যাত্ম জীবনে উন্নত হয়ে উঠতে পারে,

তবে যুরোপকে ভারতের দারস্থ হতেই হবে।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসী দেশে অন্তর্দাম্পত্যের নূতন মন্ত্র প্রথম প্রচলিত হয়। অর্ধ শতাব্দী ধরে নানা পৈশাচিক কাণ্ডের পর অতি অসম্পূর্ণ এবং বিকৃত আকারেই সে দেশে ইহার অম্লরূপ এক গণতন্ত্রমূলক রাজ্য-প্রতিষ্ঠা হয়। ফরাসীর এই রাষ্ট্রস্বাধীনতার ভাবটা সারা যুরোপে ছড়িয়ে পড়ে। গণতন্ত্র ফরাসীরাজ্যে ইহার পরিণতি সহজসাধ্য হলেও রাজবিধির কঠোর নাগপাশে আবদ্ধ ক্রমরাজ্যে ইহার নিস্তৃতি ফেলা দেয়। কত অশান্তি, কত বিপ্লব, কত আন্দোলনের পর, আদর্শের পরিপন্থী রাজশক্তিকে তারা একেবারেই ধ্বংস করেছে, কিন্তু মুক্তি ও বাহিরের নয়, অন্তরের—অধ্যাত্ম-সাধনায় অনভিজ্ঞ কবিয়া আজ অন্ধ, বাহিরের বাধাগুলি বাহিরের উপায়ে নিরাকৃত করে' করে' তাদের পশুবলই বৃদ্ধি পেয়েছে, সেই দৃষ্ট পাপবিক শক্তি যুরোপে যে অশান্তির সৃষ্টি করেছে, তা কোন পশুবলের প্রয়োগেই দূর হবে না।

কবিয়া প্রাণ দিয়ে যা করে তুলতে চুটেছে, ক্ষুদ্র আয়ল ও মনের সাহায্যে তা সাধন করতে চায় কিন্তু উভয়েরই প্রাণ ও মন অসুখী। আয়ল ও করনার পাখা হুটী ছড়িয়ে দিগন্তে ভেসে চলেছে, তারও দৃষ্টি প্রহেলিকাময়, পদে পদে ভুল করলেও মনের যে স্বভাবগতি তার প্রবল বেগকে রোধ করবার সাধনা তাদের নাই।

সমগ্র যুরোপে যে সোসিয়লিজম, তা এই মৈত্রী মন্ত্রেরই ফল। যুক্ত রাষ্ট্রগতি, উইলসন শাস্তি সভায় যে জাতি সকলের সংঘ সংগঠনের মানস করেছেন, তাহা এই মন্ত্রশক্তির প্রেরণায়। কিন্তু বিশ্ব নিঙড়ে এত রক্ত-যুরোপের যজ্ঞকুণ্ডে হবিঃরূপে আহুতি দিলেও, বাহিরের দিক থেকে এই মহাসিদ্ধি মানবজাতি কোন দিনই লাভ করবে না।

আবহমান কাল ধরে ভারতবর্ষ এরই সাধনা করে আসছে। বাহিরের সম্পদে ভারতবর্ষ বড় নয়, কেন না সে বাহিরটাকে ছেড়েই দিয়েছিল, যুরোপ বিজ্ঞানের সাহায্যে আজ যা হয়েছে, আদর্শশক্তির জন্ত তা অতি অগ্রচর, কিন্তু ভারতবর্ষ দীর্ঘ যুগ ধরে যে অধ্যাত্মরত্ন আহরণ করেছে, তা দিয়ে সে জগৎকে নূতন বেশে বিভূষিত করে তুলবে।

বিশ্বপ্রকৃতি যে শক্তি সহযোগে জীবাধারের ভিতর দিয়ে তাঁর চরম জ্যোতির পানে ছুটে চলেছেন, বিশ্বনাথ নানা শরীফার ভিতর দিয়ে সে

শক্তির শুদ্ধি বিধান করেন। যুরোপে আজ যে অশান্তি, উপদ্রব, যে নররক্তের নদী বয়ে চলেছে, তাও তাদের বিজ্ঞানকে পরিতৃপ্ত করে' তোলবার জন্ত, একদিন তারাও হয়ত জগতের সমস্যারাজির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করবে। আর আজ এই ভারতবর্ষ দীর্ঘ যুগ ধরে' নিজ বাস-ভূমে পরবাসী হয়ে যে দুঃখ-যে কষ্ট যে নির্যাতন ভোগ করেছে, এও তাদের অধ্যাত্মশক্তির পরীক্ষা মাত্র। যে-জাতি হাজার বৎসর মোগল পাঠানের অত্যাচার সয়ে' এসেছে, বৈদেশিক রাজশক্তির আচার ব্যবহারের ভিতর থেকেও নিজদেশের স্বাভাবিক রক্ষা করে' এসেছে, তাদের জীবনে এমন অক্ষয় শক্তি জাগ্রত হয়ে উঠেছে যে তারই প্রকাশ যে-দিন বাহিরে ছড়িয়ে পড়বে, আমাদের মনে হয়, তাই দিয়ে ভারতবর্ষ প্রকৃতির মহনীয় ইচ্ছাটিকে পরিপূর্ণ করে' তুলবে।

যুরোপের জ্ঞান এখনও অপরিপূর্ণ। ভারতবর্ষের প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, কেবল জীবন দিয়ে জগৎকে ধন্য করে' তুলছে না। প্রতিষ্ঠানকে দৃঢ় করে' তোলবার জন্ত, ভগবানের আঘাত নানা দিক দিয়ে এর উপর এসে পড়ছে, আঘাতে আঘাতে যেদিন এই প্রতিষ্ঠা দৃঢ় ও অবিচল হবে, তখনই স্বর্গের সম্মাননী সূচী অজস্র ধারায় ইহার উপর গতিত হবে।

ভারতের সাধনা আজপ্রতিষ্ঠাকে দৃঢ় করে' তোলা। প্রকৃতির আহুকূল্য আছে কিন্তু উন্মার্গগামী হলে সিদ্ধির বিলম্ব হবে—যুরোপের অন্ধ অহংকরণ ভারতের আদৌ উপযোগী নয়। আমরা স্বদেশজননীর বিজয়-আশীর্ব্বাদ মাথায় করে' যেদিন সঙ্কল্প করলুম, “অগ্নি জননি জগ-জ্যোতি, তোমার অনন্ত কোটি সন্তান একই মন্দিরে একই কর্ণে উচ্চারণ করবে ‘বন্দেমাতরম্’”, তখন এই মৈত্রী সাধনার শক্তিতেই উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিলুম। তারপর, পাশ্চাত্য মোহ যা এতদিন দেশের-প্রাণকে পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করতে পারেনি, এই মহাসঙ্কযোগে নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ, উত্তেজনার কুহকে উন্মত্ত আমাদের হৃদয় অধিকার করে' বসল। কংগ্রেস কনফারেন্সে বাণীর বীণা সপ্তমে স্বরকার দিয়ে উঠল, মায়ের শুণ্ড মন্দিরে যুরোপের ষড়যন্ত্র বিকট দৈত্যের মত আমাদের রিহার্সাল দেওয়ালে, কল-নার রক্ত আলোকে জ্বাট আঁধার দূর হয়ে গেল, ভারতের মুক্তি, মনে হবো, বুঝি বাহিরের মহা আড়ম্বরের ভিতর দিয়ে এসে পড়বে। উদ্ধ-

লোকে দেববন্দু স্তম্ভিত হয়ে মহাশক্তির এই অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা অবলোকন করতে লাগলো, শক্তি ঘটনার সংঘর্ষে, দিব্যমুক্তি ধরে' আজ আমাদের দৈবী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছে। সম্মুখে যে সকল বিশ্ব ভাষণ মুক্তি ধরে' আমাদের সাধনার পথটিকে দ্রুগম করে' দিচ্ছে, উহা স্বাভাবিক। এইগুলিকে দূর করবার জন্য আবার আমরা যেন বাহিরে ঝড় তুলে আমাদের অবস্থাকে আরো জটিল করে' না তুলি, বাসনা ও চেষ্টার দ্বারা মুক্তির পথটা অচিরে আবিষ্কার করতে গিয়ে, বন্ধনের ফাঁসটিকে আরও না দৃঢ় করে' বসি। আমাদের মুক্তি—সে ত আমাদের সাধনার উপরই নির্ভর করেছে, বাহিরে যে বন্ধনের মুক্তি প্রতীয়মান হচ্ছে, সে ত আমাদের ভিতরেরই অভিব্যক্তি, আমাদের ভিতরে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা না করলে বাহিরের সাম্রাজ্যে অধিকার জন্মাবে কেন? ভারতের এই অন্তঃসাধনার পথে বাধা দিবার সামর্থ্য কাহারও নাই, যে-সকল কঠোর বিধি আমাদের গতিকে অবরুদ্ধ করবে বলে মনে হচ্ছে, সেগুলি প্রাহেলিকা, বুথা মস্তিষ্ক চালনার কুফল। বাহিরের ঘটনা প্রতি পদে দেখে চলতে হবে, কিন্তু তাতে বিচলিত হ'লে চলবে না। আমাদের গতিই আনন্দ, এবং ভগবানই আমাদের পরিচালক, তাঁর নির্দেশ পেরেছি, অতএব বাহিরের আশা ও আকাঙ্ক্ষায় আমরা যেন অতঃপর লালিত ও সঙ্কচিত না হই।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উৎসব

সে দিন বেলুড় ঘাটে ঠাকুরের চতুরনীতিতম জন্মতিথি আনন্দোৎসব হইয়া গিয়াছে। প্রতিবারের মতই এবারও বহুজনসমাগম হইয়াছিল। কীর্তন, ত্র্যাক্তান বাদন, দরিদ্রনারায়ণ-সেবা প্রভৃতি যাবতীয় অনুষ্ঠানই স্বচাক্ষুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

ঠাকুর কে? কাহার মহিমায় আজ সারা ভারতবর্ষ মহিমাম্বিত! কোন্ দৈবশক্তির অনুপ্রেরণায় মুমূর্ষু হিন্দুজাতির শিরায় শিরায় নূতন শক্তি বিচ্ছুরিত! শুধু উৎসবের আনন্দেই আত্মহার্য হইলে চলিবে না—

ঠাকুরের আগমন সার্থক করিতে হইলে, তাঁর সম্পূর্ণ ভাবের সাধনা আমাদের জীবনে মূর্ত হইয়া উঠা-চাই।

মর্ত্যজীবের আকাশ ধারণ করিয়াই ভগবান প্রাণিত হন। ঠাকুর কি পূর্ণ ভগবৎ-স্বরূপ, অথবা তিনি একটা বিভূতি, বা পরাৎপর পুরুষের খণ্ডবিকাশ? তাঁর মহিমা-মণ্ডিত মূর্তির চরণতলে নতজাহ্নু হইয়া বসিলে সর্বত্র এই সকল কথাই মনে আসে।

যুগত্বেয় অবসানে, কলিযুগের ভবিষ্য নিবিড় আঁধার যখন ভারতের শৌর্য বীৰ্য্য, মাহাত্ম্য প্রাসাদ্যত, তথম দীপ্ত দিবাকরের মত কুরুক্ষেত্রের ধ্বংসলীলায় প্রাণসারথীর সাক্ষাৎ পাই, অশ্ব-বদ্ধা দৃঢ় করে ধারণ করিয়া রণসমুদ্রাত পার্থের রথখানিকে শত্রু মিত্র উভয় সেনার মধ্যবর্তী করিয়া তিনি যে সকল কথার বলিয়াছিলেন, তাহা আমরা আজও ভুলিতে পারি নাই। যদিও সেই সকল অমরবাণীর যথেষ্ট বিকৃত অর্থ করিয়া স্ব স্ব অভীষ্ট পথে চলিবার সুবিধা করিয়া লইয়াছি, তবুও মন্ত্রশক্তি অব্যর্থ অমোঘ—ভারতের জীবনে দিন দিন তার সত্য রূপটা ফুটিয়া উঠিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র আলোচনা করিতে বসিয়া, ভারতের মনীষীমণ্ডলী তাঁহাকে পূর্ণব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন, মানুষে এত গুণের বিকাশ আর বুঝি কখন সম্ভব হইবে না, মানুষ সম্বন্ধে মানুষের যত উচ্চ ধারণাই থাকুক, ভারতের এই মহা দেবতা তাহার সীমা অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছেন, কাহেই কোটা কোটা হিন্দুর তিনি উপাশ্রয় দেবতা, আদর্শ পুরুষ, সস্বয় শ্রীভগবান।

শ্রীকৃষ্ণ—তাঁর অনন্ত বিভূতির অধিকারী হইতে হইলে যে সাধনা অবলম্বন করিতে হইবে, গীতার তাহার যথেষ্ট ইঙ্গিত রাখিয়া গিয়াছেন, এবং একসঙ্গে এইরূপ পূর্ণাঙ্গ সাধনা, অথ কোন শাস্ত্রগ্রন্থে দুস্তাপ্য, সেই জ্ঞান গীতাধর্ম্য হিন্দুজাতির জীবনসর্বস্ব হইয়া উঠিতেছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহারই স্বরূপ দিয়া গড়িতে চাহিয়াছিলেন একটা জাতি—সে কার্য্য আজ পঞ্চ সহস্র বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। সে ভবিষ্য জাতির প্রতিষ্ঠান হইতেছে—পূণ্যপীঠ ভারতবর্ষ। তাই আমরা দেখিতে পাই, পর পর বুদ্ধ, শঙ্কর প্রভৃতি অতিমানবের দল এই ভাগবত ইচ্ছা পূর্ণ করিতে যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া আসিতেছেন, সৃষ্টিকে সমু-চেষ্ট সাধনায় পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্ত। মানুষের অধ্যাত্ম-সাধনার

উপকরণ ভারত যত লাভ করিয়াছে, জগতের অল্প কোন দেশের ভাগ্যে এত অধ্যাত্ম-সম্পত্তি আহরণ সম্ভব হইয়া উঠে নাই। দয়া, প্রেম, বিশ্বাস, সত্যানুরাগ প্রভৃতি মানবের উচ্চ প্রকৃতির যাবতীয় গুণগুলিই বিগ্রহ আকারে যুগে যুগে ভারতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইহার সমন্বয় করিয়া, জাতির জীবন গড়িয়া তুলিতে কোন মহাপুরুষই আগমন করেন নাই, তাই শক্তিমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণ সকল ধর্ম আপনাতে সংহরণ করিয়া গীতার আত্মোৎসর্গ মন্ত্র প্রকট করিয়া গিয়াছেন। ভগবানে জীবন উৎসর্গ করিবার পথে কোন বিরোধী ভাব পরম্পর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিবার আশঙ্কা এ ক্ষেত্রে আর নাই বলিলেও চলে।

আজ হিন্দু শব্দর বৃদ্ধ চৈতন্যের পাশে খৃষ্টের আত্মত্যাগের অলঙ্কার ছবিখানি ভক্তিপূত চিত্রে সংস্থাপন করিতেছে—মহান্দ্র প্রভৃতি অবতারগণের পূজা করিতে হিন্দু কিছুমাত্র কুষ্ঠা প্রকাশ করে না। ভগবানকে পূর্ণভাবে পাইবার যে সাধনা, তাহা শক্তির অভাবে ভারতে সংস্কৃত হইতেছিল না, ঠাকুর শক্তির পূর্ণমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া জাতির জীবনে অমানুষিক শক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। আজ অন্ততঃ, কোটি কোটি ভিন্ন ধর্মী ভারতবাসীর মধ্যে আর ভেদের কারণ দৃষ্টিগোচর হয় না, যুগ যুগান্তরের সংস্কার বিলম্বরূপ এই পথে অবস্থান করিলেও তৎপ্রভাবে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে মধুর সম্বন্ধ, তাহা প্রকাশ হইবেই। তখন এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে সমস্ত ভারতবাসী ঐক্যবদ্ধে আবদ্ধ হইবে। মুসলমান, খৃষ্টান, পারসিক—সকলেই একই ভগবানের মস্তান বলিয়া একই মন্দিরে একই সঙ্গে অবনতশিরে ঐ ভগবানের চরণে প্রণিপাত করিবে—ঠাকুরের অসাধারণ শক্তি প্রভাবে ইহা খুব শীঘ্র ঘটয়া উঠিবে বলিয়া মনে হয়।

তাই আমরা ঠাকুরকে মহাশক্তির পূর্ণবিকাশ বলিয়া মনে করি। তিনি ভারতের বিজ্ঞানময় কোষে যে ভাব-সাম্রাজ্যের ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন, তাহা বস্তুতঃ করিবার অল্প তাঁরই বিরাট কালীমূর্তির আবির্ভাব লক্ষ্য করিতেছি। তাই আজ এই পুণ্য জন্মতিথি উৎসবে, শত শত নূতনের দল তাঁর চরণে সমীপগত হইয়া বলিতেছি—“হে করুণাময় নীলেশ, আমরা তোমারই শরণাপন্ন, আমাদের শক্তিমন্ত্রে সিদ্ধি দাও।”

1. உயர்வது உயர்வுக் கொடுக்க உயர்வது.

ଗର୍ବର ସେ ଶ୍ରୀ ତତ୍ତ୍ୱର ଆଦାର ମୁଖ୍ୟାନ ଆରେ, ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ କୌଣ୍ଟିକ
 ତତ୍ତ୍ୱର ଆମାନ ଆମାନ ଆମାନ ଆମାନ ନିକଟେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଅମରର ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ
 ମାନବ ଶୃଙ୍ଖଳାର ମୁଖ୍ୟ ମାନବ, କହି ତିଳ କଲ୍ୟାଣ ସାହା
 ମିଳି ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ଏହା କହନ୍ତି ବୁଦ୍ଧେତ ମାନବ । ଅଗାଧତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ
 ଶ୍ରୀମାନ ତତ୍ତ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ମାନବ ଆମାନ କହି ଅମର ମୁଖ୍ୟାନ
 ମେଧ୍ୟ, ସେ ମିଶ୍ର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ, ମହାଶୟ ସଦୃଶୀକ ଆମାନ ମେ

[illegible][illegible]

虫豸上同。

হইবে। ছদ্মবেশে আত্মগোপন করিয়া কোন বৃহৎ ও মহৎ কর্ম কোন কালেই সংসিদ্ধ হয় না, তাই আজ কর্মীগণকে যথার্থ দেশ সেবার মহাব্রত গ্রহণ করিয়া, উন্নত বক্ষেই জটিল ও কঠোর কর্মক্ষেত্রে বীরের মতই দেখিতে চাই। দেশ ও জাতিসেবার উচ্চ ব্রত যাহাদের তাঁহাই জগৎ সেবার যথার্থ অধিকারী—দেশ-প্রেমিক রাজদ্রোহী অথবা সমাজ-দ্রোহী নহে, স্বতরাং রাজবিধির কঠোর শাসন উচ্চপ্রাণ দেশভক্তের অঙ্গ-স্পর্শ করিবে না, তবে এত বড় বিরূপ কর্ম করিতে হইলে, কোথাও রাজপুরুষগণের অন্তায় ও হঠকারিতার যদি আমরা সামান্য বাধা পাই, তাহা উপেক্ষণীয়। যে প্রোত আজ বাংলার তপঃস্কন্ধ ক্ষেত্রের উপর দিয়া প্রবাহিত হইবে—তাহার প্রতিরোধী হইবে অহুর-বুদ্ধি, দেবতার পূর্ণ সাহায্যতা আছে—অতএব নূতন পথ অব্যাহত ॥

নূতন পথের যাত্রী যাহারা তাঁহারা মনে রাখিবেন—যশঃ, মান বা হৃদয়ের কোন বৃত্তির তৃপ্তিসাধন হেতু কোন কর্মই করিবেন না—রাগ-দেবের অতীত হইয়া কেবল অনিন্দের প্রকাশ স্বরূপ যে কর্ম সৃষ্টি হইবে তাহারই একত্র সমাবেশে বৃহৎ কর্মের আবির্ভাব। এই হেতু প্রত্যেক শক্তিই, এই একমাত্র শক্তিকে অল্পসরণ করিয়া কর্ম-স্বজন করিয়া যাইবেন, আপনার জীবন আপনার তপঃরলেই পৃথিবীর মহাসংগ্রামে জয়লাভ করিবে। বাহিরে আজ যে ভগ্ন জীর্ণ প্রাসাদ ধূলিশায়ী হইতে রসিমাছে, তাহাকে ঠেকা দিবার জন্য কোন কৃচ্ছ্রতা বই প্রয়োজন নাই, ভগবানকে সৃষ্টি ইহাতে ধ্বংস হইবে না। সর্বপ্রায়ে আত্মপ্রতিষ্ঠানকে দৃঢ় করিয়া তোল, এইরূপ অসংখ্য প্রতিষ্ঠান লইয়াই আমরা একটি চক্র-নির্মাণ করিতে চাই। মনে রাখিতে হইবে এই চক্রের প্রতি-বিন্দু হইবে অমৃতের, মরুজগতের সকল সংস্কারবর্জিত, ভবিষ্য দিব্য যুগেরই মাস্তুল এবং এই চক্রই এমন এক জাতিতে পরিণত হইবে, যে জাতি সমগ্র বিশ্বকে মির-লিত করিবে। ভারতবর্ষ বিশেষতঃ বাংলাদেশের আজ এই জাতিগঠনের সুযোগ আসিয়াছে—অসার রাজনীতি চর্চায়, অথবা হৃদয়বৃত্তির তৃপ্তি-বিধানহেতু সমাজ ধর্ম দরিদ্রসেবার নিজেদের সৃষ্টি-শক্তি বিধ্বস্ত করিতে থাকিলে, হাজার বৎসরে আর এ দিন নাও আসিতে পারে। এই জন্য আমরা আহ্বান করি বাংলার কোটি-কোটি সম্ভ্রান্তকে যেন তাঁহারা হৃদয় অথবা প্রাণের আবেগে অতিশয় বিচলিত হইয়া আর ভুল

পথটি অবলম্বন না করেন। নিজের শক্তিতে নিজের ভোগ্যারতি স্বজন করিয়া জাতির সম্মুখে এক দিব্য আদর্শ ফুটাইয়া তোল। হতবুদ্ধি দেশ-বাসীর সুপ্ত চৈতন্য জাগরিত হোক, আমরা হিংসা বিদ্বেষ বর্জিত হইয়া জাতির জীবনে এক নূতন প্রবাহ আনিয়া দিব। তাই আবার আহ্বান করি আমাদের নূতনকে বাহারা এখনও পথের সন্ধান না পাইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন তাঁহাদিগকে। অন্তরের বল বড় বল, যদি আমরা বাহিরকে আঘাত না করিয়াও এই অন্তঃশক্তির বিকাশ সম্ভবপর করিয়া তুলিতে পারি, তাহা হইলে বাহিরের সহিত আমাদের সংঘর্ষের কারণ নাই—আমাদের আত্মার অমাহুযিক শক্তির পরিচয় প্রদান করিবার মাহেজ্জফণ হেলায় হারাইও না। কৰ্ম্ম অনন্ত, কেবল তুমি অতীত হও, অচিরে দেশের দুর্দশা তোমা দ্বারা ই বিদূরিত হইবে।

সং-কথামৃত

সর্বাপেক্ষা মধুর কি? প্রেম। সর্বাপেক্ষা ঈশ্বরানুরূপ কি? ধর্মজীবন। সর্বাপেক্ষা মহনীয় কি? ঈশ্বর। সর্বাপেক্ষা সুখদায়ক কি? ঈশ্বর-স্বরূপ চিন্তা ও পরোপকার।

প্রত্যেক মানবের অন্তরেই স্বর্গ বিরাজ করিতেছে। প্রত্যেক মহৎ কার্য্যই স্বর্গ। তৃষ্ণাতুর পথিককে জল প্রদান কর, অন্তরে স্বর্গস্থ থাকিবে। পীড়িতের যন্ত্রণা দূর কর, অন্তরে স্বর্গস্থ থাকিবে। বিপথ-গামীকে সুপথে পৌছাইয়া দাও, অন্তরে স্বর্গস্থ থাকিবে। দুঃখার্ত ব্যক্তির দুঃখ মোচন কর, অন্তরে স্বর্গস্থ থাকিবে। ক্ষীণ মানবকে ধর্মপথে আকৃষ্ট কর, অন্তরে স্বর্গস্থ থাকিবে।

মানবের জীবনই চিন্তার জীবন, মানবের ধর্মই ঈশ্বর-চিন্তা এবং এই ঈশ্বরচিন্তাই ঈশ্বর সহবাস বা ঈশ্বর-সহ যোগের উপায়।

সত্যের প্রতি প্রেম যতই দৃঢ় হইবে, ততই তুমি ঈশ্বরের নিকটবর্তী হইবে।

সাধু সহবাসই স্বর্গ, অসাধু সমসই নরক।

অসংখ্য লোকের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করা মহত্ব নহে, অসংখ্য লোকের সেবা করাই মহত্ব।

আত্মবিসর্জনই জীবনের প্রকৃত মহত্ব।

পবিত্র ও মহৎ কার্যের পুরস্কার বাহিরে নহে, অন্তরে।

নিরন্তর অমঙ্গলের সহিত ও অসত্যের সহিত সংগ্রাম করা, তাগ স্বীকার করা; দুর্বলকে বল, অন্ধকে দৃষ্টি, আশাহীনকে আশা প্রদান করা, অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া জ্ঞানালোক বিস্তার করা, এবং নিঃস্বার্থভাবে এই সকল করিয়া সন্তুষ্ট থাকাই আমাদের জীবনের কার্য।

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকলকে পীড়া দিবে না, কিংবা তাহাদিগকে অত্যন্ত প্রশ্রয় দিবে না, কারণ ইন্দ্রিয়সকল অত্যন্ত প্রবল হইলে মনকে বলপূর্বক হরণ করে।

মঙ্গলের উদ্দেশ্যেই মঙ্গল সম্পাদন করিবে, তাহা হইলে মঙ্গল তেমনই সহগামী হইবে।

যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, সে কখনও নিরাশ হয় না।

সকল মহত্বের যদি ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবীতে কেহই দুঃখ শোকে কাতর হইত না।

তুমি যখন লোকের দুঃখ দূর করিবার জন্য যত্ন করিতেছ না, তখন তুমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিও না যে “হে ঈশ্বর! মানবজাতির দুঃখ মোচন করা” কেন না তুমি ঐ প্রার্থনা করিবার অধিকারী নহা।

ইহলোকে তুমি ঈশ্বরের আশ্রিত, পরকালেও তাঁর নিকটতর আশ্রমে তুমি বাস করিবে, তবে হে মানব কেন ভীত হও?

যাহার যতটুকু ঈশ্বরবস্তা, তাহার ততটুকু সৌন্দর্য।

পবিত্র অবিকৃত হৃদয়ই সর্বোত্তম উপদেষ্টা; ঈশ্বরই সর্বোত্তম বন্ধু; সময়ই সর্বোত্তম শিক্ষাদাতা, জগৎই সর্বোত্তম গ্রন্থ।

বিশাল সৌর-জগৎ যেমন ঈশ্বরের অনন্তত্বের পরিচয় দেয়, তেমনি এই পৃথিবীর এক ক্ষুদ্র বাতু-কণাও তাঁর পূর্ণতা প্রকাশ করে।

প্রেমই সকল বস্তুর আদি ও অন্ত।

যিনি সকল বস্তু ও সকল লোকের নিকট হইতে সত্য গ্রহণ করেন তিনিই স্ত্রানী।

তিনিই ধনী, ধীর জীৱপ্রকৃত সকল ক্ষমতা, সকল বুদ্ধিগুলি সর্বদা পবিত্র ও সুস্থ অবস্থায় অবস্থিত ও সমগ্রসীতুতভাবে কার্যে নিযুক্ত।

জগৎ হইতে অসত্য ও অমূলক সংস্কার দূর করাই প্রতিভাবিত ব্যক্তির কার্য।

যদি কোন মানুষ মানুষকে ঝগা করে, অথচ বলে যে সে জীৱের প্রেমিক, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী।

সম্মুখে যে কার্য পাইবে তাহাই করিবে, তাহা হইলে তৎপরে কি করিতে হইবে, তাহা দেখিতে পাইবে।

স্বর্ণ ও রৌপ্য অপেক্ষা কত মূল্যবান পদার্থ এই পৃথিবীতে রহিয়াছে, কিন্তু মানুষ কি মূর্খ, যে সে প্রকৃত মূল্যবান পদার্থ আহারে চেষ্টা করিয়া না।

অসম্ভব ব্যক্তি কাহাকেও সাষ্ট করিতে পারে না; সত্যভূক্তি বাহ্যিক স্বভাব তিনিই সকলকে প্রকল্প রাখেন।

যে কোন কার্যানুষ্ঠানের সূলে ধর্ম খাঁকা প্রয়োজন, নতুবা তাহা অসিদ্ধ হয় না।

সকল সংসার যদি তোমার বিপরীত আচরণ করে তথাপি ষষ্ঠাংশ পথ হইতে কদাপি স্থলিত হইবে না।

মানুষ দিলে কুলায় না, ভগবান দিলে ফুরায় না। যেমন ছেঁচা জল থাকে না, বর্ষার জল ধরে না।

পড়া বিদ্যা পড়ে থাকে, সাধন জ্ঞান সঙ্গে যায়। খাটা কড়ি কাজে লাগে, পাওয়া কড়ি উড়ে যায়।

তুমি যারে যে চক্ষে দেখিবে, সে তোমার সেইরূপ ভাবে দেখিবে। যেমন ঘেরূপ ভাবে দাঁড়াইয়া দর্পণ দেখিবে, দর্পণ সেই ভাবের প্রতিরূপ লইয়া তোমার দেখাইবে।

ভগবান আছেন, তিনি গুণের নিধি। তাঁহাকে পাওয়া যায়।

স্বামী শুক্লানন্দের আদর্শ

১৩২৫, মাঘের “উদ্বোধনে”র পাতায় স্বামী শুক্লানন্দ “আমাদের আদর্শ ও তত্ত্বাভের উপায়” নির্দেশ করেছেন। এই আদর্শ হচ্ছে—তঁার মতে—সন্ন্যাসীত্ব। কিন্তু ওই “আমাদের” অর্থে তিনি আমরা বাঙ্গালীরা না আমরা হিন্দুরা না আমরা জগতবাসীরা বলতে চান তা কোথাও স্পষ্ট করে নির্দেশ করেন নি। প্রবন্ধ পড়ে আমাদের মনে হল, এ যেন তঁার নিজের সম্প্রদায়ের দিক থেকে একটা ওকালতি।

“উদ্বোধনের” ঐ প্রবন্ধে তিনি তঁার “বিশ্বাস যথাযোগ্য যুক্তি সহকারে প্রকটিত করিতে চেষ্টা” করেছেন। কিন্তু প্রবন্ধটা পড়ে মনে হল যে তঁার বিশ্বাসের মূল্য তঁার কাছে যাই থাক না কেন তঁার ঐ যথাযোগ্য যুক্তি পাঁচ মিনিটের জেরায় উল্টো হ্রদ ধরতে পারে।

যারা সন্ন্যাসীত্বের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করতে চান, তাঁদের কলমের আগায় বুদ্ধ ও শঙ্করের নাম আসা অনিবার্য। স্বামী শুক্লানন্দও বুদ্ধ ও শঙ্করের নজির দেখিয়েছেন। এর পাশে আমরা শ্রীকৃষ্ণ ও জনকের নজির খাড়া করে ধরতে পারি। বুদ্ধ হচ্ছেন ঐশ্বর্যবতার—শ্রীকৃষ্ণকে আমরা পূর্ণাবতার বলে মানি। শঙ্কর হচ্ছেন সন্ন্যাসী—জনক হচ্ছেন ঋষি—কেবল ঋষিই নম একেবারে রাজর্ষি—একাধারে রাজা ও ঋষি—সুতরাং আমাদের নজিরের গুরুত্ব বেশী এটা স্বীকার করতে হবে।

কিন্তু অতীতের নজির খাড়া করে তর্কে জয়লাভ করার আমরা প্রতীবর্তাই বিরোধী। কেন না আমরা মনে করি যে এই যোর কলিকালে জন্মগ্রহণ করলেও আমাদেরও একটা আত্মা আছে সুতরাং আমাদের একটা স্বাভাব্য আছে—আমাদের চিন্তাশক্তি আছে বুদ্ধিবৃত্তি আছে—আমাদেরও একটা প্রেরণা আছে, একটা সত্য আছে। আমাদের এই অন্তরের সত্যই আমাদের বিচার আলোচনার ভিত্তি। আজকার আমরা সাদা বাংলায় কথা বলি যটে কিন্তু সে বাংলায়ও সত্য ব্যক্ত হবার কোন বাধা নেই।

স্বামী শুক্লানন্দ বঙ্কিমের অভ্যন্তরীণ বই ধর্মতত্ত্ববিশ্বকোষ কলমের এক

আঁচড়েই নস্যাৎ করে' দিয়েছেন। কেননা বঙ্কিমের বৃত্তিগুলির “সামঞ্জস্য-সাধন” তাঁর কাছে “সোনার পাথর বাটী” ছাড়া আর কিছুই বোধ হয় না। স্বামিজী বলছেন—“সামান্য জ্ঞানের ক্ষুরণ হইতেই আমরা আমাদের হৃদয়ে ভাল মন্দ উভয় প্রকার বৃত্তির একটা দ্বন্দ্ব—একটা সংগ্রাম অনুভব করি। ইহাদের সামঞ্জস্য কিরূপে হইবে? খানিকটা ভাল—খানিকটা মন্দ—ইহাই কি সামঞ্জস্য? এক সামঞ্জস্য বৃত্তিতে পারা যায় যদি মন্দ সম্পূর্ণ প্রবল হইয়া ভালটাকে একেবারে নষ্ট করিতে পারে, অথবা মন্দটা সম্পূর্ণ প্রবল হইয়া মন্দটাকে একেবারে লোপ করিয়া দেয়।” স্বামিজীকে “সামঞ্জস্য” শব্দের অর্থ অভিধানে দেখবার জন্তে আমরা করবোড়ে সনির্বন্ধ অনুরোধ করি।

যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করে' কঠোর কঠে স্বামিজী প্রশ্ন করছেন—“হিন্দু শাস্ত্রের শত শত বচন উদ্ধৃত কর—যথেষ্ট দোহাই দাও—কিন্তু শাস্ত্রমর্ম বুঝিয়াছ কি?” তারপর বলছেন—“গৃহস্থশ্রমের শ্রেষ্ঠতা গোষক যথেষ্ট প্রমাণ গুলিয়াছি, গীতার ব্যাখ্যায় কর্ম-মাহাত্ম্যের ঘোষণা করিয়া সন্ন্যাসকে খর্ব্ব করিবার যথেষ্ট চেষ্টা দেখিয়াছি, কিন্তু সেই অবৈত কেশরী ভাষ্যকার শঙ্কর যে ভাবে উপনিষদ ও গীতাদির ব্যাখ্যায় সন্ন্যাসের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন, তদপেক্ষা ত কাহারও উপাদেয়তর যুক্তি চক্ষে পতিত হয় নাহি।” স্বামিজী নিজ জীবনে যে পন্থাকে বরণ করে' নিয়েছেন, সেই পন্থার গুণগান যে পুঁথিতে দেখেছেন সেই পুঁথিই তাঁর কাছে উপাদেয় লেগেছে। এটা মানুষের চিরন্তন স্বভাব।

কিন্তু অবৈত কেশরী শঙ্কর উপাদেয়তর ভাবে সন্ন্যাসের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করলেও, এই জগতের মেলায় সে সন্ন্যাস চিরদিনই অনুপাদেয় কর্ম-মাহাত্ম্যের কাছে খর্ব্ব হয়েই রইল এবং আমাদের বিখ্যাস চিরকাল খর্ব্ব হয়েই থাকবে। কেননা শঙ্করের চাইতেও বড় একজন আছেন যিনি ভাষ্যকার নন—যিনি কবি, এই সৃষ্টি কাব্যের তিনি শিল্পী, এই সৃষ্টি-কলার ষাঁকে আমরা বলি ভগবান। এই কবির শ্রেষ্ঠ কাব্য যে মানুষ, এই শিল্পীর শ্রেষ্ঠ কলা যে মানুষ—এই মানুষ কোনদিন নিগুণ হবে না—যদি না সেই পরম কবির, পরম শিল্পীর লীলা-বিরতির ইচ্ছা হয়—তাই মানুষ চিরদিন কর্মময় ভোগবান থাকবে। এমন কি সন্ন্যাসীরাও নিছক কর্মহীন ভোগহীন হতে পাবেন না। শঙ্করের মত কর্মবীর ভারতে

খুব কমই মিলবে। সমস্ত উত্তর ভারত বৌদ্ধ হ'য়ে গিয়েছিল সেটা অবশ্য বুদ্ধের নিষ্ক্রিয়তার ফল নয়। শঙ্কর ত' সারা জীবন যুদ্ধ করে বুদ্ধের ধর্মকে হিমালয় পার করে' রেখে এলেন। শঙ্কর যখন ছিলেন তখন বুদ্ধদেব ইহজগতে না থাকলেও, আসলে ও ব্যাপারটাই হচ্ছে শঙ্করে ও বুদ্ধে একটা লড়াই। আর এ লড়াইয়ের সকল চাইতে মজার কথাটা হচ্ছে যে এ লড়াইয়ের একপক্ষ নির্বাণবাদী আর একপক্ষ মায়াবাদী। বিবেকানন্দও যে একজন বিরাট কর্মী ছিলেন তা ত আমরা সবাই জানি। এমন কি স্বামী শুদ্ধানন্দেরও এ থেকে নিস্তার নেই—তাকেও এই কর্মের প্রেরণার তাড়নার উদ্বোধনে প্রবন্ধ লিখতে হয়।

এইটেই ভগবানের সবার চাইতে বড় কোডুক। যে মুহূর্তে আমরা কর্মের ও ভোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছি, কর্ম-সন্ন্যাসের মাহাত্ম্য প্রচার করছি ঠিক সেই মুহূর্তে আমাদের ভিতর দিয়ে কর্মের দেবতাই আপনাকে সার্থক করে' তুলছে। যুগে-যুগে এইটে ঘটে এসেছে—সন্ন্যাসীর ভিতর দিয়েও সৃষ্টির সেই নিগূঢ়তম সত্যটাই প্রকাশ হ'য়ে পড়ছে। এই সত্যটাই হচ্ছে লীলা—মানুষের চিরন্তন কর্ম ও ভোগ। তা এ কর্ম গৈরিক ধারণ করেই করে' আর সাদা ধুতি চাদর পরেই করে—এই ভোগ কাব্য লিখে বা মাসিকে প্রবন্ধ লিখেই হোক বা সন্তানোৎপাদন করেই হোক। এ দুয়ের তিতরের যে সত্যটা—যে principleটা সেটা এই।

স্বামী শুদ্ধানন্দের মতে “সন্ন্যাসীর অর্থ—যিনি প্রবৃত্তির উপর সম্পূর্ণ বিজয় লাভ করিয়াছেন।” তবে তাঁর মতে যে গৃহী গৃহস্থ হয়েই প্রবৃত্তির উপরে সম্পূর্ণ বিজয়লাভ করেছেন তিনিও সন্ন্যাসী—যিনি এই জগতের শত কোলাহল শত সংগ্রামের মধ্যে থেকে শত কর্ম শত ভোগের মধ্যে থেকেও আপনার প্রবৃত্তির উপর সম্পূর্ণ বিজয় লাভ করেছেন তিনিও সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর যদি এই অর্থ হয় তবে স্বামীজীর ওই আদর্শের সঙ্গে আমাদের কোনই তর্ক নেই। কারণ মানুষের তার প্রবৃত্তির উপরে সম্পূর্ণ বিজয়লাভ করাটাই হচ্ছে মানুষের নিগূঢ়তম সত্য সত্যতা। তার স্বধর্ম। আমরা জানি মানুষের মধ্যে পুরুষ হচ্ছেন ঈশ্বর—প্রকৃতি তাঁর সেবিকা। পুরুষ প্রকৃতির এই সত্যস্বরূপ মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হবে, সত্য হয়ে উঠবে, স্পষ্ট হয়ে উঠবে, জাজ্জল্যমান হয়ে উঠবে—এ আমাদেরও আদর্শ।

কেননা মানুষের ওটাই হচ্ছে পবিত্র নিগূঢ়তম সত্য—যে সত্যে ভগবান তাকে গড়েছেন।

কিন্তু আমাদের তর্ক সন্ন্যাসীর সেই অর্থের সঙ্গে যে অর্থ সন্ন্যাসীকে সংসার থেকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে' সমাজের জাতির অঙ্গহানি ঘটায়। যে সন্ন্যাসীর স্থান বনে বা নির্জনে। যে সন্ন্যাসীর সংসারের আত্মঘের জন্তে জাতির জন্তে কৃপা থাকতে পারে pity থাকতে পারে, কিন্তু সহানুভূতি নেই। যে সন্ন্যাসী কঠোর কঠে বলে—Let the dead bury their dead. যে সন্ন্যাসীর এই জগতে আনন্দ নেই, এই সৃষ্টিতে অর্থ নেই। যে সন্ন্যাসীর কাছে এই জগতের প্রত্যেক নিমেষটী ব্যর্থ। যে সন্ন্যাসী বুঝতে চেষ্টা করেন—“নির্দোষলাভ এবং তাহার সহিত পূর্ণ ভোগই আমাদের চরম আদর্শ।”

এখন তর্ক এই, এইরূপ সন্ন্যাসী মানুষের আদর্শ কি না? এই তর্কের মীমাংসা একটা প্রশ্নের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করে' আছে। সে প্রশ্নটি হচ্ছে—এই সৃষ্টি আছে কি না? ভগবানের লীলা মানি কি না? শঙ্করাচার্য্য এটা জানতেন তাই জগতটাকে মান্য ভ্রমণ করবার জন্তে তিনি অমাহুযিক বিচার তর্কের আমদানী' করলেন। এই লীলা আছে এটা মেনে ঐ সন্ন্যাসীর আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব সাব্যস্ত করা যায় না। কেননা লীলা আছে এটা মানলে ঐ সন্ন্যাসীর আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব এর ওপরে নির্ভর করবে যে আমি এই লীলার যোগদান করতে চাই কি না? যদি না চাই তবে সন্ন্যাসই আমার পন্থা—আর যদি চাই তবে এই সৃষ্টির শব্দ গন্ধ রূপ রসকেই আমি বরণ করব। এখন সৃষ্টির এই শব্দ গন্ধ রূপ রস স্পর্শকে বরণ করলেই যে সন্ন্যাসীর চাইতে আমি হীন হব—এই কথাটা সন্ন্যাসী স্বামী শুদ্ধানন্দ “উদ্বোধনে”র প্রবন্ধে বলতে চেয়েছেন। কিন্তু ভগবানের সৃষ্ট শব্দ গন্ধ রূপ রসকে বরণ করলেই যে কোন মানুষ হীন হবে এমন কথা বলবার মতো চাপরাস কোন সন্ন্যাসীর বা আর কারো আছে বলে, আমরা স্বীকার করতে নারাজ।

সে বা হোক—এখন এই সৃষ্টিটা এই লীলাটা আছে কি না? এর মীমাংসা কে করবে? এবং কেমন করে' করবে? শঙ্করাচার্য্য জগতকে মান্য বলে' উড়িয়ে দিলেন—চৈতন্যদেব ভগবানের অনাদি অনন্ত লীলার প্রচার করলেন। তোমার বিশ্বাস জগৎটা স্বপ্ন বিকার—আমার বিশ্বাস

জগতটী বাস্তব। তোমার বিশ্বাসের মূল্য তোমার কাছে ষতটা—আমার বিশ্বাসের মূল্য আমার কাছেও ততটা। তবে এ তর্কের শেষ বিচার্য কোথায় কার কাছে হবে? তুমি হুন্স ও কুট দর্শনের তর্কজাল বিস্তার করে' বুঝিয়ে দেবে জগতটা নেই—আমি কম হুন্স ও কম কুট দর্শনের সাহায্যে দেখিয়ে দেব জগতটা আছে। এ জগতটা মিথ্যা প্রমাণ করতে হলে তোমাকে চোখ বুঝতে হবে, নাক কান বন্ধ করতে হবে, হাত পা বাঁধতে হবে, তোমার মনে বুদ্ধিতে চিন্তে অমানুষিক ডিগ্বাঙ্ক খেতে হবে—কেননা সত্যকে মিথ্যা বা মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ করতে হলেই যে অসাধারণ বেগ পেতে হয় তা ত আমরা সবাই জানি। আর আমার জগত আছে তার প্রমাণ অতি সহজে চোখ খুললেই পাই—এক শব্দ গন্ধ রূপ রস আমার ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে গিয়ে আমার অন্তরাঙ্গাকে প্রতি নিম্নে জানিয়ে দিয়েছে—“আমি আছি গো আমি আছি।”

কিন্তু হাজার তর্ক করেই হোক আর হাজার বিচার করেই হোক ষতবারই এই জগতটাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা যাক না কেন সে সকল তর্ক ও বিচার মাহুষের অন্তর থেকে যে অমুভবটাকে কিছুতেই কোন দিনই মুছে ফেলতে পারে না, সেটা হচ্ছে তার অস্তিত্বের অমুভব। লক্ষ্য প্রমাণ যে জিনিষটাকে আমার ভিতর থেকে অন্তর্হিত করিয়ে দিতে পারে না—সেটা হচ্ছে আমার এই চৈতন্য যে আমি আছি।

আসলে আমি যে আছি এটা বোর মায়াবাদীকেও মানতে হবে। কেননা মায়াবাদীর আসল তর্কটাই হচ্ছে যে আমি আছি কিন্তু জগত নেই। আমিও নেই যদি মায়াবাদী বলে, তবে তার মায়াবাদও দাঁড়াবার স্থান পায় না। আমি সত্য বলে মানলেই জগতটা মিথ্যা আমি বলতে পারি। এটা অতি সোজা কথা।

এখন আমি যে আছি এর প্রমাণ কে দিতে পারে? কেউ পারে না। কেননা এর প্রমাণ ত আমার বাহিরে নেই—এর প্রমাণ আছে আমার ভিতরে। এর একই প্রমাণ—আর সেইটে সবার চাইতে বড় প্রমাণ—সবার চাইতে গোড়াকার প্রমাণ—সেটা হচ্ছে আমার চৈতন্য। এই চৈতন্যই আমার অমিত্র।

এ কথা যদি মানি তবে ভদ্রতার খাতিরে এটাও মানতে হবে যে কেবল আমিই আছি তাই নয়—তুমিও আছি। কারণ আমার মস্ত

যেমন আমার চৈতন্যের সত্তা আছে তোমার মধ্যেও তোমার চৈতন্যের সত্তা আছে—সুতরাং আমিও আছি তুমিও আছ। কেবল তাই নয়—তবে রামও আছে শ্রামও আছে, হরিও আছে যহও আছে—এর চাইতেও বেশী—ও জন আছে জ্যাকসন আছে পোল আছে পিয়ের আছে—মমসেন আছে মেকেনসেন আছে ম্যাকারক আছে—রোমানক আছে—জগতের প্রত্যেক জাতির প্রত্যেক মানুষটি আছে। কারণ প্রত্যেকের মধ্যেই তাদের আপন আপন সত্তার অনুভব আছে। আর সেইটাই তাদের অস্তিত্বের সবার চাইতে বড় ও গোড়াকার প্রমাণ।

এখন এই যে আমি আছি—এই “আমি আছি”তেই আমি শেষ হয়ে যাই নি। এই সঙ্গে সঙ্গে আমি অতি স্পষ্টভাবে দেখছি যে আমি-নিঃশব্দ নই আমি সগুণ—আমি আগার চৈতন্যে তিনটি জিনিষের পরিচয় পাচ্ছি—এই তিনটি জিনিষ হচ্ছে—জ্ঞান, শক্তি ও প্রেম। আর এই যে জ্ঞান শক্তি প্রেমের অনুভব আমি পাচ্ছি—এই অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে আমি দুঃখ পাচ্ছি না—বেদনা পাচ্ছি না, আমি আমাকে দীন করে দরিদ্র করে অধম করে পাচ্ছি না—ঐ জ্ঞান শক্তি প্রেমের অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে আমার আছে একটা বিপুল আনন্দ—ঐ আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে আমি দীন নই দরিদ্র নই অধম নই পাপী তাপী নই—আমি এই সৃষ্টির মাঝে সর্বোত্তম রহন্ত। এই যে জ্ঞান শক্তি প্রেম এ আমার কাঁধে বোঝার মতো চেপ্তে পড়ে নি—এ অমৃতের মতো আমার অস্তিত্ব বিছিয়ে আছে।

এখন এই যে আমার চৈতন্যের জ্ঞান শক্তি প্রেম—এদের একটা সহজ ধর্ম আছে আপনাদের প্রকাশ করবার আপনাদের এই বহির্জগতে সার্থক করবার। আর এই যে এদের প্রকাশ—এই প্রকাশের অন্তরালে আমার দুঃখ নেই দারিদ্র্য নেই—এর সঙ্গে সঙ্গে আছে আমার একটা আনন্দ, একটা মহত্ত্ববোধ। আসলে ঐ আনন্দ আছে বলেই ওরা প্রকাশ হ’তে চায়। কিন্তু এই প্রকাশ হ’তে হ’লে একটা কিছু আশ্রয় এদের চাই—একটা কিছু পথ চাই যা দিয়ে এরা বেরিয়ে আসতে পারে। আর সেই জন্য এরা আশ্রয় করেছে আমার মনকে বুদ্ধিকে শরীরকে ইঞ্জিয়কে। এই কারণেই আমাদের মধ্যে একদল আধ্যাত্মিক নাসিকা কুণ্ঠিত করে বলেন যে ইঞ্জিয় বহিমুখীন—কিন্তু বহিমুখীন হলেই যে

সেটা হীন এমন কোন কথা নেই। কিন্তু ভিতরের আল্পস সত্যটা হচ্ছে ইন্দ্রিয় বহিমুখীন তা নয়—আমাদের চৈতন্যের ঐ জ্ঞান শক্তি প্রেমই বহিমুখীন—আমরা আমাদের চৈতন্যের ধর্মকে আমাদের ইন্দ্রিয়ের ওপরে চাপিয়ে দিয়ে ভাবছি এই ইন্দ্রিয়ই আমাদের চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তা নয়। মানুষের চৈতন্যের ওই জ্ঞান শক্তি প্রেমই তার ইন্দ্রিয়াদির ভিতর দিয়ে প্রকাশ হতে প্রত্যেক নিমেষটীতে চাচ্ছে ও হচ্ছে।

এমন কি সন্ন্যাসীরও। তবে সন্ন্যাসী আপনার জন্যে এমন একটা পন্থা আবিষ্কার করে 'সেইটেকে বরণ করে' নিয়েছেন যেখানে বিচিত্রতা একেবারেই নেই। তাঁর জ্ঞান আত্মবোধেই পর্যাবসিত, শক্তি ইন্দ্রিয়াদিকে পিষে ফেলতেই নিযুক্ত, আর প্রেম হয়ত জগতবাসীর প্রতি শুভ কল্যাণেচ্ছার ও আশীর্বাদেই তুষ্ট।

কিন্তু মানুষের অন্তরের ঐ জ্ঞান শক্তি প্রেমের প্রকাশ হবার বিকাশ হবার মার্থক হবার ত ঐ একই পন্থা একই রূপ নয়। সহস্র রূপ নিয়ে সহস্র পথ দিয়ে তা ফুটে উঠতে পারে—বিচিত্র পথে বিচিত্র রঙে বিচিত্র ভঙ্গীতে তা সৃষ্টির আদিকাল থেকে ফুটে উঠছে। আর এই জন্যই ত মানুষ অনন্ত—তীর সীমা নেই, গন্তী নেই, বন্ধন নেই।

এখন এ কথা যদি মানি—আর যদি না মানি তবে সেটা নিতান্তই তর্কের খাতিরে জোর করে' না মানা হবে—তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে সন্ন্যাসীত্ব মানুষের জীবন-দেবতার সহস্র রূপের, অনন্ত রূপের একটা রূপ একটা ভঙ্গী একটা attitude—মানুষের অনন্ত রিচিত্রতার একটা চিত্র—তার জ্ঞান শক্তি প্রেমের কোটা অংশের এক অংশ। আর তা যদি হয় তবে ঐ সন্ন্যাসীত্ব মানুষের আদর্শ হতে পারে না। কেননা অংশ সমগ্রের চাইতে চিরদিনই ছোট। বিশ্বমানবের সমগ্র অন্তরে বৃহত্তম জীবনে সন্ন্যাসীত্ব একটা কোণ অধিকার করে' আছে। আর ঐ এক কোণের সত্য কোন দিন বিশ্বমানবের সমগ্র জীবন অধিকার করতে পারে নি পারবে না—কেন না তা তার চৈতন্যের সমগ্র সত্য নয়, চরম সত্য নয়, নিগূঢ়তম সত্য নয়—ভগবান তাকে যে সত্য দিয়ে গড়েছেন সে সত্য নয়। আর যা সত্য নয় তা কোন দিন মানুষের আদর্শ হতে পারে না। সে আদর্শকে আদর্শ করে' দাঁড় করাতে

গেলে ফল হবে বৃথা-শক্তিক্ষয় এবং দাঁড় করিয়ে রাখলে হবে অর্থব্যয় সময় নষ্ট ও সমাজের শরীর ধ্বংস।

এখন সন্ন্যাসী শেখ কথা-বা বলতে পারেন, সেটা হচ্ছে এই যে, তাঁদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে এ জগৎ থেকে মুছে যাওয়া নির্বাণ লাভ করা, তাই তাঁদের আদর্শ সন্ন্যাসীত্ব—জীবনের সহস্র পোষাক একে একে খুলে ফেলে তাঁদের নিগূঢ় আত্মটাকে একেবারে অক্ষর ব্রহ্মের সঙ্গে লয় করে দেওয়া—তাই তাঁদের ইন্দ্রিয়াদির, যার ভিতর দিয়ে মানুষের চৈতন্যের জ্ঞান শক্তি প্রেমের বিকাশ হয়, তার মুখ বন্ধ করে নিগূঢ় নির্বিকার হবার চেষ্টা করা—কিন্তু এই নির্বাণলাভই মানুষের পরম পুরুষার্থ কি না এ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল।

আত্ম-নির্ভরতা

চতুর্দিকেই অন্নাত্যাব দেখা দিয়াছে। বাংলার বাঁকুড়া জেলায় ভীষণ অন্ন-কষ্ট হইয়াছে। দুই-মুঠা অন্নের অভাবে অসংখ্য নরনারী মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, এরূপ অশ্রুভেদী দৃশ্য কোন হৃদয়বান ব্যক্তি দেখিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিবেন? আমরা আশা করি, স্বামকৃষ্ণ মিশন ও অন্যান্য সেবা-সমিতির উত্তোগে যেসকল রিফর্ম-কার্য খোলা হইয়াছে, দেশবাসী মুক্তহস্তে তাহাদের অর্থসাহায্য করিবেন, গভর্নমেন্টেরও এ বিষয়ে উদাসীন থাকিলে চলিবে না। দেশের মধ্যবিত্ত লোকদের অবস্থাও শোচনীয়, গভর্নমেন্টের যথেষ্ট করণার অভাব ঘটিলে বহু নরনারী অকালে কালগ্রাসে পতিত হইবে।

কসলের অভাবেই যে আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষ হয়, এমন কথা আমরা স্বীকার করি না। এক জেলায় প্রাকৃতিক দুর্য্যটনায় ক্ষেত খামার জলিয়া বা হাজিয়া গেলেও সেই জেলার লোক অপর জেলা হইতে চাউল, গমি অনান্যাদি ক্রয় করিয়া জীবননিকাহ করিতে পারে, কিন্তু গ্রামবাসীদের সম্বলের মধ্যে তাহাদের গ্রন্থপত্র, গ্রন্থপত্রের মূল্য কোন কারণে হস্তগত না হইলে ছাথের জাল অবধি থাকে না।

বাকুড়া জেলার আজ বাহাদের অসহায়তা ঘটনা, তাহাদের যদি অর্থ-সংস্থান থাকিত, তাহা হইলে দেশবাসীর দান লইয়া সেবা-সমিতির সভ্যগণকে চাউল ধান্য খরিদ করিয়া উহাদের মধ্যে বিতরণ করিতে হইত না, গ্রামবাসীগণ নিজেরাই ভিন্ন-জেলা হইতে আপনাপন অসহায় মিটাইয়া লইত। দেশের শ্রমজীবীগণের এই অর্থ-ক্লেশের মূল কারণটা বুচাইয়া দিতে পারিলে, দুর্ভিক্ষের কথা আর শুনা নাও যাইতে পারে।

পৃথিবীর অপরাপর দেশেও খাদ্যাভাব ঘটে, কিন্তু সে সকল দেশের লোক না খাইয়া মরে না, যথেষ্ট উপার্জনের পথ স্বয়ং থাকায়, শ্রমজীবী সকলেই প্রয়োজনমত অর্থসংগ্রহ করিতে পারে, এবং সেই অর্থ-সাহায্যে ভিন্ন দেশ হইতে খাদ্যাদি আমদানি করিয়া লয়।

কেরল যে শ্রমজীবীগণেরই দারুণ অসহায়তা ঘটনা, এরূপ নহে, মধ্যবিত্ত গৃহস্থসম্পন্ন উপযুক্ত বিদ্যালিক্ষণ করিয়াও অর্থোপার্জনের কোন পথই খুঁজিয়া পায় না। আহাৰ ও নিত্য ব্যবহার উপযোগী সকল দ্রব্যই অসমুল্য বিক্রয় হইতেছে, তদনুগতি অর্থ কৈ? দেশের এক শ্রেণীর লোক হয়ত প্রভূত উপার্জন করিতেছেন, কিন্তু শতকরা ৯০ জন লোক যে সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়াও ১০১৯৫ দশ পনের টাকা উপার্জন করিতে পারে না। সচরিত্র ও বিশ্বাসী হইলেও মূলধনের অভাবে কোন ব্যবসা করিয়া যে দিন চালাইবে এমন উপায়ও নাই। আজ বাকুড়া জেলার শেচনীর দুর্দশার কথা শুনিয়া হাহাকার উঠিয়াছে, কিন্তু বাঙালীসমাজের ভিতরে ভিতরে যে আশ্রয় গুমিয়া গুমিয়া বুদ্ধি পাইতেছে, তাহা একদিন দাঁড় দাঁড় করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে, তখন অবস্থা যে কি ভীষণ হইবে, তাহা ভাবিলেও হৃদকম্প হয়।

আমাদের দেশের উৎকৃষ্ট জীবন বাহাদের, তাহারা বাহিরের ক্ষতে ঔষধ দিতেই ব্যতিব্যস্ত, মানুষের রক্ত যে দূষিত হইয়া গিয়াছে, তাহা বিমুগ্ধ করিয়া তুলিতে না পারিলে, এ গলিত কুষ্ঠে যত প্রলেপই মাখাইয়া দাও রোগীর ধন্যতা কোনমতে উপশম হইবে না। "পত্রিকা" লিখিয়াছেন—

In Bengal the district of Bankura has been terribly affected. We understand that the Ramkrishna Mission is engaged in relief-work in that district, but is considerably hampered for want of funds. This and

other charitable societies which are in existence should be utilised by the Government....they should be supplied with money, food and clothing.

এই মামুলী উপায় ছাড়া আর কি পথ অবলম্বন করিবার আছে? যদি এই একমাত্র উপায় ছাড়া অন্তর্কৃষ্ট নরনারীর জীবনরক্ষার অন্য উপায় না থাকে, তাহা হইলে আমাদের অনুরোধ রামকৃষ্ণ মিশন অথবা গভর্নমেন্ট প্রচুর অর্থ দিয়া এক প্রুশস্ত অতিথিশালা খুলিয়া দিল—পেটে টান ধরিলে বাংলার নরনারী এইখানে আসিলেই অবধারিত অন্ন পাইবে।

আমাদের মনে হয় এতদ্ব্যতীত অপর উপায় আছে। যে দেশের মাটিতে একমুঠো ছোলা খান-ছড়াইয়া দিলে, দুই দিনে তার অল্প দেখা দেয়, যে দেশের বৃকের উপর অসংখ্য নদনদী মুক্তামালার ন্যায় শোভা পায়, সে দেশের লোক পেটের জ্বালায় জলিয়া মরিবে, পিপাসায় বৃকের ছাতি কাটিয়া যাইবে, অতিথিশালার অন্ন দিন গুজরাণ করিবে, ইহা কখনই হইতে পারে না। উপায়টি সহজসাধ্য নয়, মনোবৃত্তির তৃপ্তি-বিধানমাত্র নয়, সে উপায় দেশের ব্রতধারী যুবকগণকেই তপস্তার দ্বারা ই অবিকার করিতে হইবে।

এই আজ যাহারা সংসারের সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া জীবনে ভগবানের স্পর্শ অনুভব করিবার জন্য আমাদের পুরোভাগে দণ্ডায়মান, তাঁহাদিগকেই এই কঠোর কর্ম সাধন করিতে হইবে। জাতি রক্ষা পাইলে তবে ত ধর্ম—মামুল্যের ভিতর দিয়াই ত ভগবান তাঁর সৃষ্টি রক্ষা করিয়া থাকেন—স্বার্থলেশহীন উৎসর্গীকৃত জীবনেই দেবশক্তি জাগ্রত হয়, মামুল্যের সামর্থ্যে জাতির উদ্ধার অসম্ভব, তাই দেববরে উদ্ধৃত সাধকদের নিকটেই আমাদের কথাগুলি প্রকাশের প্রয়াস করিতেছি।

আমাদের দেশে, স্বদেশ-প্রীতির প্রবাহ যে দিন বস্ত্রের মত চারিদিক ভাসাইয়া দিয়াছিল, সেই দিন হইতে তরুণজাতির হৃদয়মন হইতে অনেকখানি মল্যমাটি ধুইয়া গিয়াছে, তাঁহারা আজ দীপ্ত পাবকের মত উজ্জলতর হইয়া উঠিয়াছেন, হীন স্বার্থে আর তাঁহারা জীবনকে পরিণত করিতে চাহেন না। ইহাদের মধ্যে অনেকেই ভগবানের সন্মানে বাংলার বহু ধর্ম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন, অনেকেই দেশাত্ম-প্রেমে বিভোর

হইয়া হৃদয়াবেগের বশবর্তীতার কারণে অকারণে রাজবিধির কঠোর বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন, আবার অনেকেই জীবন-বিকাশের উত্তম পন্থা আবিষ্কারে অসমর্থ হইয়া জলিয়া জলিয়া মরিতেছেন। আমরা এই তরুণ জাতির সম্মুখে এক দিব্য বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র উপস্থাপিত করিতে চাই।

এই যে সূজলা-সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গদেশে বৎসর বৎসর অন্নাতাবে লক্ষ লক্ষ লোক কালগ্রাসে পতিত হয়, ইহার কারণ ত অন্নপূর্ণার ভাঙারে খাদ্যাদির অভাব হইয়াছে এরূপ নহে। মানুষ ভুলিয়াছে তাহাদের অন্তরাত্মাকে, ভগবানই যে জীবাধারে অবস্থান করিয়া মন্তোর ভোগারতি নিত্য গ্রহণ করিতেছেন এই চৈতন্য তাহাদের ফিরাইয়া আনিতে হইবে। মানুষের নিজের প্রতি যখন অপরিণীম শ্রদ্ধা জাগিয়া উঠিবে, তখনই দেখিবে, তমোগুণাচ্ছন্ন আজ যে মানুষ ধ্বংসের পথে চলিয়াছে, শুদ্ধ শক্তির বিকাশে সে সকল আধার বিদূরিত করিয়া নিত্য নব নব সৃষ্টি রচনা করিতে থাকিবে। অসংখ্য অশিক্ষিত দেশবাসীর সুপ্ত চৈতন্য জাগ্রত করিতে হইলে, কলিকাতার মত সহরে বসিয়া, কেবল সংবাদপত্রের সমাদিক প্রচার অথবা সারগর্ভ বক্তৃতা করিলে কাজ যে অধিক আগাইবে এরূপ মনে করিও না। সেবাধর্মে দেশের হৃদয়ে কথঞ্চিৎ সহানুভূতি ও অনুরাগের সঞ্চার হইতে পারে, কিন্তু শক্তির বিদ্যায় দেখায় খেলা করিবে না।

এই আত্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইলে সর্বপ্রথমে আত্মনির্ভরতার চিত্র সর্বদেশে বিস্তৃতাকারে চিত্রিত করা চাই, এবং সে আদর্শ আজ বাহারা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী তাহাদের দ্বারাই সম্ভব—হীনপ্রাণ সংসারী জীব সে কর্মে কোন কালেই হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। গীতার শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

“যৎ যদাচরতি শ্রেষ্ঠতত্ত্বদেবেতরো জনঃ।”

শ্রেষ্ঠজনেরা যে যে কর্ম আচরণ করিবেন, ইतरজনরা সেই সেই কর্ম অনুষ্ঠান করিবে। আমরা শ্রেষ্ঠ তরুণ জাতিকেই এই আত্মনির্ভরতার মন্ত্রশক্তি জাতির জীবনে ছড়াইয়া দিবার তপড়া আরম্ভ করিয়া দিতে বলি।

বাহারা ভগবচ্চরণে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, যগদ্ধিতার তাহারা কোন কর্মেই অনাস্থা করিবেন না—আমরা এই উৎসর্গীকৃত জীবনগুলিকে সর্বপ্রথমে

Sensation, Emotionএর বাহিরে দাঁড়াইয়া পরমানন্দে এই শ্রেষ্ঠ কন্দটিকেই অনুসরণ করিবার জন্ত আহ্বান করিতেছি।

মাতৃষের বাহা প্রয়োজন, স্বদেশজননীর ভাণ্ডারে তাহা প্রচুর পরিমাণে সংরক্ষিত, সাধনার দ্বারা সে ভাণ্ডারক্ষেপে প্রবেশ করিতে হইবে। হে সাধক! মনে রাখিও পতিত জাতির উদ্ধার-উপায় তোমারই উপর নির্ভর করিতেছে—লক্ষ লক্ষ মুমূর্ষু কঙ্কালসার নরনারী বড় আশায় তোমার মুখপানে চাহিয়া আছে—তোমার সিদ্ধি তাহাদের জন্ত, যত শীঘ্র পার এই মহাসিদ্ধি আহরণ করিয়া মরণাপন্ন জাতির জীবনে সঞ্জীবনী-সুধা ঢালিয়া দাও, কোটা কণ্ঠে ভগবানের মহিমা গান শুনিয়া জীবন ধন্য হউক।

দ্বাদশ বর্ষ ধরিয়া বাঙ্গালীর জীবনে সাধারণভাবে যে সাধনাত্মক প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার ফলে আমরা সহস্র সহস্র নূতন সাধক পাই-
রাছি। অতঃপর তাহার বাহিরের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া আরও কয়েক বৎসর, স্বাধীন উপজীবিকা দ্বারা তাহার যে উত্তমরূপে আপনাপন জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিতে পারেন, এই চিত্র দেশের সর্বত্র বিকশিত করিয়া তুলুন। এবং যে জীবন-চিত্র অতঃপর বিকাশ করিয়া তুলিতে হইবে, তাহা সম্পূর্ণভাবে হইবে তপস্বীরই জীবন—দেশের মাটি চিরিয়া আমরা বাহা পাইব তাহাই হইবে আমাদের সম্পদ, দেশজননীর দানই রাজার বেশে আমাদের সজ্জিত করিয়া তুলিবে।

সর্বাগ্রে চাই না ধন, চাই না দাতার দান। চাই সাধকের ধৈর্য, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা। আত্মনির্ভরতার সাধনা মূর্ত করিয়া তুলিবার জন্য, এই অধ্যাত্ম-সম্পত্তি লইয়া আমরা কয়েক শত সাধককে একত্র হইতে অনুরোধ করি। তারপর এই ধৈর্য বিশ্বাস শ্রদ্ধা দিয়াই আমরা জগৎকে বুঝাইয়া দিব, মাতৃষের তপঃশক্তিই জগৎঐশ্বর্যের মূল উপাদান—রাজনীতিকদের জানাইয়া দিব—রাজনীতিক অধিকারই মানুষকে বড় করিয়া তুলিবার একমাত্র উপায় নয়।

করিতে হইবে কি? হে সাধক! উচ্চের ঐ আকাশ তোমার চক্ষা-তপ—সম্মুখে পশ্চাতে, দক্ষিণে বামে বিস্তৃত ধরণী তোমার আবাসক্ষেত্র, পাইয়াছ দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, প্রতিভা—সৃষ্টি করিয়া লও বিচিত্র রসে বিচিত্র আহার পানীয় সাজসজ্জা প্রভৃতি। পরের ঘরে ভিখারীর বেশে দাঁড়াইবার তোমার অধিকার নাই। দ্বাদশ বর্ষ পূর্বে আত্ম-নির্ভরতার

যে অসমসম উচ্চলোক হইতে আমাদের জীবনে বঞ্চিত হইয়াছিল, জীবন অশুদ্ধ থাকায় সে পুণ্য পবিত্র মন্ত্র যথাযথ ফলপ্রসূ হয় নাই, অতি বিকৃতভাবেই তাহাতে সৃষ্ট হইয়াছিল একটা জাতিগত বিদ্বেষ, আজ কিন্তু মুক্ত সরল প্রাণে আবার এক নূতন শক্তি অন্বেষ করিতেছি, আমার জীবন লইয়া ভগবানের অভীষ্ট মূর্তিই বুঝি আজ প্রকাশ পাইবে। আমার মুক্তি সিদ্ধি দিয়াই বুঝি জাতির কঠিন সমস্যার সমাধান হইবে— হে দেবতা, অনন্ত আকাশ ভেদ করিয়া তোমার যে দিব্য জ্যোতিঃ আজ আমার হৃদয় পথে তোমার দিকেই ছুটাইয়া চালাইয়াছে, অসংখ্য কোটি ভারতের নরনারীকে সেই দিব্য পথটা ধরাইয়া দাও।

মায়ের দান মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিবার জন্ত, হে অগ্রদূতগণ! পরিহার কর তোমাদের ধারকরা বসন ভূষণ, মাটি হইতে উৎপন্ন করিয়া লও তোমাদের লজ্জানিবারণের বস্ত্রখণ্ড, পরের আশায় বসিয়া বসিয়া দিন গুনিয়া যাইলে অভাবের তাড়না ভীষণতর হইবে। সিদ্ধ বাঁহাদের তাঁহাদের কিছুই প্রয়োজন নাই, কিন্তু সম্মোহিত জাতির জ্ঞানসঞ্চারের জন্ত সর্বত্রই তাঁহাদেরই কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইবে।

এই যে দরিদ্রতার দুর্জর হতাশন অসংখ্য বাদালীর বুকের রক্ত শুষ্কিা থাইতেছে, ম্যালাইন ইন্জেকশনে তাহাদের জীবন আরও দিন কতক বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিও না, চিরদিনের জন্ত ইহাদের বাঁচাইয়া তোল—ধানের মরাই, চরকার স্রুত, তাঁতে তাঁতে কাপড় প্রতি-গৃহস্থের ঘরে নিত্য সম্পত্তি হইয়া উঠুক। এইরূপ মহাসেবাব্রত পালন করিবার জন্ত কে আছে, কেবল নিজের প্রাসাচ্ছাদনে পরিতুষ্ট নির্ভীক সম্রাসী, দলে দলে হলস্কন্ধে বাংলার উর্বর ক্ষেত্রে অগ্রসর হও, স্বার্থপুষ্ট মহাজনের ষণ হইতে দরিদ্র শ্রমজীবীদের উদ্ধার কর, কে আছে বাঁহাদের উপর নির্ভর করে না বৃদ্ধ পিতামাতা পত্নী প্রভৃতির জীবন, এইরূপ নিঃসঙ্গ হাজার হাজার তপস্বীর জীবনোৎসর্গের উপরই প্রতিষ্ঠিত হইবে বাংলার ভবিষ্যৎমাজ। দেশের জন্য জাতির জন্য কে আছে, নিঃসঙ্কোচে, উন্নত বক্ষে এই বিপুল কর্মভার গ্রহণ করিয়া দেশজন্মনীর পরমাশীর্বাদ গ্রহণ করিবে?

কর্ম কঠোর কিন্তু প্রাণ ত নিস্তেজ নয়, তিল তিল করিয়া জাতির স্বত্ব দেখিগা হা হতাশ করা অপেক্ষা অচিরে আইস আমরা আত্মনির্ভরতা

ব্রত গ্রহণ করি, ভবিষ্যতে দেখিবে আমাদের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া দেশবাসী তাহাদের সকল অভাব একেবারেই দূর করিয়া দিবে।

এই কার্যের জন্য চাই প্রাণ, আর দেশ ও গভর্নমেন্টের will—আমরা কিছুরই প্রত্যাশী নহি। বাণিজ্যপ্রতিযোগিতা এক্ষেত্রে নাই আপনার পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইবার ইহাই সাধনা—আমাদের বিশ্বাস এই নূতন পথে যাত্রীর অভাব হইবে না, আমরা ক্রমশঃ উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করিয়া বলিবার চেষ্টা করিব।

মনঃস্থৈর্য

অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পঞ্চ কোষ লইয়া মানুষের জীবন। শরীর, প্রাণ, মন, বুদ্ধি এবং এই সকলের অতীত তুরীয়ের আনন্দ, ভাষা কথায়, এইগুলি সম্বন্ধে আমাদের একটা জাগ্রত অনুভূতি লাভ করিতে হইবে। তুমি যে মনঃস্থৈর্যের উপায় জানিতে চাহিয়াছ এই আত্ম-আলোচনায় সে উপায় নিজেই দেখিতে পাইবে এবং তাহা এককিঞ্চিৎ দুঃসাধ্য ও সাধনসাপেক্ষ তাহাও বুঝিবে।

সাধকের চাই অসাধারণ ধৈর্য। বাহিরের ঘাতপ্রতিঘাতে উদাসীন থাকিয়া এই আত্ম-অনুশীলন সর্বোচ্চে প্রয়োজন। অবশ্যই কোন কঠোর নিয়মের বশবর্তী হইয়া আমরা সাধনার পথে চলিতে প্রস্তুত নহি, প্রকৃতি মুক্ত প্রাঙ্গণে যে স্বভাবের খেলা অনাদিকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে সেই খেলার ভিতর দিয়াই আমরা সিদ্ধি পাইতে চাই। বিশেষ বিশেষ সাধনপ্রণালী-স্থপ্তির উদ্দেশ্য ও প্রতি সাধনপ্রণালীর উপকারিত্ব বুঝিয়া আমরা আত্মসমর্পণযোগ্য গ্রহণ করিয়াছি। দৃঢ় বিশ্বাস এক্ষেত্রে ভগবানই সাধক, প্রকৃতিসহযোগে তিনি তাঁর মঙ্গল ইচ্ছা আমার জীবন লইয়া পূর্ণ করিবেন। এই যোগে একটা কথা প্রতিনিয়ত স্মরণ রাখিতে হইবে যে কোন ব্যক্তিগত জীবনের মুক্তি বা মোক্ষের জন্য সাধনা নহে, সাধন মানবজাতির জন্য। সমগ্র মানবের মধ্যেই যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সাধন চলিয়াছে, আমরা গুরুশক্তি সহায় তাহা কেবল জ্ঞানগত করিয়াছি, তা

দ্রষ্টা হইয়া তাঁর খেলা দেখিয়া চলিয়াছি, ধর্ম্যধর্ম্য ভালমানের দায়ী আমরা নহি—“স্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিম্ব্তোহস্মি তথা” করোমি”।

দ্রষ্টা হওয়াও একটা সিদ্ধি। মাইার যেমন করিয়া এই দ্রষ্টাও আনুক, আমি কিন্তু গুপ্তর ইঙ্গিতেই এই নূতন দৃষ্টি পাইয়াছি। আমার জীবন লইয়া যে বিপ্লব চলিয়াছে, কত হইয়া তাহার পরিশাস্তির প্রয়াস কামনা কতবার করিয়াছি, কিন্তু “মচ্ছিত্তঃ সর্ব্ব দুর্গাণি মংগ্রসাদাৎ তরিষ্যামি” এই দিব্য মন্ত্র আমার নিশ্চেষ্ট করিয়াছে। আমি অতী হইয়া আজ দেখিয়া চলিয়াছি, প্রকৃতির কদ্রলীলা কি অভাবনীয় অমঙ্গল ঘটনার ভিতর দিয়া, তাঁর শুভ ও মঙ্গল সৃষ্টি থরে-থরে আমার জীবনে গড়িয়া তুলিতেছে। তুমি মনের কথা বলিয়াছ—প্রেমের গভীরতম রহস্যের কথা জানিতে চাহিয়াছ! মন দিয়া আমার কথাগুলি শুন, ভুক্তভোগীর জীবন ইতিহাস শুনিলে চিত্রলেখার মত তোমার জানিবার বিষয়টি স্পষ্ট হইয়া উঠিবে—শাস্ত্রবাক্য নীরস এবং হৃর্ষোধ্য, জীবন-বেদ সরস অথচ-জলন্ত এবং অধিকতর সহজ ও শিক্ষাপ্রদ।

যৌবন-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ত ভালবাসিতে সাধ যায়, যৌবনের প্রথম প্রভাতেই যে উদাস দৃষ্টি বিশ্বের দিকে ছুটিতে থাকে—নয়নের সে আকুল ক্ষুধায় বাহাকে সম্মুখে দৈখে তাহাকে নিজের করিয়া লইতে চায়। সেই ভাগবান, তারুণ্যের প্রথম আবেগ-আলিঙ্গনে যে সত্য-মানুষটিকে বুকে ধরিতে পারে। কিন্তু সকলের ভাগ্য ত সমান নয়, কাবেই মানুষকে অনেক আঘাতই সহ করিতে হয়, কেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়া ইহ-জীবনের সকল আশায় জলাঞ্জলি দেয়, আবার কেহ বা সত্যস্পর্শে জীবন ধন্য করিবার জন্য, আকুল হিয়াখানি উন্মুক্ত রাখিয়া গোপের ঠাকুরের আগমন প্রতীক্ষা করে। কত জলিয়াছি, সূধা ভ্রমে আকণ্ঠ করল ভক্ষণ করিয়াছি, আজও সে উৎকট বিষের দারুণ জ্বালা থাকিয়া থাকিয়া জলিয়া উঠে, কিন্তু পাগলের মত যাহা চাহিয়াছিলাম তাহা ত পাই নাই, যাহা পাইয়াছি তাহা যে ধারণা করিবার সামর্থ্য ছিল না, আকুল উন্মাদ ত আমি নই, আমার জ্বালা জুড়াইতে সে প্রেমিকের যে অধিকতর আকুলতা। কত জন্মের দুয়ারোগ্য ক্ষত, এ কার পরহস্তের চন্দনলেপনে নিশ্চিহ্নরূপে আরাম হইয়া উঠিল। ভাবের কথার কাবের কথা তুলিয়া বাই। বলিতেছিলাম মনস্তির করিবার কথা—ভালবাসার—মরি মরি ভালবাসার কথা।

মনস্থির না হইলে ভালবাসা একটা নেশা। ভালবাসা মনের উৎকৃষ্ট বৃত্তি। সৌরভই ফুলের সম্পত্তি, প্রেমই মনের ঐশ্বর্য। হাররে। এই ভালবাসাই যে জগতের চৌদ্দ আনা সাধনার মূল মন্ত্র। নাটক নভেল উপকথা—সে যে ভালবাসার ফিকে রঙেই ছোপান, কত হাজার হাজার গ্রন্থ এই মেকী ভালবাসার কথার গাঁথা হয়ে কত হাজার হাজার ছেলের মাথা বিগড়াইয়া দিতেছে। বাংলার তরুণজাতি আজ সত্য প্রেমের ভিত্তিহীন—এ কোন্ দেবতার আশীর্বাদ, এ কোন্ দেবতার বর !!

প্রবর্তকের পাঠক! তোমার আজ জানিতে হইবে—তুমি কে? এই জানাজানির পূর্বে তুমি যে কাহাকেও ভালবাসিবে না, কোন কার্য করিবে না এমন হইতে পারে না, ইচ্ছা করিলেও এরূপ পারিবে না, কর্তা ত তুমি নও, তুমি দ্রষ্টা—এ বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া তোল।

জীবনের উপর দিয়া যে কর্ম যে ভাবস্রোত অবিরাম বহিয়াছে, স্রোতের ফেনা যেমন আকারেই উদ্ভূত হউক, সে দিকে লক্ষ্য রাখিও না, মাথা পাতিয়া বসিয়া থাক, স্রোত বহিয়া যাউক। অন্তরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ কর, দেখে দেখি যেথায় কি মণিময় পুরী থরে থরে গড়িয়া উঠিতেছে।

মানুষ আমরা পাইয়াছিলাম সব—হারাইয়াছি সমস্তই—আবার পাইতে হইবে সমুদয়কে। আজ যে চারিদিক হইতে আমাদের মনকে আঘাতে আঘাতে ভাঙ্গিয়া দিতেছে—অসাধারণ ধৈর্য্যসহকারে দেখ, উহা মনের পূর্ণগঠনসম্ভাবনার জন্যই। মন যদি পূর্ণাঙ্গ না হয়, তাহা হইলে প্রেম-সামর্থ্য জন্মিবে কি প্রকারে? বিশ্বপতির অসীম প্রেম ধরিবে কে?

আমরা পাইয়াছি দেহ এবং প্রাণ—তাহাও অশুদ্ধ। এই দেহ প্রাণের ধর্ম লইয়া পশুজীবন যাপনই ছিল আমাদের স্বভাব কর্ম; এই দেহ প্রাণের আলোলনে গড়িয়া তুলিয়াছি যে মনকে, সে একান্তই দেহ ও প্রাণগত। এই মন দিয়া আমরা যাহা স্পর্শ করিতেছি তাহা প্রাণের সেবা, এবং শরীরের ক্ষণিক তৃপ্তির জন্যই ব্যবহৃত। নানা কারণে ঘটনার প্রতিকূলচরণে এই তৃপ্তিতে বিমূর্ণ উপস্থিত হইলেই, রাগদ্বেষে হৃদয় ভরিয়া উঠে—পাই আলা পাই অশান্তি। প্রেমের বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে হইলে চাই শুধু মন—সে মন এই হীন ভাস্কর্য সাধনার ভিতর দিয়াই গড়িয়া উঠিতেছে। সাধক! নিষ্কৃতি পাইতে হইলে গুরুশক্তিতে শক্তিমান হও, শুন তাঁর বিজয় হুকার—ম্রাতৈঃ।

এমন অহর্নিশি জ্বালায় জ্বালায়, মন যে-দিন শরীর ও প্রাণকে ছাড়াইয়া উঠিবে, সেই দিন তুমি হইবে ভাবুক, কবি। আজ যে ভোগ কেবলই দেহগত, প্রাণগত, তাহা হইবে ভাবগত, কল্পনার খেলা। সাধক তখনও শাস্তিহীন—কেননা পতনসম্ভাবনা সর্বক্ষণই রহিয়াছে। তবে অবস্থাটা মন্দের ভাল। মনের পূর্ণতা আসিবে তখনই—যখন চিন্তা ও কল্পনার রাজ্য ছাড়াইয়া মন উঠিয়া যাইবে সেই তুরীয়ে, আনন্দময় কোষে, আর বহিয়া আনিবে ভারে ভারে আনন্দ, চালিয়া দিবে শরীরে ও প্রাণে। সে কি তৃপ্তি, সে কি আনন্দ! আনন্দই হইবে জীবনের সবাখানি। তখন তোমার দৃষ্টি দিয়া যে স্বধামোত বহিবে, তোমার স্পর্শে যে জ্বালাহীন মধুর বিদ্যাৎস্পর্শ অল্পভূত হইবে, তাহা আর তোমার মন, সে ভগবানেরই চাওয়া—তোমার ক্ষেত্রে লীলায়ত হইয়া উঠিবে রাজ।

চাই সাধনা—চাই ভগবানের পঞ্চকোষে সমভাবে অবস্থিতি—ইহাই ত দেবজন্ম, ইহার জন্যই ত প্রেমের সাধনা, ইহার জন্যই ত ভালবাসা—মন স্থির করিবার তপস্বী। “আনন্দম্যেব খৰিমানি ভূতানি জায়ন্তে।”

সমালোচনা

ঋষিযুগের স্মৃতি ১ম খণ্ড—শ্রী প্রমোদচন্দ্র রায়, বি, এ প্রণীত। মূল্য ১ টাকা মাত্র। শিলচর, সরস্বতী লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। গ্রন্থখানি ৫টি সুদীর্ঘ পরিচ্ছেদে বিভক্ত। ধর্মের উপর যথাক্রমে আহার, অনুধ্যান, ইন্দ্রিয়জ্ঞান ও সঙ্গের প্রভাব আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার শেষ অধ্যায়ে মানবের ধর্ম সম্বন্ধে বিস্তৃত নিবন্ধ লিখিয়াছেন। আহার সম্বন্ধে তাঁহার সিদ্ধান্ত—“অজ্ঞানতা বা স্বার্থপরতার জর্জরিত মানবসমাজের ভ্রুংখ দৈন্ত্য দূর করিতে হইলে আহার বিধির সাত্ত্বিক ব্যবস্থার আবশ্যক।” স্বামিজী দেখিয়াছিলেন, হিন্দুর লৌকিক ধর্মের অনেকখানি রামায়ণে নিবন্ধ—তাই, পানাহারে পবিত্র আত্মায় কলঙ্ক স্পর্শ করিতে পারে না—এই সিদ্ধান্তটাই উদীয়মান জাতির সম্মুখে স্থাপন করেন। যাহা হউক গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য প্রশংসনীয়। চিন্তায়, ইন্দ্রিয়-ব্যবহারে, সঙ্গ প্রথমে সংযত সংহত হইয়া পরিশেষে নিঃসঙ্গ স্পন্দনরহিত অতীন্দ্রিয়-রাজ্যে প্রবেশই ব্রহ্মচর্যের লক্ষ্য—জীবের সচ্চিদানন্দময় আত্মস্বরূপ উপলব্ধিই ধর্মের সার কথা।—বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক যুক্তির সাহায্যে—লেখক এই সকল কথাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পুস্তকখানির ভাষা অসাধারণ না হইলেও গ্রামল ও প্রবন্ধগুলি চিন্তাপূর্ণ।

প্রবর্তক ৪র্থ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

১৫ই চৈত্র ১৩২৫

সিদ্ধ-সম্পাদ

আধুনিক ভারতে যে রাজনীতিক সাধনা চলিয়াছে তাহার মূলমন্ত্র—স্বায়ত্ত-শাসন, স্বরাজ বা জাতীয় স্বাভাৱ্য। কথাগুলি ইংরাজী শব্দের পরিভাষা। পাশ্চাত্যের দর্শন সাহিত্যের আলোচনা করিয়া আমরা বুঝিয়াছি, Independence বা Liberty না পাইলে মানুষের কোনই উন্নতির সম্ভাবনা নাই। ইংরাজী শিক্ষা আমাদের মধ্যে যতই বিস্তার লাভ করিতেছে ততই ইংরাজী ধরণে নানা ভাবে এই তত্ত্বেরই আলোচনা চলিতেছে। ভারতের অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিই নরম গরম প্রভৃতি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া রাজনীতিক সাধনাটাকেই বুঝ করিয়া তুলিয়াছেন।

আমরা পরাধীন জাতি, এবং কতকাল পরাধীন থাকিব তাহার নিশ্চয়তা নাই, তবে অধীনতার যে দুঃখ তাহা যে আজ ইংরাজকে দূর করিয়া দিতে পারিলেই, অথবা রাজ্যশাসনভার দেশীয়গণের হস্তে অর্পিত হইলেই, সাধারণ প্রজা সম্পূর্ণরূপে সুখী হইবে, এরূপ কোন কথা নাই। যে শ্রেণীর লোকের হস্তে শাসনভার অর্পিত হয়, সেই শ্রেণীর লোকই অধিক কর্তৃত্ব করিয়া থাকে। জাশ্মিনী এবং অষ্ট্রিয়াও স্বাধীন ছিল, কিন্তু বলশেভিজম সেদেশে প্রকট হইল কেন? ইংলও ও ফ্রান্সে গণতন্ত্রবাদের বিজয় বৈজয়ন্তী উড়িতেছে, সেথায়ও এই বলশেভিজমের আবির্ভাব সম্ভাবনা কেন? অবশ্যই স্বজাতিকর্তৃক দেশ শাসিত হইলে, সেই জাতীয় লোকের অনেকখানি যে সুবিধা আছে সে বিষয়ে সন্দেহ কি? কিন্তু মানুষের আশা ও আকাঙ্ক্ষার পরিভূক্তি অবস্থাবিশেষের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে না।

আমরা সেইজন্মই রাজনীতিক স্বাধীনতাকে প্রথম স্থান দিই না, এবং রাজনীতিক আন্দোলনের উপর অধিক আস্থা রাখি না। এইগুলি দিয়া ভবিষ্যতে নানা জটিল সমস্যারই সম্ভাবনা আছে, যুরোপের অবস্থা দেখিয়া এই সোজা কথাটা আমাদের বুঝা উচিত।

আমরা চাই মানুষের আয়ুস পরিবর্তন। একেবারে তাহাকে ভাঙ্গিয়া নুতন করিয়া গড়িতে। জগতের সর্বত্র এই কার্য আরম্ভ হইলেও, ভারতের এই মহাযজ্ঞ সম্পাদন করিবার অনেকখানি সুবিধা আছে, উপরন্তু বাংলাদেশ এই পথে জ্ঞানে অজ্ঞানে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে, আমাদের অধিক আশা বাংলার তরুণদের উপর।

আদর্শ খুব স্পষ্ট করিয়া বলা দরকার। মানুষের বুদ্ধি নানা ঘটনার বিচলিত, অধিকন্তু রাজকৃত্ত পক্ষগণের চিত্ত আজ দ্বারুণ সংশয়াবৃত্ত। এই অবস্থায় পরাধীন আমরা, আমাদের কন্ম যত সরল ও স্পষ্ট হইবে ততই আমরা কন্মক্ষেত্রে কম বাধা পাইব।

আমরা চাই মুক্তি। এই মুক্তি রাজনীতিক স্বাধীনতা নহে। কল্পনা জন্মাইতে বুদ্ধির মুক্তি, বস্তু সংশয় হইতে মনের মুক্তি, বাসনা কামনা হইতে প্রাণের মুক্তি, জরা ব্যাধি দৈত্য হইতে দেহের মুক্তি। এই মুক্তিমন্ত্রে মানবজাতিকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্ত আমাদের বিপুল কন্মক্ষেত্র সৃষ্টি করিতে হইবে।

অন্তঃকরণের শুদ্ধি হইলে, বাহিরে তাঁর দিব্য প্রকাশ অবশ্যস্বাভাবী। বহু বৎসর ধরিয়া বাংলার নানা ঘটনার অন্তরালে এ অন্তঃসাধনাই চলিতেছিল, এইবার ইহার বহিঃপ্রকাশ আরম্ভ হইবে। ইহাকেই আমরা কন্ম-বিজ্ঞান বলিয়া আনিতেছি।

যে যোগ মানবজাতির জন্ত বহু আধারের অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছিল, এক্ষণে সেই আধার দিয়াই নূতনভাবে, একেবারে নূতন কন্মের আবির্ভাব হইবে। যোগী-তপস্বীর দল আজ অতীত প্রভাব হইতে একেবারেই মুক্ত হইয়া, নবীনবেশে কন্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবে।

যাহাদের জীবন লইয়া ভগবানের খেলা তাঁহারা নিশ্চয়ই হইবেন সন্ন্যাসী, কিন্তু এই সন্ন্যাস কন্মের নহে, অহঙ্কারের। বাহিরের গৈরিক বা শঙ্কর বুদ্ধের অন্তঃশাসনের অধীন না হইলেও, একান্তই ইহারা ভগবানের অধীন, তাঁরই বজ্র। মানুষ অন্তরের সাধনায় বাহিরকে উপেক্ষা করিয়াছিল,

আজ তাই তাহার প্রতিষ্ঠান জীর্ণ ভগ্ন, আজ উপর হইতে ভর দিয়া দাঁড়াইতে হইবে এই প্রতিষ্ঠানের উপর, তাই ইহাকে জঁরা ব্যাধি ও দৈন্ত হইতে একেবারেই মুক্ত করিবার আদেশ আসিয়াছে।

নূতন সাধক নিঃসঙ্গ—ভগবানের ক্রীড়ায়ত্ত। সকল শিক্ষাই ইহাতে অধিগত আছে—কেবল তাহা প্রকাশ হইবে মাত্র। এই মুক্তিপথে বাত্মা করিতে হইলে তাহাদের চাই বিরাট সজ্জ। যাহারা অতীতের প্রভাবে আপনাদিগকে হারাইয়া ফেলিবেন, তাঁহারা আর এই পথে অগ্রসর হইতে পারিবেন না। জগতের সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, একদল সন্ন্যাসী তাঁহাদের সর্বসিদ্ধি দিয়া পৃথিবীর দারুণ দৈন্ত দূর করিবেন। মানুষ্যের জ্ঞানচক্ষু যতদিন না উন্মিলিত হয়, ততদিন ইহাদের বিরাম নাই—কিন্তু অবিশ্রান্ত এই কৰ্মে ক্লান্তি থাকিবে না, আনন্দই হইবে ইহার মূল প্রস্রবন।

এই দেবজাতির সৃষ্টি যদি ভগবানের ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে কৰ্মোপ-যোগী সকল উপকরণই ইহাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে। সেইজন্য প্রথম বাছিয়া লইতে হইবে, কাহার এই আশ্রিতেন্ত্র লাভ করিয়াছে, তারপর এই সকল সাধক সমষ্টির ভিতরই নূতন সৃষ্টির জন্ত যে ঐশ্বর্য্যরাশি বিক্ষিপ্ত আছে, সেইগুলিকে একত্র করিয়া এক কুণ্ডেরে ভাণ্ডার নির্মাণ করিতে হইবে। আজ তাহা খুবই ক্ষুদ্র, খুবই অল্প হইতে পারে, কিন্তু ইহার দিন দিন বৃদ্ধি অবশ্যভাবী, কালে নূতন জগতের বিপুল ঐশ্বর্য্য এইরূপ কেন্দ্রবিন্দুতেই সংস্থিত হইবে।

আজ মানুষ যতটুকু শুদ্ধ হইয়াছে, ততটুকু সিদ্ধিই তাহার প্রাপ্য। বুদ্ধি যদি কল্পনাক্রমক হইতে মুক্ত হয়, তাহা হইলে ক্ষুদ্র কৰ্ম্মে সে অনাস্থা প্রদর্শন করিবে না। উপরের জ্ঞান দিয়া সে দেখিতেছে, কৰ্ম্মের পথে চলিতে চলিতেই তাহার ঐশ্বর্য্য বিকাশ হইবে। আত্মবিশ্বাস যাহার নাই, তাহাকেই কিছু আঁচিয়া যোগাড় করিয়া লইতে হয়, ভগবানে যাহার বিশ্বাস, সে রিক্তহস্তেই জগতের মহৎকার্য্যে হস্তক্ষেপ করে—ভগ-বানই মানুষ্যের একমাত্র সহায়। আজ আমরা ইহার আভাস মাত্র দিলাম, আবশ্যক হইলে ক্রমশঃ ইহা বিস্তৃত করিয়া বলিবার চেষ্টা করিব।

জানা

বুকের মধ্যে দাঁউ দাঁউ করে' আঙণ জলছে। চোখের জল শুকিয়ে গেছে। কেবল আঙণের হলুকা। জীবনময় হাহাকার। কে আজ এই তপ্ত হিয়াখানি শীতল করবে?

কিসের জালা তা আমি জানি না। যখন হৃদয়ের তরল আবেগে, পতঙ্গবৃত্তিতে বিভোর ছিলাম, তখন একদিন বড় একটা আঘাত পেয়ে, কাকে উদ্দেশ করে' বলেছিলুম—ওগো এই তুচ্ছ স্ব্থের পঙ্কিল কূপ থেকে আমার উদ্ধার কর। কথাটা কার কানে গিয়ে পৌঁছেছিল, একদিন দেখলুম, আর আমি কুৎসিত নই, হৃগক্ষে আমার হৃদয় ভরে' নেই—একটা নবীন জীবন, গন্ধে দশদিক মাতোয়ারা, লুক্ক ভ্রমর আমার আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সেটা ছিল জীবনের বসন্ত। চারিদিকেই ফুলের রাশি, আর কচি কচি শ্যামসুকোমল পল্লব-দল। যে দিকেই ফিরি, আনন্দের কোয়ারা থেকে সুবাসিত সঞ্জীবনী-সুধা নিঃসৃত হচ্ছে। সে বেশ দিন, শুধু গান আর হাসি, শুধু কথা আর চাহনি। সে সুখ আজ কোথায় গেল?

এ যে নিদারুণ নিদাঘ। প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণে আমার আশার মঞ্জরী যে শুকিয়ে গেল। সে হাসিভরা ফুলদল, সে আনন্দ-উৎসবের নব নব উপকরণ, সে আমার সাধের বরণডালা কে কেড়ে নিলে, কার নিষ্ঠুর বিধি আমার সব থেকে বঞ্চিত করলে? এ নীরস বেদনাগাথা তোমরা শুনবে? কষ্ট শুষ্ক, হৃদয় ক্ষতবিক্ষত। সেই আমি সেই সব,—পরিবর্তন—সে কেবল আমার বঞ্চনা করা, সেই অন্ধকূপ, কেবল একটু বিস্তৃত, সেই প্রতিগন্ধ, একটু অল্পগ্র, হায় গো! শুধুই ছলনা, শুধুই স্বপ্ন, শুধুই মরীচিকা। চাহিলাম কি? পাইলাম—কি? কিছুই না, কিছুই না, শুধু একটা শূন্য, আর বুকভরা জালা—হায়রে এই কি সাধনা? এই কি

তোমার দান? এই কি তোমার করুণা?

কাহাকে বলি। কে আমার আছে? থাকিলেই বা সে কি করিতে পারে? তবু বলি, কতদিন জলিব প্রভু? এ জালা ত শুধু আমার জন্ত নয়—এ যে বিশ্বের জালা, এ যে মানবজাতির জালা, এ ক্ষুদ্র বৃকে এমন বিষের বাতি জালিয়া দিলে কেন? বৃক যে জালিয়া যায়—উপায় কি?

নিষ্ঠুর দেবতা—এ কি বিজ্ঞপ নয়? এতটুকু হৃদয় নিয়ে অসীমের খেলা খেলতে চাও? তিল তিল করে জীবনের পরিধি ভেঙ্গে বাড়িয়ে চলেছ, তোমার নিষ্ঠুর আঘাত যে বড় বাজে প্রভু! আর যে পারি না—একটু দাঁড়াও, একটু নিশ্বাস নিতে দাও, একটু বিশ্রাম করি। পথ যে একেবারেই নূতন। পুরাতনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখবার অবসরও দিচ্ছ না। চল, চল, আর ব্যর্থ অনুরোধ করবো না। জানি না ঠোঁট কি ক্ষণ। সু হউক কু হউক, আর ত তুমি ভাবতে দেবে না—চল চল তোমাকেই অনুসরণ করি।

ওরে অতীত! ওরে বর্তমান! তোদের মায়ায় আর বন্ধ থাকবো না, তোরা শুধু জড়িয়ে জড়িয়ে, আমার গতির ক্ষিপ্ততাকে থক্ক করতে চান, চল প্রভু চল, ঐ দিগন্তের কোন্ কোলে, ঐ অসীমের কোন্‌খানে আমার নিয়ে যেতে চাও, এ চলা ত পদক্ষেপেই শেষ নয়। এ যে আপনার সবথানির পরিধি বিস্তার।

নাও প্রভু আমার সঙ্গী বুদ্ধির বৃত্তকে অসীমের দিকে প্রসারিত করে, আমার মনের গভীর ভেঙ্গে দাও—এস তুমি বিরাট হয়ে, আমার প্রাণকে ছড়িয়ে দাও বিশ্বশক্তির সিংহাসন তলে, আর এই কলেবর যা তোমার চরণে নিবেদিত হয়েছে, তা আর কার সেবার যেন না লাগে, তোমার বিপুল দেহভার অর্পণ করে একবার দাঁড়াও, তোমার মধুর নৃত্যে আমার মানবজন্ম সফল হোক—আমার সকল জালা, সকল আকাঙ্ক্ষা, সকল সাধ পূর্ণ হোক।

সাধনার কথা

আমরা কয়েক বৎসর ধরিয়া যে সাধনার কথা বলিয়া আসিতেছি—তাহা বিস্তৃতাকারে জাতির জীবনে ছড়াইয়া পড়িতেছে। ভারতের রাজনীতিক সাধনার ভিতরে ভাগবত সাধনার অন্তর দেখিয়া, দেশ যে দিন দিন কত দ্রুতবেগে উন্নতির পথে ধাবমান, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। জাতিগত জীবনকে অধ্যাত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে, ভগবানের করুণা অজস্র ধারায় বর্ষিত হয়। বস্তুর জল যেমন গ্রাম নগর ভাসাইয়া আবার চলিয়া যায়, সেইরূপ উপযোগী ব্যক্তিজীবনে এই অঘাতিত দান ধারণ করিয়া রাখিতে না পারিলে, ইহাও অপসারিত হইতে পারে। তখন থাকে কেবল স্মৃতি, আর এই নবজাগরণের কাহিনী।

একদিন আজিকার মতই, এমনই প্রবলবেগে, ভগবানের আশীর্ব্বাদ স্বৰ্গ হইতে বাঙ্গালীর জীবনে নামিয়া আসিয়াছিল, সেদিনও মুম্বু জাতির জীবনে যে উৎসাহ, যে নবজীবনের লক্ষণ দেখা গিয়াছিল তাহার জলন্ত স্মৃতি সকলেরই হৃদয়ে অঙ্কিত আছে, কিন্তু সেই শক্তির শতাংশের একাংশও ঠিক ঠিক ভাবে আমরা অবধারণ করিতে পারি নাই। আমাদের আধার অবিভক্ত থাকায়, তাহার অনেকখানিই অপচিত হইয়াছিল, দুই চারিটা তপঃশুদ্ধ আশারে যে শক্তিটুকু সংস্থিত ছিল, আজ তাহার ব্যাপকশক্তি নূতন আকারে “রাউলাট বিল” উপলক্ষ করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষে নব চেতনার সঞ্চার করিয়াছে। ৬ই এপ্রেল কলিকাতায় যে শক্তিরঙ্গ প্রাবৃত হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া নিতান্ত আবিষ্টাসীর হৃদয়ও চমৎকৃত হইয়াছে, এই নূতন শক্তির চরণতলে বহু বৃদ্ধিমানের গর্জিত মন্তক নত হইয়াছে।

ভারতের সনাতন সাধনা অর্থলব্ধন করিয়াই জাতির মুক্তি সম্ভব হইবে, কিন্তু আজ অন্ধগতান্ধ বৈদেশিক শিক্ষার প্রভাবে, ভারতবর্ষ একান্তই জড়বাদী হইয়া পড়িয়াছিল, ইঙ্গিরের অপ্রত্যক্ষ যে আত্মিক-শক্তিই জগতের মূলকেন্দ্র তাহা শাস্ত্রনিবদ্ধই ছিল, মানুষের জীবনে ইহা মূর্ত হইয়া উঠিতেছিল না। আজ স্ক্রস্টা মহাত্মা গান্ধীর—তপঃপ্রভাবে ভারতের উচ্চশিক্ষিত

হিন্দু মুসলমান এই মহাশক্তির স্রবণাপন্ন হইতে, কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। দিল্লীর হুঘটনায় এই অপূর্ণ শক্তির সমধিক বিকাশ দেখিয়া আমরা উৎফুল্ল হইয়াছি। আজ এই জাতিগত অন্তঃসাধনার যুগে, আমরা দেশের সকল যুবকেই, কল্লনার বিচিত্র সৌধনিষ্ঠাণের সকল প্রচেষ্টা হইতে বিরত হইয়া শান্ত ও সমাহিতচিত্তে অন্তঃশক্তিকেই উদ্ভূত করিয়া তুলিবার সাধনা করিতে বলি, একবার মুদিত নয়নে স্বদেশে মনোনিবেশ করিয়া সকলকেই দেখিতে বলি—সেই যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে, যিনি আমাদের জীবন-তরলীর কর্ণধাররূপে, রিপদসঙ্কুল তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সংসার-সাগরবক্ষে আমাদের পরিচালিত করিতেছেন। জীবনের আজ নূতন পর্য্যায়—ভগবানের হস্তে জাতিগত আত্মসমর্পণের নূতন প্রভাতে আইস, বিমল বাতাসে অন্তরের মানি দূর করি।

আর তোমরা কেহই আত্মমুক্তির কথা ভাবিও না, জাতির বহির্বন্ধনকে ভয় করিও না, এই ভিতরের শক্তি জাগ্রত হইলে মানবজাতির মুক্তি সম্ভবপর হইবে। আমরা সহস্রবার তোমাদের স্রবণ করাইয়া দিই, যে বাহিরের যে রূপ তাহা ভিতরেরই প্রতিবিম্ব মাত্র। ভিতর শুদ্ধ হইলে, বাহিরে তাহার সমুজ্জল চিত্র উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

দেখ—মন্দির, মসজিদ, গির্জা, মঠ, আশ্রম প্রভৃতি হইতে এই নূতন সাধনার সন্ধান মিলিবে না—সে সকল “অচল আরতনের” ক্ষুদ্র গভীর মধ্যে, সঙ্কীর্ণ প্রাথম, প্রকৃতির দাম গ্রহণ করিবার মত বিশাল হৃদয় গড়িয়া উঠে না। অমৃতের পুত্র, সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মানুশাসনে জীবনের বন্ধন ফাংশ দূর করিও না, এই প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে গলা ছাড়িয়া মা মা রবে দ্রিষ্টাণ্ডল ধ্বনিত কর, দিব্যশক্তি সর্বসিদ্ধি প্রদান করিবেন।

তোমরা মনে রাখিও, যে মুহূর্ত্তে এই ধরাধামে আগমন করিয়াছ, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই, কোন এক অজানিত অব্যক্ত পুরুষের তুমি যন্ত্র। তোমার জীবনের যে আনন্দবিকাশ তাহা সেই অন্তঃপুরুষেরই লীলা। তোমার সাধন ভজন না করিলে এ তত্ত্ব বুঝা যায় না, তাহা সাধনার নানা আড়ম্বর সৃষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে ভগবানকে ছাড়িয়া মাছুষ, অনুষ্ঠানকেই বড় করিয়া তুলিয়াছে, কাজেই দিন দিন সহজ ও সচ্ছন্দ না হইয়া, সাধক জটিল জটিলার মস্তকে ব্রহ্মের করার মত, বিবিধ সাধনপ্রণালীতেই হস্ত পদ বদ্ধ করিয়া সংস্কারপরবশ ভগবানের দিকে সমধিক অগ্রসর হইতেছি। এরূপ বোধ করিতেছে। জগৎ-লীলার সহিত তাহার কোনই সংযোগ নাই, নূতন

সাধক কোন মতেই ধর্মের এই মায়ামরীচিকার দিগন্ত হইবে না।

চাই গুরু, চাই সাধনা, চাই একটা কিছু নিয়মপদ্ধতি, আসন মন্ত্র জপ প্রাণায়াম প্রভৃতি। এই সকল না হইলে যদি দিব্যজ্ঞান হইত, তাহা হইলে জগতের যাবতীয় লোকের এত দ্রুত কেন? আমরা স্বীকার করি—চাই সকলই—কিন্তু ভগবানের চাওয়াটাকে পাইবার জন্য এত কৌশলের প্রয়োজন কি? তিনি কি আমাদের বুকে আসন পাতিয়া বসিয়া নাই—আমরা কি কিছুই করিতেছি না? তাঁর নির্দেশানুসারে চলিতেছি এইরূপ নিত্য স্মরণ থাকিলে, আমাদের সকল কর্মই ত সাধনা। এই স্বাধীন স্বভাবের খেলা হইতে যে মানুষ গড়িয়া উঠে, তাহার তুলনার সঙ্গী সাধনপদ্ধতিতে গঠিত মানুষ অনেকটা অমুদার—তাহাদের জীবনে বিশ্বের অক্ষরস্ত লীলা ছুটিয়া উঠা একেবারেই অসম্ভব।

শ্রীচৈতন্যের ভিতর দিয়া ভগবান যাহা চাহিয়াছিলেন, তাহা নারক হইয়াছে, তাই বলিয়া শ্রীচৈতন্যের সাধনপন্থা অনুসরণ করিলে সকলেই যে তাহার মত ঐশ্বর্য লাভ করিবে এমন কোন কথা নাই, কিন্তু আত্ম-বিশ্বাসহীন মানব এই মহাপুরুষকে অবলম্বন করিয়া অমনি এক সম্প্রদায় গড়িয়া বসিল। এই কালে পিষিয়া দ্বিতীয় গোরাঙ্গের সৃষ্টি ত আজ পর্যন্ত গড়িয়া উঠে নাই, উপরন্তু বহু উৎকৃষ্ট জীবন এই সম্মুখে নিষ্পেষিত হইয়া এক অপ্রাকৃত সাধকসমষ্টির সৃষ্টি করিতেছে। এইরূপ বুদ্ধ-রামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষদিগকে অবলম্বন করিয়া দেশে বহু সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়াছে, এই সকল মঠ বা আশ্রমের বাধাধরা পদ্ধতিতে আবদ্ধ হইয়া দেশের বহু জীবন প্রকৃতির দান গ্রহণে দিন দিন অসমর্থ হইয়া পড়িতেছে। আমাদের মনে হয়, ধর্মের মন্দির আকাশেরা মতই উদার এবং অসীম হওয়াই কল্যাণজনক, হৃদয়ের সব দ্বার খুলিয়া সাধনা করিবার স্থান এরূপ হওয়া চাই যেখানে বিশ্বপ্রকৃতির সকল খেলা অবাধে চলিতে পারে।

ভগবানের চাওয়াটা জীবনের মধ্যে আগিয়া উঠিলেই মানবজন্ম সার্থক হয়। মানুষের চাওয়া সাধকের জীবনে ফুটাইয়া তুলিবার আগ্রহ কিসের? মানুষকে হইতে দাও মুক্ত, স্বাধীন জীবনের সুব দ্বার মুক্ত রাখিয়া তাকে গ্রহণ করিতে দাও জগতের যত দান—সে ভাল মন্দ প্রকৃতির যত গুণ। এই সকলের ভিতর দিয়া মানুষের মন গড়িয়া উঠিবে এক নুতন ভাবে, মরজগতের কোন বাধাই তাকে কোন দ্রব্য হইতে মুখ

ফিরাইতে দিবে না। আর যত্ন-পুত্তলিকা এই বিশ্বভুবন, তাঁর বোলি আনা ইচ্ছাই সংস্কৃত হউক, মানুষের বুদ্ধি দিয়া তাহাকে ক্ষুদ্র করিয়া তুলিও না।

গুরু চাই—সে গুরু যিনি এক মুহূর্ত তোমার স্থির থাকিতে দেন না তিনিই। কন্মের উৎকৃষ্টতা অপকৃষ্টতার বিচার তোমার নহে, তুমি করিয়া যাও—ইহাই সাধনা। থাইতে যাহা ইচ্ছা তাহা যাও, যে সময় ইচ্ছা সেই সময় তাঁর ধ্যান কর, তা সে প্রাতঃকাল হউক আর মধ্যাহ্ন হউক, আর নিশা দ্বিপ্রহরই হউক। সকল সময়ই তাঁর, একথা স্মরণ রাখিও। মানুষের জীবন শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধের অন্তর্গত না হইলে তাহার অসংযমী হইবে, এবং তদ্বারা জগতে অশান্তি আসিবে, এইরূপ হীনবুদ্ধিই তোমায় ভগবানে বিশ্বাসহীন করিয়াছে। একবার দেখ, দেখিয়া হাড়ে হাড়ে বুঝ, যে তুমি কিছুই করিতে পার না, তোমা ছাড়া দ্বিতীয় কে একজন তোমার জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন।

“আত্মসমর্পণের” সঙ্কল্পের পর সাধকের সাধনা হইবে তাহার নিত্য কন্ম, আর জপ হইবে খাসে প্রখাসে মনে রাখা যে এ জীবন ভগবানের, এবং তিনিই ইহা পরিচালিত করিতেছেন। তখন দেখিবে তুমি একা নও, কোন নির্দিষ্ট বহিষ্কৃত ধারণা না করিয়াও অসংখ্য সন্তান এই একই পথের যাত্রী, তখন পরম্পরের মধ্যে যে একা যে আত্মীয়তা অনুভব করিবে তাহা এ জগতের নহে, সে দেবপরিবার কলকাল হইতে তোমার সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ আছে।

আজ যে আত্মশক্তির উদ্বোধনমন্ত্র দেশের জীবনে ব্যাক্য তুলিয়াছে, কোটা লোক সে মধুর সঙ্গীতে আত্মহারী হইলেও, এই সত্য দীক্ষার দীক্ষিত হইবে তাহারাই, যাহারা বিনা আড়ম্বরে, কোন সন্তোদায়বিশেষের খাতায় নাম রেজেষ্টারী না করিয়া, সংসারের জটিল কন্মক্ষেত্রেই মাথা পাতিয়া সর্বশক্তিশালিনী মহাকালীর অজস্র করুণাধারা গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। আমরা প্রকৃতির দীক্ষার দীক্ষিত হইয়া এই মহাতত্ত্বের পথ অবলম্বন করিতে সকল বাঙালীকেই উপদেশ দিই। আমাদের মন্দির নাই, মঠ নাই, আশ্রম নাই, আমাদের স্ব স্ব বাসস্থানই মন্দির দেবালয়, কেন না সেখানে দেবতা বাস করেন। আমাদের সাধনার কোন ধারা নাই, কোন পদ্ধতি নাই, সাংখ্য পাতঞ্জল নাই, যাজুবল্য নাই—আছে যাহা করি

যাহা ভাবি, যাহা স্বপ্ন দেখি। এই অসংখ্যমুখী কন্দারার সামুদ্রিক আশিয়া
পড়িবে তাঁহারই জীবনে, যিনি আদ্যাপ্রকৃতির চরণতলে বসিয়া বলিবেন—
মা আমি কিছুই জানি না, আজ হইতে যাহা করাইবি, তাহাই করিব—
জানিব তোর সাধনা, তোর ভজনা, তোর পূজা। হে বাঙালী, এস এই উদার
বিশ্বাট সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া জগতের সকল জাতিকে হৃদয় ভরিয়া আলি-
ঙ্গন করি—বলি এক জাতি, এক ভগবান, এক দেশ, এক মন, প্রাণ।

শ্রম-সমস্যা

সকালে উঠিয়াই চক্রবর্তী মহাশয় শুনিলেন—বাবা, ঘরের কপাট খোলা
থাকায় কুকুরে হাঁড়ি খাইয়া গিয়াছে; জোখে, অগ্নিশর্মা হইয়া বলিলেন—
দোর বন্ধ করা হয় নাই কেন? তাহার উত্তরে শুনিলেন, কপাটের
গোবরাটি খারাপ হইয়া গিয়াছে, কপাট বন্ধ হয় না।

একজন হত্বর ডাকিয়া আনিলেন। সে দেখিয়া শুনিয়া পাঁচসিকা
চাহিয়া বলিল, চক্রবর্তী মহাশয় রক্তনেত্রে গর্জিয়া বলিলেন—বেটা পাজী
ছুটো, যত বড় মুখ তত বড় কথা, এই কাফে পাঁচসিকা, বলিল কি?
বিনীতস্বরে হত্বর বলিলেন, যতই বলুন, একটি টাকা লইব, যদি
বলেন ত হাত দিই।

সে রেচারী ত প্রাণ বাঁচাইয়া পলায়ন করিল—চক্রবর্তী মহাশয়ের
কোপে ক্ষুব্ধ হইল না—হাসিতে হাসিতে বলিয়া গেল, মহাশয় আজ কাল
বাজারি হাট কি? একটি টাকার কম যে দিন চলে না—আগনার কাষ
এক রোজের কম কি হইবে?

হত্বর ড চলিয়া গেল। চক্রবর্তী মহাশয়ের চক্ষুস্থির। কেন যে
তিনি হত্বরের কন্মটা না শিখিয়া অফিসের কেরাণী হইয়াছেন, তাহাই
ভাবিতে লাগিলেন, তাহার রেষন যে তিরিশটা টাকা। কিন্তু নিত্য
কুকুরে হাঁড়ি খাইয়া যাইবে, ইহাও ত হয় না—কাফেই মনের দুঃখ মনে
চাপিয়া, তাহাকে আবার ডাকিয়া বলিলেন—বাবা গরীব ব্রাহ্মণ, নে কর,
বার আনা দিব। চক্রবর্তী মহাশয়ের দরজা মেরামত হইল।

সহর দেশে রাজমিস্ত্রি, ছুতোর-মিস্ত্রি, জন মজুরের বড় বাড়িবাড়ি হইয়াছে, এই কথাটা আমরা সর্বত্রই শুনিতে পাই; উপরের চিত্র তাহারই পরিচায়ক।

সুদূর পল্লীগামে অল্প মজুরি দিয়া মাছ মাগা যায়, এবং এই স্বল্প পারিশ্রমিক দিয়া সেখানে কৃষি ও গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় অত্যন্ত কৰ্ম নিষ্পন্ন করা হয়। এই সকল শ্রমজীবীদের অবস্থা যে সচ্ছল, তাহা বলা যায় না; তাহাদের যে খুবই দুঃস্থতা, তা যখন শুনি তারতবর্ষের ত্রিশকোটি কৃষিজীবীর মধ্যে দশকোটি প্রতিদিন অন্ধাশনে জীবনযাপন করে, তখন একথা বুঝিতে বাকী থাকে না।

এক্ষেত্রে উপায় কি? অধিক উপার্জন না করিলে, শ্রমজীবীদের অধিক পারিশ্রমিক দেওয়া যায় না, অথচ তাহারা যে অল্প উপার্জন করে, তাহা দিয়া জীবনধারণে পৌঁছিয়াও সকল দ্রব্য অগ্নিমল্যে ক্রয় করিয়া সচ্ছন্দে বাঁচিয়া থাকা একেবারেই অসম্ভব।

আমাদের দেশে উপার্জনের পথও সাধারণের পক্ষে একেবারেই রুদ্ধ, কেবল এক শ্রেণীর লোকই দেখিতেছি ধনবান হইতেছেন, তাহাতে জাতির জীবনে শক্তি সঞ্চারিত হইতেছে না। দেশে শ্রমজীবীর সংখ্যা অধিক, তাহারা ছিন্ন কস্থা পরিধান করিয়া বৃক্ষতলে-বসবাস করে, আর মহামারী হুতিক্কে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ করিয়া মরণের কোলে আসন্ন হয়। এরূপ অবস্থার সহরের সকল প্রকর উন্নতি চেষ্টা যে একেবারেই বুথা হইরে, তাহা আর না বলিলেও চলে।

বাংলার শ্রমজীবীরা সাঁওতাল, মায়া পার্বতীয় অসত্য জাতি নহে এবং পাশ্চাত্য প্রদেশের মত জমীপুরুষ উভয়েই কৰ্ম করে না। পুরুষই একমাত্র উপায়ী, জমীজাতি সাংসারিক কাম কস্মেই নিযুক্ত। অরশ্য ক্রমশঃ অজ্ঞাবের ভাঙনায় ইহার ব্যতিক্রম যে না হইতেছে এরূপ নহে, কিন্তু তত্রাচ বেরূপ আমাদের হাত পথ একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে সংসারের আট বৎসরের শিশু পুত্রটিকেও কলে নলি কুড়াইতে দিয়াও, দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইবার সংস্থান করিয়া উঠিতে পারা যায় না। সমাজের সকলবিধ উন্নতিসাধনের প্রয়াস বাহারা করেন, তাহা দিগকে দেশের এই শ্রমসমস্যার কথাটিও ভাবিতে অনুরোধ করি। এদেশে বিলাতের মত শ্রম-সমিতি নাই এবং এই সকল শ্রমজীবীদের দুঃখটুকু

উৎপত্তি কোথায় ইহা যুগ্মবার শিক্ষাও তাহাদের নাই, কাজেই অনন্ত আকাশের দিকে চাহিয়া ইহারা নীরবে অশ্রুবর্ষণ করে, আর অস্থিগঞ্জ-সার হইয়া মাটির দেহ মাটিতে মিশাইয়া দেয়।

কতি হইতেছে কার ? দেশকে ভালবাসি বলিয়া বাহিরের দিক হইতে একটা “শিকে ছেঁড়া” স্বযোগ লাভ করিবার প্রত্যাশায় চীৎকার করিলে কি হইবে ? শিকে ত ছিঁড়িবে না, যদিও ছিঁড়ে, আত্মসিদ্ধি না থাকিলে ভগবানের দেওয়া এই অনীম দুঃখ কেমন করিয়া দূর হইবে তাহা আমরা ভাবিতেও পারি না।

আমরা শু দেখিতেছি, মানুষের মন যদি আজও বদলাইয়া যায়, তবেই কথঞ্চিৎ পরিমাণে এই দুঃখের অবসান হইতে পারে। কেননা যাহারা শ্রমজীবী খাটাইয়া দুই পয়সা উপার্জন করেন, তাহারা তাহাদের উপায়ের অংশটা যত অধিক পরিমাণে আদায় করিতে পারেন, তাহার যত বেশী দৃষ্টি রাখেন, যাহাদের হাড় ভাঙ্গিয়া এই উপায় হইতেছে—তাহারা দুই বেলা প্রচুর আহার যাহাতে পায়, তাহার দিকে আদৌ মনোযোগ দেন না।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটা কথা বলি। দেশে এখনও যে সকল শ্রমশিল্প চলিতেছে, সেই সকল ব্যবসারে মহাজন ও কারিকরের সঙ্গে নিত্য বিবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। শিল্পদ্রব্যের উপাদানগুলির মূল্য যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে, সেই জন্য প্রস্তুত দ্রব্যও দরে বিকাইতেছে, কিন্তু কারিকরের বানি সেই অনুপাতে বাড়ে নাই। নিত্য কলহ করিয়া, শ্রমজীবী মহাজনের খলি হইতে দুই একটা পয়সা টানিয়া লয় মাত্র। এ অবস্থার বিগুণ পরিশ্রম করিয়াও, আমাদের দেশে কারিকর যাহারা তাহাদের গৃহের অবস্থা দেখিলে চক্ষে জল সঞ্চার করা যায় না। অপর পক্ষে যাহারা দেশীয় মহাজন ছাড়িয়া, কলে বা অন্য কোন যুরোপীয় কারখানায় প্রবেশ করিয়াছে তাহারা একটু স্বখে সম্পদে আছে, দেশীয় ব্যবসায়ীদের পক্ষে ইহা বড় লজ্জার কথা। এই যে বাংলার আজ চতুর্দিকে অন্ধাভাবে হাহাকার শুনা যাইতেছে, অভাবী লোক আর কেহ নয়, সেই বাংলার শ্রমজীবী কুবক—হয়ত আর কিছুদিন পরে ইংরাজেরা যখন এ দেশে ক্রিশিল্পে মনোযোগ দিবে তখন দেখিবে, শ্রমজীবীর বর্তমান অবস্থা হইতে একটু অধিক স্বখে কালযাপন করিতেছে। ইংরাজ ব্যব-

সাদীরাও যে স্বার্থপর নহেন, তাহারা যে দান খসরাত করিতে আসিয়াছেন, এ কথা আমরা বলি না, তবে তাঁহাদের ভবিষ্যৎদৃষ্টি আমাদের অপেক্ষা কিছু বেশী, আমরা সব দিক বাঁচাইয়া কাম করিতে পারি না, আজিকার দিন চলিয়া যাইলে কল্যাকার ভাবনা তত রাখি না। বিলাতে শ্রমজীবীদের সঙ্গে মহাজনদিগের সংঘর্ষ চলিতেছে, ফ্রান্সেও একদিন এইরূপ গণ্ডগোল হইয়াছিল। শ্রমজীবীগণের সহিত মহাজনদিগের আপোষ নী হওয়ার, ফ্রান্সের ব্যবসায়ীগণ অপর দেশে গিয়া বাণিজ্য আরম্ভ করিয়া দেন। জার্মানী রুশিয়া প্রভৃতি দেশে ফ্রান্সের মূলধনে বড় বড় কারবার চলিতেছে, ইহার ফলে অবশ্যই ফ্রান্সের শিল্পবাণিজ্য অপরায় দেশ অপেক্ষা হীনপ্রভ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ব্যবসায়ীরা ইহা দেখেন না, তাহারা চান ধনবৃদ্ধি। আজ ইংলণ্ডের যে গোলযোগ ইহা শীঘ্র না মিটিলে, ইংলণ্ডের ধনী ব্যবসায়ীগণ নীরব হইয়া বসিয়া থাকিবেন না, ইহার মধ্যেই শুনা যাইতেছে, ইংরাজ ব্যবসায়ীগণ ভারতে বস্ত্রবয়নের কারখানা স্থাপন করিবেন। প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ কিছুদিন পূর্বে ভারতের কৃষিবিষয়ক একটা ব্যবস্থার কথাও উল্লেখ করিয়াছিলেন। আমাদের মনে হয় অচিরেই এই কৃষিব্যবসার ইংরাজ ব্যবসায়ীদিগের হাতে গিয়া পড়িবে। তখন হয়ত, আজ শ্রমজীবীদের ভিতর আমাদের অদূরদর্শিতার স্বেপ্ন ভীষণ অনাভাব দেখা যাইতেছে, তাহা আর না ঘটিতেও পারে, তবে ধীরে ধীরে ভারতবর্ষ কেবল পরানপুষ্ট শ্রমজীবীদের দেশ হইয়া দাঁড়াইবে। মানুষের মন যদি এখনও উন্নত না হয়, বিধাতার এই কঠোর বিধানই ভারতের ভাগ্য ঘটবে বলিয়া মনে হয়।

আমরা দেখিতেছি সাধারণভাবে ভারতের এই দৈত্যভোদন হইতেছে না, তাহার বিপুল শরীর এখনও তমসাক্ত, এই মহা অবিদ্যার হস্ত হইতে দেশকে উদ্ধার করিতে না পারিলে, কোন দিকেই সুফল ফলিবার আশা নাই। বিপদ চতুর্দিকেই, এমন একটা দিক নাই, যে দিক দিয়া সাক্ষ্যের কিরণ আসিয়া আমাদের উদ্ধার করিতে পারে। উপায় কি একেবারেই নাই?

সেদিন কলিকাতায় যে সত্যগ্রহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছিল, মহাত্মা গান্ধী তাহার একটা বিকৃত বিবরণ প্রাপ্ত হইয়া, বাংলার নেতৃস্থানীয় ত্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়কে ইহার সঠিক বৃত্তান্তের জন্য এক টেলিগ্রাম

করেন। তাঁহার কথাগুলির মধ্যে এই কয়ট কথা আমরা পাঠ করি.....

We must entertain the absolute conviction that the smallest body of true Satyagrahis will achieve victory. আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত যে অল্পসংখ্যক অকপট সত্যগ্রহীই বিজয়লাভ করিবে।

এত বড় বিরাট কৰ্মে তিনি লোকের ভিড় পছন্দ করেন না। আমরা রহস্য বলিয়া আশিয়াছি—আমরা Quantity চাই না—চাই Quality. দেশের আত্মা যে ভীষণ অবস্থা, সত্য সত্যই মানুষের চেষ্টায় ইহা দূর হইবে না। গান্ধী প্রেরণ চাহেন না, ভাগবতশক্তিই তাঁহার অবলম্বন। শুধু অবিচার অত্যাচার হইতে মানুষকে বিমুখ করিবার জন্যই যে এই তপস্যা তাহা নহে, এই অগ্নিও তপোবলেই আমরা জীবনীয় কর্মসকল নিষ্পন্ন করিব।

সেইজন্ত দেশের সকল রকম দুরবস্থার চিত্র প্রবর্তকের পাঠকদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া আমরা বলিতে চাই—হুঃখ অনেক—ইহা নিবৃত্ত করিতে হইলে এমন কয়েকজন সাধক চাই, যাহারা ষোলআনা এক করিয়া দৈবশক্তির তপস্যা করিবেন।

এই তপস্যার দ্বারা আমরা যুগপৎ সকল কর্মেই হস্তক্ষেপ করিতে চাই। আমরা মানুষ হইয়াছি, মানুষের যে সকল শক্তি থাকার প্রয়োজন, তাহা ত আছেই অধিকন্তু ভগবানের যন্ত্রবৎ, অসাধারণ শক্তিসম্বিত হইয়া আইস আমরা সর্বক্ষেত্রে ব্যাপ্য হইয়া পড়ি।

মনে রাখিও আজ যাহারা কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন, তাঁহারা নিবেদিত, তাঁহাদের জীবন, তাঁহাদের পরিজন সকলই ভগবানের এবং তাঁরই কার্যে নিয়োজিত হইতে হইবে। হুতরাং এই সকল কর্ম সাধনার অন্তর্কূল, অস্ত্রগুলি প্রতিকূল এইরূপ ধারণা ত্যাগ করিতে হইবে। আমরা আজ তিন বৎসর ধরিয়া সাধকের নিকট কেবল বলিয়া আসিতেছি—যে ভাগবতসেবার কোন নির্দিষ্ট প্রণালী নাই, এরূপ যাহারা মনে করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত।

এস আমরা শ্রমশিল্পে মনোযোগ দিই, এস আমরা হস্তক্ষেপ মাঠে গিয়া দাঁড়াই, এস আমরা তাঁত বসাইয়া কাপড় বুনিতে বসি, মনে রাখিও এই সকল আমাদের উপজীবিকার জন্য নহে—কর্মের সিদ্ধি আনিবার জন্য ইহা আমাদের তপস্যা। আমাদের কর্মক্ষেত্রে যাহারা পরিশ্রম করিবেন,

তাহাদের অভাব থাকিবে না, কেননা আমাদের শিল্পজাত দ্রব্য প্রতি-
যোগিতার বিকাইবে না, তাহা ক্রয় করিব আমরা, সুতরাং শিল্পীর অভা-
বান্নয়ী পারিশ্রমিক দিয়া একছোড়া কাপড়ের দর যদি হয় বাজার দর
অপেক্ষা আট আনা অধিক, তাহা ত আমরা দেখিব না, আমরা যে
বুঝিয়াছি, কাপড় খরিদে আট আনা সুবিধা করিতে গিয়া, ভায়েদের অমূল্য
জীবনের ক্ষয় হইয়া বাইতেছে।

তোমরা বলিবে, ইহাই ত স্বদেশী, কিন্তু মানুষ যে ইহা বুঝে না, ক্ষতি
করিয়া কতদিন তাহারা অধিক মূল্যে দ্রব্য খরিদ করিবে, বাজারে যখন
সুলভ দ্রব্যাদি বিক্রীত হয়? আমরা বলি তখন মানুষ তেমন প্রস্তুত হয়
নাই এবং এখনও আমরা, বহুলোক এই জ্ঞানলাভ করে নাই বলিয়া
ইতশ ইহ নাই। আমরা শতাধিক লোক আছি, হাজার আছি, দশ
হাজার আছি, আমাদের ব্যবহার্য দ্রব্য প্রস্তুত কর, আমাদের লোক সে
শিল্পশালায় নিযুক্ত হউক; আমাদের অর্থ আমাদের মধ্যেই পরিক্রমণ করুক,
তাহাতে ক্ষতি কাহারও হইবে না, এস আমরা যতই অল্প লোক হই,
আমরা একটা জাতির মত, আমাদের বাজার আমরা গড়িয়া বসি। গান্ধী
বলেন “there is never danger from outside, danger is
always from within.” বাহিরে বিপদ, নাই, ভিতরেই সর্বদা বিপ-
দের স্বত্রপাত হয়। আমাদের এই মহৎ কক্ষে কাহারও বাধা দিবার
অধিকার নাই, আমরা কাহারও উপর বিবেচ্য করিতেছি না, কাহারও
ক্ষতি করিতেছি না। আমরা ভারতলক্ষ্মীর সাধনা করিব, এ তপঃক্ষেত্রের
পবিত্রতা নষ্ট করিবার মত স্পর্শা যাহার, তাহার বিনাশচিত্তা ভগবানের,
সম্মুখে বিশাল কক্ষক্ষেত্র—এস, অগ্রসর হই।

দেশব্রত

রাউলার্ট-বিল উপলক্ষ্য করিয়া দেশে যে তুমুল ঝড় বহিবে, তাহা এই ঘটনার পূর্বে হইতেই বুঝা যাইতেছিল, এবং মহাত্মা গান্ধী ব্যতীত অপর কোন রাজনীতিবিদ যে এই বোরতর আন্দোলন সৃষ্টি করিতে পারিবেন, এমন ধারণা আমরা করি নাই, কেননা, দ্বাদশ বর্ষ পূর্বে দেশের যে অবস্থা ছিল, এখন উদপেক্ষা তাহার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। স্বদেশী যুগে স্বরেজ্জনাত্মপ্রমুখ দেশনেতৃগণের পক্ষে যাহা সম্ভব হইয়াছিল, এখন আর তাহা হইবে না, এখন শুধু কথার কুহকে কেহই মাতিবে না—চাই প্রাণ, চাই তপোবল, দেশনেতৃগণ একথা বুঝিয়াছেন—বুঝিলে কি হইবে, তাঁহারা চালাকি দ্বারা কিস্তিমাৎ করিবার কায়দা এখনও ছাড়িতে পারেন নাই, তাঁহাদের যুক্তিতর্ক পাশ্চাত্যের নিকট তুষ্টিপ্রদ ও সারিবান হইতে পারে, নতুন ভারতের নিকট তাহা একান্তই হাস্যস্পদ।

সমগ্র দেশের মতবাদ উপেক্ষা করিয়া গবর্ণমেন্ট যে এই রাউলার্ট বিল পাশ করিলেন, ইহাতে মনে হয়, ভারত গবর্ণমেন্টই যে কেবল এই আইনপ্রণয়নে আগ্রহান্বিত এরূপ নহে, বিলাতের মন্ত্রী সমাজেরও ইহাতে যথেষ্ট সহানুভূতি আছে।

লাট দরবারে এই আইন প্রবর্তিত করিবার কালে ভিনশান্ত মহোদয় বলেন “The bill to cope with anarchical and revolutionary crime as amended be passed” বিপ্লববাদ ও এনার্কিজম প্রশমনকল্পেই এই বিল প্রযুক্ত্য হইবে। বাহিরের লোকে বলেন, শুধু ইহাই নহে, যুরোপে যে বলসিভিজিম দেখা দিয়াছে, পূর্বে দেশে এমন কি ভারতেও তাহার প্রভাব বিস্তার হইবার সম্ভাবনা আছে, সুতরাং গবর্ণমেন্টের এই কঠোর পদা হস্তগত করিয়া রাখার প্রয়োজন হইয়াছে।

যুরোপীয় আদর্শে আত্মহারা ভারত ধীরে ধীরে ভাগবত আশীর্বাদে শুদ্ধ অন্তঃকরণবিশিষ্ট হইয়া নতুন আলো দেখিতে পাইয়াছে, পাশ্চাত্যের বিপ্লববাদ, এনার্কিজম, বলসিভিজিম, এমন কি রাজনীতিচর্চাতেও বীত-প্রভ হইয়া উঠিতেছে, এরূপ অবস্থায় কেবল যদি উক্ত উদ্দেশ্যসাধন-

মানসেই রাউলার প্রবর্তিত হয়, তাহা হইলে দেশবাসীর বিচলিত হইবার কারণ নাই।

কিন্তু এত বড় শাসনযন্ত্র পরিচালন করিতে, সময়-সময় এমন সাংখ্যিক ভুল হয়, যাহা মারাত্মক। এতদ্ব্যতীত যে সকল রাজকর্মচারী এই গুরুতর শাসনযন্ত্র হাতে পাইবেন, তাঁহারা সকলেই যে বিচক্ষণ দীর ছায়-পরায়ণ, এমন নাও হইতে পারেন, কায়েৎ দেশশাসনের জন্ত রাজকর্তৃপক্ষগণ যখন ক্ষুরধার শাসন-অস্ত্রে শান দিতে বসেন তখন পরাধীন দুর্বল ভারতবাসীর আতঙ্কে অন্তরাঙ্গা কাঁপিতে থাকে। এই সেদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মাননীয় শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত মহাশয় কাপড় লুটের অভিযোগে যুত আসন্নপ্রসবী একজন রমণীর যে শোচনীয় কাহিনীর কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা কি মর্মভেদী, কি শোচনীয়!

এই কঠোর আইনে দেশের ক্ষীণ প্রাণ আরও নিপীড়িত হইতে পারে, এবং উদীয়মান নূতন শক্তিটুকু অচিরে বিনষ্ট হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কায় মহাপ্রাণ গান্ধী আকুল হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার মত বিশ্বহিতৈষী উদার মহাত্মাও যখন বিচলিত হইয়াছেন, তখন জনসাধারণ যে একটা উৎকট বিভীষিকায় অধীর হইয়া উঠিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? সমর-আইন দেশের শান্তিরক্ষার জন্ত প্রযুক্ত হইয়াছিল, কিন্তু দেশবাসী প্রত্যক্ষ দেখিতেছে, এই আইনের ফলে দোষীর সঙ্গে সঙ্গে রহু নিরীহ শ্রবক কষ্ট পাইতেছে, এবং তাহাদের আত্মীয় পরিজন নিশিদিন হাহাকার করিতেছে।

উচ্চতম রাজকর্মচারীগণের উদ্দেশ্য মহৎ হইতে পারে, এবং তাঁহারা দোষীর শাস্তিবিধানের তৎপর হইতে পারেন, কিন্তু ভিত্তরের সম্মান জানিবার জন্ত, তাঁহারা এমন সকল লোক নিযুক্ত করেন, যাহারা যা তা সংবাদ দিয়া মাসহারা আদায় করে। অজ্ঞ উপায় না থাকায়, ইহাদের প্রদত্ত সংবাদই তাঁহাদের খাতায় তুলিয়া লওয়া হয়। এই যে সেদিন বোলপুরের এঞ্জেল সাহেবের একখানা পত্র সংবাদপত্রে প্রকাশ হইয়াছিল, তাহাতে দেবিলাম শান্তিনিকেতনের ছাত্রমধ্যেই সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্ত গুপ্তচর নিযুক্ত রাখা হইয়াছে। এরূপ অপরিণতবুদ্ধি বাগলচরের কথায় উপর আস্থা করা কতটা যুক্তিসঙ্গত তাহা সহজেই অস্বমেয়।

আমরা জানি, আমাদের কোন বন্ধুর বাড়ী, একদিন-না, কোন

প্রতিবাসী কন্ডার বিবাহ-উপলক্ষে লোকজন খাওয়াইবার বন্দোবস্ত হয়। সন্ধ্যারাত্রি লোকজনের যাওয়া আসা দেখিয়া গুপ্তচর সংবাদ দেয় যে এনার্কিষ্টদের একটা বড় সভা বসিয়াছে। তারপর এই সংবাদের সত্যতা অনুসন্ধান ঠিক ভাবে হইল কিনা জানি না, এক্ষণে প্রকাশ, তাঁহার বিরুদ্ধে যোরতর অভিযোগ, যে তাঁহার বাড়ীতে এনার্কিষ্টদের আড্ডা বসিয়া থাকে। “কিমার্চ্যামতঃপরম্”।

মহা হউক এই নূতন আইন কি ভাবে ব্যবহৃত হয়, ইহা না দেখিলে কোন কথাই বলা যায় না; তবে অতীতের ব্যথা মানুষকে এমনই অতিষ্ঠ করিয়াছে, যে এই আইনের দ্বারা অমঙ্গলেরই স্বত্রপাত হইবে এইরূপ ধারণাই দেশবাসীর হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

এক্ষণে গভর্নমেন্টের এই অনাবশ্যক আইনপ্রচলনের ফলে দেশে যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, আমরা সেই কথাটাই বলিব। দেশবাসীর শাস্তি-বিধান রাজশক্তির অবশ্য কর্তব্য—শাস্তির নামে অশাস্তির সৃষ্টি হইলে মূলে ভুল থাকিয়া যায়, সেই জন্য কোন আইনপ্রণয়নকালে জগতের সকল সভ্য জাতিই প্রজাশক্তির অভিনত লইয়া থাকেন, ভারতেও তাহার এক রকম অভিনয়ের অন্তর্গত হয় না। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এত বড় বিশাল দেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির বিভিন্ন প্রতিনিধিবর্গ এই রাউলাট-বিল পাশের বিরুদ্ধে অভিন্ন মত জ্ঞাপন করা সত্ত্বেও, রাজকর্তৃপক্ষগণ ইহা হইতে বিরত হইলেন না। অন্ততঃ যে উদ্দেশ্যসাধনের জন্য এই আইন প্রচলন করিতে হইতেছে, দেশবাসীরা যখন একবাক্যে তাহার প্রয়োজনের অভাব দেখাইল—তখন গভর্নমেন্ট অনারাসেই সেরূপ ঘটনা ঘটিলে, দেশ কতটা তাহার প্রতিবিধান করিবে এমন একটা কৈফিয়ৎ চাহিতে পারিতেন; দেশের তথাকথিত নেতৃস্থানীয় ষাঁহারা তাঁহারা ইহাতে পশ্চাদ্দপদ হইতেন, একথা সত্য, কেননা, তাঁহারা রাজনীতিষাট কুটতর্কেই বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন—যে সাধনায় মানুষের প্রাণ অধিকার করিতে হয়, তাহা তাঁহাদের অবদিত—কিন্তু দেশে একদল এমন লোক দেখা দিয়াছেন ষাঁহারা অধ্যাত্মশক্তিসম্পন্ন, তাঁহাদেরই ইচ্ছাশক্তিতে ভারতে বিপ্লববাদ ও এনার্কিজম তিরোহিত, দেশ এই মহাপ্রাণ সাধকদিগের প্রভাবে অন্তরে অন্তরে বুঝিয়াছে যে ভারতীয় চরিত্রে পাশ্চাত্যের উৎকট হুলাহল প্রবেশ করিলে তাহাদের ধ্বংস অবশ্যস্তারী। এই অবস্থায় অন্ততঃ ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে

এক একজন নেতা আছেন, যাহারা রাজশক্তিকে অভয় দিতে পারিতেন, কিন্তু গভর্ণমেন্ট এ প্রচেষ্টা করিলেন না। কায়েই দিল্লীতে নজনিখোযে—এই রাউলাট-বার্তা ঘোষিত হওয়া মাত্রেই, গান্ধীর জলদগর্জন সারা ভারত প্রতি-ধ্বনিত করিল। সমগ্র দেশবাসী উৎকর্ণ হইয়া শুনিল, ইহা যে তাহাদের সাধন-মন্ত্র, ইহাই যে সনাতন পন্থা, ইহাই ত তাহারা চাহিতেছিল। তাহারা ত রিফর্ম চাহে নাই, তাহারা ভারতীয় চরিত্রলাভের নির্দেশ-অন্বেষণ করিতেছিল, নন্দিরে নন্দিরে যে সাধনা আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, তাহা মুহূর্ত্তে সকল বন্ধন টুটাইয়া দেশব্যাপী হইয়া পড়িল। সে কি উল্লাস! জাতিগত-সাধনায় এমন উৎকৃষ্ট প্রাণী আর যে নাই বলিলেই চলে!

ভারতের সকল জাতি, সকল সম্প্রদায়, সকল নরনারী এক হইয়া গান্ধীর সত্যগ্রহের জয় দিল। গান্ধী প্রচার করিলেন হিংসা নহে, প্রেম দিগ্বাই জয় করিব পাগকে, অত্যাচারকে, অধর্মকে—ভারতের প্রাণের কথা এমন বীণার স্বরকারে বহুদিন বাজিয়া উঠে নাই, হিমালয়ের গিরি-গহ্বর হইতে যোগীর সমাধি ভাঙ্গিয়া গেল, দেবতার রুদ্ধ ছায়ার উন্মুক্ত হইয়া স্বর্গীয় সৌরভে ভারত পরিপূরিত হইল, হতাশ হইয়া মরণের কোলে যে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছিল, তাহারও ললাট কাটিয়া বিদ্যুৎ ঠিক্রাইয়া পড়িল—বলিল—জয় সত্যের জয়, জয় প্রেমের জয়, জয় গান্ধীর জয়!!

ইন্দ্রপ্রস্থ হিন্দুমুসলমানের মিলিত রক্তে রঞ্জিত হইল—দোষ কাহার দিব? ইহা ভবিতব্য, সর্ব প্রথমেই শোকাশ্র-প্লাবিত হিন্দু মুসলমান, বলির রক্তে সত্যগ্রহমন্ত্রে অভিষিক্ত হইল। দিল্লীর জুম্মা-মসজিদে ভগবানের চরণতলে সহস্র সহস্র হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে মাথা নত করিল, সমস্ত জাতি যেন আজ অন্তঃসাধনায় ব্রতী হইল।

তারপর, পরম বৈষ্ণব গান্ধীর মন্ত্র তন্ত্রসিদ্ধি-বাংলায় আসিয়া পৌছিল, যেন কৃষ্ণকালী এক হইয়া গেল, কলিকাতার সে অভিনব উৎসব স্বর্গস্থ দেবব্রতেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল—সে কি বিপুল উন্মাদ জনসম্বল, সে তুণের মত নীচ, তরুর মত সহিষ্ণু, অসংখ্য হিন্দু মুসলমান নাড়োয়ারী গুজরাটী মহাবিক্রম অসীম প্রেমে বিভোর, পরস্পর তপ্ত হৃদয়গুলি পর-স্পরের সঙ্গে মিশাইয়া এক মহাশক্তির দ্যোতনা অমুভব করিল।

তারপর উন্মাদ গান্ধী পৃথিবীর কঠোর বাধাসকল উপেক্ষা করিয়া

বোম্বাইয়ের রাজপথে রাজবিধি অমান্য করিয়া নিষিদ্ধ পুস্তিকা বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন। শুনিয়াছিলাম—নেতা যে সে অগ্রে যথা দেয়া বাংলায় এ নীতি দেখি নাই, দেখিবার আশাও করি নাই, আজ সত্য গ্রহীর প্রভাবে আমরা বিশ্বয়ে আনন্দে আত্মহারা হইয়াছি।

৯ই এপ্রেল বুধবার রাত্রে, গান্ধী যখন দিল্লী যাইতেছিলেন পথে তিনি দিল্লী ও পঞ্জাব গভর্ণমেন্টের আদেশ পান, যে দিল্লী ও পঞ্জাব প্রবেশ তাঁহার নিষেধ হইয়াছে। গান্ধী হাঁসিতে হাঁসিতে বলিলেন—আমি চাহিয়াছিলাম কাংগার না হয় রাউলট-বিলের উচ্ছেদ—একটা হইয়াছে, আমি কিরিব না, আমার স্বত কর।

মহাত্মা গান্ধী ধৃত হইয়াছেন, এই সংবাদ দেশ হইতে দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িল। দিল্লীতে লাহোরে অমৃতসরে সহস্র সহস্র লোক হায় হায় করিতে করিতে উন্মাদের মত দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল। অবস্থা সাংঘাতিক হইয়া উঠিল। পুলিশের সহিত জনসংঘের সংঘর্ষে বহু ব্যক্তি হতাহত হইল। অমৃতসরের লোকেরা মরিয়া হইয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে আগুণ ধরাইয়া দিল, একজন ইংরাজকে হত্যা করিল। শুনা যায় আরও চারিজন খেতাজ হত হইয়াছে।

তারপর বাংলার কথা। এই ছঃসংবাদ প্রচার হওয়া মাত্র, কলিকাতার দোকানপাট বন্ধ হইয়া গেল, মুসলমানের মসজিদে হিন্দু উপহিত হইয়া পরস্পরের সহিত পরস্পর আলিঙ্গনপাশে বন্ধ হইল, অবস্থা গুরুতর হইয়া উঠিতে লাগিল। অমৃতসরের লোকহর্ষণ সংবাদে কলিকাতার পুলিশ বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিল, ফলে মেসিন গান বসাইয়া জনসংঘের উত্তেজনার ভ্রাস করিতে গিয়া গুলি চলিল, এখানেও বহু লোক হতাহত হইল।

মহাত্মা গান্ধী ধৃত হইবামাত্র দেশকে যে বাণী শুনাইয়াছেন—তাহা আমরা অতীত প্রকাশ করিলাম, কিন্তু তাঁহাকে কারাবদ্ধ করা হয় নাই, বোম্বাইয়ে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। গান্ধী চিরদিনই রাজভক্ত, প্রেমই তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। সত্যগ্রহমন্ত্র গ্রহণ করিয়া পতঙ্গের মত মৃত্যুও বাহুনিয় কিন্তু হিংসাপরবশ আঘাতের প্রতিবাদ তিনি সহ্য করিতে পারেন না। অসংখ্য ভারতবাসীর প্রাণ এই সত্যগ্রহ আন্দোলনে বিনষ্ট হইয়াছে, গান্ধী তাহাতে মর্শাস্তিক কষ্ট অনুভব করিলেও, ইহার জ্ঞাতি বিশেষ কাতর নহেন, কিন্তু অমৃতসরে পাঁচজন রৈতাজের রক্তপাত হইয়াছে। এই সংবাদ

পাইবামাত্র তিনি এমনই অধীর হইয়া পড়িলেন, যে এই সত্যগ্রহ সত্য-
গ্রহীদের বিরুদ্ধেই আরোপ করিবার প্রস্তাব করিলেন, এই শোচনীয় কণ্ডে
সত্যগ্রহীরাই যে দায়ী এইজন্ত উপবাস করিয়াই এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত-
বিধান করিবেন এমন কথাও বলিলেন। কিন্তু রাউলাট-বিল তীক্ষ্ণশরের
মত তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ করিয়াছে, পশুবলের উপর রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা এই
কথায় তিনি মৰ্ম্মাহত হইয়াছেন, সেইজন্ত কথাপ্রসঙ্গে তিনি রাউলাট-বিল
না উঠিলে সত্যগ্রহ ছাড়িবেন না, তবে একটু বাধাধরা ভাবে ইহা পরি-
চালিত করিবেন এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন।

বঙ্গালী আজ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। যে অমর ভাব বঙ্গালীর জীবনে
কল্পধারার মত বহমান, একদিকে তাহার প্রভাব অত্ৰদিকে মহাত্মা গান্ধীর
অসাধারণ আত্মভাগ্য তাহাদিগকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। বঙ্গালী !
আজ তোমরা করিবে কি ?

ভারতের চতুর্দিকে এই আন্দোলন উপলক্ষ্য করিয়া যে শোচনীয় দৃষ্টান্ত
ঘটিল, যে-সকল নিরস্ত্র ভারতবাসী কারণে অকারণে প্রাণ দিল, অমৃতসরে
নিরীহ পাঁচজন খেতাসের রক্তপাত হইল—ইহাতে আমরা বড়ই কাতর
হইয়াছি।

কণ্ঠ আমার বাষ্পরুদ্ধ, চক্ষু অন্ধকার, হৃদয়স্পন্দন স্থির হইয়া যাইবার উপক্রম
করিয়াছে; লেখনী চলে না—আজ কি লিখিরা বাঙালীর ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে
সাস্তুনা দিব, কেমন করিয়া ভাষার সাহায্যে আমাদের কর্তব্য বুঝাইব ?

হে বাঙালী ! মনে রাখিও, আজ তোমরা প্রতিবিধিৎসা-সাধনের জন্ত
আত্মসমর্পণব্রত গ্রহণ কর নাই, স্ব স্ব হৃদয়ে আত্মশক্তি জাগাইবার তপস্যা
মুর্ত্তিমান হইয়া তোমাদের সম্মুখে আবিভূত—সর্বাত্মকরণে তাঁহাকেই বরণ
করিয়া লও। হীনচিত্ত রাজনীতিবিৎ স্বার্থসংসাধনে নানা বিরুদ্ধ বাণী
প্রচার করিতেছে, আজ আসল ও মেকী ধরা পড়িয়া গিয়াছে, কর্ণে
অঞ্জলি দাও, আশার সম্মোহন বাক্যধারা আমরা শুনিব না,—অন্তরের
মণিকোটায় রসিয়া সমাহিতচিত্তে শুন শুধু—তপঃ তপঃ তপঃ। হৃদয়ে
অন্তরবৃত্তি সর্বপ্রথমেই জাগিয়া উঠিবার প্রয়াস করিবে, জানিও
ইহা আমাদের অগ্নিপরীক্ষা। হে বাংলার যুবকগণ ! সর্বপ্রকার
অনিষ্টচিন্তা, প্রতিবিধিৎসা-সাধনের হীন চেষ্টায় তোমরা কেহই আপনাকে
উন্মূখ করিও না। সে দিন গিয়াছে, অশুদ্ধ রাজশক্তির প্রভাবে ভারতের

এই মহান্নত ব্যর্থ করিও না। আজ এই কঠোর তপস্যায় আমাদের সিদ্ধিলাভ করিতে দাও, ক্ষুদ্র অহঙ্কারের অঙ্গুলিহেতুনে জাতিগত এই মহাসাধনার প্রতিফল হইয়া দাঁড়াইলে, জানিবে আর তোমাদের পরিজ্ঞান নাই—বল উচ্চকণ্ঠে—বল সমস্তে—

“হরে মুরারে মধুকৈটভহারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌর্যো।”

মহাত্মা গান্ধীর বিদায়-বাণী

আমার দেশবাসীর প্রতি,

আজ আমি বিশেষ আনন্দের সহিত তোমাদের জানাইতেছি এবং আশা করি শুনিলে তোমরাও বিশেষ আনন্দিত হইবে যে শাঞ্জাব গভর্নমেন্ট তাঁহার অধিকারের মধ্যে আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া এক আদেশপত্র আমাকে পাঠাইয়াছেন, দিল্লী-গভর্নমেন্টের নিকট হইতেও একখানি এরূপ পত্র পাইয়াছি, তাহাতে আমার দিল্লীপ্রবেশ বন্ধ হইয়াছে এবং এ-সকলের উপর প্রায় সপ্ত সপ্ত আর একখানা আসিয়াছে India Government-এর নিকট হইতে—তাহাতে আমাকে বোম্বাইয়ে আবদ্ধ রাখিবার আদেশ হইয়াছে। বলা বাহুল্য, যে কর্মচারী উক্ত আদেশ আমার উপর জারী করিতে আসেন তাঁকে আমি স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছি, যে সত্যগ্রহ-শপথ অনুযায়ী আমি তাঁহার আদেশ মান্য করিতে অক্ষম, সুতরাং আমি তাহাই করিয়াছি এবং ইহার জন্য আমার দেহটাকে যদি তাঁহার জেলে আবদ্ধ করিয়া রাখেন তাহা হইলেও আমি তন্মুহুর্তে আপনাকে মুক্ত বোধ করিব। আইনপুস্তক যতদিন Rowlatt আইনে কলঙ্কিত থাকিবে ততদিন বাহিরে মুক্ত থাকা বিড়ম্বনা ও বড়ই বেদনাদায়ক। ধৃত হইয়া আমি বরং মুক্ত হইয়াছি। এক্ষণে সত্যগ্রহে যাহা যাহা বর্ণিত আছে তদনুযায়ী কার্য্য করিবার সমস্ত ভার তোমাদের উপর পড়িয়া রহিল। ইহাকে অনুসরণ কর—দেখিবে—ইহা কামধেনুর মত ফলপ্রসূ হইবে। আশা করি আমার অবরোধে কেহ ক্ষুণ্ণ

বা ক্রুদ্ধ হইবে না। আমি যাহা চাহিতেছিলাম—হয় Rowlatt বিলের প্রত্যাহার না হয় অবরোধ—আমি আজ তাহা পাইয়াছি। ইংরাজ বা ভারতবাসী যেই হউক কাহারও বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ভাব দেখাইয়া সত্য হইতে একচুল ভ্রষ্ট হইলে সত্যগ্রহীরা যে মহান্ ব্রত উদ্বাপনে রত তাহা নিশ্চয়ই নষ্ট হইয়া যাইবে। আশা করি হিন্দু মুসলমানের একতা আজ লোকের মনে যেমন একটা দৃঢ় ভিত্তি গাঁথিয়া তুলিয়াছে, অচিরেই তাহা বাস্তব হইয়া ফুটিয়া উঠিবে এবং আমার বিশ্বাস আমি ‘প্রেসকে’ যে সমস্ত কথা বলিয়াছি সঠিকভাবে সেগুলি অনুসরণ করিলে তাহা নিশ্চয়ই সফল হইবে। এ বিষয়ে মুসলমানদের অপেক্ষা (তাহারা সাধারণতঃ ‘অল্পসংখ্যক বলিয়া’) হিন্দুদেরই দায়িত্ব অধিক, এবং আশা করি তাহারা ইহা পার্জন করিয়া দেশের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবে। স্বদেশী ব্রত সম্বন্ধেও আমি কতকগুলি কথা বলিয়াছি; সেগুলির প্রতি যেন বিশেষ দৃষ্টি থাকে, সত্যগ্রহ সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা যখন সুপরিপক্ব হইবে তখন দেখিবে হিন্দু মুসলমানের একতা তারই একটি ধাপ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

সর্বশেষে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সহিয়া সহিয়াই আমাদের মুক্তির পথে দাঁড়াইতে হইবে—ইংলণ্ড হইতে আমাদের উপর Reforms বর্ধিত হইবে, সে সংস্কার যতই অকুণ্ঠিতভাবে প্রদত্ত হউক—আর আমরা মুক্ত হইয়া যাইব এমন বিশ্বাস আমার নাই। ইংরাজেরা মহান্ জাতি কিন্তু মহতের সংস্পর্শে আসিয়া দুর্বলেরা চিরদিন কোণঠাসা হইয়া থাকে। তাহারা নিজেরা সাহসী এবং অনেক কষ্ট সহিয়াছে, সাহসী ও কষ্টসহিষ্ণুদিগকেই তাহারা গছন্দ করে, সুতরাং তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব পাতাইতে হইলে আমাদের মধ্যেও অপরিমিত সাহস ও অদ্ভুত ধৈর্য্যশক্তি জাগাইয়া তুলিতে হইবে।

তাহাদের সভ্যতা ও আমাদের সভ্যতা দুয়ের মূলে একটি ভীষণ প্রভেদ আছে। তাহারা পার্শ্বিক শক্তিকেই শেষ নীমাংসারস্থল বুঝিয়া তাহার উপর সমগ্র শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়াছে। আমাদের সভ্যতা আমি যতদূর বুঝিয়াছি তাহাতে মনে হয় জ্যোতিষ্মত ও নৈতিক শক্তিই হইতেছে সকল কষ্টের নিয়ন্তা এবং সত্যগ্রহ বলিতে তাহাই বুঝার। আমরা যে আজ যন্ত্রণাভারে প্রিয়মান হইয়া পড়িতেছি, কাতরভাবে তাহার হাত হইতে এড়াইতে পারিলেই বাঁচি, তাহার কারণ আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদিগের সভ্যতার পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলাম। আশা করি, হিন্দু, মুসলমান, শিখ, পার্শি, খৃষ্টান,

ইহুদি এবং যেকোন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন অথবা যেকোন ভারত-
বর্ষকে নিজের দেশ করিয়া লইয়াছেন সকলেই সমবেতভাবে এই জাতীয়
ব্রতটির অনুষ্ঠান করিবেন, এমন কি রমণীগণও ইহাতে পুরুষদিগের সমান
হৃদয় লইয়া অগ্রসর হইবেন।

গান

আমি রহিব চাহিয়া তোমার দিকে
গুনিব তোমার মধুর গান;
তোমার মেহ-অনুরাগ-পুলক স্পর্শে
জাগিয়া উঠিবে আমার প্রাণ।
তোমার সুরভি-মধুর মলয় শাসে
যেন গো আমার জীবন বিকাশে—
তোমারি অন্তে জীবন ভরাতে
পাই যেন সদা করিতে গান।
আমি নিশিদিন রব তোমার ধ্যানেনে,
(তুমি) আসিও দীর্ঘে নীরব চরণে
ছেঁড়া তার জুড়ে' বীণার ঝঙ্কারে
সহসা তুলিও হৃদয়তান।
বেদনাবিধুর হিয়াটি জুড়াতে,
বাথা যদি পাও এস না স্বরিতে
আমি ধুইয়া মুছিয়া শুক করি হিয়া
পারি যদি লব' হৃদয়-দান ॥

সমাজ-কথা

জগন্নাথের রথ

আদর্শ সমাজ মনুষ্য-সমষ্টির অন্তরাখ্যা ভগবানের বাহন, জগন্নাথের যাত্রার রথ। ঐক্য স্বাধীনতা জ্ঞান শক্তি সেই রথের চারি চক্র।

মনুষ্যবুদ্ধির গঠিত কিম্বা প্রকৃতির অন্তর্গত প্রাণস্পন্দনের খেলায় সৃষ্ট যে সমাজ, তাহা অত্র প্রকার। এটি সমষ্টির নিয়ন্তা ভগবানের রথ নহে, মুক্ত অন্তর্যামীকে আচ্ছাদিত করিয়া যে বহুরূপী দেবতা ভগবৎ-প্রেরণাকে বিকৃত করে, ইহা সমষ্টিগত সেই অহঙ্কারের বাহন। এটি চলিতেছে নানা ভোগপূর্ণ লক্ষ্যহীন কৰ্মপথে, বুদ্ধির অসিদ্ধ অপূর্ণ সঙ্কল্পের টানে, নিম্ন-প্রকৃতির পুরাতন বা নূতন অবশ প্রেরণায়। যতদিন অহঙ্কারই কর্তা, ততদিন প্রকৃত লক্ষ্যের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব,—লক্ষ্য জানা গেলেও সেদিকে সোজা রথ চালান অসাধ্য। অহঙ্কার-যে ভাগবত পূর্ণতার প্রধান বাধা, এই তথ্য যেমন ব্যষ্টির, তেমনই সমষ্টির পক্ষে সত্য।

সাধারণ মনুষ্যসমাজের তিনটি মূখ্যভেদ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমটি নিপুণ কারিগরের সৃষ্টি, স্থান চাকচিক্যময় উজ্জল অমল স্খকর, তাহাকে রহিয়া লইয়াছে বলবান্ সৃশিক্ষিত অশ্ব, সে অগ্রসর হইতেছে স্বপথে সংঘর্ষে স্বরারহিত অমহুর গতিতে। সাত্ত্বিক অহঙ্কার ইহার মালিক আরোহী। যে উপরিস্থ উত্তুঙ্গ প্রদেশে ভগবানের মন্দির, রথ তাহারই চারিদিকে ঘুরিতেছে, কিন্তু কিছু দূরে দূরে রহিয়া, সেই উচ্চভূমির খুব নিকটে সে পৌছিতে পারে না। যদি উঠিতে হয় তবে রথ হইতে নামিয়া একা পদব্রজে উঠাই নিয়ম। বৈদিকযুগের পরে প্রাচীন আর্যদের সমাজকে এই ধরণের রথ বলা যায়।

দ্বিতীয়টি বিলাসী কৰ্মঠের মোটরগাড়ী। ধূলার ঝড়ের মধ্যে ভীমবেগে

বজ্রনির্ঘোষে রাজপথ চূর্ণ করিয়া অশান্ত অশান্ত গতিতে সে ধাইয়াছে, ভেরীর রবে শ্রবণ বধির, যাহাকে সম্মুখে পায় দলিয়া পিষিয়া চলিয়া যায়। যাত্রীর প্রাণের সঙ্কট, দুর্ঘটনা অবিরল, রথ ভাঙ্গিয়া যায়, আবার কষ্টে-কষ্টে মেরামতের পর সদর্প চলন। নির্দিষ্ট লক্ষ্য নাই, তবে যে নূতন দৃশ্য অনতিদূরে চোখের সম্মুখে পড়ে, “এই লক্ষ্য এই লক্ষ্য” চীৎকার করিয়া রথের মালিক রাজসিক অহঙ্কার সেই দিকে ছুটে। এই রথে চলায় যথেষ্ট ভোগ সুখ আছে, বিপদও অনিবার্য, ভগবানের নিকট পৌছা অসম্ভব। আধুনিক পাশ্চাত্যসমাজ এই ধরণেরই মোটরগাড়ী।

তৃতীয়টী মলিন পুরাণ কচ্ছপগতি আধভাঙ্গা গরুর-গাড়ী টানে, কৃশ অন-শনক্ৰিষ্ট আধমরা বলদ, চলিতেছে সঙ্কীর্ণ গ্রাম্য পথে; একজন ময়লাকাপড়-পরা ভুঁড়িসর্ব্বশ স্তম্ভ অন্ধ বৃদ্ধ ভিতরে বসিয়া মহাস্বখে কাদামাথা হুঁকা টানিতে টানিতে গাড়ীর কর্কশ ঘ্যান্ ঘ্যান্ শব্দ শুনিতে শুনিতে অতী-তের কত বিকৃত আধ আধ স্মৃতিতে মগ্ন। এই মালিকের নাম তামসিক অহঙ্কার। গাড়োয়ানের নাম পুঁথি-পড়া জ্ঞান, সে পত্রিকা দেখিতে দেখিতে গমনের সময় ও দিক নির্দেশ করে, মুখে এই বুলি “যাহা আছে বা ছিল, তাহাই ভাল, যাহা হইবার চেষ্টা তাহাই খারাপ”, এই রথে ভগবানের নিকট না-হোক শূন্য ব্রহ্মে পৌছিবাব বেশ আশু সম্ভাবনা আছে।

তামসিক অহঙ্কারের গরুর গাড়ী যতক্ষণ গ্রামের কাঁচা পথে চলে, ততক্ষণ রক্ষা। বেদিন জগতের রাজপথে সে উঠিয়া আসিবে যেখানে ভূরি ভূরি বেগদুন্দু মোটরের ছুটছুটি, তখন তাহার কি পরিণাম হইবে, সে কথা ভাবিতেই প্রাণ শিহরিয়া উঠে, বিপদ এই যে রথ বদলানের সময় চেনা বা স্বীকার করা তামসিক অহঙ্কারের জ্ঞানশক্তিতে কুলায় না। চিনিবার প্রবৃত্তিও নাই, তাহা হইলে তাহার ব্যবসা ও মালিকত্ব মাটা। সমস্যা যখন উপস্থিত, যাত্রীদের মধ্যে কেহ কেহ বলে “না, থাক, ইহাই ভাল, কেননা ইহা আমাদেরই”—তাহারা গোঁড়া অথবা ভাবুক দেশভক্ত। কেহ কেহ বলে “এদিক ওদিক মেরামত করিয়া লও না” এই সহজ উপায়ে নাকি গরুর গাড়ী—অমনি অনিন্দ্য অমূল্য মোটরে পরিণত হইবে—ইহাদের নাম সংস্কারক। কেহ কেহ বলে “পুরাতন কালের স্বন্দর রথটা কিরিয়া আনুক” তাহারা সেই আদ্য সাধনের উপায়ও খুঁজিতে মাঝে মাঝে প্রয়াসী। আশার অম্লরূপ ফল যে হইবে, তাহার বিশেষ কোন লক্ষণ

কোথাও কিন্তু নাই।

তিনটির মধ্যেই যদি পছন্দ করা অনিবার্য হয়, আরও উচ্চতর চেষ্টা যদি আমরা-পরিহার করি, তবে সাম্প্রিক অহকারের নূতন রথ নির্মাণ করা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু জগন্নাথের রথ যতদিন সৃষ্ট না হয়, আদর্শ সমাজও ততদিন গঠিত হইবে না। সেইটাই আদর্শ, সেইটাই চরম, গভীরতম উচ্চতম সত্যের বিকাশ ও প্রতিকৃতি। মনুষ্যজাতি গুপ্ত বিশ্বপুরুষের প্রেরণায় তাহাকেই গড়িতে সচেষ্ট, কিন্তু প্রকৃতির অজ্ঞান-বশে গড়িয়া বসে অগুরুপ প্রতিমা—হয় বিকৃত অসিদ্ধ কুংসিত, নয় চলনসই অন্ধস্থলর বা সৌন্দর্য্য সত্ত্বও অসম্পূর্ণ, শিবের বদলে হয় বামন নয় রাক্ষস নয় মধ্যম লোকের অর্ধ দেবতা।

জগন্নাথের রথের প্রকৃত আকৃতি বা নমুনা কেহ জানে না, কোন জীবন-শিল্পী আঁকিতে পারগ নন। সেই ছবি বিশ্বপুরুষের হৃদয়ে প্রস্তুত, নানা আবরণে আবৃত। দ্রষ্টা কর্তা অনেক ভগবদবিভূতির অনেক চেষ্টায় আশ্বে আশ্বে বাহির করিয়া স্থূল জগতে প্রতিষ্ঠা করা অন্তর্ধ্যামীর অভিসন্ধি।

জগন্নাথের এই রথের আসল নাম সমাজ নয়, সংঘ। বহুমুখী শিখিল জনসংঘ বা জনতা নয়; আত্মজ্ঞানের, ভাগবতজ্ঞানের ঐক্যমুখী শক্তির বলে সানন্দে গঠিত বন্ধনরহিত অচ্ছেদ্য সংহতি, ভাগবত সংঘ।

অনেক সমবেত মনুষ্যের একত্র কর্ম করিবার উপায় যে সংহতি, তাহাই সমাজ নামে খ্যাত। শব্দের উৎপত্তি বুঝিয়া অর্থও বোঝা যায়। সম্ প্রত্যয়ের অর্থ একত্র, অজ্ ধাতুর অর্থ গমন ধাবন যুদ্ধ। সহস্র সহস্র মানব কর্মার্থে ও কামার্থে সমবেত, একক্ষেত্রে নানা লক্ষের দিকে ধাবিত, কে আগে যায় কে বড় হয়, তাহা লইয়া ধ্বস্তাধ্বস্তি—Competition—যেমন অল্প সমাজের সঙ্গে তেমন পরস্পরের সঙ্গেও যুদ্ধ ও ঝগড়া-ঝাটি—এই কোলাহলের মধ্যেই, শৃঙ্খলার জন্মে, সাহায্যের জন্মে, মনো-বৃত্তির চরিতার্থতার জন্মে নানা সঙ্ঘ স্থাপন, নানা আদর্শের প্রতিষ্ঠা, ফলে কষ্টসিদ্ধ অসম্পূর্ণ অস্থায়ী কিছু, ইহাই সমাজের প্রাকৃত সংসারের চেহারা।

ভেদকে ভিত্তি করিয়া প্রাকৃত সমাজ। সেই ভেদের উপর আংশিক অনিশ্চিত ও অস্থায়ী ঐক্য নির্মিত। আদর্শ সমাজের গড়ন ঠিক ইহার

বিপরীত, ঐক্য ভিত্তি, আনন্দবৈচিত্র্যের জন্ত ভেদের নয়, পার্থক্যের খেলা। সমাজে পাই শারীরিক মানসকল্পিত ও কর্মগত ঐক্যের আভাস, আত্মগত ঐক্য সংঘের প্রাণ।

আংশিকভাবে সঙ্কীর্ণক্ষেত্রে সংঘস্থাপনের নিফল চেষ্টা কতবার হইয়াছে, হয় তাহা বুদ্ধিগত চিন্তার প্রেরণায়—যেমন পাশ্চাত্যদেশে, নয় নির্বাণোন্মুখ কর্মবিরতির স্বচ্ছন্দ অনুশীলনার্থে—যেমন বৌদ্ধদের, নয় বা ভাগবতভাবের আবেগে, যেমন প্রথম খ্রীষ্টীয় সংঘ। কিন্তু অল্পের মধ্যেই সমাজের যত দোষ অসম্পূর্ণতা প্রবৃত্তি ঢুকিয়া সংঘকে সমাজে পরিণত করে। চঞ্চল বুদ্ধির চিন্তা টেকে না, পুরাতন বা নূতন প্রাণ প্রবৃত্তির অদম্য স্রোতে ভাসিয়া যায়। ভাবের আবেগে এই চেষ্টার সাফল্য অসম্ভব, তাব নিজের খরতায় পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে। নির্বাণকে একাকী খোঁজা ভাল, নির্বাণপ্রিয়তার সংঘস্থিতি একটা বিপরীত কাণ্ড। সংঘ স্বভাবতঃ কর্মের, সম্বন্ধের লীলাভূমি।

যেদিন জ্ঞান কর্ম ও ভাবের সামঞ্জস্য ও একীকরণে আত্মগত ঐক্য দেখা দিবে, সমষ্টিগত বিরাটপুরুষের ইচ্ছাশক্তির প্রেরণায়, সেদিন জগন্নাথের রথ জগতের রাস্তায় বাহির হইয়া দশদিক আলোকিত করিবে। সত্যযুগ নামিবে পৃথিবীর বক্ষে, মর্ত্য মানুষ্যের পৃথিবী হইবে দেবতার খেলার শিবির, ভগবানের মন্দির নগরী temple city of God—আনন্দপুরী।

পাঠ

১

যজ্ঞভূমির উপর অশেষ শ্রদ্ধাপরায়ণ হও। ইহাই বিদ্যালয়। আপনাকে বিশ্বাস কর, পাঠনীয় সমস্তই হৃদয়গ্রাহ্যে। গ্রন্থ উন্মোচন কর। আজ যাহা অস্পষ্ট, ধৈর্য্যসহকারে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া থাক—পর্যাবিদ্যা স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইবে।

২

তুমি সঙ্কল্প নয়, অবধারিত জান—তুমি ভগবানের। জীবনবেদ তোমার নিশ্চয় পাঠ করিতে হইবে। অনন্তমনে জীবনের পাতা উন্টাইয়া যাও, এক মুহূর্ত্ত ইহাতে আস্থাহীন হইও না।

*

দেবজাতির জন্ত চাই দেবসাম্রাজ্য। ভগবানের বিপুল রাজ্যের আভাস দেখা দিয়াছে—উহা আজ অতি ক্ষুদ্র বিন্দুপরিমিত স্থানে। ইহাই বৃহৎ ও বিস্তৃত হইবে। হৃদয়ের সবটুকু শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ঢালিয়া উহা উর্ব্বর করিয়া তোল। জগৎ জুড়িয়া এই রাজ্য ব্যাপ্ত হইবে।

৩

ভাগবত শিক্ষা আমাদের একেবারে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবে। আজিকার ভাব চিন্তা কর্ম—এই আমূল পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তিত হইবে—ইহা যে নিত্য নূতন।

*

পাইতে হইবে আত্মাকে, ভগবানকে, কর্মকে নহে। আজ যে সকল কর্ম জীবনের উপরে ভাসিয়া বেড়াইতেছে, উহার উপর আস্থা রাখিলে বড়ই অসম্পূর্ণ জীবন লাভ হইবে।

*

*

*

সত্য কৰ্ম খুবই গভীর। উহা ভগবানের আনন্দসম্ভূত। ডুব দিয়া উহাকে উপরে ভাসাইয়া তুলিতে হইবে, তবেই তোমার ও জগতের জীবন ধন্য হইবে।

বর্জ্যের তরঙ্গে আত্মহার্য্য হইও না। বাসনা ও চেষ্টা হইতে একে-বারেই প্রতিনিবৃত্ত হও। ডুবিয়া যাও, আরও ডুবিয়া যুও, বাসনা ও চেষ্টা হইতে বিরত হইলেও, তাঁর অনন্ত, কৰ্ম জাতির জীবনে ছড়াইয়া পড়িবে।

৪

ভগবানের বাণী আসিতেছে—কিন্তু যেন হট্টগোল। হৃদয় প্রশান্ত ও প্রশস্ত কর, তবে বাণী স্পষ্ট হইবে। এই অস্পষ্টতার যুগে অধীর হইবার কারণ নাই। প্রকাশের অনুরাগী হও। বাণী স্পষ্ট করিয়া শুনিবার জন্য যে তত্ত্বিতা উত্তম শিষ্য হইলেই হইবে।

ভগবান্ই শিক্ষক। তাঁর পরাবিদ্যা নূতন সৃষ্টির একমাত্র উপাদান—এই বিদ্যা সম্যক প্রকারে আয়ত্ত করিবার জন্য তিনি আহ্বান করিয়াছেন—তত্ত্ব মন প্রাণ দিয়া ইহাই এক্ষণে কার্য্য।

ভগবানের ইচ্ছাই হইতেছে প্রকৃতি। প্রকাশ তাঁহার রূপ। এই রূপের উপাসনার প্রবৃত্ত সাধকমণ্ডলীর মধ্যে যে মহান্ ঐক্য উহাই দেবজাতির অবলম্বন। ভিতর হইতে এই ঐক্য বাহিরে ছড়াইয়া পড়ুক।

প্রকাশের লীলা নানা ভঙ্গিমায় ॥ সকল ভঙ্গীই দেবজাতির উপকরণ। একটা ভাল, অপরটা মন্দ—এ জ্ঞান পরিহার কর। মঙ্গলময় ভগবানের সকল ইচ্ছাই নূতন সৃষ্টির সহায়ক। অনন্ত রূপের চরণে মাথা নত করিয়া এস সংশয় হইতে বিরত হই।

৫

এই অসীম রূপের পাঠশালায় বিদ্যার্থী বাহারা—তাহাদের জীবন হইবে উৎসর্গীকৃত, প্রতিদিনের পাঠ গ্রহণ করিবার পূর্বে এই ভাব

খাঁসে প্রাণসে প্রবাহিত হইতেছে কিনা লক্ষ্য করিবে। উৎসর্গীকৃত জীবনের ভিতর দিয়াই ভগবানের সত্য-রূপ বিকশিত হইবে।

* * *

জীবনে যতটুকু হইতেছে, ততটুকুই হৃদয়ের সবখানি ভক্তি ও প্রেম সহকারে অঞ্জলি পুরিয়া দেবতার চরণতলে অর্পণ কর। বাহা হইতেছে না তাহার জন্ত ক্ষুব্ধ হইও না—অবীর হতাশ হইয়া আপনাকে তুচ্ছ মনে করিও না। ক্ষুদ্রদানই বৃহৎ হইয়া উঠিবে। ধৈর্যসহকারে মায়ের মন্দিরে, সজ্জের আনন্দে অবস্থান কর, সোণার স্বপ্ন সফল হইবে।

* * *

আবশ্যক, অনাবশ্যক, উচিত অলুচিত প্রভৃতি দ্বন্দের অবসর কৈ? নিত্য নূতন প্রকাশ, সে যাহাই হউক না, বিধিপূর্বক নিবেদন করিবার যে আয়োজন যে অনুষ্ঠান তাহাতেই দিন রাত এক হইয়া যায়। বিদ্যার্থীগণ মনে রাখিবেন, কালীশক্তি, আমাদের অহঙ্কারের খেলা বিশ্বস্ত করিয়া, আমাদের জীবন দিয়া তাঁর দিব্য লীলা প্রকাশ করিবেন। এই বিশ্বাস প্রতি বিদ্যার্থীর হৃদয়ে বসাই দৃঢ় হইবে, সজ্জের জীবন ততই স্ফোতিত হইয়া উঠিবে। সজ্জগঠনের ইহাই মূল শক্তি আদিপ্রসবন।

৬

দীক্ষিত সন্তান লইয়াই আমাদের বিদ্যালয়। দেশকাষো জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প যাহারা তাঁহারা'ই বিদ্যার্থী। হুইজন দীক্ষিত বিদ্যার্থী বৈখানে, সেইখানেই আমাদের বিদ্যালয়। গ্রন্থ, হৃদয়, শিক্ষক স্বয়ং কালী, বিদ্যার্থীর চাই পাঠে ধৈর্য, আপনাতে বিশ্বাস, কালীতে ভক্তি, আর যে স্থানে বসিয়া বিদ্যার্থীগণ কালীর এই অধ্যাত্ম বিদ্যা অন্তর দিয়া গ্রহণ করিবেন, সেই বিদ্যালয়ের উপর চাই অশেষ শ্রদ্ধা।

জীবন-সাপনা

শরীর, প্রাণ আর মন এই তিনই লইয়াই সাধনা। শরীর আছে বলিয়াই প্রাণ আছে, এবং এই দুইয়ের উপরই ভর দিয়া দাঁড়াইয়াছে মন, অথবা মনই সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে শরীর এবং প্রাণকে—আপনাকে বিধৃত করিয়া রাখিবার জন্ত। মন যদি ভাঙ্গিয়া যায়, স্বভাবতঃ মানুষের শরীর ও প্রাণ ভাল থাকে না, অতএব এই তিনটির পরস্পর সম্বন্ধ যে নিবিড়তর সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

জগদীশচন্দ্র বলিয়াছেন “উদ্ভিদ-জীবন মানব জীবনেরই ছায়া”—বস্তুতঃই প্রকৃতি মানুষ সৃষ্টির জন্ত অনেক কিছু গড়িয়াছেন; ঐতরের উপনিষদে গুল্ল আছে, যে দেবগণের জন্ত পর পর বহু প্রাণীর অবয়ব সৃষ্টি করা হইয়াছিল, কিন্তু দেবগণ সকল গুলিই পরিত্যাগ করেন, অবশেষে মানব-ধার দেখিয়া সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন “হাঁ ইহাই পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে, ইহাতেই আমরা বাস করিব।”

প্রকৃতির পরিপূর্ণ বিকাশ মানবে। বৃক্ষজীবনে যদিও মানুষের মতই চেতনার সাড়া পাওয়া যায়—কিন্তু মন বলিয়া জিনিষ সেখানে নাই, পশুজীবনেও এই মন আবদ্ধ, এখানে ইহার আবাদ খেলা সম্ভবপর নহে, মানুষের জীবনেই মনের পুষ্টি ও বৃদ্ধি।

এই মন একদিনেই যে সৃষ্ট হইয়াছিল একরূপ নহে, এখনও যে সকল মানুষের ভিতর মনের পূর্ণ সাড়া পাওয়া গিয়াছে একথাও বলা যায় না। এমন অনেক মানুষ আছে, যাহারা শরীর এবং প্রাণের তৃপ্তিই জীবনের সবখানি মনে করে, ইহাদের শরীর পুষ্ট এবং বলিষ্ঠ, যে টুকু মন ইহাদের মধ্যে গজাইয়াছে, তাহা একান্তই এই শরীর প্রাণের থাকার ঘুরিয়া বেড়ায়।

মানুষের মনকে আমরা তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। প্রথম বাহা একান্তই দেহপ্রাণগত। দ্বিতীয় শরীর ও প্রাণ ছাড়াইরা উক্কে উঠিয়াছে—কল্পনা, চিন্তা, কবিত্ব ভাবপ্রবণ যে মন, আর তৃতীয় তুরীয়ে।

ইউরোপ মনের এই দ্বিতীয় স্তরেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এবং জগতের সর্বত্র এই মানস সৃষ্টির সহায়তা করিতেছে। সর্বদেশেই আজ সমাজ

ধর্ম, বিজ্ঞান, বিদ্যালোচনা প্রভৃতির ব্যাপকভাবে যে আন্দোলন চলি-
য়াছে ইহার ফলে অতি অসভ্য জাতিদিগের মধ্যেও এই মনের স্বষ্টি
সম্ভবপর হইয়া উঠিবে।

আবেগময় (emotional) ও বিচারময় (Reasoning) মনই যদি
মানুষের সব হইত, তাহা হইলে অধুনা জগৎ যে অবস্থায় উপনীত
হইয়াছে, ইহাই তাহার শ্রেষ্ঠ অবস্থা, কিন্তু তাহা নহে, শরীর এবং প্রাণ
যেমন জীবনের উদ্দেশ্য নয়, পরন্তু মনের প্রতিষ্ঠান, মনও সেইরূপ উদ্দেশ্য
নহে, প্রতিষ্ঠান, ইহাকেই ভর করিয়া দাঁড়াইবে যে বিজ্ঞানময় আনন্দময়
সত্তা, মন দিয়া তাহাই লাভ করিতে হইবে।

ভারতের অধ্যাত্মসাধনা ঠিক এইখান হইতে আরম্ভ। বিজ্ঞানের
(Science) মাপকাঠিতে তুরীয়ার যে আনন্দ, যে সচ্চিদানন্দের অবস্থা, তাহা
মাপিয়া স্থির করা যায় না, ইহা একান্তই মন দিয়া অনুভূতিসাপেক্ষ। তবে মনের
সহিত এই সচ্চিদানন্দময় সত্তার সংযোগ স্থাপিত হইলে, শরীরে তাহার
ছাপ পড়িয়া যায়—ইহাই কায়াসিদ্ধি, দেবদেহ, বোগসিদ্ধ শরীর, কিন্তু
এই অবস্থা সাধনার শেষে ঘটিতে দেখা যায়।

মনের যে আবেগ, প্রাণের যে রাসনা, শরীরের যে কর্ম, এই সমু-
দয় সেই আনন্দময় সত্তারই খেলা, কিন্তু বিকৃত ভাবে। শরীর প্রাণ ও
মন বিগুহ্ব হইলে, এই সকল দিয়া ঠিক ঠিক ভাবে তাহার লীলা প্রকাশ
হয়। হিন্দু সাধকগণ এই শরীর প্রাণ ও মনের শুদ্ধিবিধানের জন্য
নানা যোগপন্থা আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

প্রত্যেক যোগপদ্ধতি আলোচনা করিয়া দেখিলে এইরূপ বিশেষ বিশেষ
কর্ম সম্পাদন করিবার উপায়টী ইহার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়,
কোনওটা দ্বারা দেহশুদ্ধি, কোনওটিতে বা প্রাণশুদ্ধি আবার কোনওটা
দিয়া চিত্ত ও মনঃশুদ্ধি ঘটান থাকে। মোটামুটি উদ্দেশ্য—যে প্রতিষ্ঠানটির
উপর ভগবানের উত্তম খেলা অনুষ্ঠিত হইবে, তাহাকেই শুদ্ধ করিয়া
তোলা।

কিন্তু শরীরের সাধনা করিতে গিয়া কোন ক্ষেত্রে প্রাণ ও মনকে
উপেক্ষা করিতে হয়, আবার মনের উন্নতি ঘটাইতে গিয়া শরীর এবং
প্রাণকে তুচ্ছ করিতে হয়, কাজেই হয় একটির পর অপরটিকে প্রস্তুত করিয়া
ভুলিবার জন্য সাধককে বহুকাল কুচ্ছতামূলক নানাবিধ সাধনা করিয়া ধাইতে

হয়, নতুবা মন গড়িতে শরীর ভালিয়া যায়, অথবা শরীর গড়িয়া মনের সন্ধান মিলে না, এইরূপ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়া, মানুষ একেবারে হতাশ হইয়া অতি অধম অবস্থা লাভ করে।

আফ্রিকায় যে সব বর্বর জাতি বাস করে, তাহারা যে মানবজাতির একেবারেই আদিপুরুষ এরূপ নহে, তাহাদেরও সভ্যতা ছিল, সাধনা ছিল, কিন্তু এমনভাবে হয়ত অগ্রসর হইয়াছিল, যাহাতে এরূপ অধঃপতন অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে। কেননা এই সকল অসভ্য জাতির মধ্য হইতেই এরূপ সব মানুষ জন্মিয়াছে, যাহারা অপরূপ সভ্য দেশের মানুষ অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে, অথচ কোন সভ্যজাতির রক্ত ইহাদের শিরায় বহিবীর সুযোগ হয় নাই, কাৰ্যেই বনিত হইয়া, ইহাদের মধ্যেও প্রাচীন সভ্যতার বীজ স্তূপ আছে, প্রকৃতির কিপ্রগতি সহ্য করিতে না পারিয়া অবসাদে ইহাদের মন ধোঁপ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, দিন আসিলে আবার জাগিয়া উঠা ইহাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে না।

ভারতের অবস্থা এতখানি হীন না হইলেও, তাহার যথেষ্ট অধঃপতন ঘটয়াছে। মনেরও উদ্বেগ যে তুরীয় জগৎ, তাহার বিন্দু আশ্বাদে মানুষ এমনই উন্মত্ত হইয়া উঠে, যে তখন নিম্ন প্রতিষ্ঠানগুলি ধরিয়া ধাকা ভারবহ বলিয়া বোধ হয়, “কি ছার আর কেন মায়া কাঞ্চন কায়া ত’ হবে না” অসার দেহের উপর সাধকের অবজ্ঞা আসে, মনে হয় ছার এ দেহগেহ—তখন মূল কাটিয়া গেলে সমস্ত বৃক্ষ যেমন নির্জীব হইয়া পড়ে এইরূপ স্বর্গের অমৃতও বিষাদ হইয়া যায়। ভারতের অবস্থা ঠিক এই রকমের।

সৃষ্টি বৈচিত্র্যময়, মানুষের জীবন লইয়া প্রকৃতির যে খেলা তাহাও বিচিত্র। এই বিচিত্র খেলাগুলির উদ্দেশ্য মানুষকে দেবাধারে পরিণত করা—ইহা আমরা বুঝিয়াছি, বিশেষ বিশেষ যোগাঙ্গগুলিও যে মানুষের বিভিন্ন কোষগুলিকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিবার উপায়মাত্র তাহাও অবগত হইয়াছি। এক্ষণে এই সকল হইতে আমরা নিঃসন্দেহে জানিয়াছি, যে প্রকৃতিই সাধিকা, তিনিই মানুষের জীবন লইয়া সচিদানন্দের পথে ছুটিয়াছেন, মানুষের চেষ্টা কেবল তাহার গতিকে বিলম্বিত করিয়া দিতেছে, সেইজন্য সন্ধ্যােই আমরা এই মহাকাব্যের হস্তে সমস্ত সমর্পণ করিয়া, স্বকল দিক দিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়াছি।

কোন পথ দিয়া কেমন করিয়া তিনি এই কার্য্য সাংসাধন করিতেছেন—দ্রষ্টব্যরূপ তাহা প্রতিফল লক্ষ্য করিয়া অভূতপূর্ব বিশ্বাস ও আনন্দ-সাগরে ভাসিতেছি, যে মুহূর্ত্ত হইতে বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে সেই মুহূর্ত্ত হইতে সাহস ও ধৈর্য্য আসিয়াছে, আমরা এইজন্য সকলকেই এই আত্মসমর্পণযোগ গ্রহণ করিবার জন্য আকুল হইয়া আহ্বান করিতেছি।

বহু জন্ম অহঙ্কারের খেলার মত্ত থাকায়, সহজে ভগবানের উপর বিশ্বাস দৃঢ় হইতে চাহে না। মনে হয় ভগবানকে পাইতে হইলে কিছুই করিতে হইবে না, এ কিরূপ কথা, তবে মুনি ঋষিরা এতকাল ধরিয়া মাথাকাটা তপস্যা করিল কিসের জন্য, আজও সাধু সন্ন্যাসীর দুর্জয় সাধনা সবই কি মিথ্যা? নাহুব দোড়াইয়াছে, সংস্কার তাহাকে নিশ্চেষ্ট হইতে দিবে না। মন্দ বাসনাও বাসনা, ভাল বাসনাও বাসনা, ভগবানকে লাভ করিব, অথবা দৈবশক্তিতে শক্তিমান হইব এইরূপ বাসনা নাহুবকে উন্মাদ করিয়াছে। আমরা বৌদ্ধযুগের পর হইতে ভগবানের জন্ত উন্মাদ হইয়া ইহকাল পরকাল দুই নষ্ট করিয়াছি। জাতির এই অদম্য গতি বন্ধ করিবার জন্ত ভগবানই আজ দাঁড়াইয়াছেন—সেই জন্ত ভারতের উন্নতির যুগ আগতপ্রায়।

তিনি বলিতেছেন—“সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকম্ শরণংব্রজ”। হে নবীন-যুগের ভাগবত প্রেমিক, শ্রীভগবানের বাণী কাণ পাতিয়া শুন, বৃথা জীবন ক্ষয় করিও না, বৃকের সবটুকু জোর দিয়া অতীত সংস্কার দূর করিয়া দাও, বর্তমান ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলির অভিমতে কর্ণপাত করিও না, দেখ অন্তরাআই গুরুরূপে তোমার নূতন পথ নির্দেশ করিতেছেন। দেখ আমরা পাইয়াছি শরীর ও প্রাণ, মন দিয়া ভগবানের চরণে হত্যা দাও, তাঁর আনন্দময় স্পর্শে মানসপদ্ম বিকশিত হইবে, জীবনে বসন্ত সমাগম হইবে, আনন্দে আনন্দে জীবন ছাইয়া যাইবে, অবিলম্বে সকল বন্ধন টুটাইয়া কেবল উচ্চকণ্ঠে বল, “আমি তোমার জন্য কিছু করিব না—ইহাতে নরক হয় সেও শ্রেয়ঃ—বুঝিব ইহাই তোমার ইচ্ছা”। বস, আর কিছু নয়, তারপর দেখ দেবসংঘ তোমার ঘিরিয়া ফেলিবে, দেখিবে তুমি দেবজাতির একজন হইয়া গিয়াছ, সেখানে কাণীর করুণা অজস্রধারে বর্ষিত হইতেছে—সে মহাশক্তির করুণাধারা মাথায় করিয়া জীবন ধন্য কর।

অনন্ত জীবনের কতটুকু সময় সাধনা কর? এই আত্মসমর্পণসাধনা জীবনের সবখানি লইয়া, এ সংগ্রাম ঘাসে প্রথাসে, বিরাম নাই, অবিশ্রাম প্রবাহে বহিয়া চলিয়াছে। হিমালয়ের মত অন্তর্যাতার পাহাড় ক্ষয় করিবার জন্য এই বিরাট যজ্ঞ আরম্ভ করিতে না পারিলে, তোমার নিকৃতি নাই, গাঁজা খাইয়া ভোর হইয়া থাকার মত, আসন প্রাণায়ামে খানিকজ্ঞ শরীর গরম করিয়া মনে করিও না খুব হইতেছে—সাধনার আড়ম্বরই বড় হইয়া যাইবে, অনিত্য বোঝা মাথায় করিয়া মনে হইবে বড় হইয়া গিয়াছে। ভগবানের স্পর্শে একেবারে পাগল হইয়া যাও, ভগবানের অগাধ প্রেমে বিভোর হইয়া, তাঁর বিপুল কর্মে যন্ত্রবৎ পরিচালিত হও। আনন্দেই তোমার উৎপত্তি, আনন্দেই তোমার স্থিতি, আবার আনন্দেই তোমার মরজীবন শেষ হইবে, ইহার মধ্যে কোথাও এতটুকু ফাঁক নাই, যেখানে আছে দুঃখ, আছে কষ্ট। কেবল বুদ্ধির দোষে হারা করিতে হয়, সরল পথ ধরিয়া তাঁর মন্দিরের দিকে আগাইয়া চল, দেখিবে আলোয় আলোয় জীবন ও জগৎ ভরিয়া গিয়াছে—কেবলই হাসি, কেবলই আনন্দ, কবির কথায় বলি—

সবাই যারে সব দিতেছে, তার কাছে সব দিয়ে ফেলি—

কবার আগে চাবার আগে আপনাকে ভাই দেব মেলি।

তুচ্ছ মানব—কতটুকু তুমি? একবার আপনাকে হারিয়ে ভাসিয়ে, দেখ আনন্দ-উৎস কোন্ পথে?

স্বর্গ-মর্ত্য

গান

মাটির প্রদীপখানি আছে মাটির ঘরের কোলে,
সন্ধ্যাতারা তাকায় তারি আলো দেখ'বে বলে ॥

সেই আলোটি নিমেষ হত প্রিয়ার ব্যাকুল চাওয়ার মত,
সেই আলোটি মায়ের প্রাণের ভয়ের মত দোলে ॥

সেই আলোটি নেবে জলে শ্রামল ধরার হৃদয়তলে,
সেই আলোটি চপল হাওয়ার ব্যাধায় কাঁপে পলে পলে ।

নামল সন্ধ্যাতারার বাণী আকাশ হতে আশীষ আনি,
অমর শিখা আকুল হল মর্ত্য শিখায় উঠতে জলে' ॥

ইন্দ্র। স্মরণরো, একদিন দৈত্যদের হাতে আমরা স্বর্গ হারিয়েছিলাম ।

তখন দেবে মানবে মিলে আমরা স্বর্গের জন্তে লড়াই করেছি
এবং স্বর্গকে উদ্ধার করেছি কিন্তু এখন আমাদের বিপদ তার
চেয়ে অনেক বেশি । সে কথা চিন্তা করে' দেখবেন ।

বৃহস্পতি। মহেন্দ্র, আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারচিনে । স্বর্গের
কি বিপদ আপক করছেন ?

ইন্দ্র। স্বর্গ নেই ।

বৃহস্পতি। নেই ? সে কি কথা ? তাহ'লে আমরা আছি কোথায় ?

ইন্দ্র। আমরা আমাদের অভ্যাসের উপর আমাদের সংস্কারের উপর আছি,
স্বর্গ যে কখন ক্রমে ক্ষীণ হয়ে ছায়া হয়ে লুপ্ত হয়ে গেছে, তা
জানতেও পারিনি ।

কার্তিকেয়। কেন দেবরাজ, স্বর্গের সমস্ত সমারোহ সমস্ত অলুষ্ঠানই ত
চল্চে ।

ইন্দ্র। অলুষ্ঠান ও সমারোহ বেড়ে উঠেচে । দিনশেষে সূর্যাস্তের সমারো-
হের মত, তার পশ্চাতে অন্ধকার । তুমি ত জান দেবসেনাপতি,
স্বর্গ এত মিথ্যা হয়েছে যে, সকল প্রকার বিপদের ভয় পর্যন্ত
তার চলে গেছে । দৈত্যেরা যে কত যুগ যুগান্তর তাকে আক্রমণ

করে নি' তা মনে পড়ে না। আক্রমণ করবার যে কিছুই নেই।

মাঝে মাঝে স্বর্গের যখন পরাভব হত তখনও স্বর্গ ছিল, কিন্তু যখন থেকে—

কার্তিকের। আপনার কথা যেন কিছু কিছু বুঝতে পারছি।

বৃহস্পতি। স্বপ্ন থেকে জাগবামাত্রই যেমন বোঝা যায় স্বপ্ন দেখছিলাম, ইজের কথা শুনেই তেমনি মনে হচ্চে একটা যেন মায়ায় মধ্যে ছিলুম কিন্তু তবু এখনো সম্পূর্ণ ঘোর ভাঙে নি।

কার্তিকের। আমার কি রকম বোধ হচ্চে বলব? ভূপের মধ্যে শর আছে, সেই শরের ভার বহন করছি, সেই শরের দিকেই মন বদ্ধ আছে, ভাবছি সমস্তই ঠিক আছে। এমন সময়ে কে যেন বলে, একবার তোমার চারিদিকে তাকিয়ে দেখ। চেয়ে দেখি শর আছে কিন্তু লক্ষ্য করবার কিছুই নেই। স্বর্গের লক্ষ্য চলে গেছে।

বৃহস্পতি। কেন এমন হল তার কারণ ত জানা চাই।

ইজ। যে মাটির থেকে রস টেনে স্বর্গ আপনার ফুল ফুটিয়েছিল, সেই মাটির সঙ্গে তার সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে গেছে।

বৃহস্পতি। মাটি আপনি কাকে বলতেন?

ইজ। পৃথিবীকে। মনে ত আছে একদিন মানুষ স্বর্গে এসে দেবতার কাজে যোগ দিয়েছে এবং দেবতা পৃথিবীতে নেমে মানুষের যুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে। তখন স্বর্গ মর্ত্য হুই সত্য হয়ে উঠেছিল তাই সেই যুগকে সত্যযুগ বলত। সেই পৃথিবীর সঙ্গে যোগ না থাকলে স্বর্গ আপনার অমৃতে আপনি কি বাঁচতে পারে?

কার্তিকের। আর পৃথিবীও যে যায়, দেবরাজ। মানুষ এমনি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যাচ্ছে, যে সে আপনার শৌর্যকে আর বিশ্বাস করে না কেবল বস্তুর উপরেই তার ভরসা। বস্তু নিয়ে মারামারি কাটাকাটি পড়ে গেছে। স্বর্গের টান যে ছিন্ন হয়েছে তাই আত্মা বস্তু ভেদ করে আলোকের দিকে উঠতে পারচে না।

বৃহস্পতি। এখন উদ্ধারের উপায় কি?

ইজ। পৃথিবীর সঙ্গে স্বর্গের আবার যোগ সাধন করতে হবে।

বৃহস্পতি। কিন্তু দেবতারা যে পথ দিয়ে পৃথিবীতে যেতেন, অনেক দিন

হল সে পথের চিহ্ন লোপ হয়ে গেছে। আমি মনে করেছিলুম ভালই হয়েছে; ভেবেছিলুম এইবার প্রমাণ হয়ে যাবে স্বর্গ নিরপেক্ষ, নিরলস্য, আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ।

ইঙ্গ। একদিন সকলেরই সেই বিশ্বাস ছিল কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে পৃথিবীর প্রেমের স্বর্গ বাঁচে নইলে স্বর্গ শুকিয়ে যায়। অমৃতের অভিনানে সেই কথা ভুলেছিলুম বলেই পৃথিবীতে দেবতার যাবার পথের চিহ্ন লোপ পেয়েছিল।

কার্তিকেশ্বর। দৈত্যদের পরাভবের পর থেকে আমরা আটঘাট বেঁধে স্বর্গকে সুরক্ষিত করে তুলেছি। তার পর থেকে স্বর্গের ঐশ্বর্য্য স্বর্গের মধ্যেই জন্মে আসছে, বাহিরে তার আর প্রয়োগ নেই, তার আর ক্ষয় নেই। যুগ যুগ হতে অব্যাঘাতে তার এতই উন্নতি হয়ে এসেছে যে, বাহিরের অন্য সমস্ত কিছু থেকে স্বর্গ বহুদূরে চলে গেছে। স্বর্গ তাই আজ একলা।

ইঙ্গ। উন্নতিই হোক আর দুর্গতিই হোক যাতেই চারিদিকের সঙ্গে বিচ্ছেদ আনে, তাতেই ব্যর্থতা আনে। ক্ষুদ্র থেকে মহৎ যখন সূদূরে চলে যায়, তখন তার মহত্ত্ব নিরর্থক হয়ে আপনাকে আপনি ভুলগ্রস্ত করে মাত্র। স্বর্গের আলো আজ আপনার মাটির প্রদীপের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলোর আর আলো হয়ে উঠেছে—লোকান্তরের আয়ত্তের অতীত হয়ে সে নিজেরও আয়ত্তের অতীত হয়েছে, নিরূপনের শাস্তির চেয়ে তার এই শাস্তি গুরুতর। দেবলোক আপনাকে অতি বিস্তৃত রাখতে গিয়ে আপন গুণিতার উচ্চ প্রাচীরে নিজেকে বন্দী করেছে—সেই দুর্গম প্রাচীর ভেঙে গঙ্গার ধারার মত মলিন মর্ত্যের মধ্যে তাকে প্রবাহিত করে দিয়ে তবে তার বন্ধন মোচন হবে। তার সেই স্বাতন্ত্র্যের বেটন বিদীর্ণ করবার জন্যেই আমার রূম আজ এমন বিচলিত হয়ে উঠেছে। স্বর্গকে আমি ঘিরতে দেব না, বৃহস্পতি—মলিনের সঙ্গে পতিতের সঙ্গে, অজ্ঞানীর সঙ্গে, দ্রুতীর সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দিতে হবে।

বৃহস্পতি। তাহলে আপনি কি করতে চান?

ইঙ্গ। আমি পৃথিবীতে যাব।

বৃহস্পতি। সেই যাবার পথটাই বন্ধ, সেই নিরুই ত দুঃখ।

ইন্দ্র। দেবতার স্বরূপে সেখানে আর যেতে পারব না, মাল্লব হয়ে
অন্নগ্রহণ করব। নক্ষত্র যেমন খসে পড়ে; তার আকাশের আলো
আকাশে নিবিয়ে দিগে মাটি হয়ে মাটিকে আলিঙ্গন করে; আমি
তেমনি করে পৃথিবীতে যাব।

বৃহস্পতি। আপনার জন্মবার উপযুক্ত বংশে পৃথিবীতে এখন কোথায়?
কার্তিকেয়। বৈশ্ব এখন রাজা, ক্ষত্রিয় এখন বৈশ্যের সেবায় লড়াই
করচে, ব্রাহ্মণ এখন বৈশ্যের দাস।

ইন্দ্র। কোথায় জন্মাব সেত আমার ইচ্ছার উপরে নেই—যেখানে আমাকে
আকর্ষণ করে নেবে, সেইখানেই আমার স্থান হবে।

বৃহস্পতি। আপনি যে ইন্দ্র সেই স্মৃতি কেমন করে—

ইন্দ্র। সেই স্মৃতি লোপ করে দিয়ে তবেই আমি মর্ত্যবাসী হয়ে মর্ত্যের
সাধনা করতে পারব।

কার্তিকেয়। এতদিন পৃথিবীর অস্তিত্ব ভুলেই ছিলুম, আজ আপনার
কথায় হঠাৎ মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। সেই তম্বী শ্যামা ধরণী
স্বর্ঘ্যোদয় স্বর্ঘ্যাস্তের পথ ধরে স্বর্গের দিকে কি উৎসুক দৃষ্টিতেই
তাকিয়ে আছে। সেই ভীকর ভয় ভাঙিয়ে দিতে কি আনন্দ।
সেই ব্যথিতার মনে আশার সঞ্চার করতে কি গৌরব! সেই
চন্দ্রকান্তমণিকিরীটিনী নীলাম্বরীমুন্দরী কেমন করে ভুলে গিয়েছে
যে সে রাণী! তাকে আবার মনে করিয়ে দিতে হবে যে, সে
দেবতার সাধনার ধন, সে স্বর্গের চিরদয়িতা।

ইন্দ্র। আমি সেখানে গিয়ে তার দক্ষিণ সমীরণে এই কথাটি রেখে
আসতে চাই যে, তারই বিরহে স্বর্গের অমৃতে স্বাদ চলে গেছে
এবং নন্দনের পারিজাত ম্লান;—তাকে বেষ্টন করে ধরে যে সমুদ্র
রয়েছে সেই ত স্বর্গের অক্ষ, তারই বিচ্ছেদ-ক্রন্দনকেই ত সে
মর্ত্যে অনন্ত করে রেখেছে।

কার্তিকেয়। দেবরাজ যদি অনুমতি করেন তাহলে আমরাও—পৃথি-
বীতে যাই।

বৃহস্পতি। সেখানে মৃত্যুর অবগুষ্ঠনের ভিতর দিয়ে অমৃতের জ্যোতিকে
একবার দেখে আসি।

কার্তিকেয়। বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী তাঁর মাটির ঘরটিতে যে নিভানুতন লীলা

বিস্তার করেচেন আমরা তার রস থেকে কেমন বঞ্চিত হব? আমি যে বৃষ্টিতে পারছি আপনাকে পৃথিবীর দরকার আছে, আমি নেই বলেই ত সেখানে মানুষ স্বার্থের জন্তে নির্লজ্জ হয়ে যুদ্ধ করচে, ধর্মের জন্তে নয়।

বৃহস্পতি। আর আমি নেই বলেই ত মানুষ কেবল ব্যবহারের জন্তে জ্ঞানের সাধনা করচে, মুক্তির জন্তে নয়।

ইন্দ্র। তোমরা সেখানে বাবে আমি ত তারই উপায় করতে চলেছি— সময় হ'লেই—তোমরা পরিণত ফলের মত আপন মাধুর্য্যভারে নহলেই মর্ত্যে স্থলিত হয়ে পড়বে। সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর।

কার্তিকেয়। কখন টের পাব, মহেঞ্জ, যে আপনার সাধনা সার্থক হল?

বৃহস্পতি। সে কি আর চাপা থাকবে? যখন জয়শঙ্খনিতে স্বর্গলোক কোঁপে উঠবে তখন বুঝব যে—

ইন্দ্র। না, দেবগুরু, জয়ধ্বনি উঠবে না। স্বর্গের চোখে যখন করুণার অশ্রু গলে পড়বে তখন জানবেন পৃথিবীতে আমার জন্মলাভ সফল হল।

কার্তিকেয়। ততদিন বোধ হয় জানতে পারব না, সেখানে ধুলার আবরণে আপনি কোথায় লুকিয়ে আছেন।

বৃহস্পতি। পৃথিবীর রসই ত হ'ল এই লুকোচুরিতে। ঐশ্বর্য্য সেখানে দরিদ্র বেশে দেখা দেয়, শক্তি সেখানে অক্ষমের কোলে মানুষ হয়, বীৰ্য্য সেখানে পরাভরের মাটির তলায় আপন জয়ন্তভের ভিত্তি খনন করে। সমুদ্র সেখানে অসমুদ্রের মধ্যে বাসা করে থাকে। যা দেখা দেয়, পৃথিবীতে তাকে মানতে গিয়েই ভুল হয়, যা না দেখা দেয়, তারই উপর চিরদিন ভয়লা রাখতে হবে।

কার্তিকেয়। কিন্তু সুররাজ, আপনার ললাটের চিরকোজ্জল জ্যোতি আজ ম্লান হ'ল কেন?

বৃহস্পতি। মর্ত্যে যে বাবেন তার গৌরবের প্রভা আজ দীপ্যমান হয়ে উঠুক।

ইন্দ্র। দেবগুরু, জন্মের যে বেদনা সেই বেদনা এখনি আপনাকে গীড়িত করচে। আজ আমি দুঃখেরই অভিনয়ে চপেছি—তারই আছানে আমার মনকে টেনেছে। শিবের সঙ্গে সতীর যেমন বিচ্ছেদ

হয়েছিল, স্বর্গের আনন্দের সঙ্গে পৃথিবীর ব্যথার তেমনি বিচ্ছেদ হয়েছে—সেই বিচ্ছেদের দুঃখ এতদিন পরে আজ আমার মনে স্নানীকৃত হয়ে উঠেছে। আমি চল্লম সেই ব্যথাকে বুকে তুলে নেবার জন্তে। প্রেমের অমৃতে সেই ব্যথাকে আমি সৌভাগ্যবতী করে তুলব। আমাকে বিদায় দাও।

কার্তিকেয়। মহেন্দ্র, আমাদের জন্তে পথ করে দাও, আমরা সেই খানেই গিয়ে তোমার সঙ্গে মিলব। স্বর্গ আজ দুঃখের অভিযানে বাহির হোক।

বৃহস্পতি। আমরা পথের অপেক্ষাতেই রইলুম, দেবরাজ। স্বর্গ থেকে বাহির হবার পথ করে দাও, নইলে আমাদের মুক্তি নেই।

কার্তিকেয়। বাহির কর, দেবরাজ, স্বর্গের বন্ধন থেকে আমাদের বাহির কর—মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আমাদের পথ রচনা কর।

বৃহস্পতি। তুমি স্বর্গরাজ, আজ তুমি স্বর্গের তপোভঙ্গ করে জানিয়ে দাও যে স্বর্গ পৃথিবীরই।

কার্তিকেয়। বারা স্বর্গ কামনার পৃথিবীকে ত্যাগ করবার সাধনা করেছে চিরদিন তুমি তাদের পৃথিবীতে ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছ— আজ স্বয়ং স্বর্গকে সেই পথে নিয়ে যেতে হবে।

ইন্দ্র। সেই বাধার ভিতর দিয়ে মুক্তিকে পাঁবার পথ—

বৃহস্পতি। যে মুক্তি আপন আনন্দে চিরদিনই বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করে।

গান

পথিক হে, পথিক হে, ঐ যে চলে, ঐ যে চলে,
সঙ্গী তোমার দলে দলে।

অন্ত মনে থাকি কোণে, চমক লাগে ফণে ফণে,
হঠাৎ শুনি জলে স্থলে, পায়ের ধ্বনি আকাশতলে।

পথিক হে, পথিক হে, যেতে যেতে পথের থেকে,
আমায় তুমি যেয়ো ডেকে।

যুগে যুগে বারে বারে এসেছিলে আমার দ্বারে,
হঠাৎ যে তাই জানিতে পাই, তোমার চলা হৃদয় ভলে ॥

(সবুল পত্র, কান্ডন ও চৈত্র, ১৩২৫)

শ্রীমদ্বীজনাথ ঠাকুর।

সত্যগ্রহের জের

ধীরপন্থী ও জাতীয় পক্ষ উভয় দলের প্রতিনিধি রাউলাট বিলের বিরোধী। দিল্লীর লাট সভায় উভয় পক্ষই এই বিল যাহাতে পাশ না হয়, তাহার জন্ত তুমুল বাকযুদ্ধ করিয়াছিলেন। বাংলার সুরেন্দ্রনাথ ও মাদ্রাজের ত্রিনিবাস শাস্ত্রী মহাশয় উভয়েই ধীরপন্থী দলের বিশিষ্ট নেতা—তঁাহারা বলিয়াছিলেন If the bill were passed, they will start an agitation against it, the like of which was never witnessed before in this country. অর্থাৎ বিল যদি পাশ হয়, তবে তঁাহারা এমন আন্দোলন সৃষ্টি করিবেন যাহা এখন পর্যন্ত দেশে দেখে নাই। কিন্তু বাহিরে আসিয়া তঁাহারা বুঝিলেন—জনসাধারণের হৃদয় হইতে তঁাহারা বহুদিন পরিত্যক্ত হইয়াছেন, তঁাহাদের কথায় নাচিবার মত লোক নাই, তঁাহারা দৈন্ত্যহীন সেনাপতির মত, পত্রশূন্য বৃক্ষের ছায় শোভা ও শক্তিহীন, কাষেই, রাউলাট বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন সৃষ্টি করা দূরের কথা বরং আন্দোলনের বিপক্ষে মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং জাপনাদের প্রতিষ্ঠা শিথিল বুঝিয়া নিজেদের অক্ষমতা অনুভব করিয়া ভারতে ধীরপন্থীগণের দল যাহাতে পুষ্টিলাভ করে তাহার জন্ত মনোযোগী হইলেন। দেশ কেবল উপদেশ চাহে না, চাহে একটা পজিটিভ আই-ডিয়া ও কাজ, ধীরপন্থীগণের মামুলী রিকম' কথা ব্যতীত কাজের দিক দিয়া কোন নির্দেশই নাই, কাষেই মহাত্মা গান্ধী যখন এই বিলের বিরুদ্ধে জাতির কর্তব্য নির্দেশ করিলেন, তখন জাতীয় পক্ষ তাহা অবিচারে গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু গান্ধী রাজনৈতিক নেতা নহেন, তিনি তপস্বী, সাধক, তাঁর চরিত্রে যাহা সম্ভব, পাশ্চাত্য-প্রভাববিশিষ্ট অল্পকরণপ্রবণ দেশনেতৃগণের পক্ষে তাহা যাদো সুবিধার নহে, এবং

দেশের লোকও গান্ধীর আদর্শ পালন করিবায় মত এখনও প্রস্তুত হইয়া উঠে নাই, অতএব গান্ধীর সত্যগ্রহ অবলম্বন করিয়া, ভারতে যে তুমুল ঝড় বহিয়া গেল, যে দুর্ঘটনার সৃষ্টি হইল, তাহার বিবরণ সকলেই অবগত আছেন—সে সকল অপ্রিয় কথার উল্লেখ এখানে নিম্নপ্রয়োজন।

আমরা রাজনীতিক আন্দোলনের বিরোধী। কেননা এই পাশ্চাত্যের সম্মোহনে আমাদের জাতির জীবন যদি আচ্ছন্ন হইয়া থাকে, সত্যদৃষ্টিটি আমরা কোম কালেই লাভ করিব না। আজ দেশব্যাপী এই অরাজকতার ফলে কড়ি হইল কাহার? মুমূর্ষু জাতির ধন প্রাণ অনর্থক এইরূপ করিয়া নষ্ট হইতে থাকিলে, আমাদের উন্নতির আশা সুদূরপর্যন্ত হইবে। গান্ধী যে ভাবে আন্দোলন চালাইতে চাহিয়াছিলেন, তাহা পরিত্যক্ত করিবার মত লোক কৈ, বোম্বারে বসিয়া তিনি প্রতিদিন সংবাদপত্রে message ছাপাইবেন, আর তেত্রিশ কোটি হিন্দু মুসলমান শিক্ষিত অশিক্ষিত সেই ভাবে চলিবে—দেশের বর্তমান অবস্থার ইহা দুরাশা নহে, বাতুলতা, বাংলার নেতৃগণ এই কথাটা কিছু কিছু বুঝিয়াছেন, সেই জন্য এই আন্দোলনে বাঙালী তেমন হৃদয়ের সহিত যোগদান করে নাই, এবং গান্ধীও অতঃপর ইহা বুঝিয়া সাবধান হইয়াছেন। নানাদিক হইতে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ হইয়াছে, যে বাংলার প্রাণশক্তি নিজীব হইয়া পড়িয়াছে, বাঙালীর জীবনে আর তেমন উৎসাহ নাই, কথাটা একেবারেই মিথ্যা। সারা ভারতে আজ যে লীলা সংঘটিত হইল, বার বৎসর ধরিয়া বুদ্ধিমানের মত বাঙালী এইরূপ হুজুগে মাতিয়া দেখিয়াছে ইহা একেবারেই তাহাদের চরিত্রের অনুরূপ নহে, অশুদ্ধ রাজনীতির উত্তেজনা মাত্র, নূতন সৃষ্টি এইরূপ ভাবে কোনমতেই সম্ভবপর হইবে না।

রাউলাট বিস পান্স হইয়াছে। রাজকর্তৃপক্ষগণ বলিতেছেন—ইহা বিপ্লববাদ বা এ্যানর্কিজম দমন উদ্দেশ্যে—জাতির জীবন ইহাতে দেশাত্মপ্রেম উচ্ছন্ন করিবার জন্ম নহে। রাজ্যরক্ষার জন্ম রাজার বাহা কর্তব্য তাহা করুন, পরাজিত প্রজার জাতি আমরা আমাদেরও একটা কর্তব্য আছে, আমরা একবাক্যে ইহার অনাবশ্যকতা দেখাইয়া দিয়াছি, কোটা কণ্ঠে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছি; প্রজার শাস্তিরক্ষাই রাজার কর্তব্য, জানি না যে আইন সেই শাস্তিকে এমন করিয়া ফুর করে, তাহার প্রয়োজন কি? যথল বুদ্ধি না, যখন জাতির স্বার্থের সঙ্গে রাজার স্বার্থ মিলে না—তখন

এই লইয়া অমর্থক আমাদের অসহায় দুর্ভাগ্য জীবনটুকু এমন করিয়া নষ্ট করি কেন? দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে লক্ষ লক্ষ লোক ক্ষয় হইতেছে, মধ্যে মধ্যে এইরূপ রাষ্ট্রবিপ্লবে, নিরস্ত ভারতবাসী যদি পাখীর মত প্রাণ দিতে থাকে, তবে বল দেখি এই জাতিপাত দেখিয়া প্রাণের মধ্যে কেমন বৃষ্টিকদংশন অনুভব করিতে হইবে? তুচ্ছ রাজনীতিক চর্চা! তুচ্ছ সম্মোহন! যদি প্রাণই দিতে হয়, এস না ধর্মের জন্ত, সত্যের জন্ত, ভগবানের জন্য দাঁড়াই। তাঁর অপার্থিব করুণা লাভ করিবার জন্য যদি লক্ষ বলির প্রয়োজন থাকে, তাহাতেও একটা সাধনা আছে, আর এমন রাগ ঘেষের বশবর্তী হইয়া অসার আলোচনার বকের রক্ত ঢালিয়া দেওয়ায় যে দ্বন্দ্ব, তাহা গুঞ্জীভূত হইয়া ক্রমশঃ অনর্থেরই সৃষ্টি করিবে, আমরা স্পষ্টই দেখিতেছি মরণের ভিতর দিয়া জাতি মরিয়া হইয়া উঠিতেছে, রাজার জাতির পক্ষে ইহা যেমন অশুভকর, আমাদের পক্ষেও, এই আধমরা জাতিটির একরূপ তাণ্ডব লীলা শুভজনক নহে।

দেশে এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা মনে করেন, এমনই করিয়া জাতি জাগিয়া উঠিবে। অবশ্যই, জাতির জীবনে আজ যে প্রবাহ দেখা যাইতেছে তাহার গতি উজ্জ্বল, কিন্তু তাই বলিয়া বার বার অদূরদর্শীর মত এইরূপ দুর্ঘটনার সৃষ্টি ঘটতে থাকিলে, যাহা দুই দশ বৎসরে আশা করা যায়, তাহা ঘটতে অধিক শতাব্দী লাগিতে পারে, আমরা বেশ দেখিতেছি যে রাজসিক উত্তেজনায় আমাদের উজ্জ্বলগতি আশামত অগ্রসর হইতেছে না, ভারতবর্ষকে সেই জন্য একটা নূতন পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

বাংলার নূতন দল সেই শ্রেষ্ঠ পথটি অবলম্বন করিয়াছে। সেই জনসংঘ এই সত্যগ্রহ প্রচার কালে আমরা বলিয়াছিলাম, মহাত্মা গান্ধীর প্রতিভা দক্ষিণ আফ্রিকায় কার্য্যকরী হইতে পারে, ভারতের কাজে তাঁহাকে নুতন করিয়া গড়িয়া উঠিতে হইবে, ভারতবর্ষের নেতৃত্ব গ্রহণ করা অল্প সিদ্ধির কাণ্ড নয়। বাংলা দেশ সমস্ত ভারতের হৃদয়, সেই জন্য বাংলা দেশেই সর্বপ্রায়ে অন্তঃসান্ধানার আরম্ভ হইয়াছে, কর্ম্মবীর গান্ধী এই বাঙালীর সাধন-তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া যদি নূতন বেশে দাঁড়াইতে পারেন, তাহা হইলে কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা অধিক।

বাহিরের দিক হইতে বাঙালীর এইরূপ নীরয়তা, ভাস্কর্য্যিকতায় লক্ষণ

বলিয়' জয়ভূত হইতে পারে, কিন্তু বাঙালীর হৃদয়ে আজ যে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বলিত, তাহা আর নিভিবার নহে, বিন্দু বিন্দু ঘৃতাছতি প্রদানে তাহা চিরদিন উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে এবং এই পুণ্যাগ্নিশিখায় সে অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ করিয়া দেবতার মন্ত কণ্ঠক্ষেত্রে উপনীত হইবে। ভগবানের আদেশ প্রতিপালন করিবার যে সাহস যে বীৰ্য্য তাহা স্মৃষ্ট আছে, তাহা পুনঃ জাগ্রত করিতে হইলে বাহিরের আঘাতই শ্রেষ্ঠ উপায় নহে—ভিতর হইতে বিদ্রোহ বেগে উঠকে বাহিরে বিস্তার করিতে হইবে। তাহাকে যে তপস্বী করিতে হইবে তাহাতেই একনিষ্ঠ সাধকের মত সে প্রবৃত্ত আছে, বাঙালী মরে নাই, মরিতে পারে না।

বাঙালীর যে তপস্বী তাহা ব্যক্তিগত নহে, জাতিগত—সেইজন্ত ইহা যত স্পষ্ট ও সরল করিয়া তুলিতে পারা যায়, তাহার প্রচেষ্টা ভাল। নীরব সাধনার অন্তরায় আছে। প্রথমতঃ নিজেদের মধ্যে উহার ব্যাপ্তি ঘটে না, দ্বিতীয়তঃ বাহিরের লোক কোতুলপরবশ ইহাকে নানা বিকৃত আকারে প্রকাশ করিতে থাকে, এতদ্ব্যতীত রাজকর্তৃপক্ষগণও ইহার উদ্দেশ্য অবধারণে অসমর্থ হইয়া নানাদিক দিয়া আঘাত করিতে পারেন। হয়ত আমাদের অকারণ অনেক আঘাতই সহ করিতে হইবে, কিন্তু ততাত্ আমাদেব সত্য পতিটিকে কোন মতেই ফুটল ও কুটিল করিয়া তুলিব না, মহাত্মা গান্ধী রাজশক্তির অজ্ঞায় আচরণে উতাক্ত হইয়া ইহার, প্রতিবিধানস্বরূপ এক প্রকার সংগ্রাম ঘোষণাই করিয়াছেন, আমরা শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত সহ করিব, আমাদের মধ্যে যে ধৃতিশক্তি আছে তাহাকেই জাগ্রত করিয়া তুলিব, সিদ্ধি না আসা পর্যন্ত, সাধনার যত বিঘ্ন, যত বিভীষিকা, যত প্রলোভন, তাহা অকাতরে উপেক্ষা করিব। আমরা চাই ভগবানের ইচ্ছাটিকেই জীবনের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া তুলিতে, এবং সেই দিনটা না আসা পর্যন্ত, যাহা কিছু ঘটবে, তাহা অপরিহার্যরূপে গ্রহণ করিয়া শঠৈঃ শঠৈঃ অগ্রসর হইব। আমাদের হৃদয় দিয়া অনুভব করিব, সহস্র লক্ষ কোটি মানুষের জন্ম, বাচিরের ঘটনা অবলম্বন করিয়া আমরা কাহারও সহিত ঐক্য সংস্থাপন করিব না, আজ হিন্দু মুসলমানের মিলন দেখিয়া বাহারা আশান্বিত, তাহাদের একেবারেই অন্তর্দৃষ্টি নাই, এ মিলন স্থায়ী হইতে পারে না, প্রতিবিধিংসাংসাধনে শত্রুর সহায়তা গ্রহণ করিতেও শত্রু কুণ্ঠা প্রকাশ করে না, অবশ্য মুসল-

যদি যে আমাদের শত্রু একথা বলি না, তবে ঘটনার আবর্তনে, উক্ত-জন্য কুহকে এই ঐক্যস্থাপন আশাশ্রম নহে বলিয়াই আমরা এমন কথা বলি। জাতির প্রতি-ব্যাপ্তি, সে হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খৃষ্টান হউক সর্বত্র আপনাকে পাইবে, এই আপনার পাওয়ার মধ্যে যদি কাহাকেও পাওয়া যায়, তবেই সংসারের মধ্যে অচ্ছেদ্য মিলন সম্ভব, এই একমাত্র উপায়েই আমরা জাতিগত মিলন ঘটাইতে পারি।

সেই জন্ত আজ আমাদের সর্ব প্রথম কার্য এই আপনাকে জানা এবং পাওয়া। পাশ্চাত্যপ্রভাববিশিষ্ট রাজসিকভাবাপন্ন ভারতবর্ষ একে-বারে বাহির ছাড়িয়া ভিতরে আসা সর্বনাশের কারণ হইবে বলিয়া মনে করেন, বাহিরের এতখানি সৃষ্টির মায়া সহজে তাঁহারা ছাড়িতে পারেন না, কিন্তু জাতির সত্য রূপটি গ্রহণ করিতে হইলে, যে সর্বস্বই উৎসর্গ করিতে হয়, এই নীতিটি তাঁহাদের বুঝা উচিত। অহঙ্কারের যে রচনা তাহা বোঝার মত ঘাড়েই চাপিয়া বসে; এম দিন থাকিতে উঠা চাইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আসি, আমরা আপনাকে খুজিয়া বাহির করি, এই স্বরাজ্যে যে সম্পদ ও ঐশ্বর্য আছে, তাহাই যখন বাহিরে ব্যাপ্ত হইবে, তখনই ত তোমার সৃষ্টি সার্থক এবং তখনই ত তুমি স্বরাট ও সম্রাট রূপে পরমানন্দের অধিকারী হইবে।

ভারতবর্ষ যুরোপ নহে। যুরোপের সাধনা ভারতের উপযোগী নহে। আমরা আজ শত বর্ষ ধরিয়া যুরোপীয় শিক্ষায় আপনাদিগকে জ্ঞানী করিয়া তুলিয়াছিলাম। আত্মজ্ঞান ও আত্মভাব হইতে বঞ্চিত হইয়া একেবারে পরমুখাশ্রয়ী ও পরানুকরণপ্রবণ হইয়া পড়িয়াছি। আজ যাহারা ভগবানের দিব্য প্রেরণা লাভ করিয়া নিজের স্বরূপ বোধে সমর্থ হইয়াছেন, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁহাদের কর্ম নাই, বিপুল কর্ম পড়িয়া রহিয়াছে আপনার জাতির মধ্যে। আমরা দেখিতে পাই, এই প্রেরণায় উদ্ভূত হইয়াও, বহু ব্যক্তি নিতান্ত তামসিক ভাবে জীবন যাপন করিতেছেন, জাতির মধ্যে এই পরাজ্ঞান প্রচার করিতে গিয়া একেবারেই জগন্নাথ হইয়া বসিয়াছেন, তাঁহাদের কর্ম হইয়াছে ছোটো ভাল কথা বলা, এবং পায়ের ধুলা দেওয়া। পৃথিবীর সকলবিধ অতীত ও বর্তমান মান্যর প্রভাব হইতে বীরের মত আপনাকে অপসৃত করিয়া, ভারতের বিপুল কর্ম করিবার জন্ত এক অসাধারণ চরিত্র লাভ করিতে হইবে। আমরা হই

সম্যাসী, কিন্তু অগ্নের অন্নস্বষ্ট চুরি করিয়া নহে, নিজেদের স্বষ্টি সামর্থ্যকে
বিকশিত করিয়া তুলিব, নিজের অনন্ত সম্পদ, অক্ষরন্ত সিদ্ধি, জগদ্ধিতার
অর্পণ করিব, এইরূপ অসংখ্য সম্যাসীর সম্পদরাশি একত্র করিয়া
বর্তমানের উন্নাদিনী উত্তেজনা শৃঙ্খলিত করিয়া স্থির লক্ষ্যের দিকে অগ্র-
সর হইব।

মহাত্মা গান্ধী আজ যে দেবশক্তির আভাবনীর লীলা প্রকট করিয়া
তুলিবার মনস্থ করিয়াছিলেন, তাহা এরূপ ভাবে ব্যর্থ হইল কেন? কেন
তিনি আজিকার পাণের বোঝা নিজের ষাড়ে ছুটিয়া, সভাগ্রহ হইতে
মুহূর্তের জন্যও বিরত হইলেন? এমন ভীষণ পরাজয় ঘটিল কেন?
আধার প্রস্তুত হয় নাই—সর্বপ্রায়ে আনাদিগকে আত্মচরিত্র সংশোধনের
অন্ত উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে। ভারতের প্রাণে যে যোগশক্তি
সুপ্ত আছে তাহাকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে, আয়োচিত জ্ঞানভূষণ
ও কর্মশক্তির উদ্দীপনা জাতি যাহাতে অবধারণ করিতে পারে তাহার
অধ্যয়ন করিতে হইবে। জাতির অন্তঃকরণ এই ভাবে গড়িয়া উঠিলে,
যাহা প্রেরণ, ভারতবর্ষ অনামাসেই তাহা সম্পন্ন করিয়া, জগতে আধ্যাত্মিক
অটুট রাখিতে সমর্থ হইবে।

আমরা চাই এই অন্তঃকরণকে গড়িয়া তুলিতে; জাতির মানস গঠন
করিবার জন্য হাজার হাজার উৎসর্গীকৃত দেবচরিত্র যুরক প্রস্তর হও,
এই ভাগবত কার্যে প্রত্যাবার নাই, বিস্র নাই—সমাজ ধর্ম, জাতিগত সকল
কর্মই নির্ভর করিতেছে—এই সাধনার উপর—সমুখে বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র,
দেবকার্যে ভগবানের সহায়তা আছে, রামধেন রক্তচক্ষু দেখিয়া আমরা
ভীত হইব না।

প্রবর্তক ৪র্থ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা

১৫ই বৈশাখ, ১৩২৬

পূর্ণ আদর্শ

তাব ধ্বন থাকে অম্পষ্ট ও কুরাসাবৃত, তখন অল্পকূল ও প্রতিকূল ঘটনায় মানুষের কর্ম হয় অসংলগ্ন, অনির্দিষ্ট ও বিক্ষিপ্ত। কাজেই মানুষ এরূপ অবস্থায় সকল কর্মেই প্রতিহত হইয়া প্রতিঘাতই করিয়া থাকে, তাই ভাবের কথা কহিলে কাজের লোক তাহাতে কর্ণপাত করে না, ভাব-মূর্ত্ত হইয়া উঠিলে দলে দলে লোক তাহার পূজা করিতে সমবেত হয়, তখন কাজকে ঘিরিয়া গড়িয়া উঠে সমাজ, সমিতি, সম্প্রদায়।

সত্য কথা, কি করিতে হইবে জানা না থাকিলে, মানুষ কি লইয়া দলবদ্ধ হইবে? আমাদের দেশে বহুশ্রেণীতে মানুষ যে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে তাহা এই ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতিগত ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ লইয়া— এই আদর্শ লইয়াই মতবাদ, যুক্তি তর্ক, বিবাদ বিসম্বাদ।

মানুষের মনোবৃত্তি চরিতার্থ করিতে হইলে, উপযোগী আদর্শ সৃষ্টি করিতে হয়, মানুষের প্রকৃতি সমান নহে, সেইজন্ত ভিন্ন ভিন্ন আদর্শের সৃষ্টি। অধুনা দেশের মধ্যে যে সকল দল-গঠন হইতেছে, কেন্দ্রশক্তি তাহার আদর্শ। কালানুক্রমে আদর্শের নিত্য পরিবর্তন, কাজেই দলাদলির প্রকোপ বে বৃদ্ধি-পাইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

যে সকল উচ্চ আদর্শ লইয়া মনুষ্যসমাজ গড়িয়া উঠে, তাহার দুইটি গতি। একটা এপারের ইহসর্বস্ব জগৎকে জড়াইয়া, ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ হইবার আকাঙ্ক্ষা, অপরটা পরপারের—একান্তই ইহবিমুখ, যতটুকু জীবন-ধারণের প্রয়োজন ততটুকু হেলায় ছেদ্য করিয়া চলিয়াছে। রাজনীতি সমাজ লোকশিক্ষা প্রভৃতি যে সকল অল্পমান দেশে দেখা দিয়াছে—সেইগুলি ইহজগতের হিতসাধনকামনায়, আর সন্ন্যাস, বৈরাগ্য,

পরোপকার প্রভৃতি বিবিধ আত্মগঠনিক কর্ম লইয়া বাহ্য গড়িয়া উঠিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়রূপে, তাহা একেবারেই আধ্যাত্মিক। ইহজগতের দানটুকু কেবল শুদ্ধির জন্ত, পরন্তু মর্ত্যের ভাবনা এখানে একেবারেই স্থান পায় না।

ইহজগতের যে কর্ম, তাহা একেবারেই বস্তুতন্ত্র—তাহার পরিবর্তন আছে, পরিবর্তন আছে, গতি আছে, স্থিতি আছে আবার লয়ও আছে। এইজন্ত কর্মমাত্র অবলম্বন করিয়া যে সকল সমাজ গড়িয়া উঠে, তাহার প্রতি ব্যক্তিজীবনের ধর্ম ইহা নহে, যে চিরদিনই একই সমষ্টির অন্তর্গত হইয়া থাকিতে হইবে। আদর্শের গতিভঙ্গীই সময় সময় ইহাদিগকে নিবিড় বন্ধনে অটুট করিয়া তুলে, আবার সময় সময় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন পরস্পর বিল্লিষ্ট করিয়া দূরে নিক্ষেপ করে, একটি সমাজ ভাঙ্গিয়া সহস্র সমাজের সৃষ্টি হয়, আবার কর্মের আবর্তনে সেই সকল এক হইয়া বিরাট শক্তিশালী একটি কেন্দ্রও নির্মিত হইয়া উঠিতে পারে, পরন্তু এমন কিছু নিশ্চয়তা নাই যে এইগুলি চিরদিনই বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিবে, অথবা একটি কেন্দ্রে অটুট হইয়া সেই সকল অবস্থান করিবে। ইহাদিগকে চিরদিনই পৃথিবীর সহিত সংগ্রাম করিয়াই চলিতে হয়, নানা বিরুদ্ধ শক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে স্বভাবতঃই ক্রমশঃ এইগুলি এমন শক্তিশালী হইয়া উঠে যে, তখন ইহারা সম-উদ্দেশ্যে ও আদর্শে একপ্রাণ হইয়া জাতি-সৃষ্টি করিয়া বসে, কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি জগৎ যেমন পরিবর্তনশীল, মাহুষের এই মিলনও সেইরূপ স্থায়ী নহে, এইজন্ত জগতে আমরা নিত্য নূতন জাতির সৃষ্টি দেখিতে পাই।

ওপারের যে আদর্শ—উহা এতটা চঞ্চল এতটা অস্থায়ী নহে। বাহিরের সহিত ইহাদিগকে খুব অল্পই যুদ্ধ করিতে হয়, যা কিছু দ্বন্দ্ব—সম্ভরের, ভিতরের শক্তি এই সকল সাধকের খুবই উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, কিন্তু আদর্শ একেবারেই উজ্জ্বল, অধ্যাত্মউন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইহারা উপরের দিকেই উঠিতে থাকেন, এবং ক্রমে মর্ত্যের ধুলিরাশি ছাড়াইয়া এমন এক-দেশে ইহারা উপস্থিত হন, যেখানে জগতের কোলাহল একেবারেই পৌছিতে পারে না, জীবন সেখানে অসাড়, বাহির সেখানে মৃত, তুরীয়ের সে অভূতপূর্ব আনন্দই হইতেছে ইহাদের সবথানি—সেইজন্ত জীবনের সহিত সম্বন্ধতাগই ইহাদের পক্ষে অনিবার্য হইয়া পড়ে।

সাম্প্রদায়িক গোলযোগ একেত্রে বড় প্রকট হইয়া উঠিতে পারে না। সম্ভরের বিশ্বাস ভক্তিই এ পথের পাথর, এবং ঐগুলি একেবারেই নিঃশব্দ,

পরের ভাণ্ডার হইতে গ্রহণ করিতে হয় না। কাজেই সমধর্মীর আচরণ বিমুক্তিকর হইলেও, প্রতি ব্যক্তির সাধনার পথে তাহা অন্তরায় সৃষ্টি করিতে পারে না। উপেক্ষা ও উদাসীনতা দ্বারা অনায়াসেই ইহা অতিক্রম করা যায়।

জীবন লইয়া যাহাদের খেলা, তাহাদের সমষ্টিগত হইয়া থাকিতে হয়, জীবনের খরতর গ্রবাহে ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইলেও, পুনঃ পুনঃ দলবদ্ধ হইবার বিঘ্ন ঘটে না, এবং এই সকল একত্র মিলিয়া মিশিয়া বৃহৎ কর্ম সাধন করিতেও অসমর্থ হয় না। কিন্তু ধর্মের আদর্শ লইয়া যে সমষ্টি তাহা জীবন লইয়া নেহে, অতএব সমষ্টিগত সাধনার অপেক্ষা ব্যক্তিগত মুক্তি ও সিদ্ধিই এখানে লক্ষ্য, সেইজন্য জাতিগত ঐক্য এখানে কোন কালেই সম্ভবপর হয় নাই। যে সকল ধর্মসম্প্রদায়ে ইহার অস্ত্রা দেখা যায়, তাহাদের অন্তর একেবারেই ওপারের টানে ভরপুর নেহে, ইহজীবনের দিকেও ঝোঁক আছে, আমরা ইহাদের কথা বলিতেছি না।

মোটামুটি কথা, মানুষ যে দলবদ্ধ হয় তাহা ধর্মের জন্য হউক, সমাজের জন্য হউক আর রাজনীতির জন্যই হউক, উহার মূল ক্লারণ আদর্শ। আদর্শ স্থাপন করিতে না পারিলে, ভিন্ন ভিন্ন মানবপ্রকৃতি একত্র মিলিয়া কোন বৃহৎ কর্মই সাধন করিতে পারে না। ভাবকে রূপ দিতে হইলে মর্ত্যই হইতেছে তাহার প্রতিষ্ঠানক্ষেত্র, এই মর্ত্যজীবন পরিত্যাগ করিয়া যাহারা শুধু পরপারের দিকেই চলিয়াছেন, তাহাদিগের সহিত আমাদের কোনই সম্বন্ধ নাই, আমরা তুরীয়ার যে বিপুল আনন্দ তাহারই অজস্র ধারায় এই জীবনকে অভিষিক্ত করিয়া ধন্য হইতে চাই, স্বর্গের মন্দাকিনী মর্ত্যে বহিয়া আনিব, ভগবানের স্পর্শ সব দিয়া অমৃত্যু করিব, ইহাই হইতেছে আমাদের আদর্শ, কিন্তু এই আদর্শ কেমন করিয়া সংস্কৃত করিয়া তুলিব, তাহার পথটী স্বপ্নের মত আধ আলো আধ অন্ধকারে ঢাকা, তাহা অব্যক্ত, অনির্বচনীয়—এই অবস্থায় মানবজাতিকে বিরাট ঐক্যস্থত্রে আবদ্ধ করিয়া, সকলে মিলিয়া হাত ধরাধরি করিয়া কেমন করিয়া আনন্দের পথে একই সঙ্গে ছুটিব, তাহা আমরা ভাবিয়া পাই না।

মানুষ যে একেবারেই বুদ্ধিজীবী—তাহারা যে মুক্তি ও বিচারের বিনা সাহায্যে এক পাও আগাইয়া যায় না, আদর্শকে নানা বর্ণে চিত্রিত করিয়া তাহাদের চলিবার পথটিকে আঁকিয়া সম্মুখে না ধরিলে, তাহারা যে

ফিরিয়াও চোখে না। এই অস্থায়ী মায়াচিত্র অবলম্বন করিয়াই মানুষ তুমি কি চিরদিনই পথ চলিবে, আত্মাকে ছাড়িয়া তাহার ছায়ার অনুসরণ করিয়া আজও কি ক্লান্ত হইয়া পড় নাই, মানুষের হৃদয় অনাদরে ঠেলিয়া তুমি কোথায় কোন্ পথে ছুটিয়াছ, কোথায় তোমার শান্তি, কোথায় তোমার শক্তি, প্রেম, ঐক্য? দেখ এই অস্পষ্ট মায়া-আবরণ ভিন্ন করিয়া আমার অন্তরের অন্তরটিকে, বাহিরের আদর্শ ও তাহার চিত্রিত পথটা ধলায় লুটাইয়া দিয়াছি, তাই সত্য আকর্ষণে দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে তোমার সহিত আমার যে নিত্য সম্বন্ধ। বাহা আজ আছে কাল নাই, বাহা কালের সহিত নিত্য পরিবর্তনশীল, তাহার আলোকলো আমাদের প্রেমবন্ধন অটুট স্থায়ী হইবে না, নিত্য সুন্দর ও মঙ্গল মিলনের যে অমানুষিক প্রভাব, তাহার লীলা প্রকট করিয়া তুলিতে হইলে আজ আমাদের পাওয়ার আনন্দ দিয়াই পরস্পরকে পাইতে হইবে, অন্তরের নিগূঢ়ে যে পরমানন্দময় পুরুষ নিত্য অবস্থিত, তাহারই মধুর বংশীরবে জাগাইয়া মাতাইয়া তুলিতে হইবে মানুষের এই নিগূঢ়তম পরমাত্মাকে— এই আত্মার অমৃত-ডোরে পরস্পর বাঁধাবাঁধি হইয়া, কেবল পরপারের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িব না, পরন্তু স্বর্গের সকল ঐশ্বর্য্য ভারে ভারে বহিয়া জীবনক্ষেত্রকে নুতন ও ঐশ্বর্য্যময় করিয়া তুলিব, জীবন হইবে ভগবানেরই সৌগ-নিকেতন। হে মানুষ! কণ্ঠ করিতে চাও কাহার জন্য যদি ভগবানকে না পাও, এবং এই পাওয়ার স্তূপ কি, যদি ইহা বৃহৎ ও বিস্তৃত হইয়া মানবজাতির হৃদয় উদ্ভাসিত না করে—দূর হইতে দেখিতেছ যেন অস্পষ্ট কুহেলিকায়—নিরুটে আসিয়া দেখ—

“মোহসাবনৌ পুরুষঃ মোহহমস্মি”

অ. ১৩ঃ

আমরা ভয় জিনিষটাকে একেবারেই ছাড়তে চাই। ভয়ে ভয়ে অস্পষ্ট জীবনযাত্রা নিকাশ করা মহাপাপ। কিন্তু অধুনা দেশের অবস্থা এমনই দাঁড়াইয়াছে, যে গোপন করিয়া চলাই যেন বুদ্ধিমানের কার্য, কেননা এই ভাবে অনেক দিন টিকিয়া থাকা যায়।

আমি তোমাকে ভালবাসি, তোমাকে না দেখিলে থাকিতে পারি না, কিন্তু প্রকাণ্ডে তোমার সঙ্গে মিশিলে, গুপ্ত পুলিশের চক্ষে পড়িব, হয়ত আমার ভবিষ্যৎ একেবারে মাটি হইয়া যাইবে, অতএব আমাদের সম্বন্ধটা গোপন থাকাই ভাল। আমরা যাহা করিব, যদিও জানি তাহা সং ও শুভ, লগতের অমঙ্গল চিহ্ন তাহার ভিতর নাই, তবুও কি জানি আজকাল দিন ভাল নয়, অনর্থক সবদিক মাটি করিয়া লাভ নাই। এইরূপ যুক্তি তর্কের যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান থাকিলেও, আমরা এই অস্পষ্ট নীতি একেবারেই পরিহার করিয়া, দেশে সরল ও স্বচ্ছন্দ জীবনের আদর্শ স্থাপন করিতে চাই।

মৃত্যুকে পাওয়া ও তাহাকে জাতির জীবনে ছড়াইয়া দেওয়া অপকর্ম্য নহে, এবং মহৎ জীবনেরই পরিচয়, কিন্তু প্রকৃতির পরীক্ষা কঠোর, হয়ত দুঃলোকের ভিতর দিয়া তিনি এমন আঘাত দিতে পারেন যাহাতে আমরা প্রথম পদক্ষেপেই স্তম্ভিত হইয়া যাইতে পারি, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে ইহা পরীক্ষা। যে উচ্চ আদর্শ জীবনে বহিয়া আমরা মানুষের মন উল্টে উত্তোলন করিতে ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, তাহা সফল করা দুর্ভলচিত্তজনের পক্ষে সম্ভবপর নহে, আমাদেরকে খুবই শক্ত মানুষ হইতে হইবে, এবং ধর্মের জন্ত সত্যরক্ষার জন্ত অকারণ নানাবিধ দুর্গতি সহ্য করিতে হইলেও ভবিষ্যতে আমরা বিজয়লাভ করিবই—সেইজন্ত আজ দেশে যুবকগণের মধ্যে যে সঙ্কোচ যে অস্পষ্টতা আছে, নূতন আদর্শের নিকট তাহা পরিত্যাগ করিয়া, বেশ স্পষ্টতা ও স্বচ্ছন্দতা লইয়া আমাদের উঠিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

একটা কথা গুনিতে পাই, এই অধ্যাত্মযোগসাধনরত যুবকসমূহকে লক্ষ্য করিয়া অনেকেই বলেন—ধর্ম ইহাদের ডান, রাজবিদ্রোহ উপস্থিত করাই ইহাদের আসল উদ্দেশ্য। পরের মুখে ঝাল খাইয়া আমাদের উত্যক্ত হইবার প্রয়োজন নাই, আমরা নিজেদের বুকে হাত দিয়া অহুক্ষণ দেখিব আমরা কি এবং কি করিতে চলিয়াছি। অবশ্যই সাধারণভাবে জীবনযাপন উদ্দেশ্যে আমরা আসি নাই, আমরা আসিয়াছি ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছা জীবন দিয়া সফল করিয়া তুলিতে, সেইজন্য আমাদের জীবনভঙ্গী সাধারণের সঙ্গে মিলিবে না, বাংলার কোন সম্প্রদায়বিশেষের সহিতও আমরা মিশিয়া যাইতে পারিব না, স্বতন্ত্র স্বাধীনভাবে তাঁর ইঙ্গিতে চলিব, এবং সমগ্র জাতিকে এই উদার সার্বভৌমিক নীতি অবলম্বন করিতে শিক্ষা দিব। আমরা বুঝিতে পারি না, এই আদর্শের বিরোধী হইবে কাহারো? সকলেই কি ভগবানের ইচ্ছায় পরিচালিত হইবার আকাঙ্ক্ষা করেন না, সম্রাট হইতে দীনহীন কান্দাল পর্যন্ত কি এই বিরাট ধর্ম গ্রহণ করিবার জন্য উদগ্রীব নহেন? জগতে মানুষের অজ্ঞাতে যাহা ঘটতেছে, তাহাকেই জ্ঞান দিয়া উপলব্ধি করিব, এবং এই জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ জনসংঘকে আপনার জন বলিয়া আলিঙ্গন করিব, তা সে ইংরাজ হউক, মুসলমান হউক, হিন্দু হউক—এ জগন্নাথের মন্দিরে ত জাতিপিচার নাই।

যাহারা মনে করেন তোমাদের এত মাথা ব্যথা কেন? তাহাদের কথার উত্তর নাই। বুদ্ধের, শঙ্করের, চৈতন্যের, বিবেকানন্দের যদি মাথা ব্যথা হইয়া থাকে, আমাদেরও হইবে না কেন? আমরাও ত মানুষ হইয়া জন্মিয়াছি, আর এই মাথাব্যথাও যাহার ইচ্ছায় ঘটয়াছে, যদি দুঃখ পাই, যদি লাজিত উপেক্ষিত নির্ধ্যাতিত হই, তার ফলভোগী আমরা নহিঁ। এইজন্য সর্বপ্রথমই সেই অজানিত পরাৎপর পুরুষের ত্রীচরণে জীবনের সর্বস্ব উৎসর্গ করিয়া তাঁর নির্দেশে জীবন-তরণী চালাইয়াছি, এক্ষণে ইহার উপর যে কোনরূপ ছর্ষটনা ঘটুক, তিনিই রক্ষাকর্তা। মানুষের অজ্ঞানতা অবলম্বন করিয়াই হয়ত তিনি আঘাত করিয়া দেখিতে পারেন আমাদের উৎসর্গ পূর্ণ হইয়াছে, কি না।

*

*

*

আমরা দেখিয়াছি, ভগবান এতদিন ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যেই তুরীয়ার আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন, আত্মমুক্তি ও সিদ্ধি কতিপয় ভক্ত ও শিষ্যসমষ্টির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, জাতিগত ভাবে ইহার ব্যাপ্তি ঘটিলেও, তাহা ব্যক্তিগত মুক্তিরই সাধনা, দেহপ্রাণ হইতে আপনাকে সরাইয়া নির্মাণ লাভই ছিল তাহার উদ্দেশ্য—এক্ষণে ভগবান, কিছুকে ত্যাগ করিয়া নহে, সমস্তকেই ভাগবতভাবে পূর্ণ করিয়া ভোগ করিতে চাহিতেছেন, স্বর্গের অমৃত পৃথিবীকে নতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাঁর এই অমোঘ প্রেরণা আমাদের জীবন দিয়া মূর্ত হইয়া ফুটিতে চাহিতেছে, আমরা করিব কি? প্রশান্তচিত্তে, অতী হইয়া এই রক্ত মাংসের আধারটিকে প্রকৃতির শত বজ্রাবাতের মধ্যে ধরিয়া তাঁহার কঙ্কণায় বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি—এস হুঃখ, এস কষ্ট, এস নির্ধ্যাতন, এস মৃত্যু, আবার এস শান্তি, এস আনন্দ, এস স্তুতি স্তব্যাতি অমৃত—সমান ভাবে সকলই গ্রহণ করিব।

*

*

*

অনেকেই বলেন এ তোমাদের কেমন সন্ন্যাস? আমরা বলি গৈরিক-বাস পরিধান করিয়া সম্পূর্ণ জীবনবিকাশকে ক্ষুণ্ণ করিয়া কোন বিশিষ্ট অবস্থা অবলম্বন করা খণ্ড ধর্ম, আমরা সকলই উৎসর্গ করিয়াছি, এক্ষণে এই জীবন লইয়া তিনি যে কোন কার্য করিতে পারেন, আমাদের তাহাতে আপত্তি থাকিতে পারে না। যদি কেহ গৈরিকবাস পরিধান করিয়া কায়মনোবাক্যে বলিতে পারেন ইহাও তাঁহার ইচ্ছা, আমরা সাদরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিব। আমরা চাই সেই জাতি, যে জাতিটী একেবারেই ভগবানের সত্য খেলাটী জ্ঞানসহকারে উপলব্ধি করিয়া পরমানন্দে মর্ত্যধামে অবতীর্ণ হইয়াছে—চাই ভগবানকে, চাই তাঁহার পূর্ণস্বরূপটিকে তা সে যে আকারেই যে-রূপেই আবিভূত হউন।

*

*

*

এস ভগবান, আমার জীবন দিয়া মর্ত্যের রসাস্বাদ কর, আমার জীবনের সকল ভঙ্গী বিকশিত করিয়া তোল, আমার সকল স্তম্ভ প্রবৃত্তি জাগ্রত হউক, আমার সকল গোপন প্রকাশ হইয়া পড়ুক, আমার জীবন রূপে ঐশ্বর্যে শক্তিতে প্রেমে আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠুক, শুধু আমার

একার জীবন নয় সমগ্র জগতের—মানুষ তোমার অরূপেই গড়িয়া উঠুক, পৃথিবী স্বর্গরাজ্যে পরিণত হউক।

এই অভাবনীয় কর্ম সম্পাদনের যে কৌশল, যে প্রণালী তাহাই আজ আমাদের অবলম্বন করিতে হইয়াছে; দান লইয়া অর্থসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিলে, পাছে অসিদ্ধি বিকাশের বিলম্ব হয়, তাই নিজের জীবন দিয়া অতুল ভাণ্ডারের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহার রূপ ছুটিয়া উঠিতেছে বাণিজ্য ব্যবসারে, কৃষিতে, রাজসেবায়, পৃথিবীর নানা কর্মক্ষেত্রে—ভাবের উৎস পাছে রুদ্ধ হইয়া পড়ে মানুষের খণ্ড ধর্মশাস্ত্রে, তাই সকল গ্রন্থ-মাথায় করিয়া বসিয়া আছি অন্তর্দেবতার উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্ত, অন্তরে সে ভাব সূর্য্য-কিরণের মত সাধকের হৃদয়ে হৃদয়ে ছড়িইয়া পড়িতেছে, বিদ্যাতের মত আকর্ষণ করিতেছে পরস্পরের হৃদয়খানি পরস্পরের সঙ্গে মিশাইবার জন্ত—ভাষায় কেমন করিয়া প্রকাশ করিব, আজ বাহা অনুভব করিতেছি, বাহা করিতে ছুটিয়াছি?

ভাষা অতি দীন, লিখিয়া এ অনন্তভাব প্রচার অসম্ভব—ভগবান তাই দেশে দেশে সংঘসঙ্ঘির আদেশ দিতেছেন, সাধুসঙ্গলাভ না করিলে এ নব ধর্ম অনুভূত হইবে না। কিন্তু দেশের বর্তমান অবস্থা আমাদের অজ্ঞাত নহে, আমরাও গ্রহবৈশিষ্ট্যে কম বিপর্য্যস্ত নহি, কিন্তু অসহায় দুর্বল-আধারেই তাঁর মহিমা বিস্তার সম্ভব হয়, ঘোরতর দারিদ্র্যের মধ্যেই দিব্য ঐশ্বর্যের বিকাশ যুগে যুগে ঘটয়াছে। অহংকারের প্ররোচনায় উন্নত হইয়া আমরা অসীম হৃৎক ভোগ করিয়াছি, এখনও করিতেছি, কিন্তু সে হৃৎক সমুদ্রের মধ্যে অমৃত-ভাণ্ড উঠে নাই, আজ সত্যের জন্ত ভগবানের জন্ত আমরা জাতিকে উদ্ধৃত্ত করিতেছি, বাহ্যপ্রকৃতির সঙ্গে তুল্য সংগ্রাম করিয়া এই বিরাট অধ্যাত্মরাজ্য আমাদের প্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে, পথ কুহুমাক্ষয় নহে, নিরাপদ নহে, কঠোর সাধননিরত শক্ত মানুষকেই এইপথে অগ্রসর হইতে বলি, দুর্বলচিত্ত উত্তেজনাপূর্ণ হীনপ্রাণ ব্যক্তির দূরে দূরে থাকাই শ্রেয়ঃ।

তত্ত্ব-সাধনা

(১)

সকল মানুষের মধ্যেই হই রকম প্রবৃত্তির খেলা দেখিতে পাওয়া যায়। একটা নীচের দিকের, অপরটা উর্দ্ধের। নীচেরদিকের যে প্রযুক্তি তার প্রধান-লক্ষণ আহার নিদ্রা মৈথুন, একান্ত মর্ত্যের যেনখর ভোগ তাহাই, আর উপরের দিকে যে টান, তাহা অপার্থিব, সত্য ও আনন্দময়, উহার নিকট পৌছিতে পারিলে মানুষ দেবজন্ম লাভ করে। এই হইদিকের টানে পড়িয়া মানুষ কখন নীচের দিকে অধিক ঝুঁকিয়া পড়ে, আবার কখন বা উচ্চ ও মহৎ জীবন লাভের আকাঙ্ক্ষায়, যাহা কিছু অসাধারণ, যাহা কিছু অসম্ভব, তাহাকেই সাধ্য ও সম্ভব করিয়া তুলিবার জন্ত প্রাণপণ পরিশ্রম করে, মূলতঃ এই উভয় শ্রোতের মধ্যবর্তী মানুষ অসহায় হইয়া ক্রমাগতই এদিক ওদিক করিতেছে।

প্রবৃত্তির একটানায় মানুষ কুত্রাপি চরমে উপনীত হয়। যাইতে যাইতে শ্রোতের গতি পরিবর্তিত হয়, কখন বা একটা শ্রোতঃ সংস্রপারে বিভক্ত হইয়া পড়ে, কখন বা একেবারেই রুদ্ধ প্রতিহত হইয়া পশ্চাতে আবর্তিত হয়, আবার কখন বা বহুবিচ্ছিন্ন শ্রোতধারা একত্র মিলিত হইয়া, বিস্তৃত ও উচ্ছলিত ধরপ্রবাহে মানুষকে বহুদূরে আগাইয়া দেয়, পিছাইয়া দেয়, একই মণ্ডলে বহুবার ঘুরাইতে থাকে, আছাড়িয়া আছাড়িয়া উপরে তুলে, অতলে ডুবাইয়া দেয়, প্রবৃত্তির উদ্দাম উচ্ছ্বল গতিভঙ্গিমায় তাহাকে নাকানি চুবানি খাওয়াইতে থাকে।

জীবনসম্পদন স্তব্ধ না হইলে এই বিচিত্র প্রবৃত্তিশ্রোত হইতে প্রতিনিবৃত্তির উপায় নাই। হু ও কু উভয় প্রবৃত্তির গতিভঙ্গী একই প্রকারের, উভয়ই মানুষকে কোন এক অজ্ঞাত প্রদেশে পৌছাইয়া দিবার জন্ত ধর-শ্রোতে বহমান, এই প্রবৃত্তিশ্রোতে ভাসিতে ভাসিতে মানুষের প্রকৃতিগত বিচিত্র পরিবর্তন সম্পাদিত হয়, মানুষের অন্তর ও বাহির নূতন ভাবে গড়িয়া উঠিতে থাকে। উপরের টানে বাহারা পড়িয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গে নীচের টানের মানুষের বাহিরে কোন মিল খুঁজিয়া না পাইলেও এক হিসাবে অন্তরগত বিশেষ পার্থক্য নাই। একজন নিয়মুখী প্রবৃত্তিশ্রোতে ব্যাকৃষ্ট নিমজ্জিত

হইয়া, তীব্র হলাহলজর্জরিত ক্ষীণকলেবর হইয়া দেহপাত করে, আবার নবজন্ম পরিগ্রহ পূর্বক অশেষ পারাবার উত্তীর্ণ হইবার জন্ত পুনঃ পুনঃ উজানশ্রোত তৈলিয়া অগ্রসর হইতে থাকে, অপরজন উর্জের কিছু অন্ন তরঙ্গসঙ্কুল অকুল পাথারে সাতার দিতে দিতে নিজের অস্তিত্ব ধ্বংস করিয়া বসে, আবার নূতন শক্তি আহরণ করিয়া জন্ম জন্ম এই দ্বন্দ্বের পারাবার অতিক্রম করিবার প্রচেষ্টা করে।

উভয়ের উদ্দেশ্য একই। জ্ঞানে অজ্ঞানে একটা লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে উভয়েই ছুটিয়াছে, কিন্তু বিভিন্নমুখী হইয়া, একদিকে ছুটিতে ছুটিতে প্রত্যক্ষভাবে, রক্ত মাংস অস্থি খসিয়া খসিয়া জীবন নিঃশেষ হয়, অপর দিকে পরিণাম একই, কিন্তু এমন বীভৎস দৃশ্য সেদিকে দেখিতে হয় না, শুকাইয়া শুকাইয়া নির্জীব অসাড় হইয়া জীবন সেথায় ঘুমাইয়া পড়ে।

কত হাজার হাজার বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, মানুষের বুদ্ধিতে এই উৎকট ব্যাধির প্রতীকার উপায় নির্দ্ধারিত হইল না। যদি ভগবানের পথে চলিতে হয়, অনিবার্যরূপে তোমার জীবনের আশা ছাড়িতে হইবে, আর যদি জীবন বাঁচাইয়া চল, ভগবান কিছুতেই মিলিবে না। হয়, জীবন না থাকিলে ভগবান দাঁড়াইবেন কোথা? আবার ভগবান না পাইলে জীবনই বা থাকিবে কেন? কিন্তু শরীরের সহিত আত্মার, প্রতিষ্ঠানের সহিত দেবতার মিলন আজও পর্য্যন্ত ঘটয়া উঠিল না, অথচ একটা অপর-টাতে ভর দিয়াই দাঁড়াইতে পারে, অন্ততঃ মর্ত্যস্থষ্টির ইহাই নিগূঢ় উদ্দেশ্য।

সব পথই পথ। জ্ঞানে অজ্ঞানে মানুষ নীচু দিকেই ছুটুক, আর উপরের স্রোতেই ভাসুক, ছুটিয়া ছুটিয়া, ভাসিয়া ভাসিয়া উভয়েরই শরীর প্রাণ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে; ঐ একই কারণে, উভয়কেই ঐ একই কেন্দ্রে মিলিত হইতে হইবে, ঐ একই সত্য লাভ করিতে হইবে।

মরণ হয়—এই মর্ত্যজীবন দিয়া সত্যকে পাইবার জন্ত অধিকতর শক্তি সংগ্রহ করিতে, পরন্তু পৃথিবীর মরণ নাই, যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের চরণবুগলের যে ছুপুর মাটির আঘাতেই তাহা বাজিয়া উঠিবে, পৃথিবীর বাতাসেই অনাহত বংশী স্রমধুর সুরে মুচ্ছনা তুলিবে, মাটির জগতের মানুষ বারা, তারাই প্রস্তুত হইয়া উঠিবে এই অলৌকিক, অভাবনীয় দৈবালীলা ঘটাইয়া তুলিবার জন্য। পৃথিবীর বুকে যুগযুগান্তর ধরিয়া তাহারই আয়োজন চলিয়াছে।

মানুষকে গড়িয়া ভাঙ্গিয়া, আবার গড়িয়া, ওতঃপ্রোতঃ ভাঙ্গা গড়ার মধ্য দিয়া ইচ্ছাময় ক্রমশঃ ইহারই জন্য তাহাকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছেন। অনন্ত অমন্তকাল ধরিয়া মানুষের জীবনসংগ্রামের মধ্যে এই সত্যই দিন দিন বিকশিত হইয়া উঠিতেছে, যে তাহাদের জীবন দিয়াই এমন একটা উপায় উদ্ভাবিত হইবে, যাহা দ্বারা মানুষ এই ধূলিকাদার অপরিচ্ছন্ন পঙ্কিল পৃথিবীতে স্বর্গের ঐশ্বর্য্য ভারে ভারে নামাইয়া আনিবে। জড় জগতের একটা ধূলিকণার ভিতর যে সত্য নিহিত করিয়া, ভগবান্ ফুৎকারে তাহাকে উড়াইয়া দিয়াছেন, তাহা উড়িয়া উড়িয়া আপনার ভিতরের সত্যটিকে বিকশিত করিয়া ভগবানের স্বরূপটিকেই প্রকাশ করিয়া ফেলিবে, বিশ্বের জীবন অসংখ্য প্রণালীতে বিচিত্র ধারায় ছুটিয়াছে, পরস্পর প্রতিহত হইয়া যাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া একবার মিশিতেছে, আবার বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া বিপরীতমুখী হইয়া তরঙ্গবিক্ষোভে ধাইয়া চলিয়াছে—পূর্ণাঙ্গ হইবার জন্যই, তাহার মধ্যে যে পূর্ণতা অবরুদ্ধ আছে, তাহার মুক্ত প্রকাশের জন্য—বিশ্বজীবনের মধ্যেই মহাকাশী মহাপ্রকাশ সফল করিয়া তুলিবেন।

এই যে অন্ধপ্রবৃত্তি, মানুষের জীবন লইয়া বিচিত্র খেলার সৃষ্টি করিয়াছে, ইহার নিগূঢ়ে রহিয়াছে সেই আদ্যাপ্রকৃতি—পূর্ণ প্রকাশসামর্থ্য লাভের জন্যই মানুষের জীবন লইয়া তাঁর এই লীলাভঙ্গী। কত যুগ ধরিয়া, কত পরীক্ষার পর আজ গড়িয়া উঠিয়াছে বর্তমান মানবজীবন, মানবের অন্তর দিয়াই আজ আবিষ্কার করিতে চাহিতেছেন নূতন পন্থা—যাহা দিয়া তিনি স্বীয় মহীয়সীশক্তির পূর্ণ পরিচয় লাভ করিবেন।

ভারতীয় জীবন উর্দ্ধের জ্ঞানোজ্জল পথ ধরিয়া ছুটিয়াছিল, ভারতের জীবন দিয়াই প্রকৃতি আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন কয়েকটা উৎকৃষ্ট পন্থা, সেইগুলিই যোগ নামে অভিহিত। আজ আবার সেই পুরাতন যোগপদ্ধতিগুলি মানুষের জীবন দিয়া পুনর্গঠিত ও নূতনভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া, অধিকতর বেগে মানবজাতিকে সমুদ্রের পথে, পূর্ণজীবন লইয়া ছুটাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন। আমরা ভিন্ন ভিন্ন যোগাঙ্গগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া এই কথাটাই ভাল করিয়া বুঝিব।

মানুষের শরীরকে সুদৃঢ় করিবার জন্য তিনি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন হঠযোগ, এই যোগের দ্বারা কলেবর সবল সুস্থ ও দীর্ঘকালস্থায়ী হয়।

রাজযোগের দ্বারা মানুষের অন্তরের অসংখ্য বৃত্তি সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া অসাধারণ মানসশক্তি উৎপাদন করে। এতদ্ভিন্ন আরও অল্প-আয়াসসাধ্য ও সর্বসাধারণের উপযোগী সাধনত্রয় প্রবর্তিত করিয়াছেন, ইহা চাইতেছে ভক্তি জ্ঞান ও কর্ম এই ত্রিমার্গ-যোগ। প্রকৃতির এই সকল প্রচেষ্টার মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, যে তিনি মানুষের সবখানি লইয়াই লীলা করিতে চাহেন—শরীর, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, হৃদয়, সকলেরই পূর্ণ বিকাশসাধনে তৎপর।

কিন্তু যুগপৎ এই সমুদয়ের বিকাশপদ্ধতি এখনও অনাগত। চর্যযোগে সিদ্ধিলাভ করিয়া রাজযোগ ও পর পর মানবজীবনের অন্তরঙ্গগুলিকে পূর্ণ করিয়া তোলা একই জীবনে এক রকম অসম্ভবই হইয়া উঠে। সেইজন্য ভারতীয় জীবনে অপর একটি যোগপন্থা আবিষ্কৃত হইবে, উহা কেবল ভারতেরই নহে, সমগ্র জগতের সাধনরূপে উহা গ্রহীত হইবে—আমরা এই নূতন সাধনার কথাই বলিব। তাহার পূর্বে কেবল এই কথাটাই বলিয়া রাখি যে আমাদের এই যে জীবন, ইহার উপরই নূতন যোগের প্রতিষ্ঠা। জীবনের অতাই যোগ, অথবা যোগই জীবন, অতএব জীবনের উপর উপেক্ষা মহাপাপ।

আর্য্য-শিক্ষা

আর্য্যশিক্ষার দুইটি প্রকরণ—ব্রহ্মচর্য্যরক্ষা ও জ্ঞানপ্রকাশ। প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য—কারণ আমাদের প্রতিষ্ঠানক্ষেত্র হইতেছে শরীর। এই দেহই মহাশক্তির মূলধার। প্রতিষ্ঠানক্ষেত্রখানিকে উর্দ্ধমুখী করিয়া সেই ক্ষেত্রের পুরুষের সহিত সংযুক্ত সম্মিলিত করিয়া ধরা—প্রতিষ্ঠার কারণে সংযোজনা, শরীরকে ব্রহ্মে উত্তোলন অধিষ্ঠাপন—ইহাই ব্রহ্মচর্য্য। যোগসাধনার লক্ষ্য ইহারই পূর্ণতা সম্পাদন—ব্রহ্মচর্য্যের সিদ্ধি ও পরিণতি গীতার সেই ব্রাহ্মীস্থিতিতে। সাধক কবি রামপ্রসাদের সেই গীতখানির একটি চরণার্দ্ধ স্মরণ কর—

কালী পদ্মবনে হংস সনে হংসীরূপে করে রমণ—

তারে মূলধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন।

মূলধারে সহস্রারে তত্ত্বসাধনাও মিলাইতে চাহিয়াছে। এখানেও সেই একটি কথাই অভিব্যক্ত।

শরীরের মূলধাতু—রেতঃ। তুচ্ছ অন্নরস জীর্ণ করিয়া এই রেতঃ সমুৎপন্ন হয়। অত্যাচারে অনাচারে এই রেতঃ জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে অপচিত হইয়া থাকে। কুক্রিয়ায় ইহা স্থূলভাবে অলিত হয়, কুচিন্তায় কুসঙ্গে ইহা সূক্ষ্মাকারে অথবা ব্যয়িত হইয়া যায়। ফলে দেহ-মন অত্যন্ত অপবিত্র, দুর্বল ও নিঃসার হইয়া পড়িতে থাকে। শুদ্ধ আত্মসংযমের ফলে শরীরের এই মূলধাতু অক্ষলিত ভাবে পরিষ্কৃত থাকে—মনও পবিত্রতাপূর্ণ নিষ্পাপ ও নির্মল হইতে থাকে। তুচ্ছ কণিকের দ্বায়ুগত রোমাঞ্চস্থ পাইতে গিয়া বিন্দুমাত্র রেতঃপাত না করিয়া তরুণকুলকে সেই মহাধাতু সংরক্ষণ করিতে হইবে। সংরক্ষণের ফলেই অনিবার্যরূপে হইতে থাকিবে তাহার পরিবৃদ্ধি। সেই নিত্যরক্ষিত নিত্যবর্দ্ধমান ‘রেতঃ’ধাতুর সবখানি দেহবস্ত্রের সঞ্চালনাক্রমে ব্যয়িত হয় না। উত্তৃত অংশ উর্দ্ধে উৎগৃহীত করিয়া মস্তিষ্কের সেবার সমর্পণ করিতে হয়।

এই রেতঃধাতুর বিবরণ দিতেছি—রেতঃ শুভ্র উজ্জ্বল তাম্ররঙ্গরূপ। এই রঙ্গ পরিভুক্ত হইয়া পরিণত হয় তপোরূপে—এই উত্তাপই গতি ও কর্মের অন্তর্য্যাতক। তপঃ হয় তেজঃ—যাহা জ্ঞানালোককে উদ্ভাসিত করিয়া তুলে। তেজঃ পরিণত হয় বিদ্রাভে—ইহাই সেই সকল শক্তিময় কর্মপ্রেরনার উৎসস্বরূপ, মানুষের ব্যক্তিত্বকে ইহা সেই রহস্যময় আকর্ষণীশক্তিতে বিমণ্ডিত করিয়া তুলে—ইংরাজীতে যাহাকে বলে personal magnetism. বিদ্রাভের পরিণতরূপই হইতেছে বীৰ্য—সেই হৃদয়তম ওজঃশক্তি—যাহা মস্তিকে উদ্ভূত হইয়া সেই পরমা আদ্যাশক্তির সহিত সর্কারূপে সন্ধিকর্ষে উপনীত হইয়া তাহার সহিত সংযুক্ত হইয়া মানবকে ত্রিভুবনশাসিকা মহাশক্তির দিব্য আধারে পরিণত করে। মানুষ মহাকালীর শুদ্ধ যন্ত্ররূপে ইহলোকেই দেবলীলা প্রকাশ করিবার অধিকার লাভ করে। কালীর রূরুণা ব্যতীত এই ওজঃশক্তি লাভ করিবে কিরূপে? মায়ের হস্তে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিয়া দাও—বল—ওগো আমার অনন্তশক্তি-শালিনি অগজ্জননি! আমার সমস্ত দেহবস্ত্র এই তোমার চরণ-পায়ে অর্পণ করিয়া রাখিলাম—আমি একবিন্দু রেতঃ, এক কণিকা, রসধাতু আত্মমুখে জ্ঞান অপচয় করিতে চাহিব না—তোমার হস্তে, তোমার উর্দ্ধমুখী আকর্ষণে ইহা হৃদয় হইতে হৃদয়তর, শুদ্ধ হইতে শুদ্ধতর হইয়া তপস্তেজঃ-বিদ্রাভের বীৰ্য ও ওজঃরূপে পরিণত হউক—তোমার প্রতিষ্ঠানকেন্দ্র তোমারই বিজ্ঞ

যন্ত্ররূপে গড়িয়া ভোল—এ শরীর আমার নয়, তোমার আধার তোমারই শক্তিপ্রেরণায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠুক।”

ব্রহ্মচর্য্যই আধ্যাত্মিকশক্তির প্রথমপাদ—তাহার ভূমিকাস্বরূপ। ব্রহ্মচর্য্য সাধনে ধ্বতবীৰ্য্য সাধককে সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানপথে বিচরণ করিতে হইবে। পাশ্চাত্যপ্রণালীর সহিত আধ্যাত্মিকপ্রণালীর বিপুল পার্থক্য। পাশ্চাত্যপ্রণালীতে শরীরকে শরীররূপেই সুবিস্তৃত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আধাররূপেই গড়িয়া তুলিতে হয়, আধ্যাত্ম শরীরকে শুধু শরীর বলিয়া নয়, উহাকেই সর্ব্বশর বলিয়া ধরিয়া লয় না—পরন্তু শরীরকে শুধু প্রতিষ্ঠারূপে দর্শন করে, নিয়ম এই প্রতিষ্ঠাকে সেই সমুচ্চ কারণের সহিত অনুষ্মাত করিয়া দেওয়াই তাহার দেহসাধনের লক্ষ্য। যে মহাশক্তি বিধ্বভবনকে পরিচালিত করিতেছেন, যে শক্তিপ্রেরণা তপনে তারকায় চক্রে যেমন খেলিতেছেন, ঠিক তেমনই সমভাবেই মৃৎস্তম্বে, তুণেপ্তমে, লতায় পাতায়, পশুপক্ষী, পতঙ্গে বিহঙ্গে ক্রীড়ারতা, সেই জগৎপালিকা মহাকালিকা মালুঘের মধ্যেও লীলাপরা—ইহলোকে মালুঘের শক্তিসাধনার লক্ষ্য তাই এই মহাদেবীর যন্ত্ররূপে তাহার আধারখানিকে শুদ্ধ হইতে শুদ্ধতর করিয়া তোলা, যতদিন না তাহা মানবধার যতখানি শক্তি ধারণক্ষম ততখানি পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে—আর এইরূপ যখন হইয়াছে তখনই মানব হইয়াছে শুধু শুদ্ধ ও মুক্ত নয়, পরন্তু পূর্ণ ও সিদ্ধ। আধ্যাত্মিক হইবারই প্রথম সাধনরূপে গ্রহণ করিয়াছেন ব্রহ্মচর্য্যকে। তেমন আধ্যাত্মসাধনেরও মূলসূত্র হইতেছে পাশ্চাত্য জ্ঞানসাধনপ্রণালীর একান্ত বিপরীত। পাশ্চাত্যের দৃঢ় ধারণা—জ্ঞান আহরণ করিতে হইবে বাহির হইতে, ইন্দ্রিয়সাহায্যে, বহির্জগতের বিভিন্ন বস্তুসাজী আলোচনা করিয়া—ইন্দ্রিয়প্রতীতির উপরেই ভিত্তি করিয়া, অনুমানথণ্ডের সাহায্যে অভিজ্ঞতার বিপুল মন্দির গঠন করিয়া তুলিতে হইবে। আধ্যাত্মিকতার প্রথম ও প্রধান মূলসূত্র হইতেছে এই—সমগ্র জ্ঞান আত্মার ভিতরেই অধিনিহিত, অন্তর হইতেই সমস্ত জ্ঞান আহরণ করিতে হইবে—বাহির ও অন্তর উভয়কেই বিদিত হইতে হইবে, অনুমানে উপমানে উপদেশের আশ্রয়ে নহে, এগুলিকে প্রথম অনভ্যস্ত অবস্থায় উপলক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিতে পারি মাত্র—কিন্তু অন্তরের অধ্যাত্ম স্ব্যালোকে—সেইখানেই যে সেই বরণ্য সবিতা বিবাজিত, যিনি সযত বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রেরণ করেন—তৎসবিতুবরণ্যং ভগ্নো দেবস্য ধীমহি, ষিয়ো যোনঃ প্রচোদমাং।

তাই প্রকৃতপক্ষে আহরণ নয়, চয়ন বা সংগ্রহ নয়, কিন্তু উদ্দীপন, প্রকাশ, উদ্ভাসনাই হইতেছে জ্ঞানসাধনার সত্য ও প্রকৃষ্ট পদ্ধতি। ভিতরের স্তম্ভ বিজ্ঞান-স্বার্থটিকে দেদীপ্যমান করিয়া ধরিতে হইবে মাত্র—জলদজাল অপসারণ করিয়া তাহাকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতে দিতে হইবে মাত্র। বুদ্ধির মুখের উপর হইতে শুধু সরাইয়া ফেল যাহা কিছু ফুটিয়া উঠিতে দিতেছে না সেই জলোজ্জ্বল অন্তঃস্বার্থকে—শিক্ষাসাধনার এইটুকুই একমাত্র কাজ—যাহা রহিয়াছে তাহাকেই ফুটাইয়া ফলাইয়া ধরা—এইটুকু মাত্র সাধনীয়, করণীয়।

বুদ্ধির উপর ছই প্রকারের আবর্জনা—কারণ ত্রিগুণে জগৎ, আর তাহার মধ্যে স্তম্ভ সত্ত্বগুণেই জ্ঞানের উদ্দীপনা। আমাদের ভিতরে নিহিত রহিয়াছে সেই দিব্য পরমজ্ঞান যাহা সর্বজ্ঞ, সর্বাবভাসক, আর সেই-জন্তই যাহা আবার সর্বকৃত্ব। সত্ত্বগুণের সাহায্যে সেই অনন্ত চিদ্রূপ প্রজ্ঞার প্রকাশ ঘটে। তমঃ জড়তা, অলসতা, উদাসীনতা, নিজা, তদ্ভা অপ্রবৃত্তি দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছে যেন ঘনকৃষ্ণ আবগুণের মত সেই অন্তঃপুরিকাকে—আর রজঃগুণ উচ্ছৃঙ্খলতা, অসংযম, রাগদ্বेष ভয়ক্রোধ রিপূর তাড়নার আকারে তাহার চিত্তসাগরকে সদাচঞ্চল, সদাব্যস্ত, সদাআন্দোলিত করিয়া রাখিয়াছে—উদ্ধাম উদ্বেলিত আন্দোলনে সে যেন শুদ্ধ অবিকৃতরূপে প্রতিকলিত হইতে দিতেছে না তাহার শুদ্ধ জ্যোতির্ময় সত্য-স্বরূপধানি—সত্যকে খুঁজিতে গিয়া পাইতেছে সত্যানুভূতিমিশ্রিত বস্তু, ধর্মকে পাইতে গিয়া ধরিয়া বসিতেছে এমন কিছু যাহা ধর্ম ও অধর্মের খিচুড়ি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই দুইটি বিষ অপসারণ করিতে হইবে—তামস আবরণটিকে খুলিয়া, রাজস বিকারটিকে দমিয়া মাজিয়া ঘসিয়া। অন্তঃকরণ হইবে স্বচ্ছ নির্মল ভাস্বর, আবার সৌম্য শান্ত সমাহিত—তখনই শুদ্ধ সত্ত্বগুণ-ময় সেই অন্তঃকরণটির উপরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে—সেই সর্বরহস্যের উন্মোচক, সর্বসত্যের প্রকাশক দিব্য অধ্যাবিজ্ঞান—যাহা সকল বস্তুর অন্তঃপ্রকৃতি, অন্তর্ভাব, অন্তঃরসকে আমাদের উদীয়মান তৃতীয় নেত্রের সমক্ষে উল্লস্বরূপে উদ্ঘাটিত করিয়া ধরিবে।

আখ্যা-জ্ঞানের এইটাই তত্ত্ব-কথা। তাহার সাধনও আছে—আবৃত্তি ধ্যান ও আলোচনা। আবৃত্তি—শব্দটিকে চিত্তে প্রক্ষিপ্ত করিয়া পুনঃ পুনঃ অভ্যাস—শব্দের পশ্চাতে যে অর্থ, যে ভাব তখনই তাহা স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া

উঠিবে। নিশ্চয়ই যেমন তেমন করিয়া আবৃত্তির ফলে ঠিক এই জিনিষটি ঘটনা উঠিবে না—প্রকাশমন্ডিত না হইলে শাস্ত্র, শব্দ, মন্ত্রের আবৃত্তি কখনও ফলপ্রসূ হইতে পারে না। প্রকাপূর্ণ আবৃত্তিযোগে যে অর্থ, যে ভাব স্বপ্নে উদ্দীপিত হইবে, তাহার উপর ধ্যান দেওয়াই দ্বিতীয় পর্যায়। প্রথমে স্বাধ্যায়, তৎপরে ধ্যান। ধ্যানযোগ যতই গভীর ও প্রগাঢ় হইবে, ততই অস্পষ্ট অর্থ স্পষ্টতর হইবে, অস্ফুট ভাব পরিস্ফুট, মন্ত্রের শাস্ত্রের নিগূঢ় রহস্যরাজি তরে তরে আপনাকে উন্মোচিত করিয়া দিতে থাকিবে—প্রকৃতির জগতের জীবনের জটিল অবগুপ্ত তথ্যগুলি ধীরে ধীরে দিনে দিনে স্বতঃস্ফূর্ত স্বতঃ-উদ্ভাসিত হইবে। এখানেও চাই প্রজ্ঞা; ধ্যান যদি প্রজ্ঞানিষ্ঠ ভাব-সম্বিত না হয়, তাহা হইলে তাহা গাঢ় রহস্যঅবভাসক হইবে কিরূপে? শুক্রমুখে শাস্ত্র-অভ্যাস এবং সশ্রদ্ধ উৎসাহ। সহযোগে ধ্যান—এই দুইটিই জ্ঞানের প্রধান সাধনকাণ্ড—কালে সমস্ত তথ্যই ভিতরের সেই সর্বজ্ঞ দেবতা জ্ঞানর জ্ঞানদীপ জালিয়া প্রকাশ করিয়া দিবেন—কালেনাত্মনি বিদ্যতি।

সাধকমণ্ডলীর মধ্যে দিনে দিনে এই যে নিত্য প্রকাশ তাহা লইয়া পরস্পরে আলোচনা পরম কল্যাণপ্রদ। অন্তরের ধ্যানলব্ধ ভাবরাশি লইয়া পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান করিতে হয়—আপনার ভাবের সহিত সহ-সাধকের ভাবকে মিলাইয়া লইতে হয়, আপনাকে জানিতে গিয়া পাইতে গিয়া এইরূপেই আমরা পরস্পরকে জানিতে পারি ও পাইতে পারি। এইজন্য চাই সাধকসংঘ—কিন্তু এ সংঘ চেষ্টা করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয় না, এও আপনিই ভিতর হইতে বিকশিত হইয়া উঠে। সাধকসংঘের সম-গুণে আমাদের ভিতরে স্তিরিত ভাব দীপ্ত ও প্রজ্জ্বলিত হয়, আমাদের আত্মগত ভাবরস প্রতিধ্বনি পাইয়া আনন্দে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে—জ্ঞানের উর্দ্ধাগত মন্দাকিনীধারা প্রেমের অমৃতময় ভাগীরথীস্রোতের সহিত সম্মিলিত হইয়া অপূর্ণ মিলনের লীলা পরিস্ফুরিত করিয়া তুলে।

নেতৃ-সমনস্যা

অমৃতশব্দদ্বয়ে শ্রীমতী বেসান্ত সর্বভারত হোমরুললীগের সভাপতিপদে
পরিত্যাগ করিয়াছেন। বিদায়পত্রে তিনি লিখিয়াছেন—“Your wish
that I should resign is not due to any failure of mind
as regards Home Rule, but to the offence I have given
by opposing the Satyagraha movement I was
driven out because of my open opposition to Mr.
Gandhi's movement and my later refusal to judge
the Government for its action in dealing with what it
asserts is “open rebellion” and because I will not in-
crease its dangers at this critical moment.” মোট কথা, মিঃ
গান্ধীর সভাপতিত্ব আন্দোলনের প্রতিকূলতাচরণ করার, ও পরে গান্ধীজীর
রাজস্বগ্রহণ স্বত্বকে গভর্ণমেন্টের কার্যবিধানকে বিচার বিশ্লেষণ করিতে কিংবা
এই সঙ্কটমুহুর্তে তাহার বিপজ্জ্বাল পরিবৃদ্ধি করিতে অসম্মত হওয়ার কলে,
তাঁহাকে পদচ্যুত হইতে হইয়াছে—ইহাই তাঁহার ধারণা। গভর্ণমেন্টের
বিপদবৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্য লইয়া কেহ যে তাঁহার সহিত ভিন্নমত হইতে
কিংবা তজ্জন্ত তাঁহাকে বিভাঙিত করিতে উৎসুক হইতে পারেন—এমন
ধারণা জবজ্বল আমরা একেবারেই অমূলক বলিয়া মনে করি। কারণ
যাহাই হউক, দীর্ঘ ২৬ বৎসর ধরিয়া অক্লান্তচিত্তে ভারতের সেবার আত্ম-
নিয়োগের পর এরূপ নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যান তাঁহার বুকে বড় বাজিয়াছে।
“I think you might have been a little kinder, a little
more generous, but I have no right to ask for that
you do not wish to give.” হায়, কি করণ মনুষ্যদেহ তপ্তশাসন
অনুযোগ। হউন বিদেশিনী, কিন্তু আজীবন ভারতসেবিকা এই শুভ্রকেশা
অশীতিবৎসর বৃদ্ধার দেশের নিকট এতটুকুও করুণাভিক্ষা করিবার কি দাবী
নাই? ভারতবাসী অকৃতজ্ঞ নয়, শ্রীমতী বেসান্ত যাহাই হউন, আর
যেখানেই থাকুন, তাঁর দান, তাঁর ভারতসেবার কথা সমস্ত দেশ কৃতজ্ঞ
হৃদয়ে চিরদিন স্বীকার করিবে, তাঁহার নাম তার ঐতিহাসিক স্মৃতিপটে

চিৎস্মরণীয়ই রহিবে।

ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গক্ষেত্রে বিপুল অজ্ঞতপূর্ব পটপরিবর্তন সত্যই বিস্ময়কর। কাল যাহার অক্ষুণ্ণ প্রতিষ্ঠা আসমুদ্রহিমাচল ভরিয়া, আজ তাহার মুখের এই তীব্র মর্ম্মস্তদ বিদায়-বচনে চক্ষু ফাটিয়া জল নিঃসৃত হয়—কিন্তু মাহুষের ভাগ্যবিধাতা কঠোর হস্তে যাহা ঘটাইয়া চলিয়াছেন, তাহার উপর মাহুষের কোনরূপ অভিযোগ করা চলে না। আজ শুকনেত্র দেশের জীবনভাগ্য লইয়া প্রকৃতির এই অনবচ্ছিন্ন পরীক্ষাধারা দেখিতে হইবে, তাহার প্রদত্ত শিক্ষারাজি মুক্তচিত্তে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে হইবে—সেই মহান্যময়ী বিশ্বশক্তির হস্তে মাহুষ ক্রীড়াপুত্তলী বই ত নয়!

কেমনই বা এমন সব ঘটতেছে? দেশের অতিবড় সমস্যা—আজ এই নেতৃসমস্যা। বিগত যুগের মত এ যুগের নেতৃত্বব্যাপার আর সেরূপ সহজ নিকটক নয়। দেশের সে মোহগ্রস্ত অবস্থা আর নাই—জনসংঘের আত্মচেতনা অতি দ্রুতবেগে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে—গণতন্ত্রের মন্ত্রপ্রভাব বিশ্বজগৎ ছাইয়া ফেলিতেছে। কোথায় নেতৃপুরুষের অঙ্গুলিহেলনে দেশের গণশক্তি ঘুরবে ফিরিবে, তা না হইয়া আজ দেশই আপন নেতৃকূলকে উঠাইতেছে নামাইতেছে, মাথায় চড়াইয়া আবার আছাড়িয়া ছুঁড়িয়া ফেলিতেছে! ভারতের নেতৃত্ব আজ আর যাহার তাহার কর্ম্ম নহে। এই বিপুল জাগ্রত শক্তিতেচোনাকে স্তমিত করিতে হইলে কি অপরিমেয় তপঃসাধনার প্রয়োজন—পাশ্চাত্যভাবাপন্ন তথাকথিত leaderগণের মধ্যে কয়জন কতটুকু তাহার সন্ধান রাখেন?

প্রকৃতিশক্তি নিজহস্তে আজ ভারতের শিক্ষাভার তুলিয়া লইয়াছেন। রাউলাটবিলের স্বত্র ধরিয়া নেতৃমণ্ডলীর মধ্যে তাই আজ এমন এক অগ্নি-পরীক্ষা উপস্থিত করিয়াছেন, যার কটিপাথরে আসল ও মেকির নিরাকরণ সহজেই ঘটবার সুযোগ আসিয়াছে। জাতীয় জীবনের এই সঙ্কটমুহুর্তে লঘুহস্তে সত্যমিথ্যা মিশাইয়া গোলে হরিবোল দিয়া চলিবার আর সময় নাই। গভীর অন্তর্দৃষ্টিসহযোগে আজ মাহুষের অন্তর্চরিত্রের সত্য পরিচয় পাওয়া একান্ত প্রয়োজন। রাজা ও প্রজা, লোকনেতা ও জনসংঘ—পরস্পরগত স্পষ্টতা না আসিলে, পরস্পরের সত্য উদ্দেশ্য সত্যচরিত্র অবগত না হইলে, জটিল জীবনসমস্যা যে গুরুতর আকার গ্রহণ করিতে

পারে—তাঁহাতে কাঁহারও মঙ্গলসম্ভাবনা নাই। জনশক্তি জাগ্রত—
তাঁহার চক্ষে ধূলিক্লেপ করিয়া চলিবার সকল প্রয়াসই ব্যর্থ হইবে।

শ্রীমতী বেসান্তকে আমরা যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি শুধু তিনি অপূর্ণ মনীষা-
সম্পন্ন নারীশ্রেষ্ঠা বলিয়া নয়, তিনি জগদ্ব্যাপী Theosophist মহামণ্ড-
লের অধিনেত্রী বলিয়াও শুধু নয়, কিন্তু তাঁহার ভিতর এমন একটা তেজ-
শিতা, এমন একটা উন্নত স্পর্শ দেখিয়াছি যাঁহার সম্মুখে সকলেরই মস্তক
অবনত করিতে ইচ্ছা করে। তাঁহার মনীষার মধ্যে এমন একটা মৌলিক
প্রতিভার ছটা বিকীর্ণ দেখি, যাঁহা বিদেশীয়স্থলত-অন্ধসংস্কারগুঞ্জ ভেদ
করিয়াও পরজাতির-গৌরবসম্পদের মূল্য নির্ধারণ করিতে নিপুণভাবে
সমর্থ, তাঁহার সমস্ত অন্তরখানি ভরিয়া আইরিস প্রকৃতির যাঁহা একটা
সর্বোৎকৃষ্ট অবদান, সেই হৃদমণীর স্বাধীনতাস্পৃহা এমনই প্রবলশ্রোতে
বহমান দেখিতে পাই, যাঁহা সকল দেশ সকল জাতির জন্ত আপনাকে
ঢালিয়া দিতে কুণ্ঠিত নয়, সর্বোপরি তাঁহার আপন আদেশের উপর যে
বিপুল শ্রদ্ধা, তাঁহার সাধনে যে অকুণ্ঠ নিষ্ঠা, একান্তহৃদয়ে যে আত্মনিয়োগ
লক্ষ্য করি, তাঁহা একমুহূর্তে সহস্র সহস্র হৃদয়ে সংক্রামিত হইয়া অবলীলা-
ক্রমে লোকসংঘ-সৃজন করিয়া তুলিতে পারে। এই শক্তিশালিনী রমণীর কর্ম-
শক্তিও কি বিপুল বিষ্ময়কর! ভারতের রাজনৈতিক গগন যখন ঘনতমসচ্ছন্ন
নিবিড় জলদপটলে আবৃত, তখন কি অত্যাস্চর্য্য একখানা জালামুখী উদ্ভাপিণ্ডের
মত সহসা উদ্ভিত হইয়া যেন এক ফুৎকারে হোমরুল আদর্শটিকে আকাশের
একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত উৎক্ষিপ্ত করিয়াদিলেন—যাঁহা জাতির
অগ্রলোকে সন্মুখিত কুণ্ঠাভরে ধূমায়িত হইতেছিল, তাঁহা যেন এক নিঃশ্বাসে
বস্ত্রতন্ত্র রাষ্ট্রক্ষেত্রে দীপ্ত হইয়া জলিয়া উঠিল। মহামতি তিলক ও তপস্বিনী
বেসান্তের মণিকাঞ্চন সংযোগ না ঘটিলে হোমরুল আদর্শ হয়ত আরও
অদূরপর্য্যন্ত হইয়াই থাকিত। এই একটা কার্যের জন্তও শ্রীমতী বেসান্তের
নাম ভারতের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরোজ্জ্বলিত রহিতে পারে। ভারতের
তপঃশক্তিসম্পন্ন দুই তিনজন লোকনেতার মধ্যে শ্রীমতী বেসান্ত অত্যন্ত
বলিয়া গণনীয় ছিলেন।

কিন্তু তত্রাপি সংশয়িত প্রশ্ন মনে জাগিয়া উঠে—কতটুকু তপঃশক্তি
লইয়া শ্রীমতী বেসান্ত দেশনেত্রী হইবার প্রত্যাশা করিয়াছিলেন? আমরা দেখি
অনেকে অনেক সময়ে তাঁহার সহিত সিঁটার নিবেদিতার তুলনা দিয়া

পারি—কেহ কেহ তাঁহাকে ইহার চেয়েও শ্রদ্ধাজন প্রতিভাশালিনী নারী বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু তাঁহার উপর বিন্দু পরিমাণ শ্রদ্ধা হ্রাস না করিয়াও আমরা বলিতে পারি, শ্রীমতী বেসান্ত নিবেদিতার চেয়ে শতগুণ তীক্ষ্ণদীপ্তিসম্পন্ন। বিদ্বতী নারী হইলেও হইতে পারেন, সেই নীরব সাধিকা যিনি সহরের এক নগণ্য অন্ধকারময় কোণে কতিপয় নালিকা লইয়া ধাত্রীবিদ্যাসাধনে জীবনদীপখানির সমস্ত তৈলটুকু নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া গিয়াছেন, হইতে পারে বেসান্ত ইহার চেয়ে সহস্রগুণে সমধিক কার্যকুশল। রমণী। এ সকলই সত্য হইতে পারে, কিন্তু তত্রাপি আশ্রয় গভীরলোকে উভয়ের মধ্যে একটা আকাশ পাতাল পার্থক্য দেখিতে পাই যাহা অস্বীকার করা কোন মতেই যায় না। শ্রীমতী বেসান্ত দীর্ঘ-স্বাসমণ্ডিত শৈববিদায়গজ্ঞানিতে তাঁহার অতুলনীয় ভারতপ্রীতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বেসান্তের ভারতসেবার কথা অস্বীকার করিতে পারে এমন কৃতত্ত্ব ভারতবাসী কেহ থাকিতেই পারে না। কিন্তু তত্রাপি নিবেদিতার ভারতপ্রেমের সঙ্গে বেসান্তের ভারত-প্রীতির যে একটা বিপুল পার্থক্য আছে, তাহাও লক্ষ্য করা উচিত। একজন শরীরের রক্তমাংসটুকু শুধু বিদেশ হইতে বহিয়া আনিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত ভিতরখানি—তাঁহার প্রাণ মন আত্মা ছিল ভারতের অমৃতময় রূপে রসে গন্ধে আমূল ভরপুর। পক্ষান্তরে বেসান্তের অন্তরাশ্রয় পানে যখন চাহি, খুঁজিয়া পাই না কোথায় তাহার মধ্যে ভারতের প্রাণকণা—এ যে সবখানিই স্বৈত-দীপবাসিনী—শুধু বুদ্ধির প্রথর প্রতিভা, আর হৃদয়ের উদার অনন্তসাধারণ প্রাণে ভারতের প্রাণের একটা ছায়ালেপে সেখানে পড়িয়াছে, তাহাও স্বৈতদীপের আবচ্ছায় এতখানি অবগুষ্ঠিত, যে ভারতের জাতীয় আত্মাকে তাহা দেখিয়া একটু শিরিয়াই উঠিতে হয়। নিবেদিতা মাথা লুটাইয়া ছিলেন ভারতের অন্তঃপুরুষের কাছে, কিন্তু ভারতেরই বরদপুত্র বেসান্তের উন্নতদীপ ভারতের কাহার চরণে কোন্‌খানে কতটুকু আপনাকে আনত করিয়াছে? এই দিক দিয়া যখন দেখি, তখন আপনাপনিই বলিয়া উঠিতে হয়—হায়, কোথায় ভারতনিবেদিতা নিবেদিতা, আর কোথায় আজীবন ভারতপ্রবাসী হইলেও তবু বিলাতেরই বেসান্তবিবি! কোথায় ভারতের পূতবেদীমণ্ডপে স্বামীজির উপহৃত অমল অনাঘ্রাত নিষ্কাল্যটুকু—আর কোথায় এই কংগ্রেসমঞ্চপরিশোধিকা বিদেশিনী আইভি-লতিকা? সত্য সত্যই

যখন শ্রীমতী বেসান্তের বর্তমান দারুণ অবস্থা বিপর্যয়ের নিগূঢ় কারণ অনু-
সন্ধান করিতে যাই তখন এই কথাটিই বার বার মনে জাগিয়া উঠে—
ভারতের স্বীকৃত (accepted) প্রকৃত সেবক সেবিকা হইতে হইলে যে
জিনিষটির সর্বপ্রধান প্রয়োজন তাহা মনোবা নয়, প্রতিভা নয়, কর্মশক্তি
প্রাণপ্রাচুর্য্যটুকুই শুধু নয়, পরন্তু তাহার চেয়ে গভীরতর নিবিড়তর বস্তু
—সে হইতেছে আত্মনিবেদন, অহঙ্কারের বিজয়বৈজয়ন্তী উড়াইয়া অল্প
সর্বগুণসমগন্ধত হইলেও ভারতের নেতৃপদ কাহারও জন্য বিধিনির্দিষ্ট নহে।

এইখানেই খুঁজিয়া পাই বেসান্তের মহাত্মা গান্ধীর সহিত চিরবিরোধের
মূল রহস্য। এ যেন একটা জন্মগত আধ্যাত্মিক বিরোধ। মনে পড়ে
সেই বারানসীমণ্ডপে গান্ধীর প্রতি তাঁহার তিক্তসন্তোষণের কথা। এই
সেদিন যখন তাঁহার সিংহাসন টলটল আর তিনি মুহুমুহু নানা পত্রে
আত্মসমর্থন করিতেছিলেন তখন গান্ধীর প্রতি খ্রীষ্ট ও টলষ্টয়ের শিষ্য
বলিয়া তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া আত্মপক্ষসমর্থন করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—
একগণ্ডে আঘাত করিলে অন্যগণ্ডে পাতিয়া দিবার যে নীতিসূত্রটি তাহা
শত সহস্র বৎসর পরে সম্ভবপর স্বপ্নাদর্শ, পরন্তু গীতার জনদগন্তীর বাণীই
ভারতের প্রাণের কথা। কথাটা হয়ত আদৌ মিথ্যা নয়—কিন্তু তত্রাপি বেসা-
ন্তের মুখে সেই অতিসত্য কথাটাও কেন শুধু অসার তর্কছলার মতই শুনাইয়া-
ছিল—একটুও হৃদয়স্পর্শ করে নাই! গান্ধী ভারতবাসী, অকপট ভারত-
প্রেমিক—তাই টলষ্টয়ের ভাবানুরঞ্জিত কথাও গান্ধীর মুখে ভারতীয় রূপ
লইয়াই আসিয়াছে—ভারতেরই মর্মবাণীর তাহা টলষ্টরী ছদ্মবেশ মাত্র—
সেখানে আছে ভারতেরই অনাবিল প্রাণ, নাই সেখানে একটুও ছলনা,
এতটুকু কপটতার রেখা—তাই সেখানে শঙ্কা হয় না, সংশয় হয় না,
স্বপথ হউক, কুপথ হউক, সেখানে অপথে বা কুপথে নীত হইবার এক
কণিকা বিভীষিকা হয় না। বেসান্তও ভারতকে ভালবাসেন, কিন্তু ভাল-
বাসার যদি কোনও সূক্ষ্ম তুলাদণ্ড থাকে, তবে সেই পরিমাপে বেসান্তের
হৃদয়ে কতটুকু ভারতের স্থান আর কতখানি স্থান তাঁহার স্বদেশের
স্বজাতির জন্য তাহার সত্য অন্তঃকরণ লাভ করা হুঙ্কর নহে। আর এতো
আদৌ অস্বাভাবিক কিছু নহে। একজন প্রতিভাশালিনী বিদেশিনী রমণী
যতখানি উদারহৃদয়া হইতে পারেন, যতখানি আত্মপ্রসারপূর্ব্বক ভিন্নদেশকে
হৃদয় মন দিয়া আলিঙ্গন করিতে পারেন, বেসান্ত তাহা হইতে বা করিতে

এক কণাও ত্রুটি করেন নাই, তাহার জন্য তিনি ভারতের অশেষ শ্রদ্ধা সম্মান ও কৃতজ্ঞতার পাত্রী সন্দেহ নাই—কিন্তু তাঁহার মধ্য দিয়া যদি আমরা ভারতের সত্য সাধনার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি দেখিবার প্রত্যাশা করিয়া থাকি, তবে তাহা আমাদের পক্ষে বিষম মুঢ়তা ছাড়া আর কি হইতে পারে? বেসান্তের দোষ কি—যাঁহারা অন্ধ মুগ্ধ সন্তমভরে তাঁহার নিকট অসন্তুষ্টের সম্ভাবনা চাহিয়াছিলেন প্রকৃত পক্ষে দোষ কি তাঁহাদেরই নহে?

স্পষ্ট কথা বলিতে হইলে বলিব, বেসান্তের হৃদয়ের সমস্ত ওদার্য্য সম্বন্ধে তাঁহার মধ্যে ভারতীয় সংস্কার অপেক্ষা ব্রীটিশ সংস্কারই প্রবল হইতে বাধ্য—ইহাই স্বাভাবিক। বলিয়াছি তো, তিনি কোনও দিন নিবেদিতার মত ভারতের ভারতীয়ত্বের কাছে আপনার স্বতন্ত্র জ্ঞানগরিমানর অহঙ্কারটুকু নিঃশেষে বলিদান দিতে পারেন নাই—তিনি কেবল ভারতকে বৃত্তিতে চাহিয়াছিলেন; অনেকখানি বুঝিয়াছিলেন, অনেক খানি ভালবাসিতেও পারিয়াছিলেন। হয় তো এ কথাও বহুল পরিমাণে সত্য—কিন্তু ভারতময় ভাবতিনিবেদিতা হইতে তিনি পারেন নাই। অপরাধ তাঁহার নহে, কাহারও নহে—যে ধাতু দিয়া ভগিনী নিবেদিতা গঠিতা, সে ধাতু দিয়া বেসান্ত গঠিত হন নাই। হায়, ভারতের জন্মাদিকার স্পর্ধা লইয়া যাঁহারা পাশ্চাত্য ভাবানুপ্রাণিত কর্ম্মক্ষেত্রে নেতৃত্বপ্রত্যাশী তাঁহাদের মধ্যেই বা করজ্ঞানের অস্থিকঙ্কালে বিবেকানন্দের সেই মানসকল্লার সমধাতু দেখিতে পাইবার আশা করিতে পারি? বেসান্তের রাজনৈতিক আদর্শটি সম্বন্ধে কোন-রূপ কটাক্ষেপ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। বলিতেছি না, ভারতের সহিত বৃটনের রাজনৈতিক সংযোগের প্রয়োজন নাই—মৌটেও নয়—রাজনৈতিক আন্দোলনের উপরেই আমাদের আদৌ আস্থা নাই। আমরা ভারতের সহিত বৃটনের শুধু রাজনৈতিক নয়, বরং একটা গভীরতর সামঞ্জস্যেরই ঘোরতর পক্ষপাতী—প্রাচ্যের মধ্যবিন্দু এই ভারতের সভ্যতার সহিত পশ্চিমের মুকুটমণি ইংরাজ জাতির সমাহৃত পাশ্চাত্য সভ্যতার, প্রাচ্যের সহিত প্রতীচ্যের, ভারতের সহিত ইউরোপের আমরা একটা গভীরতর ও মূলগত সমন্বয়েরই (harmony) উপর শ্রদ্ধাবান। গোল সেখানে নয়, বেসান্তের অন্তর্ভাবের মধ্যে কি একটা বিজাতীয় গন্ধ, কি একটা অস্বস্তিকর কিছু বর্তমান বাহা ভারতবর্ষের স্বাস্থ্যকর আত্মসাধনার আদৌ অগ্রকূল নহে—এমন একটা হৃদয় ভল্লিমাগত প্রভেদ

আছে, যাহা সহজ প্রত্যক্ষ না হইলেও, ভারতের ঐতিহাসিক আত্মচেতনার অন্তঃসংস্কারকে আহত করিয়াছে—তাই সে এমন অসহিষ্ণুভাবে সেদিনের সেই শিরোধার্য্য নেত্রীকে মাথা হইতে ঝাকিয়া ঠেলিয়া সরাইয়া ফেলিল।

তিলক ও বেসান্তের সিংহাসনে তার পর কালপুরুষ মহাত্মা গান্ধীকে বহিয়া আনিয়া বসাইয়া দিল। গান্ধীর কথা আর নুতন করিয়া কি বলিব? এই উদার সৌম্য স্পষ্টবাক্ অসমসাহসিক মহিমান্বয় পুরুষের কোন্ ভাষায় পূজা করিতে হয় জানি না। দেশের এই ঘোর সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে তাহার সত্য-এই মন্ত্র নিরুপায় নিরাশ জাতিটির হৃদয়ে যে আশার হিল্লোল খেলাইয়া তুলিল, তাহার অজ্ঞ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবার ভাষা সমগ্র জাতিও অববগত। খ্রীষ্টই হউক আর টলষ্টয়ই হউক, যেখান হইতেই বাহ্যঘাতটুকু (stimulus) আসুক না কেন, হিন্দুর ভারতের আত্মার ভিতর হইতেই আদল উদ্গীর্ণনা আসিয়াছে—ইহা আমরা অতি স্পষ্ট একেবারে নিঃসংশয়িতরূপেই বলিতে পারি। সে বাণী ভারতের—কিন্তু কোন্ ভারতের? এ যে সেই বুদ্ধের শঙ্করের ভারতেরই জলদঘোষণা, এ যে সেই মধ্যযুগেরই ভারতের—এ তো নয় সেই প্রাচীন, সেই আদিম, সেই মৌলিক ভারতের গভীরতর নিগূঢ়তর মর্শ্বঘোষণা। তাই উহা এমন নম্র, এমন উলঙ্গ, মহিমান্বয় হইয়াও এমন অরূপ ও নিরলঙ্কার। আত্মার সন্ধানে ডুব দিতে গিয়া প্রথমে এই মধ্যযুগের ভারতকেই চুইয়াছি, ক্ষতি নাই, অরূপ আত্মা আত্মাই তো—অনাত্ম কিছু তো সে নয়, সাধনার প্রগাঢ়তার সঙ্গে সঙ্গে তাহারও অল্পপশ্চাতে তাহারও অতলে সে গভীরতর ভারতের সন্ধান মিলিবেই—ইহা ঐক্য-সত্য। শুধু নম্র নিরাতরণ মহিমায় স্বরাট নম্র—সেই রূপে ঐশ্বর্য্যে সম্মানে গৌরবে সম্রাট যে মহিষ্ঠ গরিষ্ঠ ভারতবর্ষ, তাহার সত্য পরিচয় সত্য সাধনা বহিয়া আনিবে কে? সেই তো হইবেন সত্য ভারতের সত্য মন্ত্রদাতা সত্য মহানেতা।

‘পত্রিকা’র দুঃখ

বহুমতী লিখিয়াছেন—

“অমৃতবাজার পত্রিকা”র জামীন পূর্বদত্ত ৫০০০ টাকা বাজেয়াপ্ত হইল। ইহাতে এংলো ইণ্ডিয়ান আন্দোলন হলাহল প্রভ হইতেছে। এবার ১০০০০ টাকা জামীন তলপ করা হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেই যে “অমৃতবাজার পত্রিকা” “ভাতে মরা” হিসাবে মরিবে, এমন বোধ হয় না। বতদিন সংবাদপত্র লোকের প্রজ্ঞা না হারায়, ততদিন তাহার বিলোপ-সাধন সহজসাধ্য নহে। ভারতবর্ষের অত্যাচার-প্রদেশে এমন অবস্থায় জামীনের টাকা চান্দা করিয়া তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। “পত্রিকা”র জামীন বাজেয়াপ্তে অবশ্যই তাহার অমূল্য নীতির পরিবর্তন হইবে না।”

বাংলার রাষ্ট্রদেহের দুইটি চক্ষুর মত ইংরাজি দৈনিক দুইখানির অন্ততম এই লোকপ্রিয় পত্রিকাখানির উপর রাজকর্তৃপক্ষের এই কঠোর আঘাতে আমরা সত্যি বেদনাগ্রস্ত। পত্রিকাসত্ত্বে যদি সত্যি এমন কোন কথা বাহির হইয়া থাকে, যাহাতে রাজবিদ্বেষ জন্মিবার সম্ভাবনা, তাহা হইলেও এইরূপ কঠোর রাজদণ্ডদেশে তাহার কতটুকু প্রতিবিধানের আশা করিতে পারা যায়? ভাষা তো ভাবেরই প্রতিবিম্ব মাত্র। যদি কোন রূঢ় উচ্চ কথা সহসা ভাষামুখে বাহির হইয়া পড়ে, তাহাতে যে ক্ষতি হইবে, সে তপ্ত ভাবে প্রকাশ্যভাবে অন্তরে জমিয়া জমিয়া পুঞ্জীকৃত করিতে বাধ্য করিবে তাহার চেয়ে বেশী ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। এইজন্য আমরা দেশের হিন্দুমুসলমান পত্রিকাগুলির উপর রাজবিধানের এই উত্তম বক্তৃৎসবের ব্যবস্থার কর্তৃপক্ষগণের নীতির প্রশংসা করিতে পারি না। তাহাতে ক্ষতি কি তাঁহাদেরই সমধিক নয়? যাউক, যখন বুঝি না—তখন আমাদের সে বিষয়ে নীরব থাকাই সম্ভব। দেশবাসীকে শুধু আমরা বলিতে চাই—জাবেগে উত্তেজনার আন্দোলনের মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অবদানটুকু হস্তগত হইবার নহে। Sensation ও emotionএর বাহিরে যে বৃহৎ কর্মক্ষেত্রটি রহিয়াছে—সেইখানেই জাতি তাহার উৎকৃষ্ট মনীষার নিয়োগ করিলে সফল-ফলিবে।

পত্রিকার অর্জনতাকী ব্যাপী দীর্ঘ দেশসেবা কে ভুলিতে পারে? ভক্তকন্যা শিশিরকুমার যেরূপ অকুতোভয়ে অত্যাচার উৎপীড়নের বিরুদ্ধে স্বীয় লেখনী চালনা করিয়া গিয়াছেন, তেমনই নির্ভীক নিষ্ঠাভরে বুদ্ধ মতিবাবু আজীবন তাহার ম্যালেরিয়াজীর্ণ হৃদয় দেশবাসীর পক্ষসমর্থন করিয়া “অমৃতবাজার পত্রিকা”-খানিকে দেশের হৃদয়-বেদনার একমাত্র মুখপত্র করিয়া তুলিয়াছেন। বুদ্ধের বুকে এই দণ্ডযাত্ৰা বে বেদনার সঞ্চার করিয়াছে, তাহাতে সমস্ত দেশবাসী সম-বাথা অনুভব করিবে সন্দেহ নাই। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, পত্রিকার কর্ণ-ধারগণ এই গুরুতর অর্থদণ্ড দিয়াও কঠব্যপথে পুনরগ্রসর হইয়াছেন। দেশের এই দুর্দিনে লোকমত গঠন ও প্রকাশ উভয়ই দায়িত্বপূর্ণকাজ। অর্থাভাবে বাহাতে এই গুরুতর ত্রুটি অসম্পন্ন না হয়, তজ্জন্ত দেশহিতাকাঙ্ক্ষী সকলেরই মনোযোগী হওয়া উচিত। শ্রীযুত বোমকেশ, অধিলক্ষ প্রমুখ এতদুপলক্ষে যে সাহায্যপত্র-খানি প্রকাশ করিয়াছেন, আশা করি স্বদেশপ্রিয় ধনী মহাজনগণ মুক্তহস্তে তদু-দ্বায়ী সাহায্যদান করিয়া এই লোকহিতকর পত্রিকাখানিকে বিপন্ন করিবেন।

সমীক্ষা

ফরাসী-ভারতের নূতন গভর্ণর বাহাদুর জনান্তরে “প্রবর্তক” সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্বত্তরে আমরা গোটাঁকতক কথা বলিব। আমাদের আশা, এতদ্বারা “প্রবর্তকের” উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা স্পষ্ট হইবে, এবং অতঃপর “প্রবর্তকের” ভাষা দ্ব্যর্থপূর্ণ বলিয়া প্রতীত হইবে না।

বাঙ্গালীর জীবন যেদিন বিধাতার অঙ্গুলিসন্ধিতে নূতন জীবনের স্পন্দন অনুভব করিল, তখন উহা একান্তই তমোবিজড়িত, স্বার্থপূতিগন্ধময় শবের মতই অসাড় ও মৃতকল্প ছিল। এই নবশক্তিস্পর্শে, বিকৃতচরিত্র বাঙ্গালীর জীবন উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু উন্নত উত্তেজনার তরঙ্গভঙ্গে ইহা এমনই অধীর হইয়া উঠিল, যে প্রতি পদক্ষেপেই সৃষ্টি করিয়া বসিল উপদ্রব, অনাচার, দোয়াত্যা। যাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া আপনাকে মান্নয় করিয়া তুলিবার রাজসিক প্রবৃত্তিই হইল তাহার প্রবর্তনা-শক্তি (motive-force)।

দোষ ত মানুষের নহে, প্রকৃতির অব্যর্থ বিধানে রাজকর্তৃপক্ষগণের অন্ধশাসনপ্রচেষ্টা বাংলার তাণ্ডবলীলায় ভাল করিয়াই ইন্ধন যোগাইতে লাগিল। আমরা সেই রাজসমুগের ইতিহাস ত ভুলি নাই, সে সকল কথার আলোচনা বহুবার করিয়াছি, এক্ষেত্রে তাহার পুনরুক্তি নিশ্চয়োজন। তবে কুটিল রাগদ্বেষ উৎপীড়ন ও প্রতিবিধানস্পৃহা যখন হিংস্র স্বাপদের মত বাংলার কর্মক্ষেত্রে সঞ্চরণ করিয়া রাজা প্রজার পরস্পরগত আচরণ উৎকট বিষময় করিয়া তুলিয়াছিল, সেই ঘোর সংশয়ের যুগে আমরাই মঙ্গল ঘোষণা করিয়া তরুণসম্মুখে রাজসিক উত্তেজনা পরিস্ফুট করিয়া শুদ্ধ-সত্ত্বময় আত্মবিকাশের সত্য পথটির সন্ধান করিতে আহ্বান করিয়াছি, ধরাইতে চাহিয়াছি বাহিরের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল আবেগবন্ধনা সংযত ও সংহত করিয়া ভিতরের সেই অনাহত স্মৃতি, যাহার পুণ্যস্পর্শে দেশের এই স্নান স্তিমিত জীবনপ্রদীপখানি লেগিহান সহস্র রশ্মিলেখায় দীপ্ত

হইয়া উঠিবে। আমাদের সে বেদনার গান নূতন জাতির কানে গিয়া পৌছিয়াছে। যে অন্তর্দেবতার আহ্বান আমাদের এই ক্ষুদ্র যন্ত্রটুকুর ভিতর দিয়া কলস্বরে ছুটিয়াছিল, তাহা আদৌ ব্যর্থ হয় নাই, বাংলার শ্রামলক্ষেত্রে তাই আজ দেখিতেছি, দিকে দিকে কি অপূর্ব কল্যাণময় দেবতার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

বাঙ্গালীর জীবনের চারিদিকে যে সহস্র সংশয়বিজড়িত অস্পষ্টতার ছায়া-পাত নিবিড় মেঘজালের মত তাহাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছিল, সেই ঘনীভূত সংশয়স্তূপের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াই “প্রবর্তকের” জীবন আরম্ভ, এবং এই ছায়াঘন নিবিড় জটিলতা ভেদ করিয়া স্পষ্ট উদার সরল ঋজুপন্থাটি আবিষ্কৃত করিয়া তোলাই তাহার সমুখের লক্ষ্য। এই সত্য-প্রেরণাটুকু বুকে লইয়া তাহার সমস্ত প্রচেষ্টা প্রয়াস আমূল নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, এবং তাহাতে আমরা সম্পূর্ণরূপে কৃতকাৰ্য্য হইয়াছি--সে বিষয়ে আমাদের কোনই সন্দেহ নাই। সত্য হউক মিথ্যা হউক, যে কোন ধারণা মানুষের মনে একবার শিকড় গাড়িয়া বসিলে, সহজে তাহার মূলোচ্ছেদ করা সম্ভবপর নহে। আমাদের মনে হয়, এইরূপ দৃঢ়-সংস্কারাবদ্ধ মানুষের নিকট হইতেই আমাদের নূতন গভর্নরের চিন্তে এইরূপ ধারণা রেখাপাত করিয়াছে। পূর্বাপর ধারাবাহিকরূপে “প্রবর্তকের” অভিনিবিষ্ট অধ্যয়নের অবসর ঘটিলে, তিনি অবশ্যই আমাদের কথাগুলি হৃদয়ঙ্গম করিবেন, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

সে যাহা হউক আমাদের সম্মুখে কোনরূপ অস্পষ্ট ধারণা কাহারও মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ বাহাতে না হয় তাহার জন্য আমরা বিশেষ সতর্ক থাকিব। মানবজাতির মঙ্গল সাধনই আমাদের উদ্দেশ্য, এই উচ্চ আদর্শ কাঠো পরিণত করিতে হইলে, সর্বোপায়ে গড়িয়া তুলিতে হইবে দেবমন্ডপ, সেইজন্য আমাদের চরিত্রের আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন হইয়াছে। আমরা বর্তমানে রাজশক্তির সকল মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই, কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে চাই, এমন কোন কণ্ঠই সৃষ্টি করিব না, বাহাতে রাজবিধির সহিত বিরোধ ঘটিতে পারে। আর্থ্যজনোচিত শিক্ষায়, আর্থ্যচরিত্রগঠনের যে সহায়ক তাহা সম্পন্ন করিতে হইলে, রাজশক্তির আনুকূল্যই প্রার্থনা করি, এই কথাটা স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিলাম। অতঃপর তরুণজাতিকে একটা কথা বলি।

দেবজন্ম লাভ করিবার যে জাতিগত সাধনা, তাহার পন্থা ও নেতার প্রয়োজন। আমরা পথের সন্ধান পাইয়াছি, ভগবান্ স্বয়ং নেতা, তিনি আবির্ভূত না হইলে উপায় কি? আমাদের তাহার জন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু পথ আমরা অতিবাহন করিব, শরীরের শক্তি দিয়া নহে, অঙ্গ-বল এই পথের সহল নহে একথা বার বার বলিয়া আসিতেছি, চাই মনের বল, চাই অপরাভ্রম তপোবল। এই অপার্থিব অন্তঃশক্তি আমরা হারাইয়াছি, উহা সর্ব্বাঙ্গে গুনঃপ্রাপ্ত হইতে হইবে, সেইজন্ত যে ঐগালী অবলম্বন করিলে জাতি-এই মানসিক বল লাভ করিবে তাহার আয়োজন কর, আমাদের যে উদ্দেশ্য, যে কাজ, শ্রায়তঃ তাহার বিরোধী কেহই হইবে না। আমরা দেশের প্রচলিত সকল আইনই মানিয়া চলিব, কেননা কোন আইনই এই মহৎ উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হইতে পারে না, আমাদের বুদ্ধি আছে, আমাদের সাহস আছে, আমাদের জাতির অতীত গৌরব, অতীত সুমহৎ সভ্যতা শিক্ষা আদর্শ আছে—চাই একপ্রাণতা, চাই দৃঢ় সঙ্কল্প, চাই অসাধারণ ধৃতি।

ভারতের চতুর্দিকে যে অশান্তি-অনল প্রবলবেগে জলিয়া উঠিতেছে তাহা নিবারণ করিতে গিয়া বৈদেশিক রাজশক্তি কঠোর শাসন-নীতি প্রবর্তন করিতেছেন, কিন্তু এই সকল শক্ত আইনের নির্মম পেষণে আমাদের চূর্ণ হইবার আশঙ্কা নাই, যদিও এই বিশ্বাস নানা কারণে ভারতবাসীর হৃদয় হইতে মুছিয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছে, তত্রাচ আমাদের আত্মশক্তিকে জাগ্রত করিয়া আমরা প্রমাণ করিব, অত্যাচরণ করিয়া অবিচার করিয়া কেহই কাহাকেও শান্তি দিতে পারে না, সত্যপথে চলিয়া কেহ অকারণে কখন চিরদিন নির্ঘাতন ভোগ করে না। অবশ্য এই মহাপ্রত্যটি প্রকাশ করিয়া তুলিবার জন্ত আমাদের অনেক দুঃখই সহ করিতে হইবে, কিন্তু আৰ্য্যসন্তান নারায়ণের বরপুত্র হিন্দুজাতি যুগ যুগ সত্যধর্মের জন্ত অকাতরে আত্মবিসর্জন করিয়াছে, আজ সত্যের জয়ঘোষণা করিতে তাহারা কি পশ্চাৎপদ হইবে? এস, ধর্ম ও জ্ঞানের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্ত আমরা নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বীরের মত অগ্রসর হই।

সমগ্র বিশ্ব আজ মহাআবর্তনে মথিত। লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গল ইচ্ছা ইহার মধ্যে নিহিত থাকিলেও, কালের মহিমা অব্যাহত ভাবে আমাদের বিনাশ কামনা করিতেছে, কেননা আমরা যে আয়জনের সন্ধন করিয়াছি।

উহার মূলে যে শক্তি আমাদের প্রতি মুহূর্তে এই পথে উৎসাহ প্রদান করিতেছেন, সে মহাশক্তি আজও বিগ্রহাধিতা নহেন, পার্থিব যন্ত্রনিবদ্ধ হইয়া মর্ত্যের দুঃখ দুর্দশা হইতে আমাদের পরিত্রাণে এখনও অসমর্থ, এখনও সেই অনন্ত মহিমাময়ী মহাশক্তি ভাবজগৎ হইতে ক্ষেত্রস্থা হয়েন নাই। সেই জন্ত শুধু মন্ত্রমাত্র লাভ করিয়া, আমরা যেন কোন কারণে বিচলিতচিত্তে বর্তমান স্থূলশক্তির প্রতিযোগিতা করিবার আকাঙ্ক্ষা না করি। আমরা স্থির ও প্রশান্ত মনে, যে দিব্যমন্ত্র লাভ করিয়াছি, সমষ্টিগত হইয়া তাহারই সাধনা করিব। ব্রত ব্যক্তিগত জীবনের জন্ত হইলে কোন কথাই বলিতে হইত না, জাতিগত বলিয়াই ইহার শত্রু অসংখ্য, আমাদের চরিত্র আমাদের সমাজ আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা আমাদের প্রতিকূল—আজ শক্তির সাধনা করিতে গিয়া আমরা যেন সকল শত্রুর সহিত সংগ্রাম বোধনা করিয়া না বসি—চাই ধৈর্য্য, চাই সহিষ্ণুতা, শত বিয়ে শত প্রতিকূল অবস্থায় আমরা অধীর হইয়া যেন যোগদষ্ট না হই।

অধ্যাত্ম-মুদ্র

বর্তমান মানব-চরিত্রের খণ্ডতা অন্তর্দত্তা পরিবর্তন করিয়া উহা দেব-সত্যায় পরিপূর্ণ করিয়া তোলার যে প্রণালী যে সাধনা—তাহার নামই আত্মসমর্পণযোগ। কিছুকে ছাড়াইয়া এড়াইয়া নহে, সমস্তকে ভরাইয়া পূর্ণ করিয়া নূতন ভাবে জীবন গঠন করাই এই যোগের উদ্দেশ্য। কোন জিনিষকে অতিক্রম করিয়া চলা, আর উহাকে জয় করিয়া স্ববশে আনা, হ্রদের প্রভেদ অনেকখানি।

আমাদের যাহা কিছু সমস্তই যদি সেই সত্যস্বরূপের আবরণ হয়, তবে তাহার একান্ত নিরসনই শ্রেয়ঃ। “অম্বারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি”, দেহ প্রাণ মন বুদ্ধি, ইহাদের প্রকৃতি যদি এমনই হয়, যে কোনক্রমেই বর্তমান স্বভাব হইতে ইহাদিগকে ছাড়াইতে পারা যায় না, তবে সচ্চিদানন্দ-সাগরে ভাসিবার জন্ত এই আবর্জনারাশি মৃতপুর্ব্ববের নতই পরিহার

করিতে হইবে।

জয় নহে, প্রকৃতি অপরাঞ্জেয়। তাই স্ব স্ব রাজ্যের সীমা নির্দেশ করিয়া সন্ধি স্থাপন করা হইয়াছে। বুদ্ধির, মনের, প্রাণের, শরীরের কতক অংশে গভী টানিয়া, আমরা সাধনক্ষেত্র নির্মাণ করিয়াছি; জ্ঞান, প্রেম, কর্ম্মোৎসাহ প্রভৃতির সহযোগে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছি বটে, কিন্তু সদাই সতর্কদৃষ্টি—চঞ্চল চরণ শত্রুর সীমারেখা না স্পর্শ করে, ক্ষেত্রের পরিধি কোন ক্রমে পররাজ্যের কোন অংশে না চাপিয়া পড়ে, সদাই ভয়, সদাই সঙ্কোচ, কখন অপরাধ করি, কখন সন্ধির সূত্র ভাঙ্গিয়া বসি, প্রতি মুহূর্ত্তেই বিপদের সম্ভাবনা, সীমান্তে শত্রুসেনা তীক্ষ্ণাস্ত্র লইয়া পাদচারণা করিতেছে, একটু এদিক ওদিক হইলে নিষ্কিন্তু শর হৃদয় বিদ্ধ করিবে।

প্রবৃত্তির আদর্শ যতই উচ্চ হউক, মহৎ হউক, উহা ক্ষুদ্র আত্মশক্তির খণ্ড বিকাশ মাত্র। চিরদিনই মায়ায় সহিত আপোষ করিয়া উহাকে কার্য্যাসিদ্ধি করিতে হয়। বহুবার মানুষ চেষ্টা করিয়াছে সসাগরা ধরার অধীশ্বর হইবার জন্ত, স্বরাট সম্রাট হইবার জন্ত, স্বরাট সম্রাটরূপে দেহ-রাজ্য শাসন করিবার স্নমহৎ আশা তার বার বার ব্যর্থ হইয়াছে, তাই সে আজ পৃথিবীজয়ের আকাঙ্ক্ষা হরাকাঙ্ক্ষা বলিয়াই উড়াইয়া দেয়। ভাগবত-রাজ্যের সহিত উহার কোনই সম্বন্ধ নাই, কেবল মায়া, কেবল মিথ্যা, কেবল পাপ আর দুঃখ, উহা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য, শঙ্কর হইতে বিবেকানন্দের যুগ পর্য্যন্ত, বহুশত বৎসর ধরিয়া ভারতের সাধনা তাই ইহবিমূখ হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, ভক্তপ্রেমিক বিশ্বমঙ্গল ভাগবতপ্রেমে উন্নত হইয়াও বাপীতীরে রমণীর চরণালঙ্কারধ্বনি শুনিয়া চিন্তহারী, নখর রূপমোহে উদ্ভ্রান্ত; নয়নের মন্দস্বভাব যাইবার নহে, কাজেই তিনি চক্ষুতারকা উৎপাটিত করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। পরমাশ্রান্তের পথে অন্তরায়গুলিকে হয় ধ্বংস করিয়া, নয় অতিক্রম করিয়া, নয় নিগৃহীত করিয়া মানুষ ছুটিয়াছে। প্রকৃতির প্রতিশোধ অনিবার্য্য, রক্তগত শনির মত প্রকৃতির বাধা যুগ যুগ ধরিয়া পথটিকে দুর্গম হইতে দুর্গমতর করিয়াই দিতেছে। যে শক্তি বিশ্ব উৎপাদন করিতে পারে, তাহার আত্মকূল্য করিবারও যথেষ্ট স্পর্দ্ধা আছে, আমরা প্রকৃতির সহায়তা গ্রহণ না করিয়া ইহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম বোধগ

করিস্যাই চলিয়াছি—যাত প্রতিযাতে জীবন আমাদের অবসন্ন, সম্মানসী বিবেকানন্দ পর্য্যন্ত পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত অবধি এই কথাটিরই প্রতিধ্বনি তুলিয়াছেন।

*

*

আজ এই উৎকট অক্ষমতামূলক বৈরাগ্যের বিরুদ্ধে ভগবানের জলদ-গর্জনে ভারতের জীবন চমকিত করিয়া তুলিয়াছে, মৃত্যুর মধ্য দিয়া বিশ্বের অমিনশ্বরত্বই প্রতিপন্ন হয়, জীবন অলীক ইহা তাহার প্রমাণ নয়, সমধিক শক্তির প্রমাণ ইহাই পন্থা। বার বার মরণের মধ্য দিয়া, আজ একদল সাধক অসাধারণ সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য ও আধ্যাত্মিক বল বৃদ্ধি লইয়া ভারতের ক্ষেত্রে বিজয় নিশান তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, এই মর্ত্যের রেখায় রেখায় ভগবানকেই মূর্ত করিয়া তুলিবে, কিছুকে ছাড়িয়া নহে, খুঁজিয়া বাহির করিবে নিগূঢ়ে রহিয়াছে যে অমৃতময় সত্তা। পৃথিবীর বৃকে আজ নিগূহীত উৎপীড়িত বৃক্ষসু মানব-শিশু, তোমাদের শোচনীয় পরিণামের মূল কারণ ত বাহিরের বন্ধন নহে, জগৎকে উপেক্ষা করিয়া তোমরা বিশ্বশ্রমের অপমান করিয়াছ, ইহা যে তাহারই কঠোর প্রায়শ্চিত্ত, জগতের ধূলারাশি সদাম্মানে মাথায় তুলিয়া লও, পৃথিবীতেই তোমার সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়া নয়।

*

*

*

আমরা আর খুঁজে ছা ছা করিয়া বেড়াইতেছি না, বাংলার নতুন দলের বুদ্ধিক্ষেত্রের এককোণে আশ্রয় পাইয়াছি—আজ এই বিন্দুপরিমিত জ্ঞানে দাঁড়াইয়া, বর্তমান জগতের সকল শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতেছি, বুদ্ধিকে অধিকার করিয়া আমরা সমুখের হৃদয়রাজ্য জয় করিয়া জীব, স্থল জগতের বড় বড় দেশ জয় করিবার জন্য যত ক্রেশ, যত পরিশ্রম, যত কৌশলের প্রয়োজন, মানবের এই অধ্যাত্মরাজ্য জয় করিতে তাহার লক্ষ গুণ অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। সমস্তই আমাদের বিরোধী—রক্তকণা পর্য্যন্ত আমাদের বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিবে, অভীষ্টের সকল শক্তিই আমাদের পরাজয় ঘটাইবার জন্য বীরমর্দে যুদ্ধ করিবে, এমন অসাধারণ কে আছে, সকল সহায় হইতে বঞ্চিত হইয়া জগতে নতন জীবন বহিয়া আনিবার জন্য আমাদের সঙ্গে যোগদান করিবে।

*

*

*

সম্মুখে উত্তম গিরিশ্রৈণী, ভীষণ হিংস্রজন্তুপরিপূর্ণ গভীর অরণ্য, বয়-
শ্রোতা বিস্তীর্ণ শ্রোতৃমণী, ভাঙ্গিয়া মর্দিয়া সাতারিয়া কে অগ্রসর হইবে,
কে বীর ধীর শান্ত অসমসাহসী এই নূতন অধ্যাত্মযুদ্ধে আপনাকে বলি
দিবে? মনে রাখিও একটু হৃদয় একটু বুদ্ধি একটু প্রাণ লইয়া ছেলে-
খেলা করিবার সাধনা ইহা নহে, একটু জ্ঞানে, একটু প্রেমে, একটু
পুলকে দর দর ধারে নয়নবারি রক্ষা প্রাপ্ত করিলেই জীবন সার্থক মনে
করিবার মত ইহাতে কিছুই নাই, অবিরাম যুদ্ধ, অশান্ত অবিচ্ছিন্নভাবে,
তিল তিল জয় করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, কখন অধিকৃত সকল স্থান
হইতে বিভাঙিত হইব, আবার অধিকার করিব, এইরূপ বার বার উত্থান
পতনেও অবিচলচিত্তে কে আছে অগ্রসর হও। মানবজাতির জীবন
ভাগবতশক্তিতে পূর্ণ করিয়া মর্ত্যে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার মত স্পর্ধা
আছে যাহার, তাহাদিগকেই এই মহাযুদ্ধে আবাহন করিতেছি। স্থলজগতের
সহিত সংগ্রাম করার তুলনায়—মানুষের যে উৎসাহ যে ব্যস্ততা যে কার্যভৎপরতা
তাহাতে দেখিতে পাও, আজ ভারতের এই অধ্যাত্মসময়ে যে তাহার অপেক্ষা
কতগুণ অধিক ব্যস্ত হইয়া কি উৎসাহ-অনলে আমাদের জীবন ভরাইয়া তুলিতে
হইবে, কত দিবসাত্রে যে এই কার্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে, কতখানি
কার্যকুশলতা যে ইহার জন্য প্রয়োজন, তাহা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত না
হইলে বুঝিতে পারিবে না।

তত্ত্ব-সাধনা

(২)

সারা জীবনটাই যোগ। যোগের প্রণালীও ভিন্ন ভিন্ন। যোগের উদ্দেশ্য
ভগবানকে জানা এবং পাওয়া। এক্ষণে এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ভিন্ন
ভিন্ন যোগপন্থাগুলি আমাদের কতটা আগাইয়া দেয়, তাহা ভাল করিয়া
বুঝিতে পারিলে এমন একটি সাধন-প্রণালী উদ্ভাবিত হইতে পারে, যাহা
দ্বারা আমরা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পথে সময় ও শক্তির অপব্যয় না করিয়া,
একটা পথ ধরিয়া অতীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারি।

প্রত্যেক সাধন-প্রণালীর প্রয়োজনীয়তা বুঝিবার পূর্বে, জানে অজ্ঞানে আমরা কি পাইয়াছি, কি পাইতে চলিয়াছি, কি পাইবার এখনও বাকী আছে, এগুলি অবধারণ করিব।

মায়ী বলিয়া জীবনকে বাহারা উড়াইয়া দেয়, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। “প্রজ্ঞা প্রসূতা পুরাণী” অনাদি অনন্ত কাল ধরিয়া জ্ঞানের প্রবাহ চলিয়াছে, এই পরমাজ্ঞান-শক্তি কিছুকে ছাড়িয়া নহে, সমস্তই ইহাতে বিধৃত, অতএব স্থাবর জগৎ এই জগৎ অনিত্য নয়, অনন্ত জ্ঞানময়ের সত্তা দিয়াই সমুদয় রচিত। বাহা একান্তই জড়, স্থূল, মাটীই বাহার রূপ, তাহা নমন-সাধ্য ও পরিবর্তনক্ষম; অনিত্য বলিয়া নহে, প্রাণশক্তির বিকাশের তারতম্যানুসারে ইহার নব নব রূপ পরিগ্রহ অনিবার্য।

আমরা ইহাই পাইয়াছি। পাইয়াছি এই আধার, মানবদেহ, আর ইহার মধ্যে প্রাণশক্তি, আধারকে প্রতিদিন প্রসারিত করিয়া, উপযোগী করিয়া, ইহার উপরই প্রতিষ্ঠা করিতে ছুটিয়াছি মনোময় জগৎকে। কথাটা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয় বটে, কিন্তু সত্য সত্যই মনের পূর্ণ প্রকাশ এখনও আমাদের মধ্যে সফল হইয়া উঠে নাই, যেটুকু পাইয়াছি তাহাই এক্ষণে পূর্ণাঙ্গ হইতেছে, ইহার পর পাইতে হইবে আনন্দময় সত্তাকে।

শরীর ও প্রাণের ক্ষেত্র হইতেই মনের জন্ম। যতক্ষণ মন—শরীর ও প্রাণের অন্তর্গত থাকে, ততক্ষণ উহা পশুজীবন; শরীর ও প্রাণ হইতে বিযুক্ত হইয়া, ঐ গুলিকে পরিচালিত করিবার মত মনের স্বাধীনতা জন্মিলে, তখনই তাহাকে মানুষ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। এই মানুষ্য লাভই আমাদের প্রথম সাধনা; মন, শরীর ও প্রাণের প্রভাব হইতে মুক্ত না হইলে, দেবজন্মের আশা ছরাশামাত্র।

মনের পর পর তিনটি অবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। প্রথম, শরীর ও প্রাণ হইতে উপচিত বলিয়া, শরীর ও প্রাণের যে সংস্কার, মন তাহাতেই সংলিপ্ত থাকে—কাজেই প্রথম প্রথম শরীর ও প্রাণের বোঝা বহিবার ভূতাস্বরূপই তাহাকে দেখায়, কিন্তু মনের প্রকৃতস্বভাব এরূপ নহে, ক্রমে ইহা এই বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া আত্মপ্রকৃতি লাভ করে। মানুষ নব নব আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া, তখন হয় ভাবুক, কবি, প্রেমিক—মন তখন শরীর ও প্রাণের উপর কর্তৃত্ব করিতে থাকে, শরীরের সহিত প্রাণের যে নিবিড় সম্বন্ধ, মনের সঙ্গেও তাহার যোগসাধন হয়।

মনও যত্ন, কর্তা নহে। এইজন্য মানুষ মনের উপরেও যে আনন্দময় সত্তা আছে, মন দিয়া তাহার দিকেই প্রধাবিত হয়। শরীর ও প্রাণকে ছাড়াইয়া, মানুষের মন যখন হয় নির্লিপ্ত, শুধু বিচার চিন্তা ও বিবিধ চিন্তবৃত্তির ঘোরেই আত্মহারা থাকে, তখনই উপরের আকর্ষণ সে ধীরে ধীরে অনুভব করে, এবং ক্রমশঃ সে অবস্থা হইতে উন্নীত হইয়া এই সচ্চিদানন্দ-সাগরে আপনাকে ডুবাইয়া, মানবজীবন-সার্থক করিয়া তুলে।

হিন্দুশাস্ত্রকারগণ মানবজীবনের এই পাঁচটা কোষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন—(১) অন্নময়কোষ, (২) প্রাণময়কোষ, (৩) মনোময়কোষ, (৪) বিজ্ঞানময়কোষ, (৫) আনন্দময়কোষ। চতুর্থ ও পঞ্চম কোষ সচ্চিদানন্দময় জ্ঞান ও আনন্দের আকর।—মন ইহাতেই অবগাহিত হইয়া প্রাণে ও শরীরে এই সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চার করিলেই, মানবজীবন গইয়া প্রকৃতির যে উদ্দেশ্য তাহা তখন, সফল হয়।

একণে আমরা দেখিতে পাই, প্রকৃতির চরম উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্ত, জীবনের কোন অংশকেই আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না। ভারতের মনীষীগণ যখন বলেন, এ বিশ্ব-কেবল কর্মভূমি, সাধনক্ষেত্র, মানব-জন্ম পরাগৃহতির-উপকরণবিশেষ; পক্ষান্তরে সচ্চিদানন্দ লাভ হইলে, মৃত্যু-পূরীষের মত ইহা পরিহার করা কর্তব্য—তখন বুঝিতে পারি না, এ বিশ্বের প্রয়োজন কি? কোন-নির্গূঢ় তত্ত্ব ইহার মধ্যে নিহিত থাকিতে পারে, কিন্তু ভগবানের সৃষ্টিসাক্ষ্য ইহার মধ্যে নাই। প্রকৃতির অমোঘ শক্তি ও কর্ম-ইষণা ব্যর্থ করিয়া, একটি ক্ষুদ্র জীবনের নির্বাণপ্রয়াস একান্তই হাস্যান্বিত।

একটা কথা সাধককে মনে রাখিতে হইবে—আমাদের জীবন গইয়া এই যে খেলা, তাহা যে আকারেই পরিস্ফুট হউক না, ইহার ভিতর আমাদের কোনই বাসনা নাই, বা ইহাকে রূপান্তরিত করাও আমাদের পক্ষে অসাধ্য। অনন্ত প্রকৃতির হস্তে অনন্তকোটি ভুবন যত্নবৎ পরিক্রমিত, এই কোটি কোটি ভুবনের প্রতি অণু পরমাণু পর্যন্ত প্রকৃতির উদ্দেশ্য সাধনেই সৃষ্ট, বিবর্তিত, পরিচালিত হইতেছে, ইহার মধ্যে মানুষের মুক্তি বাসনা, প্রকৃতির বিপুল ইচ্ছার খিলু প্রকাশ হইলেও, উহা একান্তই বিকৃত, কেননা স্বর্গদ্বারে গিয়াও বুদ্ধ দেখিয়াছিলেন—আপনাকে নিঃশেষ করিলাম বটে, কিন্তু অনন্ত বিধে কিছুই নিঃশেষ হয় নাই, সবই

পূর্ববৎ অর্থে হুংথে হর্ষে বিবাহে জীবনে মরণে মাথামাথি হইয়া কি এক উদ্দেশ্য সাধনে কর্মতৎপর রহিয়াছে। তিনি ফিরিয়া আসিলেন।

প্রকৃতি যখন কিছুই পরিহার করেন নাই, সৃষ্টির প্রথম পদক্ষেপটীও যখন নিশ্চিন্ত হইয়া যায় নাই, তখন ভগবান্কে বিকশিত করিয়া তুলিবার এই চরম সৃষ্টি মানবোদার, উর্দ্ধপথে বহু বিস্র সম্পাদন করে বলিয়া ইহা যে তালিয়া চুরিয়া শেষ করিয়া দিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। তাহার উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়াছে আমাদের মন, সেই মনই ভাগবত-রসাপ্ত হইয়া, শরীরের অমরত্ব সম্পাদন করিবে। আমাদের মন, প্রাণ, শরীর ভাগবতজ্ঞান ও আনন্দেরই প্রতীক; সকল বৃত্তি, সকল শক্তি, সকল কর্মই ভগবানের। অহংকারের ছাপ উঠাইয়া, ভাগবতরূপে ও রসে ইহাকে নুতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে।

মানুষের মন যদি ভাগবতজ্ঞানে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, মানুষের অমুভূতি ও বৃত্তিচয় যদি ভাগবত-আনন্দে বিভোর হয়, মানুষের সকল কর্ম যদি ভাগবত ইচ্ছারই প্রতিকূপ হয়, তাহা হইলে লীলাময়ী প্রকৃতির খেলার মধ্যে যে গোপন ইচ্ছাটি তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িবেই।

প্রকৃতি গড়িয়া তুলিয়াছেন দেহ ও প্রাণ, মর্ত্যে ইহাই আমাদের প্রতিষ্ঠান, তারপর পাইয়াছি মন, যাহার ভিতর দিয়া দেহ ও প্রাণের গতিকে আমরা উর্দ্ধপথে উঠাইয়া ধরিতে পারি, এবং পাইতে চলিয়াছি দেবতাকে, মন প্রাণ দেহের সাহায্যেই ইহা সংসাধিত হইবে—এবং এই সকলের উপরেই ভগবান্ মুগ্ধ হইয়া অধিষ্ঠিত হইবেন।

স্বদেশী ও বিদেশী

ইউরোপ চাইতে আমাদের ভারতবাসীর কিছু শিখিবার গ্রহণ করিবার আছে কি না, থাকিলেও শিক্ষা করা গ্রহণ করা উচিত কি না—এ প্রশ্নটি নূতন করিয়া আবার স্থায়ী সমাজে আলোচন তুলিয়া দিয়াছে। একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে প্রত্যেক দেশের, প্রত্যেক জাতির আছে একটা বৈশিষ্ট্য একটা স্বভাব স্বধর্ম; এই বৈশিষ্ট্য, এই স্বভাব স্বধর্মকে তিস্তি করিয়া দেশকে জাতিকে দাঁড়াইতে হইবে, এ জিনিষটি যে হারাইবে, জীবনও সে হারাইবে। যে দেশ যে জাতি নিজের কি আছে বা না আছে সেমিকে মোটেও দৃষ্টি না দিয়া, কেবল পরের দিকে তাকাইয়া পরের অনুকরণেই ব্যস্ত তাহার অস্তিত্ব তো লোপ পাইবার বেশী বিলম্ব নাই। কারণ, জীবন হইতেছে নিজের ভিতর হইতে ফুটাইয়া, ছড়াইয়া গড়িয়া তোলা। এই নিতৃত আবেগই স্বজন করিয়া তুলিয়াছে তোমার যাহা কিছু প্রয়োজন, তোমার ধরণ ধারণ আচার ব্যবহার রীতিনীতি—এ-সকলের সাথে তোমার আছে একটা সহজ মিল, এ সকল হইতেছে তোমারই প্রতিভার শক্তির জীবনধারার প্রকাশের প্রণালী। কিন্তু এই ভিতরের স্বজন আবেগ যাহার নাই, যাহার ধরণধারণ আচার ব্যবহার রীতিনীতি নিজের অন্তর হইতে সৃষ্ট নয়, বাহির হইতে আরোপিত দ্বার, ভিতর হইতে যে আপনার বিশিষ্ট সাড়া দিতে পারে না কেবলই যে বাহিরের আঘাতে অসহায়ভাবে সরিয়া দুরিয়া চলে সে ত অভ্যুপদার্মদ্র।

ইহাতে দ্বিধা করিবার কিছু নাই। কিন্তু কথা হইতেছে জীবন অর্থ ভিতর হইতে সাড়া দেওয়া, স্বজন করা হইলেও, সেই সাথে বাহির হইতেও সে যে কিছু আহরণ সংগ্রহ করিতে পারিবে না—এমন নিষেধ তাহার পক্ষে থাকিবেই কি? বীজ হইতে বৃক্ষ ফুটিয়া উঠিয়াছে, বীজের অন্তঃস্থ প্রাণশক্তির বলেই, সত্য কথা; কিন্তু বাহিরের জল মাটি আলো বাতাস এ সকলেরও প্রয়োজন আছে। মানুষের পক্ষে, দেশ বা জাতির পক্ষেও এই কথা প্রযোজ্য। বাহির হইতে গ্রহণ করিবার আহরণ করিবার পক্ষে কিছু বাধা নাই কিন্তু চাই স্বজন করিবার, আপনার মধ্যে

মিলাইয়া নিশাইয়া লইবার শক্তি, চাই তিতরের সেই সজাগ আত্মসংস্থা যাহা বাহিরকে পরকে আপনার প্রয়োজন অনুসারে আপনারই হাঁচে গলাইয়া—ঢালিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। আমের বীজ জল মাটি জ্বালো বাতাস লইয়া আমের গাছকেই সৃষ্টি করিয়াছে, কাঁঠালের গাছ সৃষ্টি করে নাই; কাঁঠালের বীজও তেমনি সেই একই উপকরণের সহায় লইয়া কাঁঠাল গাছকেই গড়িয়াছে, আর কোনও গাছ সে লইয়া পড়ে নাই। প্রত্যেক মানুষও তেমনি বাহিরের জল বায়ু আহাৰ্য্যকে অথবা ভাষা ভাব চিন্তাকে আপনার তিতরের বিশিষ্ট ধর্মের স্বভাবের অনুসারে আহরণ করিয়া, বদলাইয়া নিজের নিজের পৃথক রকম শরীর, পৃথক রকম কথা কহিবার ভঙ্গী, পৃথক রকম প্রাণ মন গড়িয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু কথা উঠিতে পারে, বাহির হইতে জিনিষ লইতে পারি কিন্তু এ বাহির হইতেছে যাহা সাধারণ যাহা সর্বত্র; বিশ্বে যে সব সামগ্রী পড়িয়া আছে সেখান হইতে সকলেই আপন প্রয়োজন অনুসারে যাহা যতটুকু যেরূপে গ্রহণ করে রকম, কিন্তু বিশেষের কাছে সেজন্ত যাওয়া উচিত নয়, সম্ভবও নয়। আমের যাহা দরকার সে তাহা পাইবার জন্য কাঁঠালের নিকট যায় না, বাইতে পারে না—আম ও কাঁঠাল উভয়েই আহরণ করে প্রকৃতির অনন্ত উৎকৃত ভাণ্ডার হইতে। ঠিক সেই রকম ভারতবর্ষের ইউরোপ হইতে কিছু আহরণীয় নাই, থাকিতে পারে না। ভারতের যাহা প্রয়োজন সে লইয়াছে, লইবে বিশ্বসৃষ্টি হইতে, বিদ্যমানই হইতে, ভগবানের অসীম অগাধ ঐশ্বর্য্য হইতে, আপনার সাধনার স্বধর্মের জোরে। সেজন্ত ইউরোপের দ্বারস্থ হইবার প্রয়োজন নাই।

ইউরোপের শিক্ষা দীক্ষা বিধিব্যবস্থা ইউরোপের স্বভাবের স্বধর্মের পরিণতি, উহার মধ্যেই ইউরোপের প্রাণ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, উহার মধ্যেই ইউরোপের অন্তরাশ্রয় সার্থকতা। ভারতবর্ষও তেমনি আপন জীবন-দেবতার নির্দেশ অনুসারে গড়িয়া তুলিয়াছে তাহার ধর্ম কর্ম তাহার বিশেষ রীতিনীতি—এ সকল বদলাইয়া ফেলিয়া পনের নাপে কাটা, পরের প্রয়োজন অনুসারে তৈয়ারী করা পরিধান সে যদি নিজের সঙ্গে লগ্ন তবে তাহার ফল হইবে কি? এন্নিমোদের দেখাদেখি আমরাও যদি সেই রকম পশমের স্ত্রুপে ডুবিয়া থাকি তবে দম বন্ধ হইয়া মরা ছাড়া আর আনন্দের কোন পরিধান নাই।

প্রত্যুত্তরে বলা যাইতে পারে, তাহা কেন, মানুষের ত বুদ্ধি বলিয়া একটা জিনিষ আছে, নিরীকোপের মত পরের বাহা তাহা অনুকরণ করিব কেন? অপরের মধ্যে বাহা ভাল, বাছিয়া সেটুকুই আহরণ করিব, মন্দটুকু করিব না। ভারতের স্বধর্ম স্বভাব বা প্রকৃতিতে বাহা খাপ খায়, উহা কেই বাহা জাগাইয়া ফুটাইয়া ধরে, এমন সব জিনিষ ইউরোপ হইতে গ্রহণ করিবার পক্ষে কোন আপত্তি হইতে পারে না। শুধু সাবধান হইতে হইবে, ইউরোপের যে দোষগুলি তাহা যেন এড়াইতে পারি, আমাদের জাতির প্রাণের অন্তরাঙ্গার পক্ষে বাহা অনিষ্টকর এমন কিছু যেন না আমদানি করি।

কিন্তু এমন কথা বাহারী বলেন তাহার কি আকাশ কুন্ডল রচনা করিতেছেন না? কার্য্যতঃ এই উপদেশ অনুসারে চলা কি অসম্ভবই নয়? কারণ প্রথমতঃ ভালমন্দের মানদণ্ড কি, কে তাহার একটা মীমাংসা করিয়া দিবে? তারপর প্রত্যেক জাতি তাহার ভালমন্দ দোষগুণ লইয়াই এক অখণ্ড জীবন্ত। ইউরোপীয় সভ্যতার মধ্যে বাহাকে ভাল বল আর বাহাকে মন্দ বল, উভয়ই ইউরোপের জীবনপ্রতিভার বিকাশ, উভয়কেই আশ্রয় করিয়া ইউরোপের বিশেষত্বটি অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে—এক অচ্ছেদ্য নাড়ীর বন্ধনে। উভয়ে ওতপ্রোতভাবে মিশামিশি মাখামাখি হইয়া আছে। তোমার ইচ্ছামত ভালটুকুকে শুধু আলাদা করিয়া, কাটিয়া ছিনাইয়া আনিতে পার না। ভাল'র সাথে অব্যর্থভাবে মন্দেরও অনেক খানি উঠিয়া আসিবে। ভারতবর্ষেরও বিধিব্যবস্থা জীবনধারা এই ভালমন্দ উভয়কে লইয়া—সে ভাল, সে মন্দেরও মধ্যে ভারতের বিশেষত্বের, তাহার স্বধর্মেরই ছাপ রহিয়াছে। সুতরাং ভারতের মন্দকে সংস্কার করিতে হইলে, শুদ্ধ করিতে হইলে, করিতে হইবে ভারতেরই ভাল দিয়া; সেজন্ত ইউরোপের ভাল'র কাছে যাইতে হইবে কেন, সেজন্ত ইউরোপের ভালকে আনিতে যাইয়া ইউরোপের মন্দটুকুও সঙ্গে সঙ্গে আনিবার বিপদ আলিঙ্গন করিতে যাইব কেন?

এ কথা যদি সত্য হয় তবে ত দেখিতেছি স্থিতির মধ্যে—বস্তুতে বস্তুতে জীবে জীবে জাতিতে জাতিতে আদান প্রদান বলিয়া কোন জিনিষ নাই; যদি কিছু থাকে তবে তাহা মঙ্গলজনক নহে, কারণ তাহাতে উৎপত্তি হয় ধর্মসঙ্কর অর্থাৎ অনাচার অপচার উচ্ছৃঙ্খলতা—একটা লণ্ডভণ্ড।

(chaos), সেখানে সকল জীবনের অবসান।

কিন্তু জীবনে আদান প্রদান নাই বা থাকা উচিত নয় এত বড় কথা কি কেহ সত্য সত্যই নির্দিকারচিত্তে বলিতে পারেন? জীব আপনাই নিভৃত জীবন-প্রতিভাকে উন্মোচিত করিয়া পৃথিবীর উপর আপনার অধিকার বিস্তার করিতেছে, একথা যেমন সত্য, আবার জীবে জীবে পরস্পরের সহিত পরস্পরের সংঘাতে সংঘর্ষে আদানে প্রদানেও সে প্রতিভা কৃটিয়া উঠিবার সুবিধা পাইতেছে, একথাও ঠিক তেমনই সত্য। শিক্ষা সাধনা উন্নতি, অন্তরাত্মারই বিকাশ সন্দেহ নাই। কিন্তু এই অন্তরাত্মাকে সোজাহুজি খুঁজিয়া পাইবার ধরিবার অবকাশ সব সময়ে মিলে না, তাহাকে পাই গোণতঃ, বাহিরের ধাক্কা, অগ্রত্ব হইতে। নিজের মধ্যে নিজেকে নিজের ভাগ্যরত সভাকে প্রতিভাকে প্রথমতঃ না দেখিয়া অনেক সময়ে সে জিনিষটিকে দেখিতে পাই ধরিতে পাই পরের মধ্যে। এই জন্তই ত শিককের গুরুত্ব, সতীর্থের সহচরের সার্থকতা।

পৃথিবীতে কেহ একা নিঃসঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া নাই। অনন্ত প্রকৃতির সাথে প্রত্যেক জিনিষটির যেমন লেনাদেনা চলিয়াছে, সেই রকম প্রত্যেক জিনিষটি প্রত্যেক জিনিষ হইতে কিছু গ্রহণ করিতেছে, আবার কিছু ফিরাইয়া দিতেছে। শরীরের জগতে, প্রাণের জগতে বিশেষের সহিত বিশেষে এই দান প্রতিদান ত চলিতেছেই—মনের জগতেও সেই একই ধারা বর্তমান। ব্যক্তি হউক আর জাতি হউক, তাবের চিন্তার বিনিময় হইতেছে উদ্ধারের ধর্ম। নিজস্ব, বিশেষত্ব জিনিষটি সত্যকথা—এটি প্রতিভা। কিন্তু অপরের সহিত সাক্ষর্য্য মিলামিশা হইলেই যে সে নিজস্ব বা বিশেষত্ব ধর্ম হইতে বাধ্য এমন কোন নিয়ম নাই। বরং এই মিলামিশাই এই সাক্ষর্য্যই নিজস্বের বা বিশেষত্বেরই উদ্বোধক হইতে পারে। বস্তুতঃ যে কোন জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে ইহার সত্যতা প্রমাণিত হয়।

জাতির বিশেষত্ব যখন আমরা অতি সর্পিণ করিয়া ধরি, পুরাতন সংস্কার বা কোন বিশেষ ভালমন্দ বা প্রিয়প্রিয়ের দৃষ্টির মানদণ্ডকেই একান্ত করিয়া ধরি তখনই ভয়ে ভয়ে চলিতে হয়, কোন নতুন তথ্য নতুন আবিষ্কার অপরিচিত কিছুর সংস্পর্শে আসিলেই তাহাকে দূরে দূরে রাখিতে চাই, পাছে তাহার পুরাতন পরিচিত জিনিষকে ভাঙিয়া ফেলে,

অজানা অচেনা পরের ছোঁয়া পদাঘটি আমাদের বিশেষত্বকে নষ্ট করিয়া
কেলে। কিন্তু একথা আমরা ভুলিয়া বাই আহার্য বৈশিষ্ট্য অতি উদার
জিনিষ আর তাহা অতীব স্বাস্থ্য। তুমি আমি তোমার আমার সংস্কার
অনুসারে স্থির করিয়া ফেলি, ভারতের ধর্ম এইটি, এই রকম পন্থাই
ভারতের পন্থা—ইহা হইতে বিচ্যুত হইলে, ভারতবর্ষ তাহার অন্তরাঙ্গার
পথটি হারাইয়া ফেলিল। কিন্তু তাহা মোটেও নয়। বৈষ্ণব বলিবেন
আহার্যের অল্প জীবনত্যাগ করিতে নাই—মুনিঋষিগণ ফলমূল খাইয়া থাকি-
তেন, শাস্ত্রের বচন আছে দন্ধোদর ত 'শাকেনাপি প্রপূর্যতে'—অতরাং
নিরামিষ আহারই ভারতের বিশেষত্ব, এষ ধর্মঃ সনাতনঃ। শাক্ত বলিবেন
মাছ মাংস মদ্য চাই, ভারতশক্তির সাধকগণ চিরদিনই তান্ত্রিক। বাঙ্গালী
বলিবেন অবরোধপ্রথা ভারতীয় সমাজবন্ধনের বিশেষত্ব—দাক্ষিণাত্যবাসী
বলিবেন অন্য কথা। ব্রাহ্মণসমাজ বলিবেন জাতিভেদ উঠাইয়া দিলে ভারত-
বর্ষ থাকিবে না, আর্যসমাজ বলিবেন জাতিভেদই ভারতের অবনতির
কারণ। কাহার কথা মানিব, কে ভারতের প্রাণের তত্ত্ব, তাহার অন্ত-
রাঙ্গার স্বপ্নের খবর পাইয়াছে?

আমরা বলি, জাতির বিশেষত্ব, তাহার নিগূঢ় প্রতিভাকে বজায়
রাখিতে হইলে, ফুটাইয়া তুলিতে হইলে এই রকম ছুৎসংস্কার অবলম্বন
করিবার কোন সার্থকতাই নাই। সকলের আগে চাই জাতির জীবনটি
জাগাইয়া তোলা। প্রাণে প্রাণে অন্তরাঙ্গার কুলে কুলে সে যাহাতে
শক্তির স্রাবণ অল্পভব করিতে পারে তাহাই হইতেছে প্রথম কাজ।
অজীর্ণ রোগ ঘর তাহার পক্ষে কঠিন বিধিনিষেধের, অতি সাবধানতার
প্রয়োজন থাকিলেও থাকিতে পারে কিন্তু এই রোগটিকেই যে সহজ সাধা-
রণ স্বাস্থ্যের অবস্থা বলিয়া ধরিতে হইবে তাহার কি মানো আছে?
রোগীকে নিরাময় করিতে হইবে, শিরার শিরার প্রাণের তেজ ভরিয়া
দিতে হইবে—বাহাতে লোহার মটর খাইয়াও সে জীর্ণ করিতে পারে।
চিরদিন হাসপাতালে পড়িয়া জীবন কাটান একটা কিছু আদর্শ নহে।

ভারতবর্ষ আজ পরাধীন, জীবনীশক্তির বেগ তাহার মধ্যে আজ ক্রিমিত
হইয়া পড়িয়াছে—সেইজন্য তাহাকে বিশেষ সাবধানে থাকা ও চলা উচিত।
একথা স্বীকার করিলেও আমরা মানিব না ভারতকে নিজের পায়ের
উপর দাঁড় করাইবার, তাহার মধ্যে জীবনের স্রাবণ বহাইয়া দিবার

প্রকৃষ্ট পন্থা হইতেছে বিদেশীর অন্য সকলের সংস্পর্শ হইতে সরিয়া আপ-
নাকে ঢাকিয়া ঢুকিয়া রাখা। আমরা ত মনে করি ভারতবর্ষ আজ আর
রোগী নয়, সে এখন বুল স্বাস্থ্য সঞ্চয় করিবার প্রয়াসী (convalescent)।
এখন তাহাকে ক্ষুধারসারে পুষ্টিকর খাদ্য, যথেষ্ট পরিমাণ অঙ্গসঞ্চালনের
অবকাশ দেওয়া চাই। তাহা না করিয়া এখনও যদি আঁটির রাখিয়া
রাখিতে চেষ্টা করি তবে যুক্তার পথই তাহার জন্য সরল করিয়া দিব মাত্র।

সে যাহা হউক, বিদেশ হইতে কিছু শিখিবার গ্রহণ করিবার আছে
কি না, এ সন্দেহ তখনই উপস্থিত হয় যখন আমরা মনে করি বিদেশ
হইতে হবহ গোটা একটা জিনিষ কিছু তুলিয়া লইয়া আমাদের জাতীয় শিক্ষা-
দীক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বসাইয়া দিতে হইবে। তাহা নয়। ইউরোপ
হইতে তাহাই আমরা শিখিব গ্রহণ করিব যাহা কেবল ইউরোপেরই নিজস্ব
নয়, যাহা হইতেছে মানবসাধারণের বস্তু, ইউরোপ যাহা আগে পাইয়াছে
বা যাহার চর্চা করিয়াছে, জুলাইয়া ধরিয়াছে। প্রত্যেক জাতির মধ্যে
ভগবান তাহার এক এক গুণ বা প্রতিভা খেলাইয়া তুলিয়াছেন, এক
এক জাতির মধ্যে এক এক যুগে মানবপ্রকৃতিরই এক একটা মহিমা
প্রকটিত করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া কোন জাতি সে যে গুণ ধর্ম
বিধি ব্যবস্থাকে আপনার করিয়া লইয়াছে তাহার মধ্যেই চিরকাল আবদ্ধ
থাকিবে এমন কোন কথা নাই। জীবাত্মা যেমন অনন্ত গুণের আধার,
নানা দেহ ধারণ করিয়া, নানা গুণ নানা ধর্ম অবলম্বন করিয়া বিকাশের
উন্নতির পথে চলিয়াছে, ঠিক তেমনি দেশের জাতির অন্তর্ধানী পুরুষও
এক সক্ষীর্ণ ধারায় গতানুগতিক পন্থায় চলে না, সে চায় আপনাকে রহ-
বিচিত্র করিয়া ধরিতে, নানা অভিজ্ঞার আপনাকে ভরপুর করিয়া তুলিতে।
এই যেমন ভারতবর্ষকে আমরা জানি আধ্যাত্মিক সাংস্কৃতিকপ্রকৃতি বলিয়া।
সত্য কথা। কিন্তু ইউরোপ যে জীবনের আধিভৌতিকতার রাজসিকতার
আদর্শ ভারতের কাছে লইয়া আসিয়াছে তাহাও ভারতের পক্ষে মিথ্যা বা
পরধর্ম নহে। ভারতের অন্তরাত্মার লুক্কায়িত একটা বৃত্তিই আজ ইউরো-
পের ধাক্কায় জাগিয়া উঠিয়াছে। এ বৃত্তি ভারতেরও নয়, ইউরোপেরও
নয়—এটি মানুষেরই বৃত্তি। যদি বল জীবনের কর্মের আদর্শের জন্য ইউ-
রোপের কাছে যাইব কেন, সাংস্কিক ভারতের আছে বা ছিল যে নিজস্ব
একটা কর্মের রাজ্যবৃত্তির আদর্শ তাহাকে ফুটাইয়া ধরিলেই হইল। কিন্তু

আমাদের কথা ইউরোপের কাছে সেজ্ঞা গেলে দোষই বা কি? আমরা দেশের কণ্ঠের যে আদর্শ ছিল তাহা কি এখন হুবহু আমরা বাস্তব-জীবনে চালাইতে পারি, না তাহা চালান উচিত? আমরা ইচ্ছা করি বা না করি, সে প্রাচীন সনাতন আদর্শ হইতে যে আমরা বহুদূরে চলিয়া আসিয়াছি। বর্তমানের উপযুক্ত করিয়া ধরিতে হইলে সে প্রাচীনকে সে সনাতনকেও ত অনেকখানি পরিবর্তন করিয়া সংশোধন করিয়া লইতে হইবে। বর্তমানযুগের মানবধর্মের একটা প্রধান ধারা ইউরোপের মধ্য দিয়া বহিয়া চলিয়াছে, কালপুরুষের তৃতীয় নৈত্রের একটা জ্যোতি আজ পাশ্চাত্যকে আলোকিত করিয়া ধরিয়াছে, আমরা যদি ইদানীং তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকি তবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নির্বাক নিপন্থ হইয়া কোন অদূর অতীতে সেই রকম একটা কি আমাদের ছিল তাহার ধ্যানে মগ্ন না হইয়া, তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যথা চেষ্টা না করিয়া যদি আমরা স্বীকার করিয়া লই তগবানের এই জাগ্রত রিকালকে, যদি শিথি তাহাকেই মরণ করিয়া লইতে তবেই ত আমাদের পথ সহজ স্বপ্ন হইয়া উঠে।

এ কথা সত্য আদর্শটি আনিতে বাইরা আবার আদর্শের অপভ্রংশ বা বিকৃতিকে না লইয়া আসি, সেদিকে দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। কিন্তু ভাষাটি বাহিতে বাইরা মনকে আনার আশঙ্কা ত সবক্ষেত্রেই আছে। নিজের দেশের প্রাচীন গলিত দৃষ্ট ধর্মকর্ম বিধিব্যবস্থার মধ্য হইতে বিস্তৃত জাগ্রত আদর্শটি বাহির করা অপেক্ষা আমরা মনে করি বর্তমানের জীবন্ত প্রাণবন্ত বিদেশ হইতে সে-সব জিনিষ আহরণ করা বেশী ফলদায়ক। জীবনের সংস্পর্শে আসিলেই জীবন জাগিয়া উঠে—প্রাণের তরঙ্গে প্রাণ মিশাইয়াই প্রাণের ক্ষুধা।

প্রাণের মনের বিনিময়ে একটা ওলট পালট ঘটেই, কিন্তু তাহাতে ভয় করিবার কি আছে? শরীরের সহজ চেষ্টা যেমন তাহার মধ্যে অন্ত-প্রবিষ্ট কোন পদার্থকে হয় ইঞ্জম করিয়া ফেলা, নয় কোন রকমে বাহির করিয়া দেওয়া সেই রকম জাতির অন্তরাগ্নারও চেষ্টা তাহার আধারে আহরিত জিনিষকে হয় নিজের করিয়া লওয়া না হয় উদ্দীর্ণ করিয়া ফেলা। যদি জিজ্ঞাসা কর, দেশের এ শক্তি ও সামর্থ্য আছে কি না? আমি বলি যে দেশের এ ক্ষমতা নাই, তাহার কোন ভরসাই নাই,

চেষ্টি করিয়া, বাজবন্দী করিয়া সে দেশকে জিয়াইয়া রাখিলেও রাখিলে পার, কিন্তু সে দেশ কখনও মুমহান হইয়া উঠিবে না।

বাহিরের দিক হইতে দেখিলে আমাদের বোধ হয় বটে ভারতবর্ষ ইউরোপের সংস্পর্শে আসিয়া ইউরোপের দ্বিতীয় সংস্করণমাত্র হইয়া উঠিতেছে, নিজের প্রতিভাকে হারাইয়া পরের ধারকরা আলোকে সে আজ উজ্জ্বল হইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু সেটি অতি বাহিরের ভাসাভাসা সত্যমাত্র। ভিতরের সত্য এই যে ইউরোপের জীবনের স্পর্শে ভারতের জীবন জাগ্রত সচল হইয়া উঠিয়াছে। এবং এখন যে সে চারিদিকে হাত বাড়াইয়া দিয়া যেখানে যাহা পাইবার আশা করে সেই দিকেই ছুটিয়া চলিতে ব্যগ্র, এমন কি অনেক সময়ে যে না বুঝিয়া সুঝিয়া আপনাদের প্রাণের ধর্মের বিপরীত জিনিষকেই সে আঁকড়িয়া ধরিতে চায় তাহাতে প্রমাণ হয় তাহার ভিতরের নবজীবনের আবেগ আপনাকে ছড়াইয়া চারিদিক ছাপাইয়া ছুটিয়া চলিতে চাহিতেছে।

ভারতের এই নবোন্মেষিত জীবন-প্রতিভাকে আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারি—নিঃশঙ্কচিত্তে উহাকে ছাড়িয়া দিতে পারি আপনার পথ চিনিয়া লইতে, পরীক্ষা করিতে, করিতে, যাচাই করিয়া দেখিতে দেখিতে, প্রয়োজন অনুসারে গ্রহণ বর্জন করিয়া, আপনার অন্তরাত্মার স্বধর্মেরই অনুরূপ সকল বিধিব্যবস্থা সকল প্রতিষ্ঠানাদি—সমগ্র আধারটী অথও সামঞ্জস্যে পূর্ণতায় গড়িয়া সাজাইয়া ধরিতে।

নব-জীবন

বাঙ্গালী অনেক করিয়াছে, তাই ভারতের অন্তান্ত প্রদেশ বাংলার কাছ থেকে আরও কিছু আশা করে। প্রেম, ভক্তি, ধর্মসাধনা, সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি, সাহিত্যকলা সকল বিষয়েই বাঙ্গালী অগ্রণী। স্বদেশী, বঙ্গোদ্ভব, এনার্কিজম, বিপ্লববাদ প্রভৃতি নানা বিচিত্র রঙে বাঙ্গালীর জীবন চিত্রিত। ভাল মন্দে, সুযশে কুযশে তাদের জীবন-ভরে গেছে, আজ কিন্তু এই রাউলট বিল উপলক্ষ্য করে পঞ্জাব, মাদ্রাজ বোম্বায়ে যে অভিনব ঘটনা দেখা গেল, তার একবিন্দু মাত্র তাড়িৎশক্তি কলিকাতায়

এক মুহূর্তের জন্ত জলিল এবং নিভিল, তাও খাঁটি রাজালীর জীবনে নহে, অ-বাকালী-প্রবাসীর ভিতর। কাজেই ভারতের সকল প্রদেশ হ'তে এমন কি বাংলাতেই একটা প্রশ্ন উঠেছে—যে বাকালী কি বেঁচে আছে, না শতাব্দিক বর্ষ ধরে' জন্মগত অবিশ্রান্ত কর্মের পর তার তন্দ্রা এসেছে?

সত্যই ত, সেই সুরেন্দ্রনাথ, কৃষ্ণকুমার, অধিনী দত্ত, অম্বিকা মজুমদার, বিপিনচন্দ্র, পণ্ডিত সুরেন্দ্রচন্দ্র, পাঁচকড়ি, বঙ্গের নবজাগরণের পুরোহিতবৃন্দ কেহই ত কালচক্রে অথবা শাসনদণ্ডে নিষ্পেষিত হন নাই, কেবল উপাধ্যায় পরলোকে, গ্রামস্বন্দর অন্তরীণে, আর মাতৃভক্ত অরবিন্দ দেশান্তরে। তেমনি আমরা-চিত্তরঞ্জন, বোমকেশ, বিজয়চন্দ্র, জ্ঞানেন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে পেয়েছি—বাংলার জীবনপ্রবাহ তাহাতেও যদি ক্ষীণ হয়, মন্দীভূত হয় হৃর্তাগ্য বটে!

বাংলার আছেন সবাই, কিন্তু নেতৃবৃন্দের মনে এক সংশয় উপস্থিত হয়েছে। সেদিন মৈমনসিং প্রাদেশিক সভার প্রদ্বয়ের বোমকেশ বক্তৃতা করিতে উঠিলে, একজন নবীন উকিল সভাপতি মহাশয়ের নিষেধ সত্ত্বেও একটা প্রশ্ন তুলেছিলেন, তিনি পূর্ববঙ্গের অনেকগুলি শোচনীয় দৃষ্টিক-চিত্র সংগ্রহ করে' বাংলার প্রতিনিধিবর্গের সম্মুখে ধরে' বলেন, কলিকাতায় বৈদ্যাতিক পাখার তলার বসে' বরফ জল খেয়ে, মটর ইঁাকিয়ে যারা সভা করে' বেড়ান, তাঁরা কি আমাদের নেতা? তাঁরা কি দেশের এই নির্দারুণ দুরবস্থার কথা হৃদয় দিয়ে অনুভব করেন? আমরা তাঁদের কথা শুনতে চাই; যারা গান্ধীর মত, দেশের এই শোচনীয় স্তরে দাঁড়িয়ে একযোগে কর্ম করতে পারবেন, শুধু কথার নেতাগিরি আমরা চাহি না। শুনতে পাই এই কথার উত্তর সক্ষেত্রে কেহই দেন নাই।

আমাদের নেতৃগণও হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন, অতঃপর দেশনেতা হওয়া কেবল চাঁচা ছোলা বক্তৃতায় হয়ে উঠবে না, এইভক্ত তাঁরা আত্মশক্তির উপর দিন দিন প্রজ্ঞাহীন হয়ে পড়ছেন, নিজেদের দীনতা অনুভব করে' কোন কর্মে সহসা এগিয়ে আসা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে, কাজেই পরিচালকবিহীন এই বিশাল জাতির বাহু জীবনে তেমন নড়া চড়া দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, এই অবস্থায়, বহিমুখী ভারতবর্ষ, বাংলা দেশ যে মৃতপ্রায় বলে সিদ্ধান্ত করবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

কিন্তু সত্যই কি বাংলাদেশ নেতৃশূন্য হওয়ার অযোগ্যমন করেছে,

সত্যই কি তার প্রাণশক্তি মানুষের অভাবে স্তিমমান হয়ে পড়েছে, সত্যই কি সে এই নবভাগরণের ব্রাহ্মমূর্ত্তে অলস শয়নে নিদ্রা যাচ্ছে, আমরা এই কথাটা একেবারেই বিশ্বাস করি না। ১৯০৮ সালে বোম্বায়ে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ এক বক্তৃতা দেন, তার কয়েক ছত্র এই স্থানে উদ্ধৃত করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না —

There is only one force and for that force, I am not necessary, you are not necessary, he is not necessary, neither myself nor another, nor Bepinchandra Pal, nor all these workers who have gone to prison, none of them are necessary. Let them be thrown as so much waste substance, the country will not suffer, God is doing everything.

অর্থাৎ কেবল একটা শক্তি আছে, যার জন্ত আমি, তুমি, সে, বিপিনচন্দ্র, বে সকল কর্মী কারাগারে, কাহারও, প্রয়োজন নাই। নিক্ষিপ্ত আবর্জনার মত এই সকল পরিত্যক্ত হইলেও দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। ভগবান সমস্তই করিতেছেন।

অতএব বাংলাদেশের বাহ্য ক্ষতি যথেষ্ট হলেও, ভগবানের যে কাজ তা কোন মতেই রুদ্ধ হইতে পারে না। নেতার অভাবে বাহিরের চাক্ষুষ্য হ্রাস পেলেও, জাতির অন্তরে ফলপ্রবাহের মত সে খরতর স্রোত সমানভাবেই প্রবাহিত হচ্ছে।

ভগবানের কাজটা আমাদের জীবনে যেদিন প্রথম আবিস্কৃত হল, আমরা সবাই তার সত্য মূর্ত্তিটা ধ্বংসে পারি নাই, এখনও অনেকেই সেই পুরাতন সংস্কারে আবদ্ধ, তাই পুরাতন ভাবেই জীবনপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত করিতে অভিলাষী, বাংলায় যে ভাগবতপ্রেরণা দেখা দিবেছিল, মানুষের মন ও বুদ্ধির অগুহ্যতার তার বহু বিকৃতরূপ কল্পনা করা যেতে পারে, কিন্তু তার আসল উদ্দেশ্য যে কি তা অরবিন্দ বাবুর ভাষাতেই বলি—
“It is a religion by which we are trying to realise God in the nation, in our fellow countrymen, we are trying to realise Him in the three hundred millions of our people.” ইহা ধর্ম্ম বাহ্য দ্বারা আমরা ভগবানকে জাতির মধ্যে, আমাদের

দেশবাসীর মধ্যে অমুভব করবার চেষ্টা করছি, ত্রিশকোটি নগনারীর মধ্যে আমরা তাঁহাকে বোঝবার সাধনা করছি।” আজ এই আদর্শ আরও সূচুতর হয়ে উঠেছে, বাঙ্গালী যে জেগেছিল তাহা মানবমনের কোন তৃপ্তি বিধানের জন্ত নয়, রাজনীতিক সুবিধা অর্জনের জন্ত নয়, তাহা ভগবানকে সর্বতোভাবে আত্মজীবনে অমুভব করবার জন্ত, ভগবানের ভোগটীকে, জীবন দিয়ে ক্ষুরিত করে’ তোলবার জন্য—বুদ্ধির নানা অন্তর্ভুক্ত কল্পনার কুহকে বাঙ্গালী চিরদিন মুগ্ধ থাকতে পারে না। অতীতের উন্মাদ-উত্তেজনা বাঙ্গালীর জীবনে দিন দিন নব নব মূর্তিতে বিকশিত হয়ে না উঠলেও, বাঙ্গালী আজ ভগবানের সন্মুখে যে মহাব্রতে দীক্ষিত হয়েছে, সে অমর মন্ত্রে সমগ্র জাতিকে উদ্ধৃত করে’ তুলতে চায়, তাহার জন্য যে অমুষ্ঠান, যে আয়োজন, যে কর্মসূচি তা অতীতের রাজনীতিমূলক কর্মের অনুরূপ নহে। মরণের পথ পরিত্যাগ করে’ জীবনের দিকেই তাহার গতি নির্দ্ধারিত হয়েছে, বাংলার বর্তমান অবস্থা আমাদের খুবই আশাশ্রয় বলে মনে হয়।

খুব বড় আশার কথা—বাংলার নবীন হৃদয়েই এই ভাগবতশক্তি মূর্তি হয়ে উঠেছে, কালের রুদ্ধলীলায় যে তরুণহৃদয় ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়েছিল, আজ প্রকৃতির করুণায় তাহা শান্ত সমাহিত, ভবিষ্যৎযুগের জন্য নূতন ভাবে গড়ে উঠেছে। বাংলার নূতন যারা তাদের মধ্যে ভগবানের চেউ কেমনভাবে খেলা করেছে আমাদের জঁনেক বন্ধুর একখানা চিঠির এই কয়েক ছত্র পড়লে তা বুঝতে পারা যায় :—

“আমার একটি ভাই সম্প্রতি অন্তরীণ হতে মুক্ত হয়ে বাড়ী এসেছে। যতদূর বুঝেছি তার মধ্যে বর্তমান আধ্যাত্মিকতার চেউ খেলছে। তার মন এখন ঈশ্বরানুভবমুখী। তার সর্ববিধ কল্যাণ যাতে হয়, দৈবী উপায়ে তার চেষ্টা আপনারা উপযুক্ত মনে করলে করবেন। আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়ে দেখলে দেখা যায়, অন্তরীণ তার ভালই করেছে।” আমরা কায়মনোবাক্যে এই বালকটির উদ্বগতির সমধিক বিকাশ কামনা করি।

বাঙ্গালীর জীবন আড়ম্বরশূন্য হয়েছে বলে কেউ কি অতঃপর মনে করবেন, যে আমরা আবার ঘুমিয়ে পড়ছি। বর্তমান প্রাদেশিক সীমিতভেদে বিচারপতি আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় বলেছিলেন “A subject nation has no politics” কথাটা কি সত্য নয়? কিন্তু পাশ্চাত্যশিক্ষার ভোগ অপরিহার্য এবং তা যথেষ্টই ভোগ করা হয়েছে। এখনও কি জাতি-

গত সাধনাকে ঠেলে, রেখে বৈদেশিক পদ্ধতি ধরেই আমাদের চলতে হবে, জাতির বিশিষ্টতা জাতির জীবন এ সত্যকে চিরদিনই কি উপেক্ষা করবো? দেশের নবীন দল একবাক্যে ইহাতে অস্বীকৃত হবে এবং ভগবানের নির্দেশে আজ তারা যে প্রকৃষ্ট পথটা ধরে এগিয়ে চলেচে, জগতের কোন প্রলোভনেই কোন ভয়েই আর তারা সে পথ হতে ভ্রষ্ট হবেনা। চল নবীন চল, তোমার জাতির জীবন যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, জাতির বৈশিষ্ট্য যাতে বজায় থাকে, তুমি সেই পথে চল, মাছুষ তুমি, নেতার অভাবে জীবন কি নিখর নিষ্পন্ন হবে? কখনই না, ভগবানই বিশ্ব জগতের কর্ণধার।

আমরা স্বদেশীয়গে যে মন্ত্র বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ করেছিলাম, তা সান্তের মন্ত্র, রূপের মন্ত্র—সে মন্ত্র বিদ্যাপ্রবাহের মিত আমাদের বুদ্ধি হৃদয় প্রাণ ও শরীর দিয়ে বয়ে গেল—শুদ্ধিরিধানই ছিল সে মন্ত্রের লক্ষ্য, অতএব বাঙালীর এই দ্বাদশবর্ষের সাধনা ব্যর্থ হয় নাই। আমরা অনেকটাই এই ভীষণ অগ্নিপরীক্ষায় কথঞ্চিৎ শুদ্ধ হয়ে উঠেছি। এক্ষণে আরার নূতন মন্ত্রে—আরও নূতন আরও শুদ্ধ ও পূর্ণ হ'তে চাই। সে মন্ত্র জাতিগত আত্মসমর্পণের মন্ত্র—সে মন্ত্র “ত্বয়া হবীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি”^১—সে মন্ত্র “সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকম্ শরণম্ ব্রজ অহম্ ত্বাম্ সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।”

এই শুদ্ধি, সিদ্ধি, মুক্তি, ভুক্তির যে মহামন্ত্র ইহাও গ্রহণ করেছি কেবল বুদ্ধি দিয়া। হবীকেশের হস্তে সমস্তই সমর্পণ করেছি, কিন্তু সংস্কারজনিত প্রিয় অপ্রিয় জ্ঞান এখনও তিরোহিত হয় নাই। সকল ব্রহ্মই নারায়ণের এই দিবা ধারণা এখনও দৃঢ় হয়ে উঠে নাই, কোন-কোন ক্ষেত্রে বুদ্ধির সমতাসম্পাদন হলেও, যে নূতন জাতি সৃষ্ট হতে চলেছে, তাদের যে কেজ্জচক্র তার সকল রাষ্ট্রের মধ্যে যুগপৎ ইহা স্থায়ী বদ্ধমূল হয় নাই, এ অবস্থায় বহির্ঘটনার উত্তেজনাক্রোধকে নূতন বাংলা আর যোগ দিতে পারে না। তাদের জীবন আর হালকা নয়, অন্তঃসারশূন্য নয়, গভীর তপোমগ্ন এই জাতির সিদ্ধি কতদিনে আসবে তাও তারা জানে না। কেবল বিশ্বাস, ধৈর্য ও সাহস তাদের অবলম্বন, এই তিনটির সহায়েই অসীম সাগরবক্ষে তারা জীবনভরী ভাসিয়ে দিয়েছে।

সাধনার যে কতখানি বাকী, সিদ্ধির যে কত বিলম্ব, তা না জানলেও কতখানি শক্তি, কতখানি শুদ্ধি ও সিদ্ধি লাভ হচ্ছে, তার একটা

আপ আছে। জগতের বিপুল অশুভতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করে বাহিরে এসে দাঁড়াতে সেইটুকু সম্পদ যে নিতান্তই অপ্রচুর, নতুন সার্থক এ কথা বেশ বুঝে, তাই অদূরদর্শীর মত যা হয় কিছু করার পক্ষপাতী তারা নয়। গভীরে নিগূঢ়ে যে সাধনা-বাক্সালী আরম্ভ করে, দিয়েছে, তার সকল ফলই ভগবানের, কাজেই 'জগৎই' তার অধিকারী। বাক্সালী এই জগদ্ধিতায় নতুন পথের সন্ধান পেয়েছে, এবং সেই পথেই ছুটে চলেছে, মোহমুগ্ধচক্ষু সে দর্শনে বঞ্চিত, কাজেই তারা হাহাকার করে বলেছে—
গেল ! গেল !! গেল !!! পরন্তু বাক্সালী যায় নাই, বাবার নয়, প্রচুর প্রাণ-শক্তি দিন দিন তাদের জীবনকে ছাপিয়ে ভরিয়ে তুলছে—“আপুখ্যমানমচল-প্রতিষ্ঠম” হয়ে উঠছে।

রবীন্দ্রনাথের পত্র

ভারতের বাণীমূর্তি মহাকবি রবীন্দ্রনাথ রাজদত্ত উপাধি প্রত্যাখ্যানচ্ছলে মহামান্য বউলাট বাহাদুরকে যে পত্রখানি লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহার বিজ্ঞানবাদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—
“পাক্সাব গভর্নমেন্ট স্থানীয় গোলযোগ প্রশমিত করিবার জন্য যে উৎকট উপায় সব অবলম্বন করিয়াছেন, সে সকল আমাদের চিত্তে প্রবল আতঙ্কের সঞ্চার করিয়া স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছে, হায়, ভারতের বুটীশ প্রজার আজ কি শোচনীয় নিরুপায় অবস্থা! এই হৃদ্যাগা জাতির জনসমষ্টির উপর লবুপাপে বেরূপ গুরুদণ্ডের আদেশসমূহ প্রদত্ত হইয়াছে, আর সে সকল আদেশ বেরূপ নিষ্পন্নভাবে কার্যে পরিণত করা হইতেছে, পূর্বাপর দুই একটা দৃষ্টান্তের কথা ছাড়িয়া দিলে, আমাদের বিশ্বাস সভ্য জগতের কোনও শাসনতন্ত্রের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। যখন দেখিতেছি, জগতের মধ্যে মানবের জীবনধ্বংসকর সকল আয়োজন উপকরণে সুসজ্জিত প্রবলতম শাসনযন্ত্রসম্পন্ন যে বীরজাতি সেই আজ নিরস্ত্র, নিঃশব্দ জনসংঘের উপর এইরূপ আচরণ করিতে উদ্যোগী, তখন আমাদের হৃদকণ্ঠে একথা জ্ঞাপন না করিলে চলেনা—তাহাদের এ সকল কার্য নীতিসঙ্গত বিধিসঙ্গত হওয়া দূরে

থাকুক, একটু রাজনীতিক যুক্তি ওজরও তাঁহাদের অন্তর্কুলে নাই। আজ শাসনরুদ্ধ নিষ্পত্তার ফাঁক দিয়া পঞ্জাবের ভ্রাতৃবৃন্দের অপমান লাঞ্ছনার সংবাদ ভারতের রক্তে রক্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—জাতির বিপুল হৃদয় তপ্ত রোষ উচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত—পরন্তু শাসকজাতি সে বিষয়ে একেবারে উদাসীন—জাতিকে সায়েস্তা করিবার জন্য এরূপ তীব্র কষাঘাতেরই প্রয়োজন, এমনই করনাস্থখে হয়তো তাঁহারা আপনাদের মনোরঞ্জন করিতেছেন। অধিকাংশ এংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রগুলি এই অবজাগর নীতির প্রশংসায় মুখরিত, অনেকে নিশ্চয় হৃদয়হীনের মত আমাদের নিখ্যা-তনে পরম উল্লাস প্রকাশ করিতেছেন—রাজকর্তৃপক্ষের তাহাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই, পরন্তু দেশীয় মুখপত্রগুলি একটু আত্মনাদ একটু মর্মান্ত উচ্চারণ করিষামাত্র নিষ্করণহন্তে সেগুলিকে নিগৃহীত করিতে যথেষ্ট যত্ন করিতেছেন। দেখিয়াছি, আমাদের সকল আবেদন নিবেদন ব্যর্থ হইয়া খুলার লুটাইয়াছে, প্রতিবিধিঃসার তীব্র জ্বালায় গভর্নমেণ্টের শাসনদৃষ্টি অন্ধধুমাদ্ধন; হায়, প্রবল পরাক্রান্ত চিরনীতিপরায়ণ ব্রিটিশজাতি এরূপ ভাবে অন্ধরিপুপবশ না হইয়া কত সহজে স্বরাস্যাসে উদার মহত্বের পরিচয় দিতে পারিতেন! এ অবস্থায় আমি যতটুকু করিতে পারি তাহাই করিব, আমার শুদ্ধ চকিত দেশবাসী কোটা কোটা নরনারীর রুদ্ধ হৃদয়ের করুণ প্রতিবাদকে ভাষাদান করিব, ইহার জন্য আমাকে যাহা কিছু ফলভোগ করিতে হইবে, তাহা সহ করিতে প্রস্তুত রহিব। এ দুর্দিনে, জাতিগত এই বিপুল অপমানলাঞ্ছিত দেহে আমাদের এই সম্মান-নিদর্শনগুলি আমাদের দারুণ লজ্জাবোধ আরও বিকটরূপেই বাড়াইয়া তুলিতেছে—তাই আমার দিক দিয়া আজ আমি সঙ্কল্প করিয়াছি, সেই সকল বিশিষ্ট উপাধিবর্জিত হইয়া উলঙ্গবক্ষে আমার সেই স্বদেশবাসীর পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইব—আজ যাহারা নগণ্য বলিয়া উপেক্ষিত, অমায়ুষিক লাঞ্ছনাভার বহিয়া বহিয়া যাহাদের জীবনপাতের সম্ভাবনা। এই সকল কারণেই আজ আমি বাধ্য হইয়া যথাযোগ্য সম্মানপুরস্কার হস্তে সহিত প্রার্থনা জানাইতেছি, যেন আমার Knighthood-এর উপাধি-ভার হইতে আমাকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়—যে উপাধিটুকু আমি মহামান্য ভারতসম্রাটের আদেশে আপনাই পূর্বগামী আমার চির শ্রদ্ধাভাজন বড়লাট রাহাছরের হস্ত হইতে সগন্ডমে গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহা আজ প্রত্যর্পণ করিতেছি।

দান

লর্ড কর্জন শাসনসৌকার্যে অথও বঙ্গদেশের বুকে যখন একটা কার্যনিষ্ঠ রেখা টানিয়া দিলেন, স্বদেশজননী দ্বিখণ্ডিত হইল বলিয়া সহস্রকোটি দেশভক্তের হৃদয়ভেদী করুণ কলঙ্কনি শুনিয়াছিলাম, দেশে দেশে যুবকের দল রাজদণ্ড উপেক্ষা করিয়া বিলাতী দ্রব্য বর্জন করিতে লাগিল, স্বার্থপর ব্যবসায়ীগণের লোহণেটকা পূর্ণ করিয়া ছই টাকার কাপড়খানা চারি টাকা মূল্যে খরিদ করা হইল, সে কি উৎসাহ কি স্বার্থত্যাগের বিজয় কলরব! তারপর আত্মবিসর্জনের যুগ।— অর্দ্ধোদয়যোগ হইতে বর্দ্ধমানের বহুকাল পর্য্যন্ত বঙ্গসন্তানগণের স্বদেশপ্রেমের ত যথেষ্টই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিদারী যুবকবৃন্দ দেশাত্মবোধে আত্মহারা হইয়া স্বদেশের ধনরত্ন লুণ্ঠনে ও স্বদেশবাসীর প্রাণবিনাশে উদ্যত, অপরদিকে সেবা পরোপকার নষ্টশিল্প উদ্ধারের প্রচেষ্টা দেশে তুমুল আন্দোলনের সোরগোল তুলিয়া দিয়াছিল।

চিনি ও বালী একত্র মিশ্রিত হইলে সাধারণমানুষের পক্ষে যেমন চিনি-সংগ্রহ এক প্রকার অসম্ভবই হইয়া উঠে, জাতির জীবনে শুদ্ধ সাংস্কৃতিকতার সঙ্গে তমঃ ও রজঃ বিজড়িত হইয়া, শুদ্ধ কন্মপ্রকাশ তেমনি অদূরপর্য্যন্ত করিয়া দিল। সহসা সমগ্র পৃথিবী বিকম্পিত করিয়া কর্কশ রণভেরী বাজিয়া উঠিল, অবসর বুঝিয়া ভারতের রাজশক্তি এক কঠোর আইন প্রবর্তিত করিলেন, দেশের তলে তলে যে শুদ্ধ সাংস্কৃতিকতার স্নিগ্ধ প্রবাহ বিয় বিয় করিয়া বহিতেছিল, স্বযোগ বুঝিয়া, উহা বাধিরের আবরণ বিদীর্ণ করিয়া, জাতির জীবনে সঞ্চারিত হইল, সে উচ্ছ্বসিত পুষ্পপ্র বাহে অবগাহিত বঙ্গসন্তান নবজীবন অনুভব করিল, বঙ্গের ভবিষ্যৎ জীবন নবায়নরঞ্জিত, স্ববর্ণদীপ্ত সমুজ্জ্বল স্বপ্নরাজ্যের মত দেখা যাইতেছে, দ্ব্যযোগ-রজনীর বিকট আঁধার তিরোহিতপ্রায় বলিয়া বোধ হইতেছে।

য়ুরোপের গগন পূরন মুখরিত করিয়া বিকটরবে সহস্র দামামা নাকাড়া

রাজিতেছিল, কর্ণপটহ প্রতি পলে বিদীর্ণ হইবার উপক্রম করিতেছিল, আজ সে সমর-কোলাহল নিস্তরুপ্রায়, যুরোপের মনীষীবৃন্দ অচিরে যেমন করিয়াই হউক শান্তি স্থাপন করিবেন। ভারতের অশান্তি, উহার মূল-কারণ রাজবিদ্বেষ নয়, হুজুগের কর্মফলভোগ—সাধ করিয়া কুকুর শৃগালের মত লালিত হইতে চাহে কে? বিধিনির্বন্ধ—ভারতের চিত্র আর বিচলিত নহে, ভগবানের হস্ত তাহারা দেখিতে শিখিয়াছে; অতঃপর বাংলার মত সমগ্র ভারতেই শান্তি বিরাজ করিবে। তারপর সীমান্তে শাঠানের হঠকারিতা ব্রিটিশ-সিংহের হুজুয় হুঙ্কারেই উহা প্রশমিত হইতেছে, ইংরাজ আজ অপরাধের।

এই মহাসৌভাগ্যের সন্ধিক্ষণে, ইংলণ্ডের উন্নত-কিরীট যখন নবমুখ্য-করে সমুজ্জল, তখন ভারতের মর্মব্যথা শুনাইতে, আমাদের নেতৃবৃন্দ মর্ত্য-স্বর্গ ইংলণ্ডের রাজদ্বারে জানুপাতি, নিগৃহীত মুমূর্ষু তেত্রিশকোটি প্রজার ভাগ্যে বিন্দুপরিমিত সুখের রসনা ছরাশা নাও হইতে পারে, ভারতবর্ষ এই নবমুখে রাজমুগ্ধ লাভ করিয়া আরও শতবর্ষ পরম শান্তিতে কাল-যাপন করিবে, রাজপ্রসাদ বিতরণের এমন মহামুহূর্ত্ত ব্যর্থ যাহাতে না হয় তাহার জন্য ভারতনেতৃবৃন্দ উদাসীন নহেন, অঞ্চল বিছাইয়া তাহারা দান গ্রহণের প্রতীক্ষা করিতেছেন। শুনিতে পাই এইসঙ্গে ভারতের রাজনীতিকবন্দীগণের উপরও করুণাবর্ষণ হইবার সম্ভাবনা আছে—আশা কুহকিনী, শ্রান-মুখের হাসির রেখা টানিয়া দিল।

পরাবীনজাতির পক্ষে রাজপ্রসাদ বড় দান বটে। রাজার অনুগ্রহ পাইলে আমরা অধিকতর সুখী হইতে পারি। কিন্তু ইহাপেক্ষা সর্বোত্তম দান বাহা—তাহা গ্রহণ করিবার জন্য ভারতের কয়জন লোককে উদগ্রীব দেখিতে পাই, কয়জন লোক সে অপার্থিব দানের অধিকারী হইয়া এই অধঃপতিত ধর্মকর্মহীন অভিশপ্ত জাতির উদ্ধার সাধন করিবার জন্ত উদ্যত? বাহিরের সুযোগ ও সুবিধাটুকু যে আমরা উপেক্ষা করিব এমন কথা বলি না, কেননা আমরা যেটুকু সুখই পাই না, উহা যে কোন মতেই মানুষের দান নহে, তাহা আমরা জানি। ভগবানের দয়াই মাঝে মাঝে মরণাপন্ন জাতির জীবনে অমৃতবিন্দু বর্ষণ করে, কিন্তু আজ আমাদের যে দুঃবস্থা, যে সঙ্কট, তাহা আর বিন্দু অমৃতে বিদূরিত হইবার নহে, চাই অবিশ্রান্ত বর্ষণ—হরি-

পাদপদ্মনিঃসৃত সুরধুনীপ্রবাহের মত অজস্র ধারণাপাত। এই বিরাট বস্ত্র সম্পাদনের মত তপস্বী কয়জন আছেন?

মহাত্মা গান্ধী আজ ক্রব-নক্ষত্রের মত ভারতগগনে দেদীপ্যমান, কিন্তু তাঁহার জীবন কোন্ দেশের তপঃপ্রভাবে আচ্ছন্ন তাহা বলিতে পারি না। যে অধ্যাত্মশক্তির কথা ভারতের বিবেকানন্দ প্রচার করিয়াছিলেন, যে মন্ত্র গোস্বামী বিষ্ণুস্বকের মধ্যে গোপন ছিল, তাহা সিদ্ধ করিবার মত সাধনা তা গান্ধীর নহে, উহার অমুষ্ঠাননিচয় ভারতের বহু অভীষ্ট কৰ্ম সিদ্ধ করিতে পারে—কিন্তু উহা দেশের গভীরতম তপঃশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবে না—তাঁহার ঋণসাধনা ভারতের পূর্ণাঙ্গসাধনার একান্ত বিরোধী ধর্ম।

আজ ত্রিগৌরাদেব, সাধক রামপ্রসাদের, ভগবান্ রামকৃষ্ণের পদরঞ্জ পবিত্র বঙ্গভূমির দিকে স্বতঃই দৃষ্টি আকর্ষিত হয়; কণিক উত্তেজনা-কুহকে উন্মত্ত হইয়া, হে বাংলার তরুণগণ উন্মাদ হইরাছিলে, আর—আজ এই অথও ভাগবত সাধনার জন্ত দলে দলে কি অগ্রসর হইবে না, রাজসিক স্তুতি মাত্র অবলম্বন করিয়া লাঞ্ছনা অপমান মৃত্যুভয়, শত স্বার্থ পদরিদলিত করিয়া, পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে প্রতি মুহূর্ত্তে মরণের তীরে দোড়াইতে ত কাতর হও নাই, কিন্তু আজ একি দেখিতেছি? সত্যের পথ অধিকতর কঠোর হইলেও, তোমাদের অভীত সাধনা কি নিষ্ফল হইবে? উত্তেজনা নহে, চাই উৎসাহ; চেষ্টা নহে, চাই অন্তঃপ্রেরণা। মঙ্গল ঘোষণা করিয়া বাহির হও, বিশ্বের দুর্গতি দূর করিবার জন্ত, বিপুল সাধনা তোমার দ্বারে অতিথি, কোন্ স্বার্থে কিসের ভয়ে তুমি ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিবে? ভয় ও স্বার্থকে বিনষ্ট করিয়াই আজ তুমি দিব্যশক্তির অধিকারী—হে অতী! জীবন-রথ ছুটাইয়া চল—দিব্যধামে তোমার পৌছিতেই হইবে।

ধ্যান

ধ্যান কি? বাহিরের রূপ রস স্পর্শ হইতে মনকে গুটাইয়া অন্তরের মধ্যে ফিরাইয়া ধরা, আমাদের আশে পাশে চারিদিকে মুহূর্তে মুহূর্তে যে ঘটনামালা তরঙ্গে তরঙ্গে বহিয়া চলিয়াছে সেগুলির দিকে আমাদের সকল ইন্দ্রিয়দ্বার বন্ধ করিয়া কোনও গভীর গবেষণা কোনও জটিল সমস্যার সমাধানে ভুবিয়া যাওয়া; আমাদের বিপরীতে যে বহির্জগৎখানি আলোকে পুলকে স্নাত হইয়া শত পরিবর্তনের ভিতরেও ধ্রুবতারকার মত প্রতিনিয়ত অব্যাহত ভাবে চাহিয়া রহিয়াছে, তাহার সমস্ত প্রতিঘাত ঢেওয়াইয়া-ঢেওয়াইয়া যতদূর সম্ভব বাহ্য সংজ্ঞাহারা হইয়া চিন্তাসাগরে নিমজ্জিত হওয়া—ইহাকেই আমরা সাধারণতঃ ধ্যান বলিয়া জানি। অথবা যখন কাহাকেও দেখিতে পাই নির্জন সাধনক্ষেত্রে পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া নিম্নলিখিত-নেত্রে উচাটন মনকে বারবার প্রত্যাহত করিয়া সবলে ভিতরে টানিয়া আনিতেছেন, ভক্তিনিবিষ্টচিত্তে আপন বিশিষ্ট ইষ্টদেবতার মন্ত্র উচ্চারণে কিম্বা রূপকল্পনায় বিভোর হইয়া যাইতে প্রাণপণে সঙ্করিতেছেন—তখন বলি তিনি ইষ্টচিন্তায় নিমগ্ন গভীর ধ্যানযোগরত। প্রকৃতপক্ষে এই সকল ধ্যানযোগের অবস্থাবিশেষমাত্র—সম্পূর্ণ ধ্যানসাধনায় ইন্দ্রিয় প্রত্যাহার, অভিনিবেশ, পর্যালোচনা, গবেষণা; স্বরণ মনন প্রভৃতি বিচিত্র স্তরগুলি সমস্তই অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই দীর্ঘধারাবাহিক মনঃসাধনার চূড়ান্ত লক্ষ্য নির্বিকল্প সমাধি।

বস্তুতঃ জেয় বিষয়বিশেষের উপর আপন জ্ঞানশক্তি অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার মত ধারাবাহিকভাবে প্রয়োগ করাই হইতেছে ধ্যানের বিশিষ্ট লক্ষণ। অন্তরের প্রজ্ঞাকে আলোচ্য বস্তুটির উপর ধীর অনবচ্ছিন্নধারায় এইরূপ আরোপ করিবার এই ক্রমটুকু যখন সুসিদ্ধ হইয়াছে, প্রবল বেগে আমার মনের সমস্ত বুদ্ধিরশ্মিগুলি যখন বিবেচ্য বিষয় বা বস্তুটির উপর ফেলিয়া আমার চেতনাকে সেখায় কেন্দ্রীকৃত করিয়া তুলিতে পারিয়াছি, সে নিবিড় আকর্ষণে যখন জাতব্য পদার্থটি তাহার সকল গুণ

রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া আমার সমীপে ধরিয়া দিবার জন্ত উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে—তখনই জ্বলিয়া উঠিয়াছে আমার সেই দীপ্ত প্রথর জ্ঞানপ্রকাশ-শক্তি—পতঞ্জলি যাহার নাম দিয়াছেন সংযম। স্বল্পপরিমাণে খণ্ড-ভাবৈও এই সংযম অধিগত হইলে তাহার উজ্জল প্রভাস বুদ্ধিক্ষেত্রখানি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতে পারে, আমাদের ভিতরে হৃদয় দৃষ্টিদ্বার ধীরে ধীরে খুলিতে আরম্ভ হয়, সে উদীয়মান তৃতীয়নেত্রের সম্মুখে তখন কত সহজে স্বচ্ছ ভাবে জগতের বহু জটিল রহস্যরাজি আত্ম-উন্মোচন করিয়া দিতে থাকে। এই আংশিক খণ্ড সংযমও ধ্যান-সাধনার খণ্ডসিদ্ধি স্বরূপ।

আমাদের মনের অভ্যন্তর অনর্গল চিন্তামাত্রই ধ্যান নয়। সে তো মনের উচ্ছ্বাল লহরীলীলা—চিন্তাসাগরের উপর সহস্র সহস্র সংস্কার, স্মৃতি-ছবি, জল্পনা, কল্পনা, যুক্তি, অনুমানের মায়াচিত্রমালা—এসকল ভৌ উদ্ভাস-অন্তঃকরণের বিশৃঙ্খল ঢেউ—এগুলিকে স্তব্ধ করা চাই। চিত্তের আড়ম্বর-বহুল এই তরঙ্গবিক্ষেপ স্তব্ধিত না হইলে প্রকৃত ধ্যানের সম্ভাবনা নাই। মনের এই চঞ্চল নৃত্য বন্ধ করিতে হইবে, বুদ্ধি হইবে স্থির নিশ্চল, সমস্ত অন্তঃকরণখানি হইবে শান্ত নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মত স্বচ্ছ নিস্পন্দ। অচঞ্চল—একটুও সংক্ষেপ, একটুও আবেগ, এতটুকু জানো-লোকসাপ, তরঙ্গহিল্লোলে তাহা দোলাচল হইলে চলিবে না।

ধ্যানের মূলরহস্য হইতেছে এইখানে—সকল জ্ঞান অধিনিহিত আমা-দের আত্মায়—বিজ্ঞাতপুরুষের অন্তরের ভিতরে। এই জ্ঞানময় পূর্ব-রহিয়াছেন আমরাই আত্মার অন্তরালোকে—তিনিই আবার জ্ঞেয়-পদার্থটির অভ্যন্তরে তাহার অন্তরাত্মায় অধিষ্ঠিত। ধরা যাক, আমি একখানি প্রস্তর খণ্ড কিম্বা একটি তরু বিশেষকে অধ্যয়ন করিতে, তাহার সত্য রহস্য অবগত হইতে চাহিতেছি। তরু বা উপলব্ধিগের উপর ধ্যান দিবার ফলে, তাহার অভ্যন্তরস্থ জ্ঞাতপুরুষের সহিত আমার জ্ঞানময় আত্মার সম্বন্ধে যাহা কিছু স্নায়াবরণ, যাহা কিছু ভাববিপর্যয় ব্যবচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহা অপগত হইয়া যাইবে, উভয়ের মধ্যপথে এই ব্যবধানের খা মুছিয়া মিলাইয়া যাইবে, আমরা পরস্পরের ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া উভয়গত হই-ছি। যোগস্বয়ংটুকু নিশ্চিঞ্চভাবে ভিতরে লুকাইয়া থাকিতে দিয়াছি,

তাহাকেই চিনিয়া পুনরায় যোগযুক্ত করিয়া ধরিতে পারিব।

তরু লতা প্রস্তর, পশুপক্ষী পতঙ্গ, যক্ষরক্ষ দেবনর—সমস্তেরই ভিতরে রহিয়াছে স্ব স্ব বিষয়গত নিজস্ব সবখানি জ্ঞান—ধ্যানপথে তাহা আমাদের মনোগত হয় মাত্র। যখন সেই বিষয়ান্তর্গত জ্ঞান এইরূপে আমাদের চিত্তে প্রবেশ করিয়াছে, বাহিরের স্বনি তথায় গিয়া জাগাইয়া তুলিয়াছে অল্পরূপে ধ্বনি—আমাদের ভিতরের জ্ঞাতৃপুরুষ তখন সেই অপরিচিতের মধ্যে নিত্য-পরিচিতের সন্ধান খুঁজিয়া লইয়াছে, বিস্মৃত সম্বন্ধসেতু পুনরাবিষ্কৃত করিয়া উৎকল্লভাবে কহিয়া উঠিয়াছে—“জানিয়াছি জানিয়াছি এই যে সে জ্ঞান আমারও ভিতরে, এই যে সেখানে তাহাকে চিনিয়া লইতে পারিতেছি।” যদি কিছু বিকৃত ভ্রমভ্রমাদেশের সম্ভাবনা থাকিয়া গিয়া থাকে, সচকিতভাবে ভিতরের জ্ঞানময় ঠাকুর সাদা দিয়া উঠিবেই—ইকিয়া কহিবে—“না, না, না, এ তো সত্য নয়, নিশ্চয়ই কিছু ভুল হইয়াছে, মন কোনও গোলযোগ মাঝখানে ঘটাইয়া বসিয়াছে, সত্য জ্ঞান—যাহা আমার ভিতরে রহিয়াছে, তাই তাহাকে দেখিতেছি অল্পরূপে বিকৃতভাবে।” বস্তুতঃ—জ্ঞাতাও জ্ঞেয়—এ যেন চিরপুরাতন দুই অভিন্নহৃদয় সমাঙ্গী যুগ-যুগান্তরের দীর্ঘ বিরহের পর আবার মিলিতে চলিয়াছে—জানাজানি, হই-তেছে—এই মিলনেরই কোলাকুলী—বিস্মৃত পরিচয়ের পুনঃস্মৃতি—প্রেমের জগতের মত জ্ঞানের জগতেও বৃষ্টি বিচ্ছেদ ও সম্মিলনের খেলা—একের সহিত অন্যের, তোমার সহিত আমার নয়নবিনিময় ঘটতেছে, এমনই জানাজানির আনন্দ-মেলা অনাদি কাল ধরিয়া চলিয়াছে।

এই বিশ্বসংসার এক অখণ্ড ঐবিচ্ছিন্ন বস্তু। প্রস্তরখণ্ডের ভিতরের জ্ঞানময় পুরুষের সহিত আমার অন্তরের জ্ঞানবন আত্মা অভিন্নস্বরূপ—সেই আমার ভিতরের ঠাকুর, সেই উপলব্ধির ভিতরেরও ভগবান। আবার আমার অন্তর্লোকের এই যে সুপরিচিত আত্মজ্ঞান তাহার সহিত এই কঠিন প্রস্তরখণ্ডের অন্তরে অবগুপ্ত জ্ঞানপ্রভারও চিরচ্ছেদ নাই—পরিচয় ও অপরিচয়ের অতীতে উহার উভয়ে এক ও অখণ্ড। আমার ভিতরে উপলব্ধির ভিতরে সেই একই ভাগবত সত্য একই ভাগবত চেতনা প্রস্তরটুকু যেমন জ্ঞানগ্রাহ বস্তুবিশেষ—

আমিও তেমনি—আমার জ্ঞানগোচর আমিও আমার পরিজ্ঞেয় একটা কিছু-
বিষয়—এই উভয় জ্ঞানগোচর পদার্থও আবার মূলতঃ অবিভাজ্য এক
স্বরূপ—আমার আমিরূপে ভগবান্ এখানে, ওখানে প্রস্তররূপে সেই
একই ভগবান্। জ্ঞেয় যে কেবল একমাত্র একজনই বর্তমান—ভগবান্
ছাড়া অন্য জ্ঞানগোচর কোথাও কিছুই নাই। আবার ভগবান্ই জ্ঞানস্বরূপ।
জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়—এক অখণ্ড ত্রয়ী—উহার মূলতঃ অভিন্ন অদ্বিতীয়
অবিভাজ্যস্বরূপ।

মনই সকল ভেদ, বৈষম্য, পার্থক্যের জন্মদাতা। সলিলতরঙ্গ যখন
উচ্ছ্বসিত, সহস্রধারে সহস্রশীর্ষে যখন ঢেউগুলি ধাইয়া চলিয়াছে—
তখন প্রতি তরঙ্গ যেন প্রতিবাসী তরঙ্গকে ডাকিয়া কহিড়েছে—“ওগো
আমি, আমি, আমি! আমি যে আমিই আর তুমি যে তুমিই—আমরা
উভয়ে পরস্পর কত ভিন্ন!” আবার সাগরবন্ধ যখন শান্ত নিস্তরঙ্গ
গভীর অতল সমতাগর্ভে নিমজ্জমান, তরঙ্গগুলি একে একে অগাধ সিঙ্ক-
গহ্বারে ধীরে ধীরে মিলাইয়া বাইতেছে, তখন আর কেহ গর্জিয়া উঠি-
তেছে না—“আমি আমি” হাঁকিয়া—তখন যেন তাহাদের প্রত্যেকের
বিদায়বাণী শুধু—“সোহম্” “সোহম্”। শান্ত হিলোলহীন অসীম নীলাম্ব-
বিস্তার—সে কি চমৎকার অপূর্ণ দৃশ্যচিত্র! আবার সহস্রকণা নাগিনীর
মত ফেণোচ্ছ্বসিত কলগর্জনমুখরিত উত্তাল মহাসিঙ্ক—সে ও কি অতুলনীয়
রুদ্ধ সৌন্দর্য্যে ভরা অপরিমেয় মহিমার আকর নহে? এই অনন্ত পারা-
বারের অগনন ঢেউএর মালা—এইগুলি শুধু যদি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতে
পারে জ্ঞানের উজ্জল আলোকে—টলটল অসীম পুলকভরে যদি বিচিত্র
ভঙ্গিমায় এই অপূর্ণ সঙ্গীতচ্ছন্দে গাইয়া উঠিতে পারে—“আমি যে
আমি, তুমি যে তুমি—সে শুধু খেলাচ্ছলে আমাদেরই জন্ত কিন্তু আমি
আবার তুমি, তুমিও আবার আমি—আর তুমি আমি—আমরা উভয়েই
আবার সেই তিনিই”—অহঙ্কারের অতিমাত্র একান্ত স্বতন্ত্র ভঙ্গিমাটুকু শুধু যদি
সঁরাইয়া ফেলিতে পারা যায়, তাহা হইলে কি নূতন দৃশ্য কৃষ্টিয়া উঠিবে—
সে কি অপূর্ণ অভিনব জগৎ! এই পরম জ্ঞান-রহস্য—ইহাই যোগ। শান্ত
সমরস লিঙ্গবন্ধ যেমন অবস্থাবিশেষ, সহস্রচূড় সফেন তরঙ্গপুঞ্জও তেমনি
অবস্থান্তর মাত্র। মানবচিহ্নের মুক্তিচিত্র এই সাগরবন্ধ সেই সাগর-

পুরুষ রহিয়াছেন যেমন মতরঙ্গ নিস্তরঙ্গ উভয় অবস্থা উভয় ভাবকে ভরিয়া
আবার ছাড়াইয়া, ছাপাইয়া, অতিক্রম করিয়া—মানুষের চিত্তসমুদ্র সম্বন্ধেও সেই
একই কথা। যিনি পূর্ণপুরুষ তিনি যেমন ধ্যান মৌন স্তব গভীরতার মাঝে আপন
গুহাহিত নিগূঢ় স্বরূপে স্বপ্রতিষ্ঠিত—তেমনি জগতের সকল নৃত্যরঙ্গেও
অবাধে অকুণ্ঠচিত্তে আকণ্ঠ উল্লাসভরে লীলারত, দিব্য চিৎশক্তির স্পর্শ—
তপোদীপ্ত চেতনার পরিপূর্ণ বিকাশ—ইহাই পূর্ণমানবের লক্ষ্যাকেন্দ্র। পূর্ণ-
ধ্যান ও পূর্ণকর্ম—জাগ্রত সমাধিই হইতেছে তাহার সম্যক লক্ষণ।

সাধন পত্র

আমি চিরদিন তোমাদের বলিয়া আসিতেছি এই অধ্যাত্মযোগে সংশয়ই
বড় শত্রু আর এই সংশয় আসে তখনই যখন সাধক কিছু হওয়ারটার
দিকেই বেশী জোর দেয়।

সাধনা আরম্ভ করিলেই সাধক মনে করে, তাহাকে কিছু একটা
হইতে হইবে, এবং এই হওয়ার উপরই নির্ভর করে আত্মিক ভবিষ্য বিরাট
কর্মটি। নিজে কিছু হইয়া, মানবজাতির সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিলেই
জীবন সার্থক হয়।

আমি বলি এই অধ্যাত্মযোগ বা আত্মসমর্পণসাধনায় এইরূপ
হওয়ার কোন কথাই নাই। ইহা মাত্র জাগাইয়া দেয় আগনার অন্তর-
তম সত্তাকে এবং তারপর এই সত্তার জ্ঞান দিয়া পর পর বুদ্ধি হইতে
প্রাণ পর্যন্ত নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়।

অবশ্যই ইহাও একটা হওয়া কিন্তু আত্মসমর্পণযোগীর এই হওয়ার
জন্ম কোনই চেষ্টা নাই, এবং ইহা হইতে বিলম্ব হইলে তাহার জন্ম সে
ছটফট করিয়াও বেড়ায় না, কেননা যাহা হইতে হইবে, তাহা কোন
মতে তাহার নিজের উপর নির্ভর করে না, উহা একান্তই নির্ভর করে
ভগবানের উপর। আপনাকে পরাৎপর পুরুষের হস্তে উৎসর্গ করার পর,
সাধকের নিজের উপর আর কোনই দাবী দাওয়া নাই।

এই কথাটী আত্মাদের নিত্য স্মরণ থাকে না। আত্মসমর্পণ যেরূপ
একটা কথা নয়, ইহা যে ঋণপুল বিধানের প্রতিষ্ঠা, ইহা কে মানব

জীবনের খুব বড় একটা সিদ্ধি, তাহা আমরা ধারণা করিতে পারি না। সেইজন্য এই আপনাকে পাওয়া ও জানার সাধনায়, আপনার মধ্যে যে দৈবর আছেন, তাঁহার উপর নির্ভর করিলেও প্রথম অবস্থায় সাধককে, এই যোগে, যিনি অধিকতর অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন তাঁহার আনুকূল্য গ্রহণ করিতে হয়, এবং এই সাধনা ব্যক্তিগত নহে বলিয়া, প্ররম্পরের সঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া চলার সঙ্গে সঙ্গে সমষ্টি জীবনও গড়িয়া উঠে, যুগপৎ আপনার মধ্যে ভগবানকে জানা ও পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র মানব-জাতির ভিতরে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবার সঙ্কেত মিলিয়া থাকে।

অত্যাশ্রয় যোগসাধনায় যেমন বহুবিধ কঠোর বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতে হয়, সংঘম প্রতিপালন করিতে হয়, এ যোগের প্রথমসাধক সংস্কারপরবশতেনি সব যম নিয়মের প্রয়োজন প্রথম প্রথম অনুভব করে। আমাদের চাই সংঘম—কিন্তু তাহা বাহিরের কোন বিধিবাঁধন নয়—আমাদের প্রয়োজন আত্মসংঘম। আপনাকে, সর্বঘটনায় অবিচল রাখা, কিছু হইতেছে না—এরূপ মনে হইলেও অধীর না হইয়া কেবল ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করিয়া সমস্তই দেখিয়া যাওয়া; উন্নতি হইতেছে কি অবনতি হইতেছে, পাণ করিতেছি, কি গুণ্য করিতেছি, আগাইতেছি কি পিছাইতেছি ইত্যাদি চিন্তা একেবারে পরিহার করিয়া নিজেকে প্রকৃতিস্থ রাখা—ভগবানের সকলবিধ ইচ্ছাটা অবহিত হইয়া ধারণ করিবার জ্ঞান, মনে রাখিও ইহা বড় কম সংঘমের পরিচয় নহে।

ভগবান যে আমার জীবনের কৃত্তি, আমার যে কোনই কার্য নাই, এই বিশ্বাস অটুট অবিচল ভাবে রাখিতে হয়, সমস্তাই এ যোগের একমাত্র নিয়ম। মোটামুটি, বীরসাধক না হইলে এই আত্মসমর্পণমন্ত্রে দীক্ষা লইবার অধিকার নাই, দুর্বলের জ্ঞান ভগবান নহেন; তিনি সকল সামর্থ্যবান, তাঁহাকে পাইতে হইলে অসাধারণ শক্তিবল্য করিতে হইবে।

তোমরা বলিবে—যাহার বিশ্বাস আছে, যাহার ধৈর্য আছে, যাহার শক্তি আছে—সেই যদি ভাগবত করুণার অধিকারী তবে হীনচিত্ত দুর্বল ব্যক্তিদিগের উপায় কি হইবে? তাহাদের উপায়ের কথাই বলিতেছি, যুগধর্মের প্রবর্তক যাহারা তাঁহাদের যে ক্রেশ, যে দুঃখ, যে নিষ্ঠাভক্তি ভোগ করিতে হয়, পথ প্রস্তুত হইয়া বাইলে, পরবর্তী পথিকদের আর ভত কষ্ট পাইতে হয় না, উপস্থিত সমুদ্রের উত্তর গিরিশ্রেণী বিদীর্ণ করিয়া ভীষণ কণ্টকাকীর্ণ অরণ্য ভেদ করিয়া আজ যে অগ্রণীদল পথ

প্রস্তুত করিবে, তাহারা দুর্বল হইলে চলিবে কেন? দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইলে, প্রাচীন যোগপদ্ধতি যদি প্রকৃষ্ট হইত তবে এই হাজার হাজার বৎসর, উপনিষদের বলপ্রদ ধর্ম লাভ করিয়াও হিন্দুজাতি এমন হীন এমন দুর্বল এমন স্বার্থপর কেন? তর্কের প্রয়োজন নাই, বহুলোক চাহিনা, কয়েক শত বজ্রকঠোর হৃদয়, দৃঢ়বিশ্বাসী অটল অবিচল ধৈর্যশীল সাধকই সনাতন হিন্দুধর্ম প্রচার করিবে। চাই শক্তি চাই আনন্দ, ভগবানকে সব দিয়াছি বলিলেই যাহার হৃদয় অভাবনীয় শক্তিতরঙ্গে উদ্বেলিত হইয়া উঠে, ধর্মনির, রক্তপ্রবাহে আনন্দহিল্লোল বহিতে থাকে, এইরূপ বীরবৃন্দকেই সম্ববদ্ধ হইতে বলিতেছি। প্রতি মুহূর্তে কুবল আপনার হৃদয়বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্ত যাহারা সাধনার পথে আসিতে চাহেন তাহাদের পথ স্বতন্ত্র—এই আত্মসমর্পণযোগ্য শাক্তের জন্ত, শক্তিসাধনার প্রবৃত্ত হইয়া নিকামভাবে ভগবানের চরণে যে আপনাকে উৎসর্গ করিবে—তাহাকেই অগ্রসর হইতে বলি।

স্বামীজী বলিয়াছেন—ভারতের এই ধর্মবক্তা কয়েক শত সন্ন্যাসীর দ্বারাই সুসিদ্ধ হইবে, কথাটা অতীব সত্য। কিন্তু তিনি যে সন্ন্যাসীর রূপ দিয়াছিলেন, আমরা মাত্র সেই রূপের একেবারেই পরিবর্তন করিব। তিনি ভারতে তাঁহার কর্ম করিবার জন্য অর্থ ভিক্ষা করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে তেমন সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই, সেইজন্য দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন—ভারতবর্ষ হইতে কোন কার্যই হইবে না, ইহারা কথা কহে প্রকৃত কাজের সময় হাত গুটাইয়া লয়, সেই জন্য বিদেশ হইতে তিনি আবশ্যকমত অর্থ সংগ্রহে মনোযোগী হইয়াছিলেন, এবং কথঞ্চিৎ কৃতকার্যও যে না হইয়াছিলেন এমন নহে।

ভারত দরিদ্র অথবা রূপণ বলিয়াই যে স্বামীজীর বিরাট কর্মে কার্ণা প্রদর্শন করিয়াছিল আমাদের এরূপ মনে হয় না। তিনি নূতন ধর্ম প্রচার করিতে গিয়া, প্রাচীন শব্দ ও বৌদ্ধ প্রভাবে আপনাকে কিছু পরিমাণে হারািয়া ফেলিয়াছিলেন। সত্য বটে ভারতের জাতীয় জীবনসঙ্গীত ধর্ম, এবং এই ধর্মের বিপুল শক্তি দিয়াই অবসর ভারত-প্রাণকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে হইবে। স্বামীজীর এই অসমাপ্ত কার্য সফল করিবার জন্য—এখনও তাঁর বজ্রকঠোর কঠোর আহ্বানে আমাদেরকে

উদ্ধৃদ্ধ, করিয়া তুলিতেছে, আমরাও আমাদের সর্ব্বশ্রম অঞ্জলি পূরিয়া মহা-শক্তির চরণতলে উৎসর্গপূর্ব্বক সম্যাসী হইতে চাই, "কিন্তু এই সম্যাস এমন কিছু নহে, যাহা ভগবানের সর্ব্ব বিভূতি প্রকাশে বাধা প্রদান করিবে। তাঁর অনন্ত শক্তি ও সম্পদ আমাদের ভিতর দিয়াই প্রবাহিত হইবে, আমরা হইব প্রণালী—কেবল ধর্ম্মপ্রচারের ভেঁপু নহে, কর্ম্মের সকল উপাদানই আমাদের ভিতর দিয়া আবিতুত হইবে।

আমরা সেরূপ সম্যাসকে প্রসন্ন দিই না, যে সম্যাসে আপনাকে কিছু হইতে বঞ্চিত করিতে হয়, অথবা তাহা অপরের নিকট হইতে চাহিয়া লইতে হয়, এবং ইহা এত জানিও অসিদ্ধ আধারের দান লইয়া কখনই ভগবানের সিদ্ধ মন্দির নির্ম্মিত হইতে পারে না।

আমরা যে সম্যাসীর সত্য নির্মাণ করিতে চাই, তাহার জগতের কিছুকে ত্যাগ করিয়া সম্যাসী নহে, ভগবানকে সর্ব্বশ্রম দিবার জন্য সম্যাসী। জীবনের ভিতর দিয়া যে ঐশ্বর্য্য বিকাশ হইবার আছে, তাহাকে রুদ্ধ করিবার অধিকার আমাদের নাই। এই উৎসর্গীকৃত জীবনের সিদ্ধিই নূতন সৃষ্টির উপাদান।

সেই জন্য যাহারা আজ এই আত্মসমর্পণযোগ গ্রহণ করিতেছেন—তাঁহাদের অবিরত স্মরণ রাখিতে হইবে—প্রাচীন স্বভাব প্রতিপদেই নূতন সাধনায় সংশয় উত্থাপন করিবে, ভগবানে জীবন উৎসর্গ করিয়াছ—দ্রষ্টা-স্বরূপ দেখিয়া যাও, জীবন লইয়া তিনি কি করেন—যদি তোমার কোন আদর্শ থাকে তবে ভগবানের পথচীতে চলিবার আকাঙ্ক্ষা কর কেন ? হয় অভীতের প্রভাবাচ্ছন্ন হৃদয়বুদ্ধির অঙ্গুলিসঙ্কেতে জীবনতরী ভাসাও, নয়—আপনার সকল সংশয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধবোধনা করিয়া ভগবানের হাতেই আপনাকে ছাড়িয়া দাও, তিনি যে ভাবে চালাইয়া লয়েন, তাহা তোমার ইচ্ছানুরূপ ত হইবেই না, ভগবানের ইচ্ছা একেবারেই যে স্বতন্ত্র, তাই আত্মসমর্পণযোগীর প্রাথমিক জীবন এমন ভীষণ দ্বন্দ্বময়।

রাউলট আইন

রাউলট আইনের বিরুদ্ধে ভারতের বোম্বের আন্দোলন ভারতসচিব মিষ্টার মণ্টেগু মহোদয়ের সমীপে পৌঁছিয়াছে—তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে “The Rowlatt Act had caused wide-spread opposition in India. The Act was very unpopular.”

অর্থাৎ রাউলট আইন ভারতবর্ষে রিস্তৃত প্রতিবাদে উদ্বেক করিয়াছে। এই আইনটি লোকের যাবতর নাই অপরিজনক হইয়াছে।

কিন্তু তাহা হইলেও ইহা তাঁহার মতে অপরিহার্য। ভারত গবর্ণমেন্ট যে সকল প্রমাণ নিত্য সংগ্রহ করিতেছেন, তাহাতে বুঝা যায় ইংরাজরাজের শত্রুদিগের একটি ক্ষুদ্র সমিতি আছে, যাহার আমূল উচ্ছেদ একান্তই প্রয়োজন—মণ্টেগু সাহেব এমনই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

আমরা দেশ শাসন করি না—রাজকর্তৃপক্ষগণ অবশ্যই আমাদের অপেক্ষা অধিক সন্ধান রাখিতে পারিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু রাউলট রিপোর্ট—যাহার উপর ভিত্তি করিয়া এই কঠোর শাসননীতি প্রবর্তিত হইতেছে, তাহা পাঠে আমরা অবগত হই, যে বঙ্গদেশেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষ করিয়া স্বাভিজ্যোহী দলের উৎপত্তি হয়, এবং শিক্ষিত ভঙ্গ সম্মানগণই ইহাতে বোগদান করে। ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্য বাংলার এই তিনটি উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই ইহার সংখ্যাধিক্য দেখা যায়, ছাত্রগণই এই আন্দোলনের মেরুদণ্ড; অত্যাগত প্রদেশ এই ভাবে সন্মান্য মাত্রায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেও তাহা উল্লেখযোগ্য নহে, তবে ভারতপ্রবাসী হরদস্যালের প্ররোচনায় গান্ধার সমিতি যুদ্ধকালে ভারতে কিঞ্চিৎ গোপন যোগ করিবার প্রচেষ্টা করিয়াছিল, তাহার ক্ষীণশক্তি এক ফুৎকারেই নিঃশেষ হইয়াছে। বাংলা দেশও আজ প্রকৃতিস্থ, স্বদেশপ্রেমের বিমল প্রবাহ বাঙ্গালীর শিরায় শিরায় বহিলেও রাজদ্রোহী হইবার ছুরাকাজা আর কাহারও নাই। এরূপ অবস্থায় অনেকেই মনে করেন, এই রাউলট আইন অনর্থক দেশের সুস্থ প্রাণকে ব্যস্ত করিয়া তুলিবে। এবং এই

জগেই আমাদের মনে হয়, দেশের সকল শ্রেণীর নেতৃবৃন্দই ইহার বিরুদ্ধে যোরতর প্রতিবাদ প্রকাশ করিয়াছেন—মালবা স্কুল প্রভৃতি বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ জননেতৃগণ সদস্তপদ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তার-পর ইহা দেশের জনসাধারণের মনে এমনই একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছে, বাহার ফলে আমেদাবাদে, পাঞ্জারে, কলিকাতায় এমন রীভৎস ঘটনার সৃষ্টি সম্ভবপর হইল।

এক্ষণে আমরা দেখিতে পাই, এই রাউলট আইন প্রত্যাহত হইবার আর আশা নাই, এই আইন যতই গুরুতর হউক ইহাকে বোঝার মত মাথায় বহি-রাই আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। অতঃপর এই শাসননীতি সম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেন্টের ও মিষ্টার মন্টেগু মহোদয়ের যে সান্ত্বনা-বাণী তাহার উপর নির্ভর করিয়া চলা ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। বিরোধ করিয়া যখন ফল নাই, এবং ভয়ের কারণ যথেষ্ট থাকিলেও যখন আমাদের তামসিক জীবন মৃত্যুর কারণ হইবে, তখন এই কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম পথের মধ্য দিয়া আমাদের জাগতিক জীবনকে পরিচালিত করিতে হইবে। আরম্ভাহাই হউক, রাজবিধি মূলতঃ অত্যাচারী ও দুষ্ট লোকের জন্ত, ঘটনাক্রমে ইহার ব্যত্যয় ঘটিলেও, সৎ ও সত্য পথে চলিতে আমাদের সঙ্কোচ করিলে চলিবে না।

বঙ্গদেশের পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্ট হইতে যে সারকুলার জারি হয়, তাহাতে এই কয়েক ছত্র প্রকাশ আছে :—

“অরাজকতা ও রাষ্ট্রবিপ্লব দমন করাই এই আইনের উদ্দেশ্য। বাহারা শান্তিপ্রিয় ও আইন মানিয়া চলে, এই আইনে তাহাদের কোন ভয় নাই। এই আইন সম্বন্ধে একটা দরকারী কথা প্রায় লক্ষ্য করা হয় না। সে কথাটি এই যে, যতক্ষণ গভর্ণমেন্টের এইরূপ বিশ্বাস না হইবে, যে অরাজকতা বা রাষ্ট্রবিপ্লবের আন্দোলন খুব প্রবল হওয়ার ফলে, গুরুতর অপরাধের কার্য্য সকল ঘটতেছে বলিয়া জনসাধারণের মঙ্গলের জন্ত এই আইন চালান আবশ্যক, ততক্ষণ এই আইনের বিধান সকল ভারতবর্ষের কোন অংশে প্রয়োগ করা হইবে না।”

মন্টেগু সাহেবও এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন, “The Rowlatt Act had not been enforced anywhere and would never be enforced unless circumstances justified it and then it would be unflinchingly used.”

অর্থাৎ রাউলার্ট আইনটি কোথাও বিধিবদ্ধ হয় নাই এবং ঘটনাচক্রে তাহা অপরিহার্য না হইলে কখনও জারী হইবেও না কিন্তু তেমন কিছু যদি ঘটে, তবে উহা নিরঙ্কুশভাবেই প্রয়োগ করা হইবে।

এই আইন যে ভাল নহে, তাহাও তিনি বলেন “No Government was entitled to enact such a statute as a permanent measure.”

অর্থাৎ এইরূপ কোনও রাজবিধান স্থায়ীরূপে বিধিবদ্ধ করিবার অধিকার কোনও গভর্ণমেন্টেরই নাই।

কিন্তু শান্তি ও বলসিদ্ধিজন্মের জন্য বাধ্য হইয়া ইহা প্রণয়ন করা হইতেছে। তিনি আরও বলেন “The Act would not be used except to cope with anarchical and revolutionary movement.”

অর্থাৎ আইনটি অরাজকতা ও বিপ্লবমূলক আন্দোলনের দমন উদ্দেশ্যে ছাড়া অন্য কিছুই জন্মাব্যবহৃত হইবে না।

কিন্তু কথা হইতেছে সমস্তই তা নির্ভর করিতেছে গভর্ণমেন্টের বিশ্বাসের উপর। এই বিশ্বাস তা মানুষের বুদ্ধির সাহায্যেই নীত হইবে, দার্শনিকগণ ইহা অবধারিতরূপে জানেন, কত ভুল ধারণা মানুষের চিতে বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করে। অবশ্যই “গুরুতর অপরাধের কার্য সকল ঘটিতেছে” এরূপ হইলে গভর্ণমেন্টের নূতন আইন প্রচলিত হইতে পারে। এই গুরুতর কার্যগুলির বর্ণনা থাকিলে আমরা আশ্বস্ত হইতে পারিতাম, নরহত্যা দস্যুবৃত্তিকেই যদি গুরুতর কর্ম্য বলা হইয়া থাকে, তবে সত্যই দেশবাসীর আতঙ্ক হইবার কারণ নাই; আর আন্দোলন বহুপ্রকারের হইতে পারে, উহা দ্বারা এইসকল মন্দ কর্ম্য সৃষ্টি না হইলে সেরূপ কোন আন্দোলনকে বিদ্রোহমূলক বলিয়া ধারণা করা গভর্ণমেন্টের পক্ষে স্মৃষ্ট হইবে না। আমরা বহুবার বলিয়াছি, প্রমাণ সহকারে দেখাইয়াও দিতে পারি, বর্তমান প্রচলিত ভারতরক্ষা আইনে অনেক নিরীহ ব্যক্তি নির্যাতিত হইয়াছে, শক্তির এইরূপ অপব্যবহার সঘনাই মণ্টেগু সাহেব বলিয়াছেন—

“There was no danger whatever of its being used for any other purpose and if it was thought that it was being misused there would always be

reformed Local Governments, enlarged legislative assemblies etc”

অর্থাৎ অন্য কোনও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাহার প্রযুক্ত হইবার আদৌ কোনও আশঙ্কা নাই আর যদি কখনও মনে হয় যে উহার অপব্যবহার হইতেছে, তাহার জন্য তো নবসংস্কৃত প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট সমূহ, পরিবর্দ্ধিত ব্যবস্থাপক সভা ইত্যাদি সব বরাবরই রহিয়া যাইতেছে।

আজ পর্যন্ত দেশনেতৃগণের শাসনপরিষদে যে স্থান আছে তাহার মূল্য বড় অধিক নহে, তবে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সাহেবের শাসনসংস্কারের ফলে যদি ভারতের ভাগ্যবিপর্যায় ঘটে তাহা বলা যায় না, উহা না লাভ করা পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন মন্তব্য প্রকাশ যুক্তিসঙ্গত হইবে না। আজ শঙ্কর নায়ায়ের পদত্যাগ ও কবি রবীন্দ্রের রাজউপাধি পরিত্যাগ দেশের বুকে যে রেখা টানিয়া দিয়াছে, তাহা মিলাইতে বহু বিলম্ব ঘটবে।

ভারতের ভাগ্যচিত্র সুরু মোটা আশা ও নৈরাশ্রের রেখায় যেমন যেমন ফুটিয়া উঠিতেছে, আমরা তাহার অতি অল্প অংশই বিবৃত করিলাম, আমাদের ছুর্ভাগ্য—ইহার অবসান ঘটবে তখনই যখন আমরা আপনাকে যোল আনা বুঝিয়া পাইব। রাজকর্তৃপক্ষগণ যে কঠোর রাজ্যশাসন দণ্ড হস্তগত করিতেছেন, তাহা আমাদের পিষিয়া ফেলিতে পারে এরূপ ধারণা আমাদের নাই—এবং একটা জাতিকে অকারণ নিষ্পেষিত করিবার প্রবৃত্তি যদি কাহারও কাহারও থাকে সমগ্র ইংরাজ জাতির এরূপ অভিপ্রায় নহে। অতঃপর আমরা যে সুন্দর ও সরল পথটী ধরিয়া চলিতে সক্ষম করিয়াছি, সে পথের মাঝে এই বিকট রাজবিধি অন্তরায় হইতে পারে না, যদিও হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, এই আইনের যে বিপুল শক্তি, তাহা অপরায়ে নিস্তেজ হইয়া পড়িবে।

আমাদের যে পথ, উহা রিকর্মের জন্ত নহে, রাউলাট আইনের বিরুদ্ধেও নহে, উহা রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের বৈধ অবৈধ আন্দোলন নহে, উহা আপনাকে জানিবার ও পাইবার উপায়।

আপনাকে রক্ষা করিতে হইলে, ভর্তা হিসাবে আমাদের প্রচুর ধন উপার্জন করিতে হইবে, অর্থসম্পদহীন আমরা, কাজেই আমাদের সমবায়শক্তির সাহায্যেই এই কার্যে অগ্রসর হইতে হইবে, আপনাকে

আত্মনির্ভরশীল করিয়া তেলির সঙ্গে সঙ্গে আপনার উপর অশেষ বিশ্বাস
 বাহাতে হয় তাহার সাধনা করিতে হইবে। আমরা যে হীন নহি, আমরা
 যে হিংস্রক পরবিদ্বেষী, পরত্নীকাতর নহি, আমরা যে শিব সুন্দর আমরা
 যে সর্বাত্মবদ্ধ আত্মাস্বরূপ—এই জ্ঞানকে সমষ্টিভাবে উদ্বোধিত করিয়া
 তুলিতে হইবে। এই আত্মবিশ্বাস লাভের জন্য জাতিগত যে শুদ্ধ সাংখ্যিক
 আন্দোলন, তাহা রাজনীতিক আন্দোলনের মত আড়ম্বরপূর্ণ না হইলেও
 ইহার প্রভাব সামান্য নহে। বিশ্বের কল্যাণ ও মঙ্গল মস্তাই ইহার
 মধ্যে নিহিত থাকায়, এই নবধর্মপ্রচারকগণের চরিত্র অসাধারণ
 সহিষ্ণুতাপূর্ণ ও অধ্যাত্ম বীরত্বব্যঞ্জক হইবে—ধৈর্য, সাহস, বিশ্বাস
 ইহারই মূর্ত্ত স্বরূপ। বাংলার নবীন সজ্জ্ব দলে দলে সনাতন ধর্ম প্রচার
 করিবে। এই নবীন দলদের মনে রাখিতে হইবে, আপনার উপর অশেষ
 অত্যাচার উপস্থিত হইলেও ভগবানের স্পর্শ বলিয়াই আনন্দ সহকারে
 উহাকে আলিঙ্গন করিতে হইবে সদাহাস্যময় সৌম্য শান্ত নূতন দল,
 রাউলট আইন ত তোমাদের জন্য নহে, রাজদ্রোহী নরঘাতকের জন্য,
 সম্মুখে আকাশপ্রমাণ বিঘ্ন দেখিয়া ইতীশ হইও না—অসাধারণ সহি-
 ক্ষুতা অবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হও।

জাতীর সাধনা

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী একটি বক্তৃতায় এই মর্মে একটি কথা বলেছিলেন—দশবৎসরের মধ্যে ভারতের মরাগাঙ্গে বিপুল ধর্ম-বলী এসে সমস্ত সন্ধীগণ্ডীবদ্ধ জীর্ণসংস্কারের মলা-মাটি ধুয়ে নিয়ে যাবে—জগদ্ব্যাপী জীবন-আবর্তের প্রচণ্ড প্রাবল্যতরঙ্গে পড়ে দেশের জীবনে গুরুতর যুগান্তর উপস্থিত হবে। সে নূতন বস্ত্রাশ্রোত সত্য সত্য একদিন নেমে এলো—খরতর জীবনপ্রবাহ বাংলার বুকের উপর দিয়ে কলকল্লোল তুলে বয়ে গেল—বঙ্গভঙ্গের ঘটনাটুকু উপলক্ষ করে স্বদেশী আন্দোলনের পুণ্যপ্রবাহে আবালবৃদ্ধ নরনারী স্নাত হয়ে যে নূতন মাতৃমন্ত্র লাভ করলো, সে ছিল মূলতঃ জাতির এই গভীরতম অধ্যাত্মপুরুষেরই নবজাগরণ বার্তা—রাখীবন্ধনের শুভ মাহেন্দ্র মুহূর্তে মঙ্গল শঙ্খধ্বনি করে ভগীরথের মত বাংলার হিরণ্ময় অন্তরাগ্না নবীন ভাবধারা আহ্বান করে নিয়ে এসেছিল। আমাদের এখনও মনে আছে কিরূপে মফঃস্বলের একখানা নগণ্য পত্রিকার আবাহন দেখিতে দেখিতে সপ্তকোটি মাতৃষের হৃদয়ে সংক্রামিত হয়ে ৭ই আগষ্টের অপূর্ণ হৃদয়োচ্ছ্বাসে পরিণত হ'ল। সেদিন কোথা হ'তে কে জানে করুণার ধারাবৃষ্টি বাংলার মাথায় নেমে এসেছিল—সে অলোক-সামান্য উর্দ্ধপ্রেরণার বিন্দুস্পর্শে দেশের শুষ্ক মৃতকল্প জীবনতরু সহসা নবরসে মুঞ্জরিত হয়ে উঠেছিল—চক্ষের পলকে একটা মোহমুগ্ধ আত্মবিশ্বত বিশাল জাতির চরিত্রে অভাবনীয় ওলট পালট ঘটে গিয়েছিল—পঙ্কুর গিরিলজ্বন কিম্বা মুকের কণ্ঠে ভাষাযোজনায় চেয়ে এ বড় কম অত্যাশ্চর্য্য অঘটন ঘটনা নয়। বীরসাদকের সিদ্ধবাণী ব্যর্থ হয় নাই—সে অপূর্ণ ভাবতরঙ্গ কি উর্দ্ধলোভের আশীর্বাদপূত যুগান্তরকর বস্ত্রাপ্রাবন নয়? কিন্তু উর্দ্ধের ব্রহ্মকমণ্ডলু হ'তে সে অমৃতধারা যে আধারখানির উপর বর্ষিত হয়েছিল, সে শুধু কত শতাব্দীর জড়ত্বপূর্ণ অলসতমোঘোর-বিজড়িত ছিল না—তার হৃদয়ের পর্কে পর্কে শতাধিক বর্ষের ধারাবাহিক শিক্ষা-নবীশির ফলে পাশ্চাত্যের বিকৃত প্রভাব এমন দৃঢ় ও গভীর অঙ্কপাত করে গিয়েছিল, যে তার সম্মোহনমুক্ত হয়ে শুদ্ধ স্বচ্ছভাবে সেই দিব্য স্বরূপের দানকে গ্রহণ করা তার পক্ষে একেবারেই সম্ভবপর হয় নাই। তাই

লর্ড কর্জনের নির্মম ব্যবচ্ছেদ থেকে আরম্ভ করে' অবিশ্রান্ত দণ্ডাবত বাংলার কোমল হৃদয়কে যখন যারপর নাই উদ্ভাস্ত করে তুলতে লাগলো— তখন তার মধ্যে ফুটে উঠলো সেই অম্লকরণ-জর্জরিত হৃদয়বুদ্ধিরই নির্দারুণ প্রতিক্রিয়া। দণ্ডাত উদ্যতফণা মহানাগের মত বাংলার অশুদ্ধ প্রাণশক্তি আপন অন্ধ আবেগভরে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে' তাই সেই উৎকট বৈদেশিক নীতিরই অনুসরণ করে' তাণ্ডব রুদ্রলীলার বীভৎস অভিনয় সৃষ্টি করলে—পরস্পরের জ্বালাময় হলাহল উলগারে দেশের শাসক ও শাসিত উভয়ের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা হয়ে উঠলো। এই সংশয়ের যুগ এখনও সম্পূর্ণরূপে কাটে নাই—প্রাশ্চাত্যের শিক্ষাপুষ্ট বাংলার বুদ্ধি ও হৃদয় সমস্ত অশুদ্ধ প্রভাবমুক্ত হয়ে আপন অমর স্বভাবধর্মের স্বপ্রতিষ্ঠিত হ'তে এই দীর্ঘ দশবর্ষকাল গ্রহণ করেছে—এই অশুভবর্তী যুগটি কি অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়ে বাঙ্গালীকে অতিক্রম করতে হয়েছে তার পুনরুল্লেখ না করলেও চলে—কিন্তু সমগ্রজাতির আত্মশিক্ষা এখনও সমাপ্ত হয় নাই।

বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ক্ষুধিত আগ্রহভরে যে জিনিষটুকু প্রাশ্চাত্যের কাছ থেকে গলাধঃকরণ করে নিয়েছিল, তার জীর্ণ অজীর্ণ ফলাফল এখনও তার স্তরে স্তরে জড়িয়ে রয়েছে—সে হচ্ছে মোহমদিরাময় রাজনীতিক আদর্শ।—এই তরল চঞ্চল নিত্যপলানপন অপূর্ণ স্বর্ণযুগের পশ্চাতে পশ্চাতে আমরা প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল উর্দ্ধ্বাসে অনুধাবন করে এসেছি—মুগ্ধনেত্রে তার চমৎকার সূচিক্রিত স্বর্ণপুচ্ছের লোভে উধাও হয়ে পিচ্ছিল পথে ছুটে ছুটে যতই চলেছি, ততই সেই মাসামুগ দূর হ'তে দূরতর সেরে' গিয়ে দিগ্বলয়ের কোল থেকে আমাদের উপর তীব্র অট্টহাস্ত বর্ষণ করেছে কিন্তু এমনই আমাদের মদির সম্মোহন—আমরা সে কঠোর বিজ্ঞপের ধারাকে আমাদের সাধের জয়মাল্য বলেই গলায় তুলে নিয়েছি। জানি না ভগবানের রতথানি করুণা এই জাতির জন্ম সঞ্চিত আছে—তাই এই স্বপ্নবোর ভাদ্রবার তাঁর ধীর আরোহনের কিছু কিছু পরিচয় দিন দিন স্পষ্ট হ'তে স্পষ্টতর রূপেই পাওয়া যাচ্ছে।

আমরা জানি, রাজনীতিজর্জরিত আমাদের বুদ্ধিক্ষেত্রটিকে নির্মল নিম্নুক্ত করে' হিন্দুর সনাতন পথটির প্রকৃষ্ট সন্ধান পেতে কি নির্মম আত্মচিকিৎসার প্রয়োজন—আমরা বুঝি গভীরগতিক বাঁধাপথের বন্ধমূল বুদ্ধিসংস্কারটিকে সরিয়ে ফেলে একেবারে উললচিতে নতুন শক্তির দিব্যস্পর্শ

লাভ করা কত কঠিন কত দুঃসহ দীর্ঘসাধনসাপেক্ষ—তবে এইটুকু জানি ও খুঁষি বলেই আজ এক ক্ষুদ্র কোণে বাহিরের চক্ষে গভীর গুহাভ্যন্তরে নতুন মন্দিরে যে নতুন দীপাবর্তন আরম্ভ হয়েছে তার সঙ্গে দেশের উৎকৃষ্ট মনীষাগুলির চিন্তালোকের কোথায় অসামঞ্জস্য ঘটেবে তা অবধারণ করা খুব কঠিন হবে না।

সেদিন বরিশালহিতৈষীর স্তম্ভে সত্যগ্রহ সম্বন্ধে আমাদের কয়েকটি কথার কিঞ্চিৎ প্রতিবাদ দেখে খুব আশাবিভ হয়েছি। লেখকের যে জিনিষটুকু বুঝতে বিষম গণ্ডগোল হয়েছে, জাতিগত নতুন সাধনার পথে ঠিক সেইখানটতে অনেকেরই গুরুতর অস্পষ্টতার সম্ভাবনা বর্তমান বলেই আমরা তাঁর কথাগুলি তাঁর একার হিসাবে না নিয়ে সাধারণ দিক থেকে এইখানে সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করি। জাতির আপন গভীর অন্তর্লোকেই যে নবীন সাধনা জন্মলাভ করেছে, তার মন বুদ্ধিকে তার দিব্যালোকে নবোদ্ভাসিত করে' তুলতে একটু বিলম্ব হবে—তাতে ক্ষতি কি—তবে জাতির অন্তরাআর নিবিড় অন্তঃ-প্রেরণা যে দিন দিন আমাদের জাতীয় অন্তঃকরণটিকে শুদ্ধ ও দীপ্ত করে' অধিকৃত করতে আরম্ভ করেছে—সেইটুকুই আমাদের পরম আশা উৎসাহ ও পুলকের বিষয়।

প্রথমে এই মূল বিষয়টি সম্বন্ধেই একটা স্পষ্টতার প্রয়োজন দেখতে পাই। জাতি আপনই জাগিতেছে—এই গোড়ার সরল সত্য কথাটা বুঝতে এতটুকু ভুল করলে চলবে না। একদিন গরীব অহঙ্কারের দৃষ্ট প্রশ্ন শুনেছিলাম বটে—“Who rolled the ball?”—কিন্তু কালের ভৈরব অট্টহাস্য এই দশবৎসর দেশের বুকে নির্মমভাবে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে প্রমাণিত করে' দিয়েছে—যে অদৃশ্য মহাশক্তি এই মহাবজ্রের পুরোহিত—তার অব্যর্থ অনুলিহেলনেই জাতির সমষ্টিজীবন গড়ে' উঠছে—সে আপন আবেগ আপন প্রেরণাভরেই দুর্জয় পদক্ষেপে নিত্য অগ্রসর—কোন জড় জীব কোন তুচ্ছ মানবের তুচ্ছ সাধনার উপর তার একবিন্দু নির্ভরতা? জীবন হউক, মৃত্যু হউক, প্রচণ্ড প্রাণবেগ কিংবা নিশ্চেষ্ট পক্ষুষ্ট যাহাই তাহার অভিপ্রেত হউক না কেন—তুমি আমি, গান্ধী তিলক, বরিশাল-হিতৈষীর কথিত “গুহাভ্যন্তরস্থ জ্যোত্বকের সাধক”—কে তার এতটুকু গতিরোধ করবে—কাহার অপেক্ষাই বা সে রাখে?

জাতি আপনাই জাগিতেছে—কারণ জাতির ভগবান জাগিতে চাহিয়াছেন—ভারতের জাগরণ তাঁহার নির্গূঢ় চিদগর্ভে বদ্ধত হয়ে উঠেছে—কত যুগ তো তাঁর এ ইচ্ছা জাগে নাই—তাই নিবিড় অন্ধতমিস্রার কোলে তার অবসর আত্মবিস্মৃতির গতি ফিরা'বার সমস্ত মাহুয়া চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল—বুদ্ধ শব্দর রামানুজাননক চৈতন্যের সে বিপুল চেষ্টামালা কোথায় ভেসে গিয়েছিল—আজ তাঁরই আবার মহাসঙ্কল্প উদয় হয়েছে—ভারতের জাগরণ ব্যর্থ হবে না—সে অমোঘ অব্যর্থ ভাগবত ইচ্ছাটিকেই সম্পাদন করতে বিশ্বপ্রকৃতি সাধন আরম্ভ করেছেন—প্রবর্তকের এইটিই মূল জীবন-মন্ত্র। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস দ্বাদশবর্ষের কঠোর উগ্র চেষ্টাসাধনার পর জাতি এই সুরম্য পরম মহাসত্যটুকু হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করার অধিকারী হয়ে উঠেছে। এই জন্তই আমরা বাঙ্গালী যাহাতে অগুহ্য রজঃশক্তির প্রভাবে আবার আত্মবিস্মৃত হয়ে ভারতের মহাব্রতকে ব্যর্থ না করে তজ্জনা পুনঃপুনঃ সাধন হ'তে বলেছি। বাঙ্গালীকে তার সমগ্র জীবন দিয়ে ভগবানের ইচ্ছাটিকে অনুভব করতে হবে। এই ভাগবত ইচ্ছাটিকে আত্মার ভিতরে আত্মা দিয়া জানা ও পাওয়াই হচ্ছে বাঙ্গালীর অমর জীবনসাধনা—আমাদের কথাগুলির মধ্যে একটু গভীরভাবে প্রবেশ করলেই বুঝতে পারা যাবে, এই অনাহত সনাতন সাধনস্বারাটিকেই আমরা ভারতের মহাব্রত বলে' উল্লেখ করেছি—ইহাই দেবব্রত। কে জানে কোথা হ'তে এ স্পর্শাও ধীরে ধীরে আমাদের হৃদয় অধিকার করে' বসছে—একদিন সমগ্র ভারতকে বাঙ্গালীর আব্রু এই মহাযজ্ঞে যোগদান করে' এই দেবব্রত আবিষ্কার ও অধিকার করতে হবে।

বস্তুতঃ, গান্ধীর সত্যগ্রহণে নানাভাবে দেবব্রত বলে' বোষণা আমরা কোথাও কোনও প্রবন্ধেই করি নাই। প্রবর্তকের একজন চিরানুরাগী পাঠকের হৃদয়েও কেন যে এমন বিঘন ভ্রম ধারণা জন্মিল, তা আমরা বুঝতে পারি না। একটু গভীরতর দৃষ্টি ও অভিনিবেশের সঙ্গে সেই প্রবন্ধগত আমাদের সমস্ত কথাগুলি পাঠ করলেই লেখক দেখতে পেতেন—“যে অমরভাব বাঙ্গালীর জীবনে যজ্ঞধারার মত বহমান একদিকে তাহার প্রভাব অন্যদিকে মহাত্মা গান্ধীর অসাধারণ আত্ম-জ্যাগ তাহাদিগকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে”—একপ অবস্থায় কিংকর্তব্য-

বিমুঢ় জাতিকে আপন অমরভাবের সাধনায় জলাঞ্জলি দিয়ে মহাত্মা গান্ধীর অঙ্গসরণ করিতে কেমন করে' আমরা বলতে পারি? বাঙ্গালীকে আমরা বাহিরের এই ঘনবটাপূর্ণ নানা কলকোলাহল হ'তে বিরত হ'য়ে অন্তরের মণিকোটায় বসে' সমাহিতচিত্তে তার তপঃসাধনার মূল সূত্রটি ধরে' নিতেই বলেছি। “বাঙ্গালীর সম্মুখে যে আত্মশক্তির তপস্তা মূর্তিমান্ হয়ে আবিভূত তাঁহাকেই বরণ করে' নিতে হবে” আমাদের এই কথাগুলি দিয়ে কি মহাত্মা গান্ধীর প্রতি অঙ্গুনীনির্দেশের কোনও সম্ভাবনা দেখে লেখক তাঁর ভ্রান্ত ধারণার গহ্বরে পড়তে পারেন? কিন্তু লেখকের এতদূর অগভীর লঘুদৃষ্টি হ'তে পারে বলে' আমাদের বিশ্বাসই হয় না।

প্রকৃতপক্ষে আমরা গোড়া থেকেই স্পষ্ট করে' বলে' আসছি—গান্ধীর সত্যগ্রহসাধনার সঙ্গে জাতির সনাতন অন্তঃসাধনার মূলগত ঘোরতর প্রভেদই বর্তমান। উদারচরিত্র মহাত্মাগী তপস্বী-সাধকশ্রেষ্ঠ বলে' মহাত্মা গান্ধীকে আমরা চিরদিন হৃদয়ে উচ্চ শ্রদ্ধাসন দিয়ে পূজা করে' এসেছি—তাঁর নেতৃত্বের যোগ্যতা সম্বন্ধে বাদপ্রতিবাদ করাও কোনদিন আমাদের অভিপ্রেত নহে—বিধাতার স্বহস্তলাঞ্ছিত জয়মুকুট মাথায় পরে' যে কেহ আমাদের সম্মুখে এসে জাতির সনাতন সাধনার সত্য পথখানির জলোজ্জল চিত্র তুলে ধরতে পারবেন, আমরা সর্বতোভাবে সন্মান্তঃকরণে তাঁহারই জন্ত আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধাসনটি ছেড়ে দিতেই চাই—আমরা জানি মান্বষের যোগ্যতা অযোগ্যতা এসকল কিছুই আসল কথাটি আদৌ নয়—ভগবানের বিজয়হৃন্দুভি সত্য অবিকৃত ভাবে যার হস্তে বাজবে আমরা তাঁকেই বরণ করে' নিতে বাধ্য—আমরা হৃদয়ের সবটুকু শ্রদ্ধা দিয়েই যে এই পরম বিশ্বাসটিকে আঁকড়িয়ে ধরেছি—এই জাতির চিরকর্ণধার সর্বশক্তিমান্ সর্বযোগ্যতার আধার শ্রীভগবান্ স্বয়ং—তাঁর রূপ, তাঁর বিভূতি, তাঁর শক্তি যেখানে যেখানে যেমন যেমন ভাবে ফুটে উঠবে, সেখানে তদনুরূপ পূজার অর্থ্য নিয়ে আমাদেরিকে যে উপনীত হ'তেই হবে।

মহাত্মা গান্ধীর প্রতি আমাদের যারপর নাই স্নগভীর শ্রদ্ধা বর্তমান—তাঁর অসাধারণ ত্যাগ, দেবত্বভরিত্র, তাঁর প্রগাঢ় আত্মবিশ্বাস, তাঁর অটুট সত্যনিষ্ঠা, তাঁর বিশ্বোদার হৃদয়, তাঁর সর্বভূতে প্রেম—এ সকল দৈবীসম্পৎ তাঁহাকে সত্যই ভারতের এক অপূর্ণ ভাগবত বিভূতিস্বরূপ

‘সুপ্রতিপন্ন করে’ দিয়েছে—স্বয়ং মণ্টেগুসাহেব পর্য্যন্ত তাঁর প্রশংসার শতমুখ, একথাটাও ভুলে চলে না—দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর যে অনন্ত সাধারণ নেতৃত্বের পরিচয় সমস্ত বিশ্ববাসী পেয়েছে সে কথাও বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। আর আমরা কি দেখি নাই—যখন কালভের্ণের স্বয়ং স্বাক্ষর করে’ গুজরুর নিভৃত সাধনকুঞ্জ হ’তে সেই সাধকবরকে ভারতের ক্ষুদ্র দিকনির্দেশহীন যৌরধনচ্ছায়াপূর্ণ রাষ্ট্রক্ষেত্রে সহসা ছুঁড়ে এগিয়ে দিয়ে গেলেন, তখন সেই তপোক্ষীণ কণ্ঠাগত জলদগভীর গর্জনে আসামুদ্রহিমাচল সমস্ত ভারতবাসী দধীচির দুর্জয় অস্থিকঙ্কালের বনুঝনা শুনতে পেয়ে আশায় উৎফুল্ল হয়ে কেমন কাতারে কাতারে তাঁর উন্নত পতাকার তলে সমবেত হল? তাঁর অপূর্ণ তপঃপ্রভাব কেমন এক মুহূর্ত্তে দেশের বুকে অলক্ষিত ভাবে বিপুল নাড়া চাড়া দিয়ে বোধহি সঞ্জার প্রভৃতি যে-যে প্রদেশের বুকে তামসিক শাস্তিচ্ছায়া ছেয়ে রয়েছিল, তাদের সে সব নির্মমভাবে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে’ দিয়ে’ যে জালাময় জীবনতাড়নার ভিতর দিয়ে এসে বাংলাদেশ আজ এই নবীন সাধনার উপযোগী অভিজ্ঞতা ও ধীরগামাৰ্থ্য লাভ করেছে তার কথঞ্চিৎ আশ্বাদ দিয়ে গেল—এ সব কি আমরা লক্ষ্য করি নাই? গান্ধীর মত রাজভক্ত পুরুষও যে কি আশঙ্কায় উদ্বেলিত কি রেদনার বিচলিত হয়ে রাউলাট রিলের ঘোরতর প্রতিবাদ করতে উদ্যত হয়েছেন, তা কি কাহারও জানতে বাকি আছে? গান্ধীর ভিতর দিয়ে ভগবান এই মহাজাতিকে আরও একটা অভিজ্ঞতার অবদান দিয়ে গেলেন, এ কথা অস্বীকার করবার অধিকার কারও থাকতে পারে না!

কিন্তু সেই মহাত্মার এই সত্যগ্রহ-সাধনা ভারতের সনাতন অন্তঃসাধনা নহে, এ কথাটাও সঙ্গে সঙ্গে আমাদের না মানলে চলবে না। কি এক বৈদেশিক তপস্ছায়া তাঁহার দৃষ্টিকে এমন ঋণিত, তাঁর সাধনাকে এমন অপূর্ণাঙ্গ করে’ তুলেছে—যেটার সন্ধান ভারতবর্ষকে অচিরে জানতেই হবে—নচেৎ তার সনাতন জীবনসঙ্গীত পরিপূর্ণ হয়ে কিছুতেই ঝঙ্কত হয়ে উঠতে পারবে না। আমরা নানাভাবে বরং শুধু এই কথাটিই বলতে চেয়েছি—পরন্তু লেখকের কণ্ঠ অস্বীকার করলেও তাঁর হৃদয় নিশ্চয়ই ‘বড়’র মোহেই একটু একদিকঝোঁকা হয়ে পড়ে’ থাকবে—নচেৎ গান্ধীর প্রতি সম্পূর্ণ প্রদ্বাবান হয়েও কেন যে আমরা তাঁর

সত্য-গ্রহ সাধনা ভারতের সনাতন জীবনসাধনাটি হওয়া দূরে থাকুক বরং তাহার পরিপন্থী স্বরূপ ব'লেই আভাষ দিগেছি এই কথাটা বুঝতে গিয়ে তাঁকে এমন গোলযোগে পড়তে হ'ত না। দক্ষিণ আফ্রিকার চেয়ে ভারত-বর্ষের কাজ আরও বৃহত্তর ও গভীরতর—সে মহাত্মতের ইঙ্গিত আমরা প্রবর্তকের ছত্রে ছত্রেই একনিষ্ঠভাবে নির্দেশ করে' আসছি—সুতরাং এখানকার তার পুনরুন্মেষ না করলেও চলবে। সে কাজের উপযোগী হ'তে গেলে মহাত্মা গান্ধীর মত তপস্বীশ্রেষ্ঠেরও নূতন ভাবে গড়ে উঠার প্রয়োজন—এ কথাও আমরা বহুবার বলেছি।

আর একটা কথার উল্লেখ করে', আমরা প্রবন্ধটি শেষ করতে চাই। রাউলাট আইন দেশের হাড়মাস চূর্ণ বিচূর্ণ করে' ফেলতে পারে এমন আশঙ্কা আমাদের নাই। রাউলাট আইন হবে—তাকে দারুণ বোঝার মত মাথায় বহন করেই আমাদের আপন জীবনপথে চলতে হবে—আমাদের গতি যদি সভ্যই ভাগবত ইচ্ছাসম্মত হয়, তবে সে গতি কিছুতেই রুদ্ধ করলে চলবে না। এ সকল কথা আমরা প্রবন্ধান্তরে ব্যক্ত করেছি—শুধু রাউলাট বিল নয়, দেশের এটা ওটা সব তরল আন্দোলনেই অনর্থক শক্তির অপচয় করতে আমরা অন্তরের ইঙ্গিত আদৌ পাই না। জাতির সম্মুখে যে বড় কাজটা পড়ে' রয়েছে—সেটা রাজনীতিও নয়, অসবর্ণ বিবাহও নয়, দরিদ্রনারায়ণের সেবাও নয়—সেটা তথাকথিত গতানুগতিক ধর্মসাধনাস্তম্ভও নয়—দেশ যে নিগূঢ় জিনিষটির সন্ধান ও সাধন চেয়েছে সে এ সব কিছু নয়—তাই বলে' যে এ সমস্তের সঙ্গে তার চিরবিরোধ থাকবেই এমনও নয়। এই সমস্ত নেতি নেতি সত্ত্বেও যে একটা বিপুল নিগূঢ় অব্যর্থ “হাঁ”-এর দিকের ইষণা জাতির অধ্যাত্মলোকে নিহিত রয়েছে—সেটা তো মায়াদানের কোনও পকেট এডিসন নয়—পরন্তু তার উপরেই জাতির মক্তি সিদ্ধি সমস্তই নির্ভর করছে। বরং রাষ্ট্র সমাজ প্রভৃতি অচলায়তনের সব গভী-চূর্ণ করে' জাতির সেই নিগূঢ় অধ্যাত্মশক্তির পরিষ্করণ হলেই এই সব বাহ্য আন্দোলন, এই সব বিচিত্র কর্মধারা আপন আপন সত্য পরিপূর্ণ ভাগবত স্বরূপ খুঁজে পাবে—কিন্তু সর্বপ্রথমে চাই তো এই নিগূঢ় বস্তুটিকে জানা ও পাওয়া।

সমালোচনা

The Ramkrishna Mission Home of service, Benares —
The Eighteenth Annual Report—সেবাশ্রমের এই সাপ্তাহিক
কার্যবিবরণী পাঠে তাঁদের অশ্রুজল মানবসেবার পরিচয় পাওয়া যায়।
দরিদ্রনারায়ণের সেবা, অনাথা বিধবার সাহায্য, আর্ন্ত-ব্যাধিগ্রস্তের
চিকিৎসা, অন্নবস্ত্রহীনকে অন্নবস্ত্রদান—এই সকল পুণ্য কাজই উক্ত সেবা-
শ্রমের ব্রত। সেবকগণের উদ্দেশ্য সাধু এবং কার্য-সাক্ষ্যও প্রশংসনীয়। সর্ব-
ভূতে নারায়ণের অধিষ্ঠান উপলব্ধি, তনোজর্জরিত অলসতার বিতাড়ন,
দেশের চিন্তাশক্তির জন্মই স্বামীজী এই সরল নিকাম কর্মযোগের ব্যবস্থা
দিয়াছিলেন। স্বামীজীর পদচিহ্ন অম্লসরণ পূর্বক যারা অনন্তব্রত হইয়া
এই সেবামার্গ সাধনের অমুরাগী, তাঁদের সম্বন্ধে আমাদের কিছুই বলিবার
নাই। অনেক জন্মনাকল্পনার চেয়ে যে কোনও উচ্চাদর্শের কার্যে পরিণতি
সর্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। কিন্তু দেশের বায়ুমণ্ডলে একটা বিষয় আমরা লক্ষ্য
করিতেছি—দেশ স্বামীজীর যুগে যে জড়তাগ্রস্ত ছিল, আজ তাহা হইতে
মুক্ত হইয়াছে—তাই সেই রোগোপ্লেয়াগী ঔষধ ব্যবহার প্রয়োজন
ধীরে ধীরে সে কাটািয়া উঠিয়াছে। আজ নতন কর্মপন্থার নির্দেশ
দেশের অন্তঃপুরুষ চাহিতেছেন—তাঁহার দৃষ্টি আজ স্বল্পতর ও গভীরতর।
তাই শিক্ষাঞ্জলি পাতিয়া শিক্ষালব্ধ দানের সাহায্যে দরিদ্রনারায়ণের
সেবাটুকুতেই আর কেহ পরিতৃপ্ত নহেন। দেশের চিরদারিদ্র্যের মোচন,
দরিদ্রের মধ্যে নারায়ণের শুধু অধিষ্ঠান নয়, তাঁহার জানে ধর্ম্মে ঐশ্বর্য্য-
সম্ভারে জাগ্রত আত্মবিকাশেরই উপায় অন্বেষণ করাই অধিকতর প্রয়ো-
জনীয় হইয়া পড়িয়াছে। দেশের চিন্তাশক্তি এই ভাবেই যুরিয়া আসি-
তেছে—নানাস্থান হইতে ইহার অভাব পাইতেছি বলিয়াই আমরা এত-
গুলি কথা বলিতে বাধ্য হইলাম।

প্রাপ্তি-স্বীকার

মায়ে-পোয়ে—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক পরিব্যক্ত এবং কলিকাতা
৫৫নং আপার চিংপুর রোড, আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত, মূল্য ১০ আনা।

সিফন-বিল

১৯১৭ সালের ২০শে আগষ্ট ভারতসচিব মন্টেগু সাহেব ভারতবর্ষকে যে রাজনৈতিক অধিকার দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, ১৯১৯ সালের ২০শে আগষ্ট তাহা বর্ণে বর্ণে প্রতিপালিত হইবে কিনা ভারতের রাজনীতি-বিশারদ মনীষীবর্গ সে বিষয়ে সন্দেহ করিতেছেন।

সন্দেহের কথা বটে। যুদ্ধ-বিগ্রহে বিচঞ্চল ইংলণ্ড আজ সমরান্তে জগজ্জয়ী, ইংলণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি জগতে আর নাই বলিলেই চলে, এ অবস্থায় ২০শে আগষ্টের আশাবাণী সফল নাও হইতে পারে, সেইজন্য ভারতের রাজনৈতিক হৃদয় ক্ষুদ্র নৈরাশ্যপূর্ণ।

যাহারা রাজনীতি লইয়া নাড়া চাড়া করেন, কন্ফারেন্স কংগ্রেস ও সভাক্ষেত্রে যাদের কণ্ঠধ্বনি প্রায় শুনিতে পাওয়া যায়, যাদের রাজনৈতিক সন্দর্ভে বাংলার দৈনিক ও সাপ্তাহিকগুলি আবহমান কাল ধরিয়া ভরিয়া আসিতেছে, তাহাদের ধারণা স্বদেশী আন্দোলনের মত ভারতবাসী-তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করিতে পারিলে, মন্টেগু সাহেবের পূর্ব অঙ্গীকার কড়ার গুণায় বজায় থাকিতে পারে।

কিন্তু এরূপ আন্দোলন সৃষ্টি করা আর তেমন সুবিধার নহে, ভারতের রাজকর্তৃপক্ষগণ এইরূপ রাজনৈতিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে যে উৎকট প্রতিকার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে ইহা কৃতকার্য হওয়া একপ্রকার অসম্ভব—সকল কথা বুঝিয়া ভারতের প্রাণশক্তি যেন মস্তাবিষ্ট ভূজঙ্গের ছায় নীরব ও নিশ্চেষ্ট।

অন্তঃসারশূন্য-বুখা আফালনে ইংরাজ জাতি কতটা ভুলিবেন সে বিষয়ে আমাদের ঘোরতর সন্দেহ আছে, আমাদের তর্জ্জনগর্জনের মূলে যদি জাতির সমষ্টিশক্তির প্রাণ না থাকে, তবে সেরূপ গ্রহসনের প্রয়োজন কি? দুইশত বৎসর একত্রবাসের ফলে, আমাদের সাংঘাতিক দুর্বলতা কোথায়

পূজীকৃত ইংরাজ বিদেশী হইলেও তাহার সন্ধান পাইয়াছে, এবং আবশ্যক হইলে সেই ক্ষতের উপর তীব্র আঘাত করিয়া আমাদের অবসন্ন জীবন অধিকতর দুর্বল করিয়া দিতেছে। এক্ষণে আমাদের সর্বপ্রধান কর্তব্য জাতিগত এই মহাব্যাধির প্রতীকার করা—রাজশক্তির পুনঃপুনঃ কঠোর আঘাত এইদিকেই জাতির মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে।

বালুর উপর গৃহ নির্মাণ করিলে, উহা অচিরেই ভূমিসাৎ হইবে। আমাদের বনিয়াদ কোথায়? কিসের উপর আমরা দাঁড়াইয়া আছি বলত? যে একেবারে উপর-আধীনতার ভিত্তি, যে জ্ঞান ও শক্তির সাহায্যে উহা আয়ত্ত করিতে হয়, তাহা স্বর্জন করিবার যে সাধনা, তাহা শুনিলে তোমরা কর্ণে অঙ্গুলি দাও—গতর্গমেন্ট প্রেশ-এ্যাক্ট, মিটিংস-এ্যাক্ট, সিদিসন বিল, রাউলট আইন উঠাইয়া দিউন, আর তোমরা বাক্যারীর বাঙ্গালী হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত সিংহনাদে গগন বিদীর্ণ করিতে থাক; বলিহারি তোমাদের কর্মগুণিত্তি, তোমাদের দেশভক্তি।

এই যে যুদ্ধের সময় কেবল দিয়াশলাই বিক্রয় করিয়া জাপান লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ভারত হইতে লইয়া গেল, আর আমাদের দেশীয় দিয়াশলাইয়ের কলগুলি উঠিয়া গেল কেন—সংবাদ রাখ কি? এই দারুণ বহুসঙ্কটকালে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের শোচনীয় দুরবস্থার কথা শুনিয়াছ কি? কর্তা মহলে কিরূপ গুণগোল চলিয়াছে তাহার কথা জান কি? এংলো ইণ্ডিয়ান কাগজগুলিতে বিলাতের মূলধনে, বিলাতের লোকের কার্যাবধানে ভারতে বড় বড় ব্যবসাবাগিজ্য বিস্তারের বিজ্ঞাপনগুলি পাঠ করিতেছ কি? অতঃপর সমস্ত ভারতবর্ষটা যে বৈদেশিক শ্রমজীবীর দেশ হইয়া যাইবার সুত্রপাত ঘটতেছে তাহার দিকে তোমাদের দৃষ্টি নাই, আছে বিনা পয়সার গলাবাজী আর দীর্ঘ সন্দর্ভ—ইহাতেই দেশোদ্ধার হইবে না—চাই আত্মবিশ্বাস আত্মনির্ভরতা, ইহার জন্ত চাই জাতিগত সাধনা। কাগজে কলমে কাজের প্রণালী ছকিয়া ভারতে কার্যোদ্ধার হইবে না, কর্মীর মধ্যে সর্বাঙ্গে একা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

ভারতের যে একটা তাহা কর্মকে কেন্দ্র করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবে না—রাজনীতি সমাজনীতি অথবা শিকাসমস্যাকে সাধারণ করিয়া ভারতবর্ষ কোন দিনই একপ্রাণ হইয়া উঠিবে না। ভারতের একা সম্বন্ধিত হইবে আত্মসাধনার, এই ধর্ম অবশ্যই কিছুকে জড়িত কর, কিছু কিছুকে জড়ও

এই ধর্ম নয়, ধর্ম—ধর্মেরই জন্তু—ধর্মের উপরই জ্ঞান শক্তি ঐক্য সংস্থাপিত হইবে।

মানুষের ধর্ম ভগবানকে জানা এবং পাওয়া। কত বিপদ, কত বিপ্লব, কত হুংসের ভিতর দিয়া আমরা ভগবানকে জানিতে পারি, কত বিপুল সহিষ্ণুতা ও আত্মসংযমের কলে তাঁহাকে অন্তরে বাহিরে পাই। ভগবানকে জানা ও পাওয়ার কথাটা গোণ হিসাবেই আমরা সাধারণতঃ লইয়া থাকি, কিন্তু ইহাই মুখ্যকর্ম, এই পথে চলিবার যাহার সাহস আছে, সেই জাতিগত ঐক্য সাধনায় অগ্রসর হইতে পারিবে।

কোনও কর্মের অজুহাতে আমি তোমার সহিত মিশিব না ইহা এবং জানিও, হয়ত তোমার কর্মটা আমার আনুকূল্যে পূর্ণ হইবে, কিন্তু তোমায় না জানিলে, না পাইলে কোনমতেই উহাতে হস্তক্ষেপ করিব না। ইহাই মিলন। এইরূপ ঐক্য দুই চারি জনের মধ্যেও যদি সংস্কৃত হয় তবে উহার দ্বারা যে কার্য্য ভবিষ্যতে সম্ভব হইবে, আজ কংগ্রেসমণ্ডপে পাঁচ হাজার প্রতিনিধি একত্র হইলেও উহার আশা করিও না।

দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থার সন্ধান যাহারা রাখেন তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন—জাতির অন্তর্নিহিত এই নিদারুণ অশুদ্ধতা নিকালিত না হইলে তাহার কোনও আশাই নাই। ইন্দ্রজালের দ্বার আকস্মিক কোনও অন্তত ঘটনার প্রত্যাশা ধীমান ব্যক্তি কখনই করিবেন না—মানবের অন্তঃপ্রকৃতির একান্ত উন্নতিসাধন না ঘটিলে বাহ্যজীবনের সমুদয় বিকাশ একেবারেই অসম্ভব, ভিতরের শুদ্ধি বিস্তৃত হইয়া বাহিরে অভিনব বেশ ধারণ করিবে। সেইজন্ম একেবারেই আমরা দেশবাসী সমুদয় পূর্ণ স্বেচ্ছের প্রত্যাশা করি না, ভারতের এই অন্তঃসাধনার উপর নির্ভর করিয়া যাহারা বুদ্ধিপট হইতে অতীতের কলনচিত্র একেবারেই মুছিয়া ইহাতেই আত্মনিয়োগ করিতে কৃতসঙ্কর তাহাদের এই অধ্যাত্মসাধনার পথে অগ্রসর হইতে বলি। বর্তমান ও ভবিষ্যতের ঘটনারাজি অনুকূল হউক প্রতিকূল হউক, অবিচলিত চিত্তে সমস্তই ভাগবত সঙ্কেত ও আত্ম-মুক্তির উপায় বলিয়া অবধারণ কর—জাতির গুহাভ্যন্তরস্থ পরাৎপর গুরুত্ব তোমার সহায় হইবেন।

মিলন-সঙ্ঘ

ধর্মের উপর ভারতের জাতীয় জীবন চিরপ্রতিষ্ঠিত। আজ এমন কোনও ভীষণ দুর্ভিক্ষপাক ঘটে নাই, যাহার জন্ত আমাদের চিরাগত স্বধর্ম বিসর্জন করিয়া নূতন কোনও জীবনযাত্রা ধরিয়া চলিবার প্রয়োজন হইয়া থাকিতে পারে। বিদেশীয় পণ্ডিতগণের ধারকরা বুলি উচ্চারণ করিয়া বাঁহারা বলিয়া থাকেন—ধর্মের সেবার আত্মনিয়োগ করিয়াছিল বলিয়াই আজ ভারতের এই দারুণ অধঃপতন, তাহারা আত্মহার্য্য দ্রাব্য জীব—তাহাদের কথা কাজ নাই। আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছি, ধর্মই ভারতের জাতীয় জীবনের মণিযাত্রা—ইহাকেই অবলম্বন করিয়া আমাদের শুধু দর্শন সাহিত্য রস-কলায় উদ্ভব, বিকাশ ও পরিপূষ্টি নয়, পরন্তু ইহারই গভীর প্রেরণায় আমাদের রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, আমাদের জাগতিক বাহ্য-জীবনের সমুদয় ধারা গঠিত নিয়মিত পরিচালিত। ধর্ম ও যোগই ভারতের মূল জীবনতন্ত্র—যেদিন হইতে এই মূলতন্ত্রের সাধনপথ হইতে আমাদের পদস্থলন হইয়াছে, যে দারুণ কুক্ষণে আমরা জাতি হিসাবে ধর্মভ্রষ্ট ও যোগভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছি—সেই মুহূর্ত্ত হইতেই আমাদের অপমান লাঞ্ছনা ও অবনতির যাত্রাপাত। অগভীরদর্শী তরলমস্তিষ্কের স্বকপোলকল্পিত ইউরোপীয়ছায়াচ্ছন্ন অনুমান সিদ্ধান্ত ছাড়িয়া দিয়া আপন প্রতিভার অবিশ্রামিত স্পষ্ট অব্যর্থ আলোকে ভারতের জাতীয় ইতিহাস গভীরভাবে পাঠ কর—দেখিবে ধর্মের জন্ত হওয়া দূরে থাকুক, ধর্মের অভাবে যোগচ্যুতির ফলেই আমাদের জাতীয় চরিত্রের এই শৌচনীয় অধঃপাত।

*

*

ভারতবর্ষ জানেবিজ্ঞানে ঐশ্বর্য্যোৎসম্পদে সম্রমেগোরবে উন্নত ও মহৎ ছিল—অতীতের এই মহিমাময় কল্পচিত্রখানির পানে নির্নিমেষনেত্রে শুধু চাহিয়া রহিব—আর মায়াবের সর্ব-অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া বর্তমান জগতের সমস্ত উপহাস ও উৎপাতের বোঝা বহিয়া ভারবাহী বলদের মত অভিশপ্ত জীবনপাত করিতে থাকিব—বাতুলের মত একরূপ পরামর্শ দানে কোনই লাভের সম্ভাবনা নাই। নিশ্চেষ্টতার তগোসমুদ্রে গা ভাসান দিয়া

অনেকদিন আমরা চলিয়াছি—কবে যত ভোজন করিয়াছি তাহার স্মৃতি-সৌরভ আশ্রয় করিয়া স্তম্ভস্বপ্নের খেলায় মাতিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী অথোরে কাটাইয়া দিয়াছি—আজ পশুদের জড়তার চরম সীমায় উপনীত হইয়া বহিঃপ্রকৃতির নিশ্চয় ঘাতপ্রতিঘাতেও যদি এখনও আমাদের আত্ম-চেতনা উদ্ভূত হইয়া না উঠে—তাহা হইলে বিশ্বজগতে আর আমাদের গতি মুক্তি নাই—একথা কেবল সত্য নিঃসন্দেহে। কিন্তু প্রকৃতির অকুশলতা-নার বিচলিত হইয়া আবার যদি মত্তমাতঙ্গের মত ইউরোপের উৎকট মদিরায় উদ্ভূত ও বুদ্ধিব্রষ্ট হইয়া পড়ি, লুক্কনেত্রে উজ্জল পরধর্মের অমু-করণ করিয়া আপনাদের জীবনভঙ্গী পরকীয় ছাঁদে, বিজাতীয় ধরণে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টাই উঠিয়া পড়িয়া লাগি—তাহা হইলে এক নরক হইতে আর এক নরকেই আমাদের অভিযান করা হইবে মাত্র—এক অন্ধকার হইতে গভীরতর অন্ধকারেই আমাদের ডুবিতে হইবে—সেই হইবে সত্য সত্যই একেবারে অতি ভীষণ অতি শোচনীয় জাতীয় আত্মহত্যা—ততো ভয় এবং তে তমঃ যত সমুদ্রাং রতাঃ—ভারত যদি মদোন্মত্ত ইউরোপেরই সহস্রতম সংস্করণ মাত্র হইয়া উঠিতে প্রয়াস করে, তাহা হইলে আর তাহার আশা নাই—ইহাও কেবল সত্য কথা।

এত কথা পুনঃপুনঃ বলিবার প্রয়োজন আছে—আমরা দেখিতে পাইতেছি, ভারতের মনীষীবর্গের মস্তিষ্ক হইতে উজ্জল রাজনৈতিক আদর্শটি মুছিতে মুছিতেও মুছিতেছে না—আশার ছলনায় কতরার প্রতারিত হইতেছি—কিন্তু আবার একটু আশটু স্বর্ণমণ্ডিত স্বপ্নপিণ্ডের লোভে দলে দলে ছুটিয়া চলিয়াছি, তাহার জন্ত কত হাত্তজনক প্রহসনের সৃষ্টি করিয়া বসিতেছি, আবার সেই সকল রাষ্ট্রসংস্কারেরই উগ্র তিক্ত অজীর্ণোদ্যারের ফলে কি উৎকট হলাহলে দেশের বিশাল জনসমুদ্রকে জর্জরিত করিয়া তুলিতেছি—প্রকৃতির গভীর ও সত্য শিক্ষাটুকু এখনও আমাদের আরত হইয়া উঠিল না—এই ভিক্ষা ও ক্রন্দনের, রোষ ও প্রতিবাদের ব্যর্থ আফালনের পাগ্লা এখনও শেষ হইল না—এখনও আশার কুহক-কলার মুগ্ধ নেতৃবৃন্দ ভাবিতেছেন—আবার একবার বিপুল আন্দোলনে স্বদেশ বিদেশ, ভারত ও বিলাত ঘুরিত করিতে পারিলে হয়তো আমরা দেব উপর কিছু কৃপাবৃষ্টি হইলেও হইতে পারে—হায় কুহকিনী কল্পনার স্বপ্ন!

ভারতের জাতীয়জীবনবীণায় এই যে বেসুরা রাগিনী চারিদিকে
 ঝাজিতেছে, জাতীয় জাগরণের প্রথম ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত হইতে আজ পর্যন্ত এই
 যে যখনই বিপুল সঙ্গীতভান তুলিবার উদ্যোগ করিয়াছি, তখনই জন্ম
 দিয়া বসিয়াছি এমন গীতচ্ছন্দকে যাহা শুদ্ধ মঙ্গল সুরলয়যুক্ত হইয়া থাকত হইয়া
 আদৌ উঠে নাই—কেবল অনবরত সপ্তসুরের পিণ্ডই পাকাইয়া তুলিয়াছি
 ইহার কারণ কি? আমরা আমাদের পরিপূর্ণ জীবনসঙ্গীতটুকুর সত্য
 রহস্য অবগত হইবার জন্য এতটুকু পরিশ্রম করিতে চাহি না—আপন
 আপন আদর্শ কল্পনার আবেশে এমনই স্বপ্নমুগ্ধ আমাদের চেতনা, যে
 সেরদিকে আমাদের চক্ষু ফিরাইয়া ধরিবার প্রয়োজনও আমরা অনুভব
 করিতে পারি না—আমরা বুঝি শুধু বুদ্ধির সঙ্গে বুদ্ধির সংঘর্ষে উৎপন্ন
 ছকাছকির (plan and scheme) সৌখীন খেলা—আমরা বুঝি শুধু
 agitation ও resolution—বক্তৃতার অগ্নিশাব ও সঙ্কল্পের রাগীকৃত
 বার্থত্বপূর্ণ; আমরা বুঝি শুধু মতামতের নিকীচন, যুক্তিবিচার অনুমান ও
 সিদ্ধান্তের কচকচানি, তোতার বুলি ও নেতৃত্বের বড়াই—বড় জোর আমরা
 বুঝিতে পারি ও ধরিতে পারি দেশের জন্য আত্মত্যাগ, লক্ষপতির হুই
 এক মুদ্রার বিনিয়োগ, নাম সহি করিয়া দগবুদ্ধি, আর প্রতিজ্ঞা এবং
 প্রতিজ্ঞা। আমাদের জদয় নাই এমন কথা বলি না—কিন্তু আমাদের
 বুদ্ধিপ্রতিভা কোন রাক্ষণীর অভির্শাপে একেবারেই আত্মহারা আত্ম-
 প্রতিষ্ঠাবিহীন—তাই ক্রোধের উপর কল্পনার রঙ্গীন আকাশকুসুম
 রচনায় আমাদের এতটুকুও সন্কোচ নাই—জাতীয় জীবন প্রতি-
 ঠানের মূল সন্ধান না জানিয়া না পাইয়াই আমরা চাই বিশ্বজগতের সকল
 জাতির সমকক্ষ হইয়া সমান অধিকারের রূপালক অবদান—আর মুখের
 ও লেখার জোরেই আমরা সেই যোগ্যতার প্রমাণ প্রদর্শন করিতে
 পারিলে বাঁচিয়া যাই। ইংরেজ আমাদের জাতীয় চরিত্রের এই সাংঘাতিক
 দুর্কলতার সন্ধান ভালরূপেই বুঝে ও জানে—তাই ইন্দুরকে লইয়া বিভাল
 যেমন স্বচ্ছন্দে কোতুকজীড়া করে, এখানে ওখানে হুই একজন জবর-
 দস্ত শাসনকর্তার কথা ছাড়িয়া দিলে, সাধারণ ইংরেজ জাতি এমনই
 কোতুকপূর্ণ রূপানেজেই আমাদের হোমরাচোমরা নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সখের
 রাজীয়খেলা খেলিয়া আসিতেছেন। হায়, জগতের হাটে আমাদের যোগ্য-

তার কি অপূর্ণ পথরা মাথায় করিয়াই আজ আমরা উন্নীত।

গান্ধী আজ রাউলট আইনের প্রতিবাদ করিতে সমগ্র জাতিকে আহ্বান করিয়া দাঁড়াইয়াছেন—দিল্লী, লাহোর, অমৃতসর, আমেদাবাদের রক্ত-কাণ্ডের ফলে সে অভিযান স্থগিত রাখিয়া আজ দেখিতেছি তিনি মিশ্র অমিশ্র স্বদেশীভূতে দেশের ছাপ্পান লক্ষ সাধুসন্ন্যাসীকে দীক্ষিত করিবার করুণা লইয়াই পড়িয়াছেন—স্বদেশীয়জ্ঞের অপরিহার্য প্রয়োজন বুঝিলেও, বঙ্গসঙ্ঘটে বিপর্যস্ত দেশের নরনারীকে সহস্র উৎপন্ন বঙ্গ পরিধান করিতে পরামর্শ দেওয়া অপরিহার্য হইলেও—এই আত্মনির্ভরতার মহাব্যঙ্গ সম্পন্ন করিবার মত একহৃদয় কর্মীর দল কোথায়? মহাত্মাগান্ধী নিজে বিবেকবান উৎকৃষ্ট আত্মসাধক—কিন্তু দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা বাধাহীন নিষ্কণ্টক আন্দোলনের তরঙ্গে আকর্ষ ডুবিলেও আবার মুহূর্ত পরেই বেথানকার সেখানে ভাসিয়া উঠিলে—যে বঙ্গদ্রুত চরিত্র গড়িয়া উঠিলে জাতির সমষ্টিবদ্ধ আত্মনির্ভরতা অসিদ্ধ হইবে, যে তপঃশক্তির উদ্বোধন ঘটাইতে পারিলে ভারতের স্থায়ী অটুট নিবিড় সমষ্টিজীবন গড়িয়া উঠিলে—সে গভীর নিগূঢ় অব্যর্থ ভারতীয় সমষ্টিসাধনার মূল উৎসের সন্ধান দেশ না জানিলে মর্মে মর্মে তাহা আকড়িয়া না ধরিলে—শুধু উপরিভাসমান কতিপয় বিচ্ছিন্ন কুস্ময়ুজ পাইয়া কখনও সে আপন জীবনপথ পূর্ণবিকশিত করিয়া তুলিতে পারিবে? না। কুস্মপুঞ্জ তো জীবনসমুদ্রের উচ্ছ্বসিত উপরের ফেণা মাত্র—ভারতের সমষ্টিবদ্ধ জাতীয়জীবনের সনাতনধারা আরও গভীরতর লোকে প্রবেশ করিয়া ধরিতে ছুইতে হইবে—সে নিরিডতর দীক্ষামন্ত্রে অভিষিক্ত হইবার জন্য অধ্যাত্ম তপস্তার নির্দেশ বিপুল ভারতের বিস্তীর্ণ তপঃক্ষেত্রে এই জাতি কয়জনের নিকট হইতে পাইতেছে।

তপঃ তপঃ তপঃ—এই তপস্তা এমন সহস্রময় কিছু নয়—ইহা মিলনের জন্ত তপস্তা, ইহা ঐক্যের জন্ত তপস্তা, ইহা আত্মার সঙ্গে আত্মার নিবিড় অচ্ছেদ্য সঙ্গীভমর সামঞ্জস্যের (harmony) জন্ত তপস্তা—বাঙ্গালীর জীবন-গঙ্গার তলে তলে ফন্তুপ্রোভের মত আজ এই তপঃপ্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে। মিলন তো সমাজ নয়, সমিতি নয়, সম্প্রদায় নয়, মিলন তো

স্বাক্ষরপত্রে নাম সহি করিয়া দলে ভর্তি হওয়া নয়, কোনও বিশিষ্ট আদর্শ ভাব (principle), বা কর্মকল্পনাসূত্রে একত্র সহযোগ ঘটাইয়া দল গঠন করিলেই তো মিলনসংঘ গড়িয়া উঠে না। অর্থের, আদর্শের, প্রাণের, মনের—এই সব তরল তরঙ্গবিক্ষোভের উপর মিলনের দেবমন্দির নির্মাণ করা যায় না। সে তো সমস্বার্থের জন্ত, সম আদর্শের জন্ত মানুষের সঙ্গে মানুষের সহযোগিতা মাত্র (co-operation), সে তো শুধু কঙ্কালসার কর্মসমবায় মাত্র, সে তো নামের জন্ত, বড় বড় বাসনাবিশেষের জন্য হৃদয় লইয়া সখের কারবার মাত্র—এক আঘাতে, এক ঝটিকায় তাহা কোথায় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া উড়িয়া যাইবে। এ সখের শিউজলীড়ায় আজও যাহারা তৃপ্তি পায়, তাহারা তাহাই করুক—প্রকৃত স্বদেশপ্রেমকে মূর্তিদান করিয়া ভারতশক্তিকে বিগ্রহবান্ করিয়া তুলিতে যাহারা দেব প্রেরণা পাইয়াছেন, তাহাদিগকে অবিচল শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা ও ধৈর্য্য মাত্র সঞ্চল লইয়া স্বর্গের তুরীয় সাধনা ধুজ্জটীর মত মাথায় বহিয়া আনিয়া জাতির জীবনে ছড়াইয়া দিতে হইবে। কর্মের জন্ত ধর্ম নয়, কর্মের জন্ত জীবন নয়—ধর্ম ও যোগই ভারতের মূল সঞ্চল—সেই চির সনাতন ধর্মশক্তি, সেই অপ্রান্ত অধ্যাত্ম যোগপথ অবলম্বন করিয়া ভারতের বিপুল জাতীয় জীবন পুনর্গঠিত করিয়া তুলিতে হইবে। তাই এই দেবজাতির আজ সর্বপ্রধান কাব্য—প্রাণের, মনের, প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়সংজ্ঞার অতীত হইয়া অতীন্দ্রিয় আত্মার অধ্যাত্ম স্পর্শ দিয়া মহাশক্তিময় অমর মিলনসংঘটিকে গড়িয়া তুলিবার নিগূঢ় প্রণালী-টুকু আয়ত্ত অধিগত করা—মানুষের সঙ্গে মানুষ মিলিবে আত্মবিধৃত মহাসত্তার অমোঘ আকর্ষণে—সেই মহামিলনের অমুস্তময় আনন্দরস দিয়াই আমরা অভিনব জাতীয় কর্মজীবন বিকশিত করিয়া তুলিব।

জীবন-সমস্যা

মহাত্মা গান্ধীও যখন ভারতের পঞ্চাশ লক্ষ সন্ন্যাসীকে গিরিগহ্বর ও গভীর অরণ্য হইতে টানিয়া, তাঁতে বসাইয়া দিতে চাহেন, তখন বুঝিতে হইবে, ব্যক্তিজীবনের মুক্তি বা মোক্ষের যুগ ইহা নহে, জাতিগত সাধনার সাড়া চারিদিক হইতে শুনা যাইতেছে। সভ্যই ত—বাহার উপর দাঁড়াইয়া সাধন ভজন করিব, তাহা যদি বাতাসের ভরে ভাসিয়া যায়, তবে কোন মূৰ্খ আজ হরিনামের তরী ঘাটে ঘাটে ফিরাইয়া ধর্মপ্রচারে সাহসী হইবে? জীবন থাকিলে ত ধর্ম, ব্রত, পূজা, ভগবান্।

আজ জীবন নাই টানাটানি আরম্ভ হইয়াছে, বাঁচিবার উপায় সর্বপ্রায়ে নির্ধারণ করিতে হইবে, দেশের অন্নভাব ও বস্ত্রভাব দূর করাই এক্ষণে সর্বোত্তম ধর্ম। মর্ত্য-সম্পদে আজও উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে, আগামী পঞ্চাশ বৎসরও লাগিবে না, দক্ষিণ আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের মত ভারতের অরণ্য পর্বতে ভূত প্রেতের মত আমাদেরকে উলঙ্গ হইয়া ভ্রমণ করিতে হইবে, ভারতের বুদ্ধ শঙ্কর চৈতন্যের নাম যত জোর করিয়াই উচ্চারণ করি না কেন আমাদের রক্ষার উপায় কেহই করিয়া দিবে না।

এই আত্মরক্ষার ভাবটী দেশে দিন দিন জাগিয়া উঠিতেছে, শরীর ও প্রাণের ইহাই যে বিশেষ ধর্ম। কিন্তু এই শরীর ও প্রাণের জাগরণ ভারতে বহুবুগ সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই, তাহার প্রধান কারণ, ভারতবর্ষ অধ্যাত্মজীবনের উপরই সমধিক জোর দিয়া চলে—শরীর প্রাণকে ততটুকু খাদ্য দেয়, যতটুকু দিলে সে কোন গতিকে টিকিয়া থাকিতে পারে, এবং তাহা হইলেই ধর্মজীবনধারণের কোনই ব্যাঘাত হয় না। কিন্তু শত শত বর্ষ, শরীর ও প্রাণের উপর চড়িয়া ভারতের অধ্যাত্মবাদ রাজত্ব করিয়া আসিয়াছে, কোন দিনই সে লক্ষ্য করে নাই, যে অপ্রচুর আহারে তাহার বাহনটী দিন দিন রুগ্ন ও জীর্ণ হইয়া পড়িতেছে—প্রতি মুহূর্ত্তেই আরোহীকে ভূমে নিক্ষেপ করিবার সম্ভাবনা। বস্তুতঃ প্রাণের অমরত্বে ভারতবর্ষ যদি বিশ্বাসবান্ না হইত তাহা হইলে এতদিন ভাষন্ত-বাসীর নাম ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইত মনেই নাই, যুগ যুগ ধরিয়া

প্রাণকে নিপীড়ন করিয়া ভারতে ধর্মপ্রচার হইয়া আসিতেছে, আজ তাহার ভীষণ প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইবে বলিয়াই মনে হয়, তাহা না হইলে অরণ্যগুহাবাসী সাধু সন্ন্যাসী মোহান্তগণের উপর বিজাতীয় বিদ্বেষের আভাষ দেখিতে হইবে কেন? চিরদিনই ত উহারা মানবসমাজের অঙ্গ হইতে পুরুভূজের মত রক্ত শোষণ করিয়া আশ্রয়লাভ করিয়া আসিয়াছে, আজ কেন জাতির এই বিদ্বেষহলাহল উহাদিগকেই সর্বপ্রথমে গ্রাস করিবার জন্ত উদ্বল তরঙ্গ তুলিয়া ধাবমান!

ব্যষ্টিজীবনের যে সিদ্ধি—তাহা জাতির জীবনে সঞ্চারণ করিয়া দিবার জন্ত। জাতি যে ব্যষ্টির পূজা করে, তাহা ব্যষ্টিকে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত করিয়া তুলিবার জন্ত নয়, আবার উহাকে আপনা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া শৃঙ্খল পরিণত করাও তাহার উদ্দেশ্য নয়, সমষ্টিজীবনের যে লক্ষ্য সেই লক্ষ্যে উপনীত হইবার যে সাধনা, ব্যষ্টিজীবনের মধ্য দিয়া উহাকে বাহিয়া আনিয়া জাতির জীবনে ছড়াইয়া দেওয়াই তাহার আসল উদ্দেশ্য। আজ পর্য্যন্ত জাতির এই মহাসাধনা ব্যর্থ হইয়াছে, মূলে এক গলদ থাকিয়া গিয়াছে, যাহার জন্ত ইচ্ছা করিয়াও কেহই জাতিগত সাধনার উৎকৃষ্ট পন্থাটি আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।

কিন্তু শরীর এবং প্রাণের উপর গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে বলিয়াই যে ভারতের অধ্যাত্মবাদের উপর বীতশ্রদ্ধ হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। অধ্যাত্মবাদও যেমন শরীর ও প্রাণের প্রতি উদাসীন থাকায় আজ হত্যারের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এই অধ্যাত্মবাদের উপর অশ্রদ্ধা করিয়া শরীর ও প্রাণের অভাব পূরণ করিয়া চলিলে, বরং ধর্মসাধনার ফলে আজ আমরা মাত্র শক্তিহীন দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি—এরূপ করিলে পশুর অধম হইয়া যাইব।

সমস্যা এইখানেই। দেশ আজ উঠিয়া পড়িয়া কেবলই যদি অর্থসংস্থানে স্নানোযোগী হয়, তাহা ত কোন কালেই সিদ্ধ হইবে না, উপরন্তু ভারতের জাতীয় জীবন আরও খিটুড়ি হইয়া যাইবে, আবার যেভাবে ধর্মসাধনা চলিয়া আসিতেছে, এইটির উপরেই অধিক জোর দিয়া চলিলে, তাহার ফলও যে ভাল হইবে না—তাহা আমাদের বর্তমান অবস্থা দেখিয়া অনায়াসেই নির্দ্ধারণ করা যায়।

পাশ্চাত্যশিক্ষামুরাগী একদল লোক দেশে দেখা দিয়াছেন, তাঁহারা বলেন ধর্মস্থান হইতে ভগবানকে টানিয়া আনিবার অর্থ কি? আশ্রয়লাভ জন্ত,

আত্মতৃপ্তির জন্য মানুষকে অল্পের মত পৃথিবী লুণ্ঠন করিতে দাও, তার অবাধ গতির পথে ভগবানের ঘাঁধা নিক্ষেপ করিও না। দেশের নীতি-রক্ষার উপায়ও ইহারা স্থির করিয়াছেন, আপনার স্বার্থ দেখিয়া চলিতে শিখিলে অপরের স্বার্থে যা দেওয়া চলে না, কেননা আবাতের আবার প্রতিঘাত আছে। ইহারা বলেন মানুষের সমস্যা তার জীবনকাল পর্যন্ত, জন্মকাল-হইতে অবস্থানুগামী সকলেই সমান স্বত্ব-দ্রুতের অধিকারী, অতএব স্বত্ব হুটি হইয়াছে কেবল অসার ভাবকৃত্য। জরনা করনা ছাড়িয়া আত্মভোগ আহরণ করা।

কিন্তু কোন্ কৰ্ম করিলে স্ব-স্বার্থ সিদ্ধি হয়—ইহাই ত সমস্যা। পরকে আঘাত করিলে নিজেকে ইহার প্রতিঘাত পাইতে হইবে ইহাও কি চিন্তা নয়, এই চিন্তাসূত্রে ক্রমশঃই জীবনপ্রবাহ কি পরের স্বত্ব-দ্রুতের গুণী দেখিয়া বহিবে না, কে জানে ক্রমে সারা জীবন হয়ত পরের জন্যই হইয়া উঠিবে, তখন হয়ত ইহাদিগকে বলিতে শুনিব আমার জীবন একান্তই আমার জন্য নয়, এই পরিবার, এই জাতি, সমগ্র মানব-সমষ্টির জন্য।

তারপর ভগবানের কথা। জন্মকৃত ব্যক্তি ও সবল স্বত্বজনের স্বত্ব-দ্রুত তুলনার সমান-তর্কযুক্ত একুণ প্রমাণ হইলেও আত্মস্বার্থের সাধনার আপনাকে যখন চিনিলে তখন পরের সহিত তোমার অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ দেখিয়া তুমি আশ্চর্য হইয়া যাইবে, মনের-গতি ত রুদ্ধ হইবে না—সে সেই অচ্ছেদ্য হ্রদ ধরিয়া অমর সন্তার সন্ধান পাইবেই, ভগবানকে তুমি স্বীকার কর আর না কর, ইহাতে তাঁহার কিছু আসে যায় না, আপনাকে বুঝিয়া জানিয়া চলিতে শিখিলেই সব দিক রক্ষা হইবে।

ভগবানকে আমরা যে-মানিয়া চলি, ইহা আমাদের জন্মগত সংস্কার মাত্র। অবশ্যই এই সংস্কার থাকার তাঁহার উপর অন্যায়সেই আমাদের অহুরাগের উদয় হয়, তবুও যতদিন না তাঁহাকে বুঝি, জানি ও পাই, ততদিন তাঁর থাকা না থাকা তুল্যকথা। শাস্ত্রে বলিয়াছে—“আত্মানং সত্যং ব্রহ্ম” —তাঁহার মূল কারণ এই, আপনাকে জানিলেই আরও কিছু জানা যায়, আপনাকে প্রকৃষ্টরূপে না জানিয়া ভগবানের থাকা না থাকার প্রকৃতমাধান-প্রয়াস বাতুলতা মাত্র।

একুণে কথা হইতেছে, জাতিগত এই দীক্ষণ বুদ্ধিশার প্রতীকার করিতে

হইবে, স্ব-স্বার্থ সংসাধনপ্রয়াসী অতি বড় স্বার্থপর ব্যক্তিও ইহা স্বীকার করিবেন। কোন্ দিক দিয়া কার্য আরম্ভ করিলে আমাদের শৌচনীয় দুরবস্থার অবসান ঘটে তাহাই এক্ষণে চিন্তনীয়।

ভগবানকে লাভ করিতে গিয়া, আমরা আপনাকে অবজ্ঞা করিয়াছিলাম, এক্ষণে এই আপনাকে পাইতে হইবে, কিন্তু এই আপনাকে পাওয়া অর্থে, আজিকার যে দুর্গতি তাহার আশু প্রতীকার নয়, এই কথাটা মনে রাখিয়া আমাদের কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে।

আপনি বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার প্রত্যেক স্তরটা জানা ও বুঝা, পাওয়ার প্রথম মন্ত্র। কিন্তু এই জানা ও বুঝার জন্য পুণির সাহায্য লইবার প্রয়োজন নাই, অধুনা সকলেই বুদ্ধিমান, বাহির হইতে আরোপিত জ্ঞান পাছে মানুষকে আচ্ছন্ন করে এইজন্য সকলেই সতর্ক, কিন্তু জ্ঞানী জগৎ হইতে যে সকল ঘটনা আমাদের জীবন দিয়া বহিয়া চলিয়াছে তাহার প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শন বিজ্ঞতা নহে, মূর্থতার পরিচয়।

আমরা যখন শরীরের যৎসামান্য রসদ যোগাইয়া—ভূরীয় জীবনের সন্ধানে ব্যাপ্ত ছিলাম, তখন একদল মানুষ আমাদের বাহনটার ঘাড়ে জোয়াল চাপাইয়া দিল, বলীবর্দের মত দোটানায় পড়িয়া বেচার। যখন একান্তই নাস্তানাবুদ হইয়া পড়িল—তখন আমরা বুঝিলাম আমরা একেবারেই শূন্যে ঝুলিতেছি, বাহনটা মুমূর্ষু এবং তাহার ঘাড়ে চড়িয়া বীর-পুরুষের দল “বীরভোগ্যা বসুন্ধরা” বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে, একেবারেই নিরুপায়, এই অবস্থায় হয় শূন্যেই আমাদের ঝুলিতে হইবে, না হয়, আমাদের প্রতিষ্ঠানক্ষেত্রটিকে আমাদের করিয়া এমন বড় ভুল আর যাহাতে না ঘটে তাহার জন্য সাবধান হইতে হইবে।

আজ আমাদের ঠিক এই অবস্থা। আপনাকে ফিরিয়া পাইবার জন্য আমরা উদগ্রীব হইয়াছি—কিন্তু এমন পথ পাইতেছি না—যে পথ ধরিয়া চলিলে কার্যসিদ্ধি হইবে।

আমরা তুলার চাষ করিবার কথা বলিতেছি, কাপড় বুনিবার বস্ত্র-বস্ত্র করিতেছি, চাষবাসের ব্যবস্থা, যৌথ কারবার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার দিকে মনোযোগী হইয়াছি, এগুলি সবই প্রতীকারের ছায়া, এইগুলিকে পাইলে স্নেহের মত আবার ইহা শেষ হইয়া যাইবে—আজ হাজার বৎসর আমরা স্বপ্নমাজের মানুষ হইয়াই আছি, বাস্তবজীবনলাভের যে সাধনা তাহা

আমরা অবলম্বন করিতেছি না।

যুরোপ শরীর ও প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে—মনের বলকে, এই মানসবলের ইন্জেক্সনে তাদের শরীর ও প্রাণ এত বলশালী, জগতে আজ তারা অপরাভ্যন্তর, আর আমরা এই শরীর ও প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছি তুরীয় জীবনকে, কাজেই স্থলজীবন দিন দিন নির্বাহের পথেই দৌড়াইয়াছে। অবস্থা যুরোপের অপেক্ষা আমাদের যে অধিক সাংখ্যিক এমন নহে, আমরা এই ধর্মের ইন্জেক্সনে যতদিন বাঁচিয়াছি, যুরোপ মনের ইন্জেক্সনে কিছু ততকাল বাঁচিবে না—ইহা অবধারিত, কিন্তু মানবজীবনের চরম উৎকর্ষলাভের পক্ষে উভয় বিধিই অসম্পূর্ণ।

আমাদের এই দারুণ দুর্বৃত্ত্যের প্রতীকারনির্ঘর বাহিরের কর্মসূচি করিয়া সংস্কৃত হইবে না, এই আভ্যন্তরিক সাধনার সাহায্যেই সম্ভবপর হইবে, দেশে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মহামারীতে মরিতেছে, লজ্জায় ঘৃণায় অপমানে আত্মহত্যা করিতেছে। দেশের শোচনীয় অবস্থার কথা স্মরণ করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে, কিন্তু শরীরের যে অংশ পচিয়া গিয়াছে তাহাকে খসিয়া পড়িতে দাও, অতি ব্যাকুল হইও না, যদি ভিতরে সঞ্জীবনী-ধারা প্রবাহিত হয়, আবার আমরা নবজীবন লাভ করিব।

আমরা ধর্মকেই বড় করিয়া ধরিয়াছিলাম—কিন্তু এই ধর্ম দিয়া মনকে ভরাইয়া, জীবনকে যে গড়িয়া তুলিতে হইবে এই কথাটা একেবারেই তুলিয়া গিয়াছিলাম, ধর্মের ঝোঁকে পড়িয়া, মনকে ডিঙ্গাইয়া একেবারে শরীর প্রাণের সঙ্গে একটা আপোষ করিয়া ভাবিয়াছিলাম এইবার আমাদের মোক্ষ লাভ হইবে। প্রথম প্রথম উপরের অনির্বচনীয় প্রভাবে শরীর প্রাণ নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রে তুষ্ট হইলেও গদ্যবর্তী উপেক্ষিত মন দিন দিন সঙ্কীর্ণ ও জটিল হইয়া উঠিল, যে শ্রোতটুকু প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাইয়া রাখিত তাহাও দিন-দিন রুদ্ধ হইয়া পড়িল, বাস—তারঙ্গর একেবারেই সব শুক, কঠোর, সব ছাঁড়াছাড়ি, প্রকৃতির অন্ধ পরিচালনায় আমাদের জীবন আজ বিপ্লবপূর্ণ, উপরের যোগশক্তির সাহায্যেই, মনের এবং প্রাণের সঙ্গে তুরীয়ের যোগসাধন করিতে হইবে, তবেই আমাদের জীবন দৈবী সামঞ্জস্যে পূর্ণ হইয়া এক অভিনব দিব্যরাজ্যের উপাদানস্বরূপ হইবে। দেশ আজই মরিয়া যায় বলিয়া যে কলরব উঠিয়াছে এ হাহাকারের যথেষ্ট মূল্য থাকিলেও দেশ মরিবে না, এবং আত্মপ্রতিকারের

হুলত উপায়গুলি অবলম্বন করিলে, চিরদিনই হাহাকার শ্রুতিতে হইবে; —আমরা যে সাধনা আরম্ভ করিয়াছি, উহা কোন মতেই নিশ্চেষ্টতার সাধনা নয়, জড়ত্বের সাধনা নয়, উহা শক্তির সাধনা—সিদ্ধি না পাওয়া পর্য্যন্ত হে সাধক! বিলম্বচিন্ত হইও না—তোমার ভিতর হইতে যতটুকু শক্তি ও সিদ্ধি পাইবে, দেখিবে বাহিরে ততটুকুই পরিবর্তন দেখা দিয়াছে—ভিতর হইতে পূর্ণ শক্তি ও সিদ্ধি লাভ কর; বহির্জগতে পূর্ণ দিব্যরাজ্য গড়িয়া উঠিবে।

বর্ষার প্রলাপ

আজ শিখীর মহা আনন্দ। জলদারিত গগন, শীতপ্রকম্পিত পবন, আর মাঝে মাঝে অশনির তড়িতফুরিত মহাগভীর স্বনন। শিখী আজ শিখা বিস্তার করিয়া শিখিনীর অম্লসন্ধানে নৃত্য করিতে করিতে বাহির হইয়াছে। আজ যে বর্ষা সমাগত, তাই শিখি শিখিনীর মহা উৎসব।

বর্ষা সমাগত, তাই আকাশের সে নীলিমা নাই। মেঘমালা সে নীলিমা আবৃত করিয়াছে। সলিল-ভারাবনত মেঘমালা; কোথাও কৃষ্ণ, কোথাও পাটল, কোথাও ধূসর; কোথাও চূর্ণ, কোথাও পুঞ্জীকৃত, কোথাও নিবিড়; কোথাও স্থির, কোথাও চঞ্চল; কিন্তু সে নীলিমা আর নাই। যে নীলিমা অনন্তের সমুদ্রে দাঁড় করাইয়া দেয়, যে নীলিমার দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে নয়ন গলিয়া জল হইয়া যায়, যে নীলিমা অনন্তকে সন্দেশে জড়াইয়া অমাদিকাল হইতে অনন্ত পথ জুড়িয়া চাহিয়া আছে, সে নীলিমা আর নাই। যে নীলিমা গভীর, যে নীলিমা উদাত্ত, যে নীলিমা এক মহাগভীর অথচ মৌন ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত প্রকম্পিত সে নীলিমা আজ মেঘমালা আবৃত করিয়া ধরিত্রীর দৃষ্টি হইতে গুপ্ত রাখিয়াছে। আজ আর বিহঙ্গ বৃক্ষে বৃক্ষে ডাকিয়া বেড়ায় না। তাহাদের এ ঘোর হৃদয়ে তাহারা বৃক্ষপত্রান্তরালে আশ্রয় লইয়াছে। ভ্রমর আর ফুলের পরাগ মাগিয়া ফুলে ফুলে মধু আহরণে ব্যস্ত নয়। বায়ু বহিতেছে। কিন্তু তাহা মলয় পবন নহে। তাহা শীতসলিলসম্প্রসৃত ধীর ধীর শিহ

রিত পূর্বপ্রবাহিত বাতাস। কারণ আজ বর্ষা সময়গত। একুতি
আজ বর্ষার সেবিকা।

এ যোর দুদিনে, এ নিদারুণ বর্ষার বড়ই সাধ হয় আপনার সুখ
দুঃখের কথা কহি। কিন্তু আমার সুখ দুঃখের কথা কে শুনিবে ?
আমি, সিদ্ধবক্ষের একটি বারিবিন্দু—আমার এ তুচ্ছ জীবনের সুখ
দুঃখের কাহিনী কে শুনিতে চাহিবে ? কিন্তু না—আমার জীবন কি
তুচ্ছ ? ঐ যে ক্ষুদ্র পীপিলিকার দুই মুহূর্তের জীবন—উহা তুচ্ছ ?
না। উহার ঐ ক্ষুদ্র জীবনকে তুচ্ছ বলিবার অধিকার তোমার
নাই। উহার ঐ জীবন স্বল্পকালস্থায়ী বিচিত্রঘটনাপরিবর্জিত বটে
কিন্তু তাহা তুচ্ছ নহে। আমার এই জীবন ক্ষুদ্র হইতে পারে, কৌতু-
হলোদ্দীপক না হইতে পারে; বহুল বিচিত্র ঘটনাপরম্পরায় গ্রথিত না
হইতে পারে, আমার এই স্বল্পকালস্থায়ী জীবন মহৎব্যাপক না হইতে
পারে, জগতের কোন উপকারে না আসিতে পারে—কিন্তু তাহা তুচ্ছ
নহে। সমুদ্রের এক একটা বারি বিন্দু নগন্য—কিন্তু সেই এক একটা বারি-
বিন্দু না থাকিলে সিদ্ধুর অস্তিত্ব কোথায় থাকিত ?

না, আমার এ জীবন তুচ্ছ নয়। এ জীবনও কি ভগবানের দান
নহে ? এ জন্মে কি ভগবান বাস করিতেছেন না ? তাঁহারই জন্য
রচিত এ হৃদয়মন্দির কি তাঁহারই পাদম্পর্শে প্রতিমুহূর্তে ধন্য হইতেছে
না, কৃতার্থ হইতেছে না ? সুখ দুঃখের মার দিয়া, মঙ্গল অমঙ্গলের ভিতর
দিয়া, পাপ পুণ্যের মধ্য দিয়া এ জীবনও কি তাঁহারই দিকে ধাবিত
হইতেছে না ? হ্যাঁ, হইতেছে বই কি। তবে আর এ জীবন তুচ্ছ
কেন ? না, এ জীবন তুচ্ছ নয়। কাহারও জীবন তুচ্ছ নয়। যতই নীচ
যতই অপদার্থ যতই হেয় হউক না কেন ভগবানের মঙ্গলম্পর্শ সেখানে
রহিয়াছে, তাই কাহারও জীবন তুচ্ছ নয়। তুচ্ছ না হউক তথাপি আমার সুখ
দুঃখের কাহিনী কে শুনিবে ? সবারই সুখ দুঃখের কাহিনী আছে, সবাই
আপন আপন সুখ দুঃখ লইয়া বিব্রত, সবাই আপন আপন সুখ দুঃখের
কাহিনী কহিতে ভালবাসে, তবে আমার সুখ দুঃখের কাহিনী শুনিবে কে ?
সকলেই বক্তা, তবে শ্রোতা কে ? আর আমার দুঃখের কাহিনী কে
শুনিতে চাহিবে ? সুখের কাহিনী বরং কেহ কেহ শুনিতে পারে, কিন্তু
দুঃখের কাহিনী কে শুনিতে ভালবাসে ? কেমন কে শুনিতে চায় ?

তোমার স্রুথের দিনের হাতে অনেকে যোগ দিবে, কিন্তু তোমার হ্রঃথের দিনের ক্রন্দনে কে আঁখিজল মিলাইবে? কে তাহার স্রুথকোমল স্বদয়ের মধুময় সহাস্রভূতির প্রলেপ দিয়া তোমার হ্রঃথক্লিষ্ট ব্যথিত হৃদয়খানিকে আবৃত করিয়া দিবে? তোমার স্রুথের অংশ অনেকে গইতে পারে কিন্তু তোমার হ্রঃথ কে হ্রঃথ মানিবে? তবে আর কাহিনী কহিব না, হ্রঃথেরও না স্রুথেরও না। হ্রঃথ ছাড়া স্রুথ কি? হ্রঃথ আছে বলিয়া স্রুথের মর্যাদা, নইলে স্রুথ কি? সেই হ্রঃথকে বাদ দিয়া স্রুথের দিনের কাহিনী আমি কহিব না। তবে করিব কি? আমার শ্রোতার প্রয়োজন নাই। আমি আপনার শ্রোতা হইব। আমি আমার স্রুথ হ্রঃথের গীত গাহিব। একাকীই গাহিব। নিজেই গাহিব, নিজেই শুনিব। নিজেই গায়ক, নিজেই রসগ্রাহক, নিজেই শ্রোতা নিজেই ভোক্তা।

আমি গাহিব, কিন্তু গাহিব কি? আমার স্রুথ হ্রঃথের কাহিনী? কিন্তু গীত ত বাঁধিতে জানিনা। তাহা ত কোন দিন শিখি নাই। স্বদয়ের ভাব গভীর, ভাষা ত তাহার তল পায় না—প্রাণের আকাঙ্ক্ষা অনন্ত, কথা ত তাহার পরিমাণ করিতে পারে না—তবে করিব কি? গীত গাহিব, কিন্তু গীত বাঁধিতে জানি না। তবে বাঁধা গীতই গাহিব। কি গাহিব?—গাহিব কি—

“স্রুথের লাগিয়ে এ ঘর বাঁধিছ আঙুনে পুড়িয়ে গেল।

অমিয় সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল।

না।

“স্রুথের লাগিয়ে এ ঘর বাঁধিছ—” এ সংসারে আসিয়া ত কোন ঘরই বাঁধি নাই—তবে আঙুনে পুড়িবে কি? তবে “স্রুথের লাগিয়ে এ ঘর বাঁধিছ আঙুনে পুড়িয়ে গেল” এ গীত গাহিব কেন? এ সংসারে আসিয়া হ্রঃথেরই হউক বা স্রুথেরই হউক কোন দিনই কোন ঘর বাঁধি নাই। ঐ অনন্ত কোটি কোটি হৃদয় চক্রে তারকা উদ্দীপিত নভোমণ্ডল, এই বিশাল বিস্তৃত কোটি কোটি নরনারীর আবাসস্থল পৃথিবী, ঐ সহস্র সহস্র যোজনবিস্তৃত জলধি—এই আমার ঘর তবে আর অন্য ঘর বাঁধিব কেন? এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে একখানি ক্ষুদ্র কুটীর বাঁধিয়া তাহাতে আবদ্ধ হইব কেন? তাই ঘর বাঁধি নাই। মধুর সমীরণে মুক্ত আকাশ-তলে শয়ন করিতে পাইলে রুদ্ধ অঙ্গকার ওহাঃ প্রবেশ করিব কেন?

ভাই ঘর বাধি নাই। এই পৃথিবী হইতে চন্দ্র, চন্দ্র হইতে সূর্য্য, সূর্য্য হইতে গ্রহ, উপগ্রহ তারকা ইত্যাদিতে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইব—তাই ঘর বাধি নাই। ঘর যদি বাধিব, তবে প্রাকৃতিক-কুসুম-শোভিত ফুল উদ্যানে বাতাসের সহিত মাতামাতি করিবে কে? তবে কোমুদী-কর-বাপ্ত বামিনীতে গগন-বিহারী বিহঙ্গের ন্যায় আনন্দোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গীত গাহিবে কে? তবে মধু সমীরণে দোহন্যমানা বসন্তলতিকার পেলব ভ্রমর প্রকম্পন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবে কে? ঘরিতীর শ্রামল শম্পাচ্ছাদিত বক্ষে আনন্দের নৃত্য করিয়া ছুটিয়া বেড়াইবে কে? তাই ঘর বাধি নাই। তবে আর “সুখের লাগিয়ে এ ঘর বাধিঁলু—” গীত গাহিব কেন? গাহিব না। তবে ঘর বাধিতাম, যদি সেই ঘর আমাকে না বাধিত। সেই ভয়—কি জানি যদি ঘর আমার মন বাধিয়া ফেলে। ঘর বাধিতে গিয়া যদি দেখি—

“গড়া যখন শেষ হয়েছে কঠিন স্কন্ধটোর

দেখি আমার বন্দী করে আমারই এই ডোর”

সেই ভয়। ক্ষুদ্রের সহিত বৃহত্তর বিনিময় করিব? মুক্ত আকাশি হইতে রুদ্ধ কুটার প্রের হইবে কেন? অকূল জলধিতে যে ভাসিয়া বেড়াইতে চাহে ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীতে সে ভেলা ভাসাইবে কেন? মুক্তি অপেক্ষা ভুক্তি প্রের হইবে কেন? তাই আমার ঘর বাধাও হয় নাই।

তবে ঘর কি বাধিব না? ঘর-বাধার সুখ পাইতে হইলে ঘর বাধিতে হইবে বই কি। তবে বাধিব একদিন। বাধিব সেই দিন, যেদিন নয়ন হইতে কৃষ্ণ ঘবনিকাখানি খসিয়া পড়িবে—যেদিন আঁধারি ফুটিয়া আলো বাহির হইবে। সেদিন ঘরে বসিয়াও মুক্ত আকাশ দেখিতে পাইব। সেদিন পিঞ্জরে স্বর্ণশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়াও গগন-বিহারী বিহঙ্গের ন্যায় আনন্দোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গীত গাহিতে শিখিব। সেদিন আর ভুক্তি আসিয়া মুক্তিকে বন্ধন করিবে না; অমঙ্গল ও অশান্তি হাত ধরাধরি করিয়া আমার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইবে না; সেদিন প্রের ও প্রের আর অমিত রহিবে না। সেদিন বৃক্ষে বৃক্ষে সমীরণহিল্লোনে নব কিশলয় বিকশিত হইয়া চিরবসন্তের সৃষ্টি করিবে, বিহঙ্গকণ্ঠের কাকলীতে বনভূমি প্রতিধ্বনিত হইবে, মঞ্জু কুঞ্জ অলিকুলের গুঞ্জনধ্বনিতে মুধরিত হইবে। সেদিন শশানে ফুল ফুটিবে, মরুভূমে মন্দাকিনী প্রবাহিত হইবে।

সেদিন টান উঠিবে, পাখী গাহিবে, দিক হাসিবে। আর আমার এই
রুদ্ধ হৃদয় তাহার অর্গলিত কবচ ভাঙিয়া দিয়া সমস্ত বিশ্বকে আলিঙ্গন
করিবার জন্য উন্মুক্ত হইবে।

“অমিয় সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল”

অমিয় সাগরে স্নান করিব কি, অমিয় সাগর এ পর্যন্ত খুঁজিয়া পাই-
লাম না। যখন জীবনের পূর্বাংশে কেবল উষার ক্ষীণ মিথ রেখা
প্রথম ফুটিয়া উঠিয়াছিল—তখনও হৃদয়কুঞ্জ পক্ষীকাকলীতে কুজিত হইয়া
উঠে নাই, জীবন-উদ্যানে সমীরণহিলোলে প্রসুত ফুলটী ছলিয়া যায়
নাই, প্রাণের বীণায় সেই গোপন রাগিণীটি বাজিয়া হৃদয় আকুল করিয়া
তোলে নাই, সেই তখন অমিয়সাগরের সন্ধানে বাহির হইয়াছিলাম—আর
আজ কত দিন কত মাস কত বর্ষ কাটিয়া গেল, হৃদয়কুঞ্জে বিহঙ্গমকুল
ডাকিয়া ডাকিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল, জীবন-উদ্যানের ফুলটী রবির উত্তাপে
স্নান হইবার উপক্রম হইল; প্রাণের বীণাটি গাহিয়া গাহিয়া ঘুমাইয়া গেল,
কিন্তু সে অমিয় সাগরের সহিত সাক্ষাৎ হইল না। পথে কত সাগর
মিলিয়া গেল—সুখের সাগর, দুঃখের সাগর, রসের সাগর, রক্তের সাগর
—কিন্তু সে অমিয়সাগরটি মিলিল না। কতবার মনে করিলাম অমিয়
সাগর পাইয়াছি, কিন্তু হায় জ্বলন্ত পরে বুঝিলাম তাহা মিথ্যা। তাহার
অমিয়সাগরের মতো তৃপ্তি দিবার ক্ষমতা আছে বটে কিন্তু সে ছ পঁচ
দিনের জন্য মাত্র। তারপর সে সাগরের জল বিস্মাদ অথবা স্বাদহীন।
তাহাতে সে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র কই? সে আজীবন হৃদয়ভরা আনন্দ
দিবার ক্ষমতা কই? সে শুক লতিকাকে মুঞ্জরিত করিবার শক্তি কই?
যে সাগরের এক বিন্দু জলস্পর্শে সমস্ত জীবন অমৃতময় হইয়া উঠিবে,
জীবনের প্রত্যেক নিমেষটি পরিপূর্ণরূপে দেখা দিবে, প্রাণের প্রত্যেক
স্বরটি আনন্দের বাধারে বদ্ধ হইবে—সে সাগরটি আজও মিলিল না;
তবে আর তাহাতে স্নান করিবার অবসর পাইলাম কবে? তবে আর
“অমিয় সাগরে সিনান করিতে—” এ গীত কেন?

কিন্তু যে দিন সে সাগর মিলিবে সেদিন কি তাহাতে অবগাহন
জরলময় হইয়া উঠিবে? না। কেমন করিয়া কহিব সেদিন কি হইবে।
কেমন করিয়া প্রকাশ করিব। সে যে ভাবের অতীত, মনের অগম্য,
বুদ্ধির অগোচর! কেমন করিয়া কহিব? সেদিন বুঝি সমস্ত জগতে একটা

আনন্দের খেলা বসিয়া যাইবে। সেদিন বুঝি চন্দ্র সূর্য্য হাসিতে হাসিতে উদয় হইবে, হাসিতে হাসিতে কিরণ দিবে, হাসিতে হাসিতে অস্ত যাইবে। সেদিন নক্ষত্ররাশি হাসিতে হাসিতে আকাশে ফুটিবে, জলদমালা হাসিতে হাসিতে নীলাধরে ছুটিবে, সমুদ্রবারি হাসিতে হাসিতে উথলিয়া উঠিবে। সেদিন বুঝি মনে হইবে একটা বিহঙ্গম হইয়া ঐ অসীম অনন্ত নীলাতপে উড়িয়া যাই না কেন, একটা ক্ষুদ্র পক্ষী হইয়া আপনার ক্ষুদ্র কণ্ঠ অনন্তের গীতিতে ঢালিয়া দিই না কেন! সেদিন মনে হইবে অশরীরী হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক অণুটির সহিত মিশিয়া যাই। মনে হইবে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারকা বৃক্ষ লতা পশু পক্ষী নরনারী প্রত্যেককে ডাকিয়া আমার হৃদয়ে স্থান দেই। সেদিন জগতে দেখিব আমি আর আমাতে দেখিব জগৎ। সেদিন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে আলিঙ্গন করিয়া সবা-ইকে ডাকিব—

“এস এস বঁধু এস—!”

গান

হৃদয়াগরের ওপার থেকে, কাহার পরশ ভেসে আসে!

কাহার মধুর বাণীর সুরে, পরাণ জাগে নুতন আশে!

হৃদয় ছিল আধার ভরা,

পরাণ নদী পথ হারা,

কোন্ গগনের আলো এসে

ভাসায় জীবন উল্লাসে!

আয়রে নামি স্বরা করি,

গান গেয়ে তুই ভাসা তরী,

হৃদয় পরাণ মেশামিশি কাহার পুলক উচ্ছ্বাসে!

পরাণ বেয়ে ছুটুক তরী,

হৃদয়াগরে লাগাও পাড়ি—

অহুরাগের মাতল হাওয়ার

পাল ভুলে দাঁও বিধাসে।

পাগালের চিঠি

ভায়া! আমার লেখা চেয়ে পাঠিয়েছ। বেশের চারিদিকেই যখন হাহাকার, অন্নকষ্ট বজ্রাতাব মহামারীর কথা নিয়ে বাংলার সকল শিক্ষিত ব্যক্তিই যখন অগ্নাধিক ব্যথিত, তখন আমার ঝাপছাড়া একতারার গান ভাল শোনাবে না। যে পাথর বুক চেপে বসে গেছে, চীৎকার করে' তো কথা বলতে পারব না, একি কম পরিতাপের কথা! মর্মব্যথা বিনিম্বে বিনিম্বে চিরদিনই যে আমরা গেয়ে এসেছি, আজ সে পথ বন্ধ, ভগবান কোন নূতন পথে বাঙ্গালীকে চালিয়ে নেবেন কে জানে?

যে একতারটা নিয়ে আমি পথে পথে গেয়ে বেড়াতাম, ঝটকা বাতাসে তার তারটা ছিঁড়ে গেছে, বিনা সুরে সাদা গলা কেউ শুনতে চায় না, তাই নীরব হয়েই ছিলুম, তোমরা দেখছি নাছোরবন্দা।

কি বলি বল ত? কোন দিকেই ত গরম কিছু দেখতে পাই না, যুদ্ধ সেও জুড়িয়ে আসছে, কাবুলী লড়াই তেমন যুগসই হ'ল না, তারপর অন্তরীণের কথা, পাঞ্জাবের কথা, রবীন্দ্র শঙ্করণ-নায়ায়ের কথা, রিফম বিলের কথা, হুর্ভিক্ষ বঙ্গদলট মহামারী এ সবই আছে, কিন্তু ভাঙ্গা-হাট, কোন দিকেই জমজমা নাই। সম্ভ্রতি দেশে কয়েকটা বড় বড় বাণিজ্য-কেন্দ্রের সংস্থাপন হচ্ছে, বঙ্গদলী কটনমিলের এই ছয় মাসে মাত্র ৪৫ হাজার টাকা উপায় হয়েছে—শুনে আমাদের আঁকল শুভুম হয়ে গেছে, বাঙ্গালী ছ'সিয়ার হলে কি হয়, এক হাতটানেই সব মাটি করে' দিয়েছে। বরং রাজনীতিক চর্চায় তার থাকা-ভাল, কাঁচা পয়সার জায়গায় থাকলে এই মন্দ স্বভাবটি কোন কালেই শোধাবে না।

একটি বড় কথা আছে। দেশপূজ্য আন্তবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার হয়ে, মন্দলোকে তার যত নিদ্রাই করুক, তিনি যে দেশের উন্নতি সাধন করেছেন সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই, আজ হঠাৎ এই হুর্ভিক্ষের দিনে পরীক্ষার টাকা এমন অসম্ভবভাবে বাড়িয়ে দিলেন কেন, তা বুঝতে পারলেম না। সহরের ছেলেদের অবস্থা হয়ত ভাল, কিন্তু তিনি কি মফঃস্বলের জ্বাংগণের অবস্থার কথা অবদিত, হুর্ভাগ্য যখন আসে তখন সবদিকেই

তার বিভীষিকা দেখা দেয়, তা না হ'লে বঙ্গের মুসলমান আশুতোষ দেশের বুকে এমন বজ্র নিক্ষেপ করবেন কেমন?

তারপর মহাত্মা গান্ধীর কথা। পাকপাকি ভাবেই ইনি কাজ করতে চান, কিন্তু বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো। গান্ধীর ব্রত গ্রহণ করাও যেমন সহজ সরল, আবার ত্যাগ করাও তেমনি সুবিধার। স্বারকাদাস যমুনালাল ব্রত গ্রহণ করলেন আবার ছাড়লেন, পাঞ্জাবের স্বামী শ্রদ্ধানন্দ গান্ধীর সত্যগ্রহ নাকচ করেছেন, গান্ধী কিন্তু জানেন যা কিছু করতে হবে সবচেয়েই প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর চাই, আজ তিনি স্বদেশীব্রত নিয়ে বেরিয়েছেন, একধার থেকে সহি আরম্ভ হয়েছে, মিশ্র অমিশ্রমত্রে দীক্ষা চলছে। বাঙ্গালী এসব অনেক করেছে, কালীঘাটে মা কালীর সামনে দাঁড়িয়ে স্বদেশীযজ্ঞের প্রধান পুরোহিত সুরেন্দ্রনাথ পাঁচ দশ হাজার বাঙ্গালীকে স্বদেশীমত্রে দীক্ষিত করেছিলেন, সেদিন একজন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল যিনি এখনও বিদেশী তিনি ব্যবহার করেন না, কিন্তু লেডিকেনী অভ্যাংকুষ্ঠ হওয়ার গৃহস্থায়ী একান্ত অনুরোধে গোটাকতক গ্রহণ করলেন, শ্রীকৃষ্ণও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি অস্ত্রধারণ করবেন না, তারপর রথের চাকা তুলে প্রহারোদ্যত হয়েছিলেন, অবশু রথের চাকা অস্ত্রবিশেষ নাও হতে পারে। যাই হোক, বাঙ্গালী এ-তদ্ব হাড়ে হাড়ে বুকেছে, বিপ্লববাদের ভিতরও এইরূপ প্রতিজ্ঞা ছিল, হয় রে, মানুষ যে একটা সজীব পদার্থ, তার বুদ্ধি আছে গতি আছে, তাকে কি কথার বাঁধনে জড়িয়ে রাখা যায়?

যার হাতে খাই নি সে বড় রাধুণী। সারা দেশ দেখে এসুম, নদের তুল্য জায়গা কোথাও নাই। ওরে আমার সোণার বাংলা, তোর কোলে যে শান্তি, যে প্রেম, যে আনন্দ, তা আর কোথাও মিলবে না, তোর মাটির অগুণরমাগতে যে ধর্ম, যে সাধনা, যে শক্তি, তোর রাস্তায়ে যে স্নেহ, যে শ্রীতি, যে অনুরাগ, তা বুঝি আর কোথাও পাওয়া যায় না। ভায়া! তোমরা খবরের কাগজে বড় বড় অক্ষরে দেশের বড় বড় কাজের কথা পড়ে আপনহারা হয়ে না, জাগিয়ে তোল তোমাদের মধ্যে সেই অমর সত্যটিকে, কারূ পানে চেয়ে আশায় উৎক্ল হওয়া না, নিজের উপর অগাধ বিশ্বাস যাতে হয় তার সাধনা কর, জীবন-তরী নিজেই চালাতে হবে, সর্বান্তর্য়ামী স্বরীকেশ তোমার অন্তরে বিরাজ করছেন।

গানের যন্ত্রটি ভেঙ্গে গেছে, কাজেই আমার গান বন্ধ, মনের হৃৎক্ষে
বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছি, দোষের মধ্যে ঐ এক দোষ, যে,
আপনার উপর কারু শ্রদ্ধা নই বিশ্বাস নাই, তা কে জানে শিক্ষিত
আর কে জানে নিরক্ষর। হৃষ্টবুদ্ধি অকর্ম্মার দল, নিজের নিজের বুদ্ধি
অনুসারে, এই অন্ধ জাতিটির আত্মবিশ্বাসের দরজাগুলো এমন ক'সে এঁটে
দিচ্ছে যেন সহজে সেগুলো আর খোলা না যায়। এ যে নিজের পায়েই
নিজের কুঠারাবাত, এ তারা বুঝছে না।

ভায়া! এই সাবেক ভক্তিসাধনার সর্কার খালটাকে বুজিয়ে দিতে
পার, অনেক ভক্তের অঙ্গসংস্থান মাটি হবে, তা হোক, নিজের উপর
মানুষ ভক্তি কর্ত্তে শিখুক, এমন আত্মলাঞ্ছনা আর সহ্য করা যায় না।
মানুষ জাম্বুক, আপনাকে চিম্বুক, আপনার দিব্যদৃষ্টি দিয়ে মানুষকে দেখতে
শিখুক, মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্বন্ধ যে মিলন তা অটুট হোক,
শক্তিমান হোক, সত্য হোক।

ভায়া! মানুষকে ভালবাসতে হ'লে, যে কি হতে হয় তা জানি, সে
যে একবারেই আপনাকে ভেঙ্গে ফেলা, আপনার বোল আনা রেখে
দলে দলে এক হয়ে যাওয়া অভিনয় বলেই মনে হয়,

“পিরীতি লাগিয়া, আপনা ভুলিয়া, পরেতে মিশিতে পারে,

পরকে আপন করিতে পারিলে পিরীতি মিলয়ে তারে।

আমি এই প্রেমের ভিখারী হয়ে' ঘুরে বেড়াচ্ছি, মাকে কেবলই বলছি
“দে মা আমার পাগল করে”—পাগল না হ'লে আপনাকে বুঝি কি
করে', পাগল না হ'লে তোমার ভালবাসি কেমন করে', তোমার বুকে মাথা
রেখে আপনাকে হারিয়ে ফেলবো কেমন করে', বুকের মধ্যে তোমার জন্ম
যে হত্যাশন ধু ধু করে জ্বলছে, সর্বাগ্রে তাহাতে আমার সর্ব্বের পুড়িয়ে
ছাই করে' ফেলতে হবে, যদি সত্যি তোমায় পেতে চাই, তবে আপনাকে
রাখা আর চলে না, তবুও যদি থাকি সে তোমার দয়া, তোমার দান,
যখন ফিরে চাইবে তখন নিঃশেষ হয়ে, তোমার বুকের মাঝে মিলিয়ে
যাব।

চেপটা করে' যখন হ'ল না, সন্ধ্যা আত্মিক আসন প্রাণারামে বুক যখন
ভরে' উঠলো না, তখন চোক চেরে দেখলুম, সে কি রূপ, কি কক্ষণ-
নত মঙ্গলদৃষ্টি, কি অগাধিষ আনন্দসৌরভ, সে-বে আমার সবখালি

ভগিয়ে দিলে, সে যে আমার এক মুহূর্তে পাগল করে' তুললো! তার পর আরো আরো, আমি যে শুধু ইন্দ্রিয় দেহ বুদ্ধি রক্ত মাংস নই, তোমার প্রশ্নে আমার নতুন দৃষ্টি ফুটে উঠলো, আরও আরও, আমি যে অসীম, তুমিও যে অসীমের দেবতা—আজও বুক ভেঙ্গে তোমার জায়গা করে নিচ্ছ—“জনম অবধি হাম রূপ নিরখিছ নয়ন না তিরপিষ্ঠ ভেল”। চোখের দৃষ্টি আজও সেইরূপ দ্রুত দৌড়েছে, আজও তোমার ডাক কানের জিতর দিয়া মরম বিদ্ধ করছে, কিছুতেই অবসাদ নাই, অভিশ্রু নাই, তোমায় যত দেখি; দেখবার সাধ আরও বেড়ে যায়; তোমার কথা যত শুনি, শোনবার সাধ আরও প্রবল হয়, তোমায় যত পাই, আরও পেতে চাই, কেবল আরও, আরও, আরও—কোথাও তোমার সীমা নাই, শেষ নাই, ছেদ নাই, তোমার রূপ অসীম, তোমার মনেরও অন্ত নাই, তুমি আমার ছোট কর নাই, হীন কর নাই, দুর্বল কর নাই, ছুটিয়ে ছুটিয়ে হাসিয়ে কাঁদিয়ে নাচিয়ে খেলিয়ে দিন দিন বৃহৎ করে' তুলছ, শক্তিমান করে' তুলছ, আনন্দময় করে' তুলছ—তোমায় নমস্কার।

আমায় লোকে পাগল বলে, আমায় লোকে মূর্থ বলে, আমায় লোকে অপদার্থ বলে, আমি যে সাধন ভজন করি না, আমি যে খাদ্যা-খাদ্যের বিচার করি না—আমি ত সব করতুম, পূজা হোম জপ তপ ইবিষায় ভোজন, শাস্ত্রের প্রতি বর্ণ মেনে চলতুম, তখন আমার ধার্মিক বলে' সবাই খাতির করতো, অল্প বয়সে ধর্ম্য মতি দেখে সবাই আমায় দেবতার মত বিশ্বাস করতো, আজ হাসি পায়, কি গরলভরা হৃদয় নিয়েই তখন মানুষের শ্রদ্ধা কুড়ুতুম, অপ্রাশংসা হবে বলে চোরের মত রূপের সেবা করতুম, ভীকু কাপুরুষের মত গোপনে গোপনে প্রেমের যাচিঞা করে' বেড়াতুম, মানুষ আমায় আজ অবজ্ঞা করুক, আমার প্রতি আমার বিশ্বাস শ্রদ্ধা হয়েছে—আমি আজ সব ছেড়ে দিয়ে বলতে শিখেছি—যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি”। এখন আমি আর ভীকু নই, কাপুরুষ নই, আমি স্পষ্টাঙ্গাঙ্গি ভাগবতপ্রেমের ভিখারী।

আর আমার মঙ্গলপে চিত্ত স্থির হয় না, বিধি নিষেধের আবর্তে মনের কালি ধুয়ে যায় না, শাস্ত্রের সাধন ভজনে আর আমার আনন্দ নেই, আমার আনন্দ হয় শুধু খেলার, আমি যে খেলার বজ্র দিবানিশি খেলতে চাই, একদণ্ড বসে থাকতে পারি না, ঐ দেখ দৃষ্টি দৌড়েছে

কত দূর দূরান্তের অনন্ত নীলিমায়, ঐ শ্রবণ উৎকর্ণ হয়ে শুনছে কে
আমায় ডাকে—এস এস—প্রাণবঁধুয়া, তোমায় বুকে করি, এস পাতের
এঁটো তোমার মুখে তুলে দিই, এস ছুঁলে দৌড়ে যাই ঐ শ্রামল
পল্লবদলপরিণোদিত বটবৃক্ষমূলে, এস হরিৎ শস্যক্ষেত্রে ছুটোছুটি করি,
এস ঝাঁপিয়ে পড়ি উঁচল তরঙ্গসঙ্কুল নদীবক্ষে, সাতরে পার হই, এক-
বার দুইবার, কেবলই পারাপার—শ্রান্ত হয়েছ, তবে দাঁড়াও কাদা ছোঁড়া-
ছুঁড়ি করি—লেগেছে, তা লাগুক, আঘাতে আঘাতে একটু রুধির বরষক,
চল অশ্রান্ত অবিরাম খেলি, গলা ছেঁড়ে গান গাই, বাংলার গগন পবন
আনন্দ উচ্ছ্বাসে ভরে যাক, ধরিত্রীর বুকের শ্রগানচিহ্ন মুছে যাক—আনন্দে
ইর্ষ্যে উৎসাহে ধরণী সজীব সন্তানের কলহাস্তে উৎফুল্লা হোক।

বাংলায় এই সাধনা প্রবর্তন করতে এসেছি, বাঙ্গালী তোমরা আমায়
খেলতে নেবে, খেলার ছলেই অসীম সাগরবক্ষে অর্ণবধান ভাসাব, মজা-
হাজা প্রাচীন নদী তড়াগের বুকে প্রফুল্ল কমল ফুটিয়ে তুলবো, তীরে তীরে
ক্ষেত গোলা গজ বসাব, হে বাঙ্গালী! আমায় তোমরা খেলতে নেবে?

কে আমায় খেলতে নেবে, কে আমার খেলার সাথী হবে, ওগো
কে এমন আপনভোলা সোণার গোপালি আছ, আমার খেলার সাথী
হবে? নেই কি? কোটি কণ্ঠে ও কাদের সম্মতি আমার কাণে এসে বাজছে,
ওধু ডাক দিয়ে ভাই ফিরে যাব না, ওধু সাড়া পেয়ে ভাই ঘরে যাব
না, আজ তোমাদের হাতে আমার অমর প্রাণ সঁপে দিয়ে তোমাদের
অন্তরে অন্তরে মিশে যাব, আমার বড় সাধের খেলা আবার আমি জন্মকে
তুলবো—চোক চেয়ে থাকলে যদি আসতে লজ্জা করে, এই চোক বুজে
হাত বাড়িয়ে রইলুম—দেখি কতদিনে তোমাদের ছোঁরা পাই।

প্রবর্তক—৪র্থ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা

১৫ই আষাঢ়, ১৩২৬

সন্ধি

মহাসংগ্রামের শেষ অঙ্ক দেখিবার জন্য জগৎবাসী উদ্যত হইয়াছিল; ঘটনার পর ঘটনার তরঙ্গে এই ভীষণ অভিনয়ের চরম অঙ্কপাত সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহান হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে ঘোরতর গুলট পালিটের ভিতর দিয়া জয়গজাতির নবগঠিত মজীসমাজ ২৮এ জুন তারিখে, ক্রান্তের ভারসিলিস্ সহরের শান্তিসভায়, জগতের সম্মুখে মিত্রশত্রুর অভিমত সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া দিয়াছেন—বৃক্তরাষ্ট্রপতি উইলসন সাহেব যুদ্ধান্তে যে নবযুগের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহা এই সন্ধিদ্বারা সত্য হইয়া উঠিল না; স্বপ্নই রহিয়া গেল, অদূর ভবিষ্যতে আবার যে ভীষণ সময়ানল প্রজ্জ্বলিত হইবে, ইহা যেন তাহারই সূত্রপাত।

সন্ধি-সংবাদে সমগ্র জগৎ আর আনন্দে উৎফুল্ল হইলেও, জগতের বুকে যে বেদনার বোঝা পুঞ্জীভূত হইয়া রহিল; তাহার ভারে ধরিত্রী আবার একদিন শিহরিয়া উঠিবেন। সমগ্র যুরোপ, বাহিরের ঐশ্বর্য্যসম্পদে এতদিন বিভোর থাকিয়া, অন্তরগত দারুণ বৈষম্যের দিকে উদাসীন ছিল; আজ এই জীবনযজ্ঞের প্রবল ছতাসনে বাহ্যভবের স্বর্ণপ্রাসাদ ধূলিশায়ী হওয়ার অন্তরপ্রদেশের দিকে তাহাদের একটু লক্ষ্য পড়িয়াছে বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু স্বার্থশক্তিদের লেলিহান রসনা পরস্পরের হৃদয়রক্ত পান করিয়া তুষ্ট হইবার জন্য যে সেধায় লক্ লক্ করিতেছে—প্রেম কৈ, ঐক্য কৈ—যে আদর্শের আবর্তনে সমগ্রজগতের প্রাণ একই তীর্থে সমবেত হইয়া আত্মবলির স্রোত প্রস্রবত হইয়াছিল, খেত, কৃষ, পীত বিবিধ বর্ণের মানুষগুলি অকাতরে বৃক্ষের রক্ত দিয়া যে দেবমন্দির নিৰ্ম্মাণের আশা করিয়াছিল, যে উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্য সহস্র বৎসরের পদদলিত ভীষ ভারতবাসীও স্বয়ংলাসে সমরপ্রাঙ্গণে আপনাকে বলি দিতে ছুটিয়াছিল, তাহার কতটুকু সফল হইল? যতই সকল মানুষই বিশ্ববিক্ষারিতচক্ষে অনন্ত আকাশপানে চাহিয়া আজ জিজ্ঞাসা করিতেছে—বিশ্বের কি পরিবর্তন হইল? জাপান

চীৎকার করিয়া বলিতেছে, বর্ণবৈষম্য দূর হইল কি? আমেরিকা বঙ্ক-
কঠোর-কঠে স্বীয় নেতা উইলসন মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, উদ্দেশ্য
সফল হইল কি? ইটালির মন্ত্রীসমাজ পুনঃ পুনঃ পরিবর্তনের ভিতর দিয়া
এই একই বার্তা ঘোষণা করিতেছে।

আর ভারতবর্ষ! পঞ্চনদের বীরবৃন্দ এখনও ইংলণ্ডের গৌরবরক্ষায়
সগর্বে জগতের ভিন্ন ভিন্ন রণক্ষেত্রে অটল পদে দাঁড়াইয়া, আর হায়—
পাঞ্জাবের হৃদশাকাহিনী, সে আর বলিবার নহে, এ যেন বিধাতার কঠোর
বিজ্ঞপ, নিজের হাতে নিজের মুখে মসী লেপিয়া জগতের হাটে সঙ্-
সাজার অভিনয়!

ভারতের যে অসীম দুঃখ, তাহার জন্ত চিন্তা নাই—ভারতবর্ষ তুরীয়
জগতের, স্বথ দুঃখের অতীত, মরণ তাদের অমৃত, এ দেশ “মার গায়
আর হরি বলে” এমনই এদের প্রেম। কাজেই ভারতের কথা কেহই
কর্ণগোচর করিতে চায় না। কিন্তু যুরোপের সমস্যা দিন দিন গুরুতর
হইয়া উঠিতেছে, ভগবান, অদৃষ্ট, কৰ্মফল, এসব বাজে কথার তোয়াক্কা
তাহারা রাখে না, ওপারের কথা শুনাইলে ইহার স্থির হইয়া শুনে,
তারপর অতি ধীরভাবে প্রশ্ন করে, তোমাদের তেত্রিশকোটি নরনারীর
মধ্যে এই অদ্ভুত জীবন কয়জন পাইয়াছেন, তাহার উত্তরে যখন শোনে
বিশ পঁচিশজন, তখন দুইবার হিশ্ হিশ্ করিয়া বলিয়া উঠে “তোমরা
ত আচ্ছা পূর্ণল, এই বিশ পঁচিশজনের খেয়ালে তেত্রিশ কোটি নরনারী
পেটে খেতে পাও না, পরিণামে বজ্র পাও না, আর না থাইরা মর!”
তারপর পকেট হইতে টাকার থলি বাহির করিয়া বলে “এই দেখ ধর্ম,
ভগবান, ইহকাল পরকাল, ইহারই বলে তোমাদের মত অনন্তকোটি মানু-
ষের মাথায় পা দিয়া চলিব, তোমাদের ধর্ম করাই ভাল, ইহাতে আমা-
দের সুবিধা বৈ অসুবিধা নাই।”

এই জাতির প্রাণে আজ একটা গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে, ইহাদের
মন আজ নতুন কিছু র জন্ম উদ্ভাদ হইয়া উঠিয়াছে, এই যুদ্ধের চরম
শিক্ষায় ইহার সুবিধা আছে, প্রাণের উপরেও যে কল্পময় ভগৎ আছে,
সেটা একান্তই প্রাণের সেবার জন্ম নয়, তার আছে একটা উর্দ্ধগতি—
চরম পরিণতি। যুদ্ধান্তে এইরূপ নতুন উপাদানেই নিজেদের রাষ্ট্র সমাজ
প্রকৃতি গড়িয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল, সমষ্টিকীবনে আজ যেটা

স্বপ্নের ছায়ায় আচ্ছন্ন ব্যষ্টিজীবনের উৎকট দ্বার্ব্য তাহা ধ্বংস করিয়া দিতে চায়, কিন্তু ছায়া হইলেও উহার পশ্চাতে একটা কিছু সত্য আছে, যুরোপের জনসংঘ সেই নূতন পথের যাত্রী হইতে চায়, কাজেই সকল দেশে আমরা দেখিতে পাই গভর্নমেন্টের সহিত প্রজাশক্তির বিরোধ চলিতেছে। যুরোপের মনীষীবৃন্দ এই সমস্যা যে দিন দিন গুরুতর হইয়া উঠিবে তাহা ভালরূপেই জানেন, এবং উপযুক্ত চালে চলিতে পারিলে এই সমস্যা যে অনন্তকাল ঠেলিয়া ঠেলিয়া চলা যাইতে পারিবে, এ বিষয়েও তাঁহারা নিঃসন্দেহ—এইজন্যই জর্জনজাতির ভিতর যত গোলমালই থাকুক, সন্ধিপত্রে যতশীঘ্র সম্ভব স্বাক্ষর হয়, তাহার জন্য মিত্রশক্তি ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে ইহা সংসিদ্ধ হইয়াছে, অতঃপর যে বিলাস ভোগের হলাহলে যুরোপ এতকাল বিভোর ছিল, তাহার আয়োজন অল্পাংশই হইবে যুরোপের সর্বপ্রথম কর্ম, ইহারই মধ্যে আমেরিকা কাঁচামাল সরবরাহ করিবার কথাবার্তা কহিতেছেন, যুরোপের রাষ্ট্রকর্তৃপক্ষগুলিকে জনসংঘের এই নবজাগরণ রুদ্ধ করিতে হইলে অচিরে সারা বিশ্ব কর্ষণ করিয়া ভোগ-সামগ্রী আহরণ করিতে হইবে। সমগ্র যুরোপে আজ যে নূতন শক্তির নড়াচড়া দেখা যাইতেছে, ইংলণ্ডে তাহার লক্ষণ ততটা প্রকট নহে, তাহার প্রধান কারণ, ইংলণ্ডের প্রাণশক্তি সমান ভাবেই আহুতি পাইয়া আসিতেছে, উহারি দুর্জয় বহুশিখা কোন দিনই ভোগ ছাড়াইয়া উপরের সন্ধান যাহাতে না পায়, স্বয়ং বিধাতা তাহার আয়োজন করিতেছেন, ইংলণ্ডের কামধেনুগুলি বাঁচিয়া থাকিতে ইংরাজজাতির নূতন চিন্তার অবসর আসিবে না।

অভিশপ্ত ভারতবর্ষ! তোমাদের আজ স্থান কোথায়? শান্তিসভায় ভারতের প্রতিনিধি রিকানিয়ার মহারাজ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন, আর লর্ড সিংহ বিলাতের মন্ত্রীসভায় তোমাদের নূতন অধিকারের বন্দোবস্ত করিতেছেন, ইহাই কি তোমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়? তোমাদের আছে কি? প্রাণ মন বুদ্ধি সমস্তই ত তুমসাচ্ছন্ন, অন্ধকার পথে অন্ধের মত পরামুগ্ধে জীবনধারণই তোমাদের একমাত্র উপায়—কিছু প্রচুর ভিক্ষা সংগ্রহ হইলেও, এক্ষণে কিছুদিন কাটিয়া যাইবে, ঝুলি খালি হইলে আবার চীৎকার—ভিক্ষা! ভিক্ষা!! ভিক্ষা!!!

আর কি কোন উপায় নাই? বাঙ্গালীর শিরোমণি কবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন “পারা মারে তাদের চেয়ে আমরা যখন বড় হ’তে পারবো

তখন আমাদের মার খাওয়া ধরা হবে। সেই বড় হবার পথ না লড়াই করা, না দরখাস্ত লেখা।

বড় হবার পথটা সাধনা। হে বাঙ্গালী, তোমাদের সেই সাধনার পথটাই দেখাইতে চাই এবং সেই একমাত্র পথই পথ, দ্বিতীয় পথ আর নাই বলিলেই চলে, সেকথা আজও কি তোমাদের স্মরণ-দিন আসে নাই ?

কঃ পন্থাঃ ?

বাংলার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আজ ঋবনক্ষত্রের মত অচপল অন্তর্দৃষ্টির আলোকে এই নিরুপায় জাতিকে যে পথে অভিযান করতে আহ্বান করেছেন—সে পথ ক্ষুরধারসদৃশ নিশিত এলং দুর্গম। “আমাদের জন্তে কেবল একটা বড় পথ আছে, সে হচ্ছে দুঃখের উপরে যাবার পথ।” ইউক্লিড গইন বঙ্কর—বাঙ্গালীকে এই পথই অনুসরণ করে চলতে হবে—দুঃখের কঠোর দীক্ষায় অভিযুক্ত হয়ে তাকে ভগবানের আলীষধারা মাথা পেতে গ্রহণ করতে হবে—ভিক্ষা আর কান্না নয়; দুঃখ-কণ্টকিত আত্মসাধনার পথ অবলম্বনই আমাদের পক্ষে একমাত্র উৎকৃষ্ট উপায়। “আমাদের একথা মনে রাখতে হবে বাইরে বাধা বিষয় বিরুদ্ধতা চিরদিনই থাকবে, থাকলে ভাল বই মন্দ নয়—কিন্তু অন্তরে বাধা থাকলেই বাইরের বাধা ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। এইজন্তে ভিক্ষার দিকে না তাকিয়ে সাধনার দিকে তাকাতে হবে, তাতে অপমানও যাবে, ফলও পাবে।” নুতন জাতির জীবনে জাতীয় মহাকাবির এই জলন্ত বাণী বেদমন্ত্রের মত সার্থক ইউক্লিড—দুঃখের উপরে যাবার সাধনপথই আমাদের অমৃতত্বের একমাত্র পথ—সোহৃমৃত্যুর কল্পতে।

আমাদের এত দুঃখ কেন—কবি স্পষ্টভাষায় তারও কারণ নির্দেশ করেছেন—“নিজেকে আমরা নিজে ছোট করে রাখব, আর অত্রে আমাদের বড় অধিকার দিয়ে প্রশ্রয় দেবে এই অভিশাপ বিধাতা আমাদের দেবেন না বলেই আমাদের এত দুঃখের পর দুঃখ।” দেশের রাজনীতি-ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত যারা আশাপূর্ণনত্রে উপর হাতে রূপাবৃষ্টির প্রতীক্ষায়

কালের ঢেউ গণনা করে এসেছেন, তাঁরাও আজকাল হতাশহৃদয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে বলতে আরম্ভ করেছেন—হায়, আমাদের আশা পূর্ণ হবার আর সম্ভাবনা নাই—যুদ্ধের সময়ে যখন জয়লক্ষী কোন পক্ষের গলার জয়-মালা তুলে দেবেন তার কোনও নিশ্চয়তা ছিল না, তখন বরং যাদের একটু আধটু মুক্তহস্তে ভিক্ষাদানের উদ্যোগ দেখা গিয়েছিল, আজ যুদ্ধান্তে নিশ্চিত হয়ে তাঁরা সেটুকু মুষ্টিভিক্ষা দিতেও কুণ্ঠাবোধ করছেন—এ অবস্থার আমাদের দুর্গতিমোচনের আর আশা কোথায়। শুধু আজ নয়, এমন গভীর নৈরাশ্য অনেকবার আমাদের নেতৃবৃন্দের হৃদয় অন্ধকারে ঢেকে দিয়ে গিয়েছে—আমরা আশাহতচিত্তে কত তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে আমাদের রাষ্ট্র-ক্ষেত্র আবহমান কাল ধরে ভরিয়ে এসেছি—রূপণের কুঞ্চিত হস্তকে লক্ষ্য করে কত না তিক্ত গালি বর্ষণ করেছি—তবু যে দুঃখ আমাদের ঘুচে নাই, দুর্গতির শেষ হয় নাই, তিক্ষালব্ধ বড় অধিকার পেয়ে আমাদের সকল কান্নার অবসান হয় নাই—এইটুকুই আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলে মনে নিতে হবে। ভগবান যে এই শত অভিশপ্ত জাতির প্রতি এখনও একেবারে বিমুখ হন নাই—তার সবার চেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, তিনি আমাদের আত্মলাঞ্ছনার লজ্জা থেকে এত সহজে নিকৃতি দেন নাই।

আমরা দুর্বল অক্ষম পরাধীন প্রজার জাতি—আমাদের জীবন-সমস্যা যে বড় গুরুতর হবে—সে সন্দেহ আর কথা কি আছে? এই গুরু সমস্যার যে কোনও সহজ মীমাংসা নাই ইহাও আশ্চর্য নয়। যত বড় নুতন শাসনসংস্কারই আমাদের ভাগ্যে মিলুক না কেন, আমাদের শাসন-যন্ত্রের শতচ্ছিন্ন ফাঁকের উপর যত তালিই জোড়া লাগুক, ব্যবস্থাপক সভার যত পরিবর্তনই ঘটুক, যতগুলি শাসনবিভাগই আমাদের হস্তগত হউক—মণ্টেশ্বর কথামত যারা স্বর্গচ্যুত ফলের প্রত্যাশায় আলাদীনের মত অধঃস্বপ্নের খেলায় বিভোর আছেন, তাঁদের বুঝা উচিত ছিল এত অল্পে এত সহজে জাতির ভাগ্যপরিবর্তন হয় না। “সাধ কখনও মেটে না ভাই—সাধে পড়ুক বাজ”—ইতিহাসকে যারা সত্যভাবে পড়েছেন, তাঁরা বেশ জানেন, যে যেজাতি মনুষ্যচ্যুত হয়ে একবার পড়েছে, তাকে কত মূল্য দিয়ে সেই নষ্ট সম্পদ পুনরুজ্জীবন করতে হয়েছে। মানবচরিত্র সন্দেহে যাদের এতটুকুও

গভীর অভিজ্ঞতা আছে, বিশেষতঃ যারা কঠোর ন্যায়নিষ্ঠ বৃত্তিচরিত্রের সামান্য পরিচয়ও পেয়েছেন, তাঁরাই মর্মে মর্মে বুঝেন—ইংরেজের কাছে কীকি দিয়ে কখনও কোনও সত্য দান আদায় করা অসম্ভব। বৈশ্যের বণিক-ধর্ম বজায় রেখে যারা ক্ষত্রিয় হয়েছেন এমন বস্তুতাত্ত্বিক ইংরেজজাতি মানুষের মনুষ্যত্বের সত্যমূল্য নিখুঁতভাবেই ওজন করে দেখতে জানে—অনধিকারীর জন্ত এতটুকু বাজে খরচ তার দৃঢ়বদ্ধ আঙ্গুলের কঁক দিয়ে গলবার কোনও সম্ভাবনা নাই। আমাদের ভাগ্য খুব ভালই বলতে হবে, যে মনুষ্যত্বলব্ধ হয়ে আমরা ইংরেজের মত এমন শক্ত রাষ্ট্রগুরু হাতেই এসে পড়েছি—আমাদের যদি রাষ্ট্রজগতে উৎকৃষ্ট গতিলাভের সত্যই কোনও আশা থাকে, তবে তাহা এইটুকুই, যে ইহাদেরই উপর আমাদের রাজ-নৈতিক শিক্ষাভার বিধাতা সমর্পণ করেছেন।

আমাদের এই দেড় শত বৎসরের রাজনীতিশিক্ষা যে একেবারে পণ্ড-প্রম হয়েচে, তার সুস্পষ্ট প্রমাণ এই যে, আমাদের রাষ্ট্রগুরু এই মূল নীতিটুকুই এখনও আমরা আরও করে উঠতে পারি নাই। রাষ্ট্রজগৎ প্রেমের জগৎ নয়—সেখানে উপযুক্ত মূল্য দিরাই সমস্ত পণ্য ক্রয় করতে হয়—আমরা কীকি দিয়ে দুচারিটা মিষ্ট বুলি উচ্চারণ করে' আর তার-স্বরে ক্রন্দনরোলে গগন পবন মুখরিত করে' বিধিভুক্ত স্বাধিকার অর্জন করতে চলেছি—এর চেয়ে ছেলেমানুষী আর কি হতে পারে বুঝতে পারি না। এ অবস্থার বীদের ব্যাকুল হৃদয়ে প্রশ্ন করতে শুনি, নূতন শাসন-সংস্কার হবেই বা হয় একটা কিছু, কিন্তু সে নূতন দানের ফলে আমাদের মাথার উপর দিয়ে বজ্রা-ঝটিকা আপদ বিপদের নিশ্চয় ধারাপাত একেবারে বন্ধ হবে কিনা—তাঁদের কথায় হাস্য সংবরণ করা যায় না। এইজন্যই ত-বারম্বার স্বাধিকারপ্রমত্ত জাতিকে ডেকে বলতে ইচ্ছা হয়—যখন বুঝ না রাজনীতির কত ধানে কত চাউল তখন এস না আপন কোটে ফিরে গিয়ে আপন প্রতিভার আশ্রয় গ্রহণ করি—এস না যা কিছু চরিত্রচর্চণ কুড়িয়ে কুড়িয়ে আজ পর্যন্ত ধনী সাজতে ব্যর্থ চেষ্টা করেছি, সে সমস্ত অজীর্ণ শিক্ষার জলাঞ্জলি দিয়ে মায়ের মন্দিরে জাহ্নু পেতে বসে' মাতৃদত্ত সত্যজ্ঞান মাথায় করে' বহে' আনি। জ্ঞান, মুক্তি, নিরাপদ সুখ শান্তি সবই কি পরের দ্বারে ভিক্ষাজলিস্বরূপ মেগে নিতে হবে? বাক, তবু এই

দেড়শত বৎসরের সম্বন্ধনির্মিত বার্থ দুর্ভাবনারাশির মধ্য দিয়ে এসে, এ দীর্ঘ পরিশ্রমী পরচর্চার ফলে অন্ততঃ যদি আমাদের বহুযুগের নিকর্মা মস্তিষ্ক একটুও সাফাই হয়ে, একটুও পরিপাক লাভ করে থাকে, তবে সেটুকুও লাভ বলে গণ্য করতে হবে। একান্তপক্ষে আর কিছু না হউক, ভারতবর্ষের মনীষী নেতৃবর্গের এই জল্পনা কল্পনা স্বপ্ন, এই আশা দুর্ভাবনা প্রতীক্ষা, এই তর্জন গর্জন ভিক্ষাযাত্রার ফলে এইটুকুও জগতের কাছে প্রতিগম্য হবে, যে, ভারতবাসী তার স্বাধিকার লাভের জন্ত বিধিসম্মত কোনও চেষ্টা প্রয়াসেরই ক্রটি করছে না—এইটুকুও লোকসান নয়।

*

*

*

ফিরে ফিরে সেই কথাটিই বাঙ্গালীর মাথায় আসে—দেশের শোচনীয় রাজনীতিক অবস্থা। পাঞ্জাবের ভূতপূর্ব ছোটলাট জবরদস্ত শাসনকর্তা ছিলেন—অন্য নানা কারণ থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর কঠোর শাসনের ফল সেখানকার বিষময় উৎপাতের জন্ত অনেকখানি দায়ী কি না, সে সম্বন্ধে তদন্ত করবার জন্ত কমিটির আয়োজন করবার কথা চারিদিকেই উঠেছে। হায়, কমিটি আর কমিটি—অবশ্য বোম্বার উপর আর একগাছা শাকের ভর সহিবেই, সে সম্বন্ধে কোনও কথা নাই। কমিটির বিচারফলে যাহাই নিষ্পন্ন হউক—পঞ্চনদের দুর্ঘটনা ভারতের প্রাণে উগ্রভাবেই বেজেছে—শঙ্কর নাথ ও রবীন্দ্রনাথ দেশের বুকের সেই গুমট বেদনাকে ভাবাদান করেছেন বলেই দেশ আজ লক্ষ কণ্ঠে তাঁদের জয়গান করছে। জাতির বেদনামূর্ছিত হৃদয়ের ক্ষুব্ধ উচ্ছ্বাস গত কলিকাতা টাউনহল সভায় বাংলার চিত্তরঞ্জনের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে, চিত্তরঞ্জনের সঙ্কল্প খাঁচী ব্রিটিশ রাজনীতির অগ্নুগত হলেও ভারতীয় রাষ্ট্রক্ষেত্রে এরূপ সঙ্কল্প এই প্রথম। ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউজ বলেন :—

“Thursday's meeting at the Town Hall is important in so far as it, for the first time, gives articulate expression in Bengal to the feelings of the Indian public in respect of the Punjab. It seems that Indian public opinion is gathering strength.....”

এই সব উগ্র শিষ্ণ নরম গরম আন্দোলন দেশের জাগ্রত প্রাণশক্তি-
রই পরিচয় দেয়—জাতির প্রাণগত আশা আকাঙ্ক্ষা বেদনা দিন দিন
নির্ভীক ভাবে আপনাকে অভিব্যক্ত করে তুলছে—ইহা একটা সুলক্ষণ-
সন্দেহ নাই। দেশ ও গভর্নমেন্ট উভয়ের প্রাণের পরিচয় পরস্পরের
কাছে যতটা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে ততই উভয়েরই পক্ষে মঙ্গল। পরস্পর-
গত অন্ধকারাচ্ছন্ন সংশয় ও অস্পষ্টতাই অধিকাংশক্ষেত্রে সমস্ত গোলযোগের
জন্ম দায়ী—সে সংশয়চ্ছারা যতই মুছে যায়, ততই ভাল। কিন্তু দেশের
প্রাণের এই যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন আত্মপ্রকাশ এটা ওটা সেটাকে
নিয়ে চলেছে—জাতির সমস্তখানি মনীষা যদি সেইখানেই বলিরূপে আহুতি
দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাতে আমাদের চিরকল্যাণের পথ একটুও
মুক্ত হবে না—একথা স্মরণ রাখতে হবে। এই দুর্ভাগ্য জাতির হৃৎযন্ত্র-
ণার কি অবধি আছে? কিন্তু হৃৎযন্ত্রের জ্বলন্ত নিবিড় ঘনঘটার মধ্যে
বিচলিত আপনহারা হ'লে সমস্ত পথশ্রম শুধুই পণ্ড হবে, ঘোর বিপদ-
সমুদ্র আরও ঘনীভূত হবে, আত্মহারার দুর্গতির সীমা পরিসীমা কোথার?

কবির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তাই আমরাও বলি—“খোঁজ নিজ অন্তরে।”
—সেই মণিমন্দিরেই যে জাতির সত্য সাধনা আত্মপ্রকাশের জন্ম অপেক্ষা
করছে। আমাদের জীবনপ্রবাহের মাঝে সহস্র ঘূর্ণাবর্ত ফুটে উঠেছে—
সহস্র ঘাত প্রতিঘাতে আমরা ব্যথিত বিপর্যস্ত—কি করবে? প্রাণের
বিরুদ্ধে প্রাণেরই অন্ধ অভিযানের ফলে কি কোনও দিন কোনও শেষ
নিষ্পত্তি মিলেছে? সত্য সত্যই আমাদের আছে কি? দেশের দেহ
অন্নহীন, বস্ত্রাভাবে উলঙ্গ—সেই জীর্ণ শীর্ণ ক্ষীণ অস্থিকঙ্কাল কয়নানার ভিতরে
এখনও যেটুকু জীবনীশক্তি ধুক ধুক করছে, দৈব হৃদয়কে তাহাও আঘাতে
আঘাতে ঝটকঝাপটে নির্ঝাপোনুথ—এ ঘোর হ্রস্বস্থায় তোমরা কি কর্তে
চাও বল ত? অন্ধ আবেগে উত্তেজনায় উদ্ভ্রান্তচিত্ত হয়ে কি ফল? পর-
হস্তধৃত মায়াহুত্রটুকু ধরে' নৃত্য করে' কি অপূর্ণ সিদ্ধির অবদান উপার্জিত
হবে? হৃদয় মন মনীষাকে কোথায় কেমনভাবে নিয়োজিত করলে এই

বিষমস্তপ্রায় জাতির জীবনদীপ নির্বাপিত না হ'য়ে দীপ্ততেজে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠবে—তার সন্ধান করবে কারা? দেহের স্থিতি ও পুষ্টি, প্রাণের আত্মরক্ষা, মনের আত্মবিকাশ—সবই ত প্রয়োজন—কিন্তু কোন্ রাজপথ অবলম্বন করে' জাতির সমষ্টিজীবনে সে সমস্ত অধিগত হবে—তার খোঁজে ক্ষণবিলম্ব করলে সত্য সত্যই আমাদের জীবনরথ একেবারেই অচল হয়ে উঠবে।

ভারতের সমষ্টিসত্তার অব্যর্থ আকর্ষণে আজ ধারা অনাভ্রাত নবীন জীবনে চঞ্চল জাগরণ অনুভব করছেন, তাঁদের ছোট বড় এই সব বাহ্যি বিভ্রমনার জলাঞ্জলি দিয়ে সর্বোপরি আত্মপরিচয় লাভ করতে হবে। উদীয়মান বাঙালীজাতি! আজ গভীরে অন্তঃপ্রবেশ করে' তোমাদের সর্বপ্রথমে মর্মে মর্মে অনুভব করে' নিতে হবে—এই আত্মসাধনার মূল জীবনমন্ত্র। দেখেছ না—আমাদের কিছু নাই—আমাদের জীবনধর্মের সকল অঙ্গই গলিত দুষ্কর্ত্তে চিরময়? রাষ্ট্র? সে তো চর্কিত চর্কণ—কুপণের কুষ্ঠিত রূপাদান মাত্র। সমাজ? সেও ত বছদিন যাবৎ শাস্ত্রের অক্ষরপূজায় সত্যমর্জ্যুত হ'য়ে লক্ষ জালজঞ্জালে আকীর্ণ হয়ে গিয়েছে—তাতে আর আছে কি ধার জীর্নসংস্কারের এখনও আশা পোষণ করা? ধন দৌলত সম্মান গৌরব—কি আমাদের অবশিষ্ট আছে বল ত? কিছু নাই, বাহিরের সকল ঐর্ষ্যে বঞ্চিত দীন হীন ভিখারীর দল—আজও দেখতে পাও না কি তোমাদের জননী হুঃখিনী হতসর্বস্বা কান্দালিনী! শাসনসংস্কার, সমাজসংস্কার—মাথা নেই তার আবার মাথাবাথা—কি ছাইভয়ে এ শ্মশানের সংস্কার করতে চাও? সব ব্যর্থ পণ্ডশ্রম হবে—যদি এখনও এই সব সখের কন্দ-ভোগে জীবন ক্ষয় করতে থাক। বাংলার নূতনের দল—এস রিক্তহস্তে একেবারে নূতন করে' আমাদের জীবন-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলি—মা তাঁর অন্তঃভাতিরে অনধিকারী সন্তানের কাছ থেকে যে সিদ্ধ-সম্পদ নুকিয়ে রেখেছেন—ধীরে ধীরে সে সমস্তই বিকশিত হয়ে উঠবে—সেই মাতৃদত্ত অভিনব দানেই আমরা জননীকে রাজরাজেশ্বরীবেশে নবসজ্জিত করে' তুলবো। জীর্ণগলিত ভয়ভূপ ঠেঙ্গিয়ে কোনও লাভ নাই—এস দেবজাতির দিব্যমন্দির একেবারে আনকোরা নূতন বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত করি।

তত্ত্ব-সাধনা

(৩)

প্রকৃতি বিশ্বজীবনে যে তিনটি স্তর গড়িয়া তুলিয়া তাহার ভিতর দিয়া আপনার গুহাস্তর্গত পূর্ণসত্তাটিকে ব্যক্ত করিতে চাহেন—তাহার প্রত্যেকটির প্রয়োজন আছে—কোনওটিকে খর্ব করা বা একেবারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নষ্ট করিয়া ফেলা তাহার উদ্দেশ্য নয়। স্থূলজীবনকে পাইয়াছি—মানসজীবনের মধ্য দিয়া তাহাকে উর্দ্ধপথে উঠাইয়া ধরিয়া সূক্ষ্ম চিন্তা করনা স্বপ্নের জগৎ বিকশিত করিয়া চলিয়াছি—পরিশেষে পাইতে চলিয়াছি সেই উর্দ্ধ জীবন—শরীর প্রাণ ও মন ইহাদের কাহাকেও ক্ষুণ্ণ না করিয়া সকলকে পূর্ণ ও সার্থক করিয়াই দেবত্ব লাভ করিতে হইবে।

এক্ষণে এই তিনটি উপাদান স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে গঠিত হওয়ায় প্রত্যেকটি এক একটি বিশেষ ধর্ম লইয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে। মানুষ যে কোনও একটি স্তর বাছিয়া লইতে পারে,—পশুজীবন, মানুষজীবন বা দেবজীবন ইচ্ছামত যে কোনও জীবনস্তর লইয়াই আপনাকে পরিতুষ্ট রাখিতে পারে। জীবনের ক্রমবিবর্তনসূত্রে তিনটিকেই একত্র গ্রহণ করিয়া পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করিয়া পূর্ণজীবন লাভ করাও তাহার পক্ষে অসম্ভব নয়। প্রাকৃত জীবনে ইহারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গুণ লইয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রথমে শরীর ও প্রাণ। প্রাণই শরীরের সঞ্জীবনীশক্তি। দেহকে বাঁচাইয়া রাখাই প্রাণের প্রধান ধর্ম। তাই স্থূলজীবনে গতি ও পরিবর্তন খুব অল্প—স্থিতি পুষ্টি ও পুনরাবৃত্তির চেষ্টাই সেখানে সমধিক। প্রাণ অমরত্বকেই চায়—কিন্তু দেহ নখর—বিশ্বক্షণের কলনায় শুধু রূপের সূক্ষ্ম ভাবচিহ্ন—টুকুই কখনও নিশ্চিহ্ন হয় না—তাই প্রাণশক্তি মরদেহের পুনরাবৃত্তি করিয়াই প্রবাহ-আকারে তাহার অমরত্ব রক্ষা করে। অতএব সকল প্রাণ-জীবনের বিশিষ্ট স্বধর্ম হইতেছে এই আত্মরক্ষা (Self-preservation) আত্মপুনরাবৃত্তি (Self-repetition) এবং আত্মগুণন (Self-multiplication)।

তারপর মনের কথা। মনের ধর্ম পরিবর্তন। নিজের ক্ষুদ্র অপ্রশস্ত

ক্ষেত্র নিত্যপরিবর্তনে ক্রমবিস্তৃত করা, তাহাকে উন্নত, পরিবর্দ্ধিত, সুসজ্জিত করিয়া তোলা। প্রাণের ক্ষেত্র দেহ—উহা সীমাবদ্ধ। মনের ক্ষেত্র অসীম, অনন্তবৃদ্ধিক্ষম—যতই উহা গভী ভাঙ্গিয়া পরিধিচক্র বিস্তার করিয়া অগ্রসর হয়, ততই বিপুল ও বৃহৎ হইয়া উঠে—নিত্য নূতন নূতন জ্ঞান, রস, কর্মশক্তির উপযোগী ধারণাসামর্থ্য লাভ করিতে থাকে। পরিবর্তন, আত্ম-প্রসারণ, আত্মোৎকর্ষই স্তুরাং মনের বিশেষ ধর্ম। পূর্ণতাই তাহার লক্ষ্য।

পরিশেষে আনন্দময় সত্তা। উহা অজ নিত্য শাস্ত—আত্মবিধৃত পরি-পূর্ণস্বরূপ। ইহার পরিবর্তন নাই, উন্নতি অবনতি নাই, জন্মবৃদ্ধি অপক্ষয়ও নাই—অনাদি অনন্তকাল ধরিয়া একই ভাবে সর্বজীবে সর্ববস্তুর ভিতরে অথও পূর্ণত্ব লইয়া বর্তমান। জগৎ ও জগদতীত—বিচিত্র সৃষ্টির অন্তরে বাহিরে থাকিয়াও ইনি অক্লেশ নিরাসক্ত শুদ্ধ অপাপবদ্ধ। প্রাণের অম-রত্ব-লিপ্সা মনের পূর্ণতার স্বপ্ন সবই এখানে আপন আপন সার্থকতা পায়, কারণ, অমৃতত্ব পূর্ণত্ব এই দিব্যসত্তারই অন্তর্গত নিত্যগুণ। ইহাকেই জানা ও পাওয়া সৃষ্টির চরম উদ্দেশ্য—ধর্মজীবনের চিরগৌরবময় ফল লক্ষ্য।

একণে এই প্রতি স্তরের সাধনা বাষ্টিজীবনেও যেমন সম্ভবপর, আবার সমষ্টিজীবনেও তদ্রূপ হইতে পারে। মানুষ আত্মোন্নতির জন্য যে কোনও জীবনস্তর হইতেই ব্যক্তিগত সাধনা আরম্ভ করিতে পারে, অথবা 'আত্ম-জীবনে জাতিগত সাধনাকেই উপলব্ধি করিয়া অগ্রসর হইতে পারে—আবার আত্মজীবন ও সমষ্টিজীবনের মধ্যে অপূর্ব সামঞ্জস্য বিধান করিয়া প্রকৃতির গভীরতর উদ্দেশ্যটিকেও সুসিদ্ধ করিয়া চলিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ভগবান্-প্রতি জীবের ভিতরে, আবার পরিবার কুল জাতি বিশ্বমানবসমষ্টির ভিতরে সম্ভাবেই আপনার কাছে আপনাকে গোচর করিয়া চলিয়াছেন। তাই স্বতন্ত্র অহং-পূজাও নয় আর শূণ্য ব্রহ্মে আত্মবিলোপও নয়—পরন্তু আপনার মধ্যে সকল সম্ভাবনীয়তা সর্বতোভাবে ফুটাইয়া-তুলিয়া-চিন্তা করি, প্রভৃতি নানা পথে সমস্ত চারিদিকে চালিয়া দেওয়া—বিশ্বমানবের মহাসিদ্ধির জন্য আপনার সমস্ত তপঃসাধনা নিয়োজিত করাই পূর্ণসাধনার লক্ষ্য।

প্রকৃতি মানুষের মধ্যে এই তিনটি জীবন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—কিন্তু এখনও তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধান করিতে পারেন নাই। প্রাণকে শুধু মনের নিয়মে বাধিতে গিয়া কি বিষয় বিষয়ের সৃষ্টি হইয়াছে—উন্নতি-

শীল অধিময় ইউরোপই তাহার প্রমাণ। আর শুধু ধর্মের বাধনে প্রাণকে মিলাইতে গিয়া যাহা গড়িয়া উঠে—তাহারই মুক্তিমান চিত্র বর্তমান ভারত-বর্ষ—প্রাণ যেখানে নিজ্জীব তিমিত, আর ধর্মও যেখানে সজীব মনঃশক্তি হারাইয়া শাস্ত্রবদ্ধ অন্তঃসারশূন্য।

নানা পরীক্ষার ভিতর দিয়া প্রকৃতি মানুষের জীবনকে নানাভাবে সাজাইয়া ধরিতেছেন—উদ্দেশ্য পূর্ণ সামঞ্জস্য একদিন প্রকটিত হইবে। মানুষের স্থলজীবনের সুপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল—প্রাণের ধর্ম অবলম্বন করিয়াই উহার গঠন। সুখসুচ্ছন্দে জীবনযাপন, বংশবৃদ্ধি, কুলধর্ম দেশাচার লোকাচার বর্ণে বর্ণে মানিয়া চলাই প্রাকৃত মানুষের স্বভাব। স্বভাবতঃই সে প্রতি উন্নতি পরিবর্তন বিপ্লবের প্রতি বীতরাগ—মনোজগতের কোনও নূতন পরিবর্তন প্রাণজগতে সহজে স্থান পায় না—কোনও নূতন ভাবের আবির্ভাব হইলে সাধারণ মানুষ চিরকাল তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে—বহুসংগ্রামের পর হয়ত শেষে তাহার কিছু কিছু পূজা আরম্ভ হইয়া থাকে। প্রাণজগৎ ধর্মকেও সহজে প্রশ্রয় দেয় না—অতীতে তাহার মধ্যে ধর্ম সংস্কার যতটুকু জোর করিয়া প্রবেশ করান হইয়াছে, তাহার ফলে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের জন্ত একটা অন্ধ শ্রদ্ধাসন কোনও মতে ছাড়িয়া দিয়াছে—কিন্তু গভীর ধর্মসাধনার স্থান সমাজের মধ্যে নাই—দূরে অরণ্যে পর্বতে সে স্বাধীন ধর্মসাধনার বিভীষিকাকে নির্বাসিত করিয়া দিয়াছে।

মনের ধর্ম স্বপ্ন দেখা—নিত্য নবানব আদর্শের কল্পচিত্র রচনা। কাজেই, প্রাণের সঙ্গে জাগ্রত মানুষের নিত্য লড়াই। স্থল জড়জীবনের সঙ্গে নিত্য সংগ্রামে যখন সে হতাশ হয়, তখন নিরীলে আপন মনে বসিয়াই সে চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হয়, প্রাণের দাবী তাহার কাছে যাহাতে না পৌছায় তাহার জন্ত সতর্ক থাকে। কবি, দার্শনিক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক ইহারা অধিকাংশ স্থলে সকলেই এইরূপ মানসসম্মাগীর দল—লোকালয় হইতে আত্মনির্বাসন করিয়াই তাহারা অবাধ চিন্তার সুবিধা করিয়া লন।

মন এবং প্রাণ উভয়ে এত সাম্রিপ্যে থাকিয়াও যখন পরস্পরের মধ্যে সম্ভাব স্থাপন করিতে পারে নাই, তখন তুরীয় জগৎ যে মনকে ডিঙ্গাইয়া আপন পূর্ণ সত্য প্রেম সুন্দরের পূজায় এই অপূর্ণস্বভাব স্থল প্রাণজীবনকে দীক্ষিত করিতে পারিবে ইহা সম্ভব নয়। হাজার হাজার বৎসর ভারতবর্ষ ধর্মজীবনের সহিত স্থলজীবনের একটা সন্ধি স্থাপন করিয়াই এক

বাস করিতেছে—সামঞ্জস্যময় মিলন ঘটাইয়া তুলিতে পারে নাই। ভারতের ধার্মিক বিভিন্ন যোগপথের সাধকগণ জড়জীবনজন্মে অক্ষম হইয়া ইহবিমুখ সম্মাসিকেই সার করিয়া লইয়াছে, সমাজের কাছ হইতে একমুষ্টি অন্ন ও একটু প্রকার বিনিময়ে সমাজকে তার-আপন অন্ধ গতানুগতিক জীবনধারণের জন্ত ছাড়পত্র লিখিয়া দিয়াছে। ইউরোপ মন এবং প্রাণের সহিত সখ্য স্থাপন করিবার সাধনা বহুশত বৎসর ধরিয়া করিতেছে—জড়জীবনকে একটু কিছু গতি-দান করিতে পারিলেও স্থূলপ্রকৃতি তাহার প্রতিশোধ লইতে ছাড়ে নাই—ইউরোপের মন তাই কত স্থূল জড়ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে—ধর্ম, ভগবান, স্বর্গরাজ্য এ সবই আজ তাহার কাছে হয় উপহাসের বস্তু, নয় দানবীর ভাবেই সাধনীর আদর্শ। ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কাহারও সাধ-নাই সফল হয় নাই—ইউরোপ আধ্যাত্মিক দৃষ্টি পায় নাই, অচিরে তাহাকে উহারই জন্ত প্রাচ্যের দ্বারস্থ হইতে হইবে; ভারতবর্ষও যে সজীব মানসজীবনকে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে, আজ—ঠিক—সেই বস্তুটিরই সহিত তাহাকে নির্দয় সংঘর্ষে আসিতে হইয়াছে। মন ও অধ্যাত্মসত্তা একে অগ্নিকে ছাড়িয়া স্থূল জীবনকে জয় করিতে পারিবে না, কিন্তু উভয়ের স্তম্ভ সন্নিহন ঘটাইতে উভয়েই চিরপরাশ্রয় রহিয়া গিয়াছে। প্রকৃতির এই অন্ধ প্রচেষ্টা কোনও দিনই মানবজীবনের পূর্ণ সাফল্য আনিয়া দিবে না। ভারতে ঋণ ও ঋণে তাহা যে যোগশক্তিকে প্রকৃতি এ পর্যন্ত কণ্টেক্ষিতে বিকশিত করিতে পারিয়াছেন, তাহাই যখন পূর্ণ অর্থও বিপুলধারার নামিয়া আসিবে তখনই মানবের পূর্ণসাধনার সন্ধান মিলিবে।

এই পূর্ণযোগশক্তি ভারতেই সর্বপ্রায়ে জাগ্রত হইয়াছে। প্রকৃতি উন্নতি-শীল মনের সাহায্যে বিজ্ঞানের (Science) সহযোগে মানবজাতির জন্ত মনের পূর্ণ বিকাশের আয়োজন যেমনভাবে করিতেছেন, এই যোগশক্তির সহায়ে অচিরে তেমনিভাবে সমগ্র মানবসমষ্টির মধ্যে তাহাকে দেবজীবনের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। প্রকৃতি নিম্নস্তর হইতে উপরের দিকে উঠিয়া আসিতে চাহিতেছেন, কিন্তু নিম্নের অধোমুখী আকর্ষণে বারবার পদখলিত হইতেছেন—যোগশক্তি উপরের পুরাতন পুরুষের দৈবী ইচ্ছা, উহা যেদিন মন ও শরীরকে শুদ্ধ দৈবীযন্ত্ররূপে নূতনভাবে গড়িয়া তুলিবে, সেদিন মানুষ মনের ছায়াময় স্বপ্নধোর কাটাইয়া উঠিবে, দিব্যজ্যোতি আমাদের সবখানি উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবে, সেইদিন জানিবে মর্ত্যে সত্যময় স্তম্ভ

যুগের আবির্ভাব হইয়াছে।

বিশ্বলা প্রকৃতি আনন্দ-উৎসবে অন্ধ আত্মহারা—পূজার নিৰ্মাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু কোন্ সূত্রে উহা গাঁথিয়া মহা দেবতার কণ্ঠে দোলাইয়া দিবেন তাহার সন্ধান পাইতেছেন না—শ্রীভগবানের করুণাবিগলিত স্নেহদৃষ্টিই প্রকৃতির ভুল ভাঙ্গিয়া দিবে, ভারতের দীপ্ত যোগশক্তিই বিশ্বের অজ্ঞানতা বিদূরিত করিয়া দেবরাজের রাজপ্রাসাদ নিৰ্মাণ করিয়া তুলিবে। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের আত্ম-বিগ্রহই মানুষের মন ও শরীরে মুক্ত হইয়া উঠিবে। মানুষ, শুধু ইহা বিশ্বাস কর, হৃদয়ে ধারণ কর, বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে দৈবী মাতৃশক্তি আবির্ভূত হইতেছেন, তাঁহারই হস্তে আপনাকে যজ্ঞস্বরূপ নিবেদন করিয়া দাও—তিনি তোমারই মধ্য দিয়া তাঁহার এই সর্বোৎকৃষ্ট দিব্য যোগশক্তির সাহায্যে আপন অন্তর্নিহিত পরিপূর্ণ ভাগবত আদর্শ সুসিদ্ধ করিয়া তুলিবেন।

জীবন-সঙ্কট

নটকায় আশুপ লাগিলে, কে হ'নয়ন মুদ্রিত করিয়া ভগবানের ধ্যান করিতে বসে? আজ দেশের সর্বত্রই হাহাকার, হা অন্ন, হা অন্ন করিয়া চতুর্দিক হইতেই দেশবাসীর করুণ আর্তনাদ আমাদের কর্ণ বধির করিয়া তুলিয়াছে, আমাদের সাধনার কথা শুনিবে কে?

পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন “দেশে হাহাকার রব উঠিয়াছে, পেটে খাইলে ত পিঠে সহিবে? আমি যেখানে কাজ করি সেখানকার অধিকাংশ লোকই দিন আনে দিন খায়, কোন কোন বালক হুই-তিন দিন উপবাস করিয়াও জ্বলে যায়, তাহাদের মুখের দিকে চাহিলে হৃদয় ফাটিয়া যায়, চক্ষের জল সম্বরণ করা যায় না, গতকল্য একজন লোক স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে তিন দিন উপবাস করিয়া ভেউ ভেউ করিয়া মর্মান্বিত-স্বরে কাঁদিতো ছিল, গ্রামে দরিদ্র-ভাণ্ডার থাকতে ছাত্রবন্ধগণ একটা টাকা তাহাকে দেওয়ায়, তাহার মুখে স্বর্গের জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল, সে হুই বাছ-তুলিয়া সকলকে আশীর্বাদ করিল।”

তারপর, দুর্ভিক্ষরাক্ষসীর বীভৎস দৃশ্য সকল সংবাদপত্রেই চিত্রিত হই-
তেছে, উপায় কি? দেশ-যে না-ধাইতে পাইয়া রসাতলে যায়?

এদিকে বিলাসনগরী কলিকাতায় বসিয়া স্যার আন্তোষ বাংলার
অবস্থা ভাল-বলিয়াই মনে করেন, পরীক্ষার ফী বাড়াইতে একটুও কুঠা
বোধ করিলেন না। আমাদের দেশ, আমরাই-যখন এতটা উদাসীন, তখন
হ্রবস্থার সীমা কোথায় গিয়া পৌঁছাবে তাহা বিধাতাই জানেন।

কলিকাতার ছাত্রগণের অবস্থা-কথঞ্চিৎ সচ্ছল-হইলেও মফঃস্বলের
বিদ্যার্থীগণ যে কি হুঃখে অর্থকরী বিদ্যার সেবা করে, তা জনৈক পুত্র-
প্রেরকের কয়েক ছাত্র লেখা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়।

“ছাত্রগণ পেটে ভাত দিতে পারে না, লজ্জা নিবারণ করিবার এক-
খণ্ড নেকড়া পর্য্যন্ত অনেকের ভাগ্যে জোটে না, কেহ কেহ এমন কুঁড়ে
ঘরে বাস করে, রুষ্টি তুফান না আসিতেই ধরাশায়ী হইবে, কয়েকদিন
হইল একজন মেয়েমানুষ অভাবের তাড়নায় আত্মহত্যা করিয়াছে। আমি
একদিন ছাত্রগণকে পড়াইতেছি, হঠাৎ একটি ছাত্র অশ্রুপূর্ণলোচনে আমার
নিকট বাড়ী-ঘাইবার ছুটি চাহিল, জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম সে তিন
দিন পর্য্যন্ত ভাত খাইতে পারা নাই।”

কমলার বরপুত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কৰ্ত্তৃপক্ষগণ দেশের এই সকল শোচ-
নীয় ঘটনার সংবাদ রাখেন কি? আমরা কৰ্ত্তৃপক্ষগণের আচরণে সন্তোষিত
হইয়াছি।

আবার জিজ্ঞাসা করি, দেশকে যারা শুধু মাটি-নদী-পাহাড় মনে
না করিয়া, কোটা কোটা সম্ভানপালিনী চিন্ময়ী মাতৃমূর্ত্তিজানে পূজা করেন,
তাহারা রাজরাজেশ্বরী জননী জন্মভূমির এই শোচনীয় হ্রবস্থার প্রতীকার
কেমন করিয়া করিতে চাহেন? ভাব, রুদ্ধ, ভাষা আমার নীরব, অতিকষ্টে
অর্দ্ধফুট কর্কশকণ্ঠে তোমাদের জিজ্ঞাসা করি, করিতে চাও কি? আত্মের
হাহাকার—এ যেন আজ শৃগাল কুকুরের অশ্রুট ক্রন্দন। একবার স্থিরচিত্তে
গভীর চিন্তা করিয়া উত্তর দাও—তোমরা কি করিতে পার?—

এ-নানা হন্দে বাক্যের পর বাক্য বিন্যাস করিয়া, কথার আঘাতে
ব্রাহ্মাণীকে আর জাগাইয়া তুলিতে পারিবে না, লেখায় আর বক্তৃতায়
যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, এক্ষণে তৃতীয় পন্থা যদি কিছু থাকে তাহাই
অবলম্বন করি।

বাংলার শ্যামল ধান্যক্ষেত্র দিক্ হইতে দিগন্তেরে বিস্তৃত, মাথার
 ধাম পায়ে ফেলিয়া একমুষ্টি অন্নের বিনিময়ে শ্রমজীবীর দল উদয়াস্ত পরি-
 শ্রম করিতেছে, আর আমরা থাইতে পাই না—সুজলা সুফলা বঙ্গদেশ,
 আজও নদ নদী তড়াগ অসংখ্য স্রোতস্থিতী মুক্তামালার ন্যায় মায়ের
 শ্যাম অঙ্গে বিজড়িত, আম কাঁঠাল তাল নারিকেল প্রভৃতি অমৃত-আশ্বাদময়
 ফলকর বৃক্ষের উন্নত শির আজও বাংলার সুনীলগগন চুবন করিয়া
 ধরণীর শোভাসম্পদ বৃদ্ধি করিতেছে, আমরা মরুবাসীর মত উগ্রজ প্রলাপে
 হা অন্ন হা জল করিয়া করাঘাতে বক্ষ বিদীর্ণ করিতেছি, আমাদের অল্পশ্র-
 মশ্রুপাতে ধরাতল সিক্ত হইতেছে। একি ইন্দ্রজাল নহে? সম্মোহন নহে?
 --কোন মন্ত্রে এই অদ্ভুত-প্রহেলিকা দূর হইবে?

দেশের কথা যাহারা ভাবিতে শিখিয়াছেন, যাহাদিগকে এই ভাবের
 ভাবুক করিতে আমরা প্রয়াসী তাঁহারা সকলেই শিক্ষিত—কিন্তু সে শিক্ষা
 একেবারেই যে আমাদের অ-মানুষ করিয়া তুলিয়াছে। ডাক্তার পি, সি,
 রায় বলেন “ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনের সূচনা থেকে, ছাত্রগণের এক-
 মাত্র চিন্তা হ’য়ে উঠেছে, কি করে’ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উপাধি নেব।
 তারপর উকিল, ডাক্তার, মাষ্টার, কেরানী—এ ছাড়িয়ে যাবার আর
 যোগ্যতা নেই, কেবল দাসত্ব আর গতাব্যুগতিকের গা ঢালা। স্বাধীন
 জীবিকা বলে’ যে একটা কথা আছে—শিক্ষিতদের সে ধারণা নেই।
 পোর্ট অফিসের ছাপের মত তাঁরা ইউনিভারসিটির ছাপটাকেই সার
 বুঝেছেন।” এইখানেই আমাদের বোল আনা গলদ। দেশের উন্নতিচিন্তা
 আমাদের মাথা হইতে নামিয়া সর্কাঙ্গে ছড়াইয়া পড়িতেছে না, মস্তিষ্ক
 হইতে বড় জোর লেখনী চালনায় ও বক্তৃতায় উহা পর্য্যবসিত হইয়াছে,
 কবে আমরা দেশের দুঃখে উন্মাদ হইয়া কাদিতে কাদিতে আমাদের এই
 জলাজীর্ণ দেহটাকে মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দাঁড়াইতে অগ্রসর হইব?
 দেশের এই দারুণ দুর্দিনের প্রতীকারের জন্ত আমরা গভর্ণমেন্টকে
 বলিতেছি—“হে রাজস্বাধ্যক্ষ! ভারতের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, রেজুনের চাউল
 ভারতে আমদানী কর, ভারত হইতে চাল রপ্তানি বন্ধ করিয়া দাও,
 আমাদের যে আর উপায় নাই, আমরা যে না থাইতে পাইয়া মরিতে
 বসিয়াছি।” কিন্তু এই প্রতিযোগীতার দিনে কে কাহার কথা শুনে? বৎসরের
 পর বৎসর থাইতেছে, বাঙ্গালীর দুঃখের মাত্রার বৃদ্ধি বৈ কম হইতেছে না।

আজ আমরা যে সমস্যার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা নতুন নহে, সকল সংবাদপত্রেই ইহার বিশদ আলোচনা চলিয়াছে, অধিকাংশ সংবাদপত্রেই গভর্ণমেণ্টের করুণা ভিন্ন অন্যপথের কথা বড় নাই, প্রকৃত প্রস্তাবে এ অবস্থায় রাজী রক্ষা না করিলে প্রজার উপায় কি? আর এক সাময়িক প্রতীকার, দেশের ধনীগণ মুক্তহস্তে দান করিলে সেই দানের বোঝা মাথায় বহিয়া সেবকগণ নিরন্ন লোকদিগকে উপস্থিত বাঁচাইতে পারে, কিন্তু নৌকার তলা ফুটা হইয়াছে, সে'চিয়া সে'চিয়া কিছুদিন চলিতে পারে, পরন্তু অনর্গল জলপ্রবেশে ফুটা বৃদ্ধি হইতেছে, তরা ডুবি হইবেই। ইহার জন্য এক নতুন অথচ শক্তিপ্রদ পথ আমাদের অবলম্বন করিতেই হইবে।

দেশকে বাঁচারা বাঁচাইতে চাহেন, তাঁহাদের বাঁচিবার যে শক্তি তাহা পুরানাতায় সংগ্রহ করিতে হইবে, কেবল হৃদয়াবেগের তরঙ্গে দাচিলে হইবে না—বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, বৃকের জোর, প্রাণের সাহস, দেহের অপরিমিত বল চাই, আর এই রকম প্রচুর প্রাণশক্তিসম্পন্ন একদল লোক হইলেই যে কার্যোদ্ধার হইবে এরূপ নহে, এই মণ্ডলী বহু ব্যস্তিসম্মিত হইলেও একহৃদয় এক-আত্মা হওয়া চাই—সাধকমণ্ডলীর মধ্যে এক অপূর্ণ ছন্দোময় দৈবী সামঞ্জস্য (divine harmony) প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

এই যে আজ দেশে প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ লোক বেঘোরে প্রাণ হারাইতেছে, বাহিরের চেষ্টায় এই মরণের স্রোত রোধ করিতে পারিবে না, হাজার সেবাসমিতির সাধ্য নাই এই মরণ আবর্তনের সম্মুখে বাঁধ দিয়া রাখা—Co-operative Credit Societyই কর, আর স্বদেশীমন্ত্রটাকে আর একবার ভাল করিয়া ঝালাইয়া দশটা সখের ভাগুরই খোল, দেশ যে তিমিরে সে তিমিরেই রহিয়া যাইবে। বাহিরে আজ যে শ্মশান-চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, উহা কি আমাদেরই হৃদয়ের চিত্র নয়? যে হৃদয় যে অনাচার অত্যাচারে আমরা আজ বিপর্যস্ত উহা কি আমাদেরই অন্তরের হীনবৃত্তির পরিচায়ক নয়? প্রাণের শান্তি দেখিয়া চীৎকার করিলে কি হইবে, পাপবিরত হইবার সাধনা কর, হৃদয় বাহাতে পরিমার্জিত শুদ্ধ হইয়া উঠে তাহার আয়োজন কর। রাজবিধানে আজ বাহার চতুর্দশ বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে, তাহাকে যুক্ত করিবার চেষ্টা কর না কেন—জান ইহার আর উপায় নাই—সেইরূপ জানিও—ভাগবতবিধানে জাতির আজ যে প্রাণশক্তি তাহা ভোগ করিতেই হইবে—তবে জাতির প্রাণ

বাইবার নয়—বিশ্বমঙ্গলের পাগলিনীর ভাবার বলি “এ প্রাণ ত বাবার নয়, আশুপে ঝাঁপ দিয়ে দেখেছি আশুপ নিভে যায়, জলে ঝাঁপ দিয়ে দেখেছি জল শুকিয়ে যায়”—এ অমর জাতি মরবে না।

আমরা করিব কি? যে বিপুল বিরাট দেবজাতি-সৃষ্টির মানস করি-
মাছি, আমাদের মধ্যে তাহার ক্ষুদ্র সংক্ষিপ্ত আদর্শচিত্র(miniaature model)
সফল হইল কি? আমাদের দশজনের হৃদয় দশজনের সহিত মিলিয়া এক
হইল কি? আমাদের দশজনের স্বার্থ এক স্বার্থে পরিণত হইল কি?
যে দেবসংঘের কথা আজ চারি বৎসর প্রচার করিয়া আসিতেছি, বাংলার
কোনও ক্ষেত্রে তার একটি ক্ষুদ্রস্বরূপও গড়িয়া উঠিয়াছে কি? এই দেব-
স্রুত লইয়া ক্ষুদ্র সমষ্টির মধ্যেই যদি আমরা আজও মিলন প্রতিষ্ঠা করিয়া
উঠিতে না পারি, জ্ঞানও, বাহিরেও সকল কার্যেই আমরা অকৃতকার্য
হইব—চাই দেবসংঘ, চাই দেবকার্যে একপ্রাণ একচিত্ত এক-
স্বার্থে বিজড়িত অভিন্নস্বরূপ শক্তিময় সমষ্টি; দেশে এই নূতন সংঘ যতক্ষণ
না গড়িয়া উঠে, বুঝিবে ভাগবতশক্তি এখনও আমাদের প্রতি বিরূপ।

কিন্তু আমি এ কি দেখিতেছি—দীপ্ত অগ্নিশিখার জায় উজ্জ্বল ত্যাগ
বৈরাগ্যের প্রতিমূর্তি একটা ক্ষুদ্র সমষ্টি মর্ত্যের সকল অশুদ্ধতাকে দুই
হাতে ঠেলিয়া পরম্পরের সহিত যোগযুক্ত হইতে উদ্যত, চতুর্দিকেই ঘোর-
তর অন্তরায় প্রকৃতির ছুরীর বিষমশিকি তগোবলে বিদলিত করিয়া কোন্
স্বর্গীয় শক্তিতে শক্তিমান তোমরা, স্বপ্নরাজ্যে আপনাদের মধ্যে মূর্ত করিতে
ছুটিয়াছ? কোন্ অজ্ঞাত অজানা প্রদেশ হইতে যুমুসু ভারতে নবজীবনের
নূতন সঙ্গীত ধ্বনিয়া তুলিয়াছ। স্থলদৃষ্টি যে সেই নরকের বিভীষিকার দ্রুত
ভীত সঙ্কুচিত, আজ তৃতীয় নয়নের বিমল দৃষ্টিতে তোমাদের দেখিয়া
আশায় বুক ভরিয়া গেল, মৃতকল্প প্রাণে তাড়িৎশক্তি ফুরিয়া উঠিল। হে
বাঙ্গালী! দেখ ঐ জলদজালীবৃত প্রাবৃটের ঘনাকার গগন ভেদ করিয়া
তোমার হৃদয়ে ও কোন্ দেবপুরুষের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে—পার্শ্ব-
স্বার্থে আর তুমি ভ্রান্ত নও, দেবজাতির শক্তিবুদ্ধি করিবার অদ্বুত
তগোবল তোমার সর্কাজে পরিফুট—এস তোমায় আলিঙ্গন করি—তারপর
তুগরাজ্যসময়ই দূত রজ্জু যেমন মত্তহস্তী বাধিবার শক্তি ধরে—এই একো
সামঞ্জস্যে পূর্ণ হৃদয়ে পুণ্যময় বিপুল তগোবল সঞ্চয় করিয়া এস স্বদেশজননীর
দেবা করিয়া চরিতার্থ হই—সে সহস্র হৃদয়ের গুঞ্জীভূত জীবনবেগের সম্মুখে

দেশের সকল দুঃখ দীনতা অবসাদ এক মুহূর্তে কোথায় ভাসিয়া যাইবে—
 চূর্তিক মহামারী হাহাকার তার খরতর প্রাবল্যমুখে সমস্তই তগাইয়া যাইবে—
 —সে অমৃতময় অভিষেকে দেশের সমস্ত মলমাটি অভাব সঙ্কট চিরতরে
 ধুইয়া দিবে। এই নবাক্ষরযজ্ঞিত নূতন যুগের প্রভাতে সোণার বাংলার
 অপূৰ্ণ রূপ আবার অলোজ্জ্বল ফুটিয়া উঠুক—আবার কাননে প্রাপ্তরে,
 উচ্ছ্বসিত নদীতটে, বাঙ্গালীগৃহস্থের প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে মধুর কলহাস্য খেলিতে
 থাকুক—আমার সাতকোটি ভাই বোন মায়ের চরণে মাথা নত করিয়া
 পুলকভরে উদাত্ত কর্তে গাহিয়া উঠুক—বন্দেমাতরম্।

ততঃ কিম্

প্রকৃতির যৌৱরক্তনের মর্ত্যবাসীদের সর্বনাশে উদ্যত। মানুষের প্রতি মানু-
 ৱের এমন বিজাতীয় বিদ্বেষ আর কোন যুগে এরূপ কঠোর মূর্তি পরিগ্রহ
 করে নাই। সমরারম্ভে দুর্দ্বর্ষ জৰ্ম্মণী যখন নিরপেক্ষ বেলজিয়মের উপর
 ঝাঁপাইয়া পড়িল, বিমানপোত হইতে অজস্র অগ্নিবৃষ্টিতে লুণ্ঠন, এ্যান-
 টুয়াপ প্রভৃতি জনপদগুলি ভস্মীভূত করিতে আরম্ভ করিল, নিরপরাধা
 মিস্ ক্যাভালের প্রাণসংহার করিয়া জগৎকে শুভিত করিয়া দিল, তখন
 মনে করিয়াছিলাম যুদ্ধান্তে এই সকলের আর পুনরভিনয় হইবে না,
 মার্কিন ফরাসী ইংলণ্ডীয় মনীষীবৃন্দ জগতে চিরশান্তিপ্রতিষ্ঠার একটা স্থায়ী
 বন্দোবস্ত করিবেন, কিন্তু মানুষের অতি বৃহৎ চেষ্টাও বিধাতার ভ্রতঙ্গীতে
 স্বপ্নবৎ প্রতীরমান হইতেছে। ভারসিলিসের শান্তিবার্তা মার্কিন ও ফ্রান্সের
 অধিবাসীবৃন্দ তেমন সাদরে গ্রহণ করিবে কি না সে বিষয়ে এখনও সন্দেহ
 আছে—ইটালীতেও গণ্ডগোল চলিতেছে, চীন সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করে নাই,
 জাপান উদাসীন, মিত্রপক্ষের ত ইহাই সংবাদ—অপরপক্ষে, জার্মানরা জ্যে
 ষোরতর অশান্তি, অষ্ট্রিয়ায় হাঙ্গারীতে বিপ্লব, আর রাশিয়ায়, সে যে কি
 বিভৎস লীলা চলিতেছে তাহা অবর্ণনীয়।

জগতের এই যোরতর অশান্তি দূর করিয়া শান্তির জন্মই মিত্রপক্ষ
 জৰ্ম্মণীকে দ্রুত সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করাইয়াছেন, জার্মানরা জ্যে আভ্যন্তরিক
 অবস্থা তেমন আশাপ্রদ নহে, তবে য়ুসোপের রাষ্ট্রক্ষেত্র বহু দলে বিভক্ত,

উপস্থিত অধিকতর শক্তিশালী দলকে হস্তগত করিয়াই জর্মণীর সহিত সন্ধি হইয়াছে, রাষ্ট্রীয়শক্তি হাতে পাওয়ার এবং মিত্রপক্ষের সহায়তায় নানা বিরোধী দলকে শক্তিশীন করা হয়ত জর্মণীর পক্ষে এক্ষণে তেমন অসম্ভব ব্যাপার নাও হইতে পারে, তদ্রূপ দেশে পূর্ণশান্তি আনয়নের এখনও চের বিলম্ব আছে। অষ্ট্রিয়া-সাম্রাজ্য আজ তিনখণ্ডে বিভক্ত, হাঙ্গারী অষ্ট্রিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, এই হাঙ্গারী রাশিয়ার বলশিভিজ টদের সহিত যোগ দিয়াছে, অন্তিতে পাই জর্মণীর খ্যাতনামা সেনাপতি ম্যাকেন-স্যান হাঙ্গারীর সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করিতেছেন; তুর্কীর অবস্থা আরও শোচনীয়, সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, বোগদাদ হইতে দুইশত মাইল উত্তরে খুর্দিস্থান বলশিভিজ টগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়া দিয়াছে—কাবুল নগর্য হইলেও, সে কি ভরসায় বিপুলশক্তি ইংরাজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল তাহাও ভাবিবার কথা, নূতন আমীর এখনও সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন নাই, এইরূপ অশান্তিবার্তা ভাগতের সর্বত্র হইতে শুনা যাইতেছে, জগৎ যেন প্রলয়মুখী—ধ্বংসের আগুণ চতুর্দিকেই ধু-ধু করিয়া জলিতেছে।

তারপর সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর হইলেও জর্মণদেশের সংবাদপত্রগুলি মিত্রশক্তির উপর অনর্গল গালিবর্ষণ করিতেছে, জর্মণজাতির মানসিক অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয় নাই, ইহাই তাহার সুস্পষ্ট পরিচয়। মনের মিল না হইলে চিরশান্তির সম্ভাবনা নাই, কিন্তু যুরোপ মানসিক পরিবর্তনের যে কৌশল তাহা অনবগত, কাজেই বাহিরের কঠোর বন্ধন দিয়া জর্মণীকে এমনভাবে দৃঢ়বদ্ধ করিতে চাহে; যাহাতে-আর উহার ভবিষ্যতে মাথা তুলিতে না পারে।

ফরাসীজাতির উপর এতদিন জর্মণী যে অত্যাচার করিয়া আসিতেছিল, ফ্রান্স তাহা ভুলিতে পারে না। আলসাস-লোরেনের রাজধানী ষ্ট্রাসবার্গ ইউনিভারসিটিতে যে সকল জর্মণছাত্র অবস্থান করিতেছিল, ফরাসী গভর্ণমেন্ট চরিত্র ঘণ্টার মধ্যে উহাদিগকে স্থান পরিত্যাগের আদেশ করিয়াছেন, লেপ্‌জিগের ইউনিভারসিটির প্রতিনিধিগণ, স্ট্রাইডেনের আপশালা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণের নিকট ইহার প্রতিবিধানের জন্য আবেদন করায় ঐ স্থানের কর্তৃপক্ষগণ কলোণিয়া ইউনিভারসিটির সভাপতিকে এই বার্তা জ্ঞাপন করেন, তিনি তাহার উত্তরস্বরূপ বলিয়াছেন—

জন্মণ সমরবাহিনী লুভনের পাঠাগার ও ইউনিভারসিটি যখন নিশ্চয়ভাবে ধ্বংস করে, তখন সুইডেনের আপ্পালা বিদ্যালয়ের প্রতিনিধিগণ কি প্রতীকার করিয়াছিলেন? জগতের সভ্যজাতিসমূহের মানসিক অবস্থার যখন ইহাই পরিচয়, তখন এই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর ফলে জগতে স্থায়ী শান্তির সম্ভাবনা আছে কিনা তাহা সহজেই অনুমেয়।

মুরোপীয় জাতিগণের মধ্যে যে বিদ্রোহ ফলস্বরূপ মত অন্তরে অন্তরে বহমান, সুযোগ হইলে উহা যে আবার ভীষণ মূর্তি পরিগ্রহ করিবে না তাহা কে বলিতে পারে?

সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে, পের্টোগ্রাডে আটশত বিদেশী লোককে বলসেভিক গভর্নমেন্ট তোপের মুখে উড়াইয়া দিয়াছে, আঠার হাজার লোক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে—এইরূপ লোমহর্ষণকারী সংবাদ পৃথিবীর চতুর্দিক হইতেই প্রতিদিন আমাদের বিশ্বয় উৎপাদন করিতেছে, এমন লোকহত্যা করণ ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে আর নাই বলিলেও চলে।

প্রকৃতির রক্তমূর্তি স্বাধীন দেশের রক্তপান করিয়াই নিশ্চিন্ত নহেন, অস্থিকঙ্কালসার নিরীহ ভারতবাসীর উপরও তাঁহার দণ্ডাঘাত সমানভাবেই চলিয়াছে। হুর্ভিক্ষে মহামারীতে ভারতের বহু জনপদ একেবারেই উৎসন্ন গিয়াছে; সম্প্রতি রাজকোষে ভারতবর্ষ বিপর্যস্ত। কি অন্তর্ভক্ষে রাউলট বিলের কথা উত্থাপন হইয়াছিল, কি অন্তর্ভক্ষেই মহাত্মা গান্ধী সভ্যগ্রহ প্রচার করিয়াছিলেন, শান্তিপ্রিয় ভারতবাসী কোটাকর্থে ইহার প্রতিবাদ করিতে গিয়া অনর্থক আত্মবলি দিল, পঞ্জাবের শোচনীয় সংবাদে ভারতের হৃদয় যে কিরূপ ব্যথিত মর্ম্মাহত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার বিশদ বর্ণনা করিবার সাহস আমাদের নাই, কেবল একবিন্দু অশ্রু অধিরূপ উপহার দিলাম।

লালা হরকিশনলাল, লালা হুনিচাঁদ, পণ্ডিত রামভূজ দত্তচৌধুরী প্রভৃতি লাহোরের বিশিষ্ট নেতৃগণ দীপান্তরিত হইয়াছেন, তাঁহাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইয়াছে; অমৃতসরের সাহুদিন কিচলু সত্যপাল প্রভৃতিও উক্তদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন—হায় সভ্যগ্রহ! তপস্বী গান্ধীকে নিমিত্তস্বরূপ করিয়া পঞ্জাবের মৃত্যুশেল তুমি, আজ নিকপদ্রব স্বদেশীতে পর্যাবসিত হইয়াছ।

দোষ-কাহারও নহে, প্রকৃতির রক্তলীলা—জগতে কত রাজ্য ভাঙ্গিয়াছে—

গড়িয়াছে তাহা আমরা দেখিলাম, একরায়ে ক্রশসম্রাট জারের শিরো-
মুকুট ধুলার লুটাইয়া পড়িল, পলাকের মধ্যে দুর্দমনীয় জর্জগাধিপতি
কাইজার পথের ভিখারী সাজিল, কত কনষ্ট্যানটান, ফারডিন্যান্ডের
লালাটপ্রদেশ হইতে রাজতিলক এক নিমেঘে মুছিয়া গেল, তাহার ইয়ত্তা
কে করিবে? তামসিক অগস শয়নে নিদ্রিত ভারত—যুদ্ধবিগ্রহে উতাজ-
না হইলেও প্রকৃতির অব্যর্থ আঘাত হইতে তাহার পরিত্রাণ নাই।

জগৎ আজ শান্তিপ্রার্থী। প্রতিবিধিৎসাপরায়ণ যুরোপ এই শান্তির
প্রতিষ্ঠা কেমন করিয়া করিবে? গ্রীষ্টের অসাধারণ মহিষুতার মন্ত্র যুরো-
পের প্রাণস্পর্শ করে নাই, শত্রুর প্রতিও কেমন করিয়া প্রেম প্রদর্শন
করিতে হয়, যুরোপ তা জানে না, যুরোপে দানবীর শক্তিই প্রধান,
এই অন্ধ আনুতিকশক্তিতে উদ্ভূত হইয়া, কেবল মায়াজাল রচনা করিয়া
জগতের অশান্তিকে তৈলিয়া রাখাই যুরোপের ধর্ম।

ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য সম্মোহনে মুগ্ধ হইয়া, এই পশুবলকে জাগ্রত করি-
বার প্রয়াস করিয়াছিল, এবং এই প্রচেষ্টা একেবারেই যে তিরোহিত
এমন আমরা বলি না, কিন্তু ভারতের নূতন শক্তি পশুবলের উপর আস্থা-
পরায়ণ নহে। ভারতে রাউলাট বিল প্রবর্তনকালে মহাত্মা গান্ধী ইহার
প্রতিবাদকরে যে অস্ত্রপ্রয়োগে মানস করিয়াছিলেন, তাহা একান্তই আধ্যা-
ত্মিক, জাতির অন্তঃশক্তিই ইহাতে জাগ্রত হইয়া উঠিবে। যদিও সেই
অন্তঃসাধনার প্রথম অঙ্গপাত অভাবনীয় দুর্ঘটনার রক্তরঞ্জিত হইয়া উঠিল,
নিদারুণ ঘাতপ্রতিঘাতে মানুষের মধ্যে সুপ্ত অন্ধ রিপু দাউ দাউ করিয়া
জ্বলিয়া উঠিল, প্রতিহিংসার আলামত দাবানল পঞ্জাবের ভাগ্যাকাশ সহসা
তপ্তধুমোচ্ছন্ন করিয়া দিল, প্রকৃতির রক্ত অট্টহাস্যময় এই কঠোর জড়জিমা
বিধাতার দ্বন্দ্বজ্য বিধান বলিয়াই মানিয়া লইতে হইবে।

জাতিগত সাধনার স্রোত যদি সত্যি বিধাতার নিগূঢ় অভিপ্রায় লইয়া
দেশের বুকের উপর আসিয়া থাকে, আজই অমৃতের সন্ধান না মিলুক,
অনর্গল গতির মুখে চলিতে চলিতেই মঙ্গলময়ের সে অভিপ্রায় একদিন
অভিব্যক্ত হইয়া পড়িবে। একান্ত জটিল জীবন-সমস্যারও একটা শেষ
সীমাংসা বিধাতার কল্পপটে আছেই আছে—এই বিপুল জাতির ভাগ্য-
নাট্যের বর্তমান পরিচ্ছেদই তাহার শেষ পরিচ্ছেদ নয়—ভগবানের
স্বপ্নবিধানের উপর আটুট-শ্রদ্ধাবান হইয়া জীবনপথে চলিতে চলিতে

সে অনাগত ভবিষ্যতের অবরুদ্ধ পৃষ্ঠাগুলি একে একে খুলিয়া যাইবে।
ব্যর্থ উদ্ভাদনার সৃষ্টি করিয়া অনর্থক লোকক্ষয়কর দুর্ঘটনার জন্মান করা
বিধাতার অভিপ্রেত নহে—পঞ্জাবের অস্থিরকাল চূর্ণ করিয়া আজ যে উৎ-
কট প্রায়শ্চিত্ত চলিয়াছে—তাহার পুনরভিনয় কোথাও আরার ঘটলে মৃত-
কল্প দেশের শেষ জীবনকণিকাটুকুও নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। কিন্তু মহাত্মা
গান্ধী ভারতীয়-রাষ্ট্রক্ষেত্রে যে নূতন প্রবাহ-বহিয়া আনিলেন, জাতির
জীবন রক্তস্রোতগোচর বলিয়া ইহার প্রথম বিকাশ-বীভৎস হইলেও,
বিপন্ন দেশ আজ অসমাপ্ত নাট্যের শেষ অঙ্কের জন্ত গান্ধীরই মুখ চাহিয়া
রহিয়াছে, এবং রাউলট বিলের উচ্ছেদ-প্রেরণা যদি তাঁর সত্য প্রেরণাই
হয় তবে তাহার প্রভাবও তাঁহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছে। এইরূপ
অবস্থায় সহজেই সত্যগ্রহের পুনঃ প্রবর্তনার কথাই মনে আসে, তাই ওই
জুলাই আমেদাবাদ হইতে তাঁহার এইরূপ ঘোষণাবাদী পাইয়া আমরা
বিস্মিত হই নাই।

“If civil disobedience has to be renewed it shall be
offered in the first instance by me only as being the
one fitted to do so. I have suggested that civil dis-
obedience by others should not be taken up for at
least one month after my incarceration.”

অর্থাৎ যদি বৈধভাবে আইনভঙ্গপর্ব পুনরায় আরম্ভ করিতে হয়, তাহা
হইলে সর্বপ্রথমে আমাদেরই তাহার সূত্রপাত করিতে হইবে—সর্বতোভাবে
আমিই তাহা করিবার অধিকারী। আমার প্রস্তাব আমার অবরোধের
পর অন্ততঃ একমাসকাল না যাইলে যেন অন্য কাহারও দ্বারা আইনভঙ্গ-
আন্দোলন পরিগৃহীত না হয়।

গুজরসিংহের যোগ্য আত্মঘোষণা হইলেও, ভারতের জীবনে দক্ষিণ
আফ্রিকার কর্মপ্রণালী কোন মতেই উপযোগী হইবে না। প্রকাশ, বোম্বা-
য়ের গভর্নর জর্জ লয়েডের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি পুনরায় সাময়িক-
ভাবে সত্যগ্রহ স্থগিত রাখিয়াছেন।

আমরা গোড়া হইতে বলিয়া আসিতেছি, ভারতের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে
হইলে, তাঁহার মত বিচক্ষণ ব্যক্তিকেও আবার নূতন করিয়া তপস্যা
করিতে হইবে, এতদ্বিষয়ে আমরা আর কোন কথা বলিব না, ইতিয়ান

ডেলি নিউজ বাহা লিখিয়াছেন, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া আমাদের মত ব্যক্ত করিলাম।

“Let Mr. Gandhi manufacture fit medium first and then think of popularising such a subtle, albeit, noble idea as the subjugation of brute force through the agency of soul force. Let him live at Point Loma some time.”

অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধী প্রথমে উপযুক্ত আধার প্রস্তুত করুন, তারপর অধ্যাবসায়ের সাহায্যে পুণ্ডবলের নিরসন করিবার স্থল অথচ মহান ভাবের প্রচারের কথা চিন্তা করিবেন। এখন কিছুদিন নীরব সাধনার জন্ত নির্জনবাসই তাঁহার পক্ষে শ্রেয়ঃ।

আজ মনে পড়ে সেই আদি তপঃসাধক রত্নাকরের কথা। ভারতবর্ষকে মরিয়া মরিয়া পুণ্য তপোবল অর্জন করিতে হইবে। বাকীকের স্তূপ আত্মস্থ সাধকের উপর গভীর অবলোপ ঢাকিয়া দিলেও, সেই পুঞ্জীকৃত আবর্জনা দ্বারা ভেদ করিয়া সাধকের তপঃশুদ্ধ কণ্ঠে অমর রাম নাম বহুত হইয়াছিল—তপস্বীর জীর্ণ তকঙ্কালের মধ্য হইতে যে সঞ্জীবনী মন্ত্রশক্তি ফুটিয়া উঠিল—সেই অমর মহামন্ত্রেই না গৌরবোজ্জ্বল ত্রেতাযুগের দীক্ষা? আমরা যে অমর, অস্থি মাংস ধও ধও হইয়া থমিয়া পড়িলেও, বাহিরের পরিচ্ছদ আঘাতে আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইলেও, অন্তস্তম সত্তা তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না, পুঞ্জীভূত হৃৎকথার সহিয়া সহিয়া সেই চিরঅমৃতময় দেবতার পুণ্যস্পর্শ মিলিবেই—বাহিরের আচরণেও যেদিন আমরা তাহার সাক্ষ্যপ্রদান করিতে পারিব—সেই দিনই ভারতের সনাতন সত্য সমগ্র বিধে তাহার বিজয়বৈজয়ন্তী উড়াইয়া দিবে।

আমরা এই অমৃতপথের যাত্রী—বাংলার মহাকবির উদাত্ত-বীণায় আজ সুরসগুমে এই সঙ্গীতই বাজিয়া উঠিয়াছে—বাংলার নূতন—তাহারও আজ শান্ত সমাহিত আত্মপ্রকৃতিস্থ—হৃৎকথা-সাধনার অগ্নিপরীক্ষায় জীবন রিঙদ্ধ হইলেই অচিরে ভারতের সত্যস্বরূপ জ্যোতির্শয় বিগ্রহে আবির্ভূত হইবে। একপ অবস্থায়, জগতের মহাকল্যাণ ভারতবাসীর ভিতর দিয়াই যে ফুটিয়া উঠিবে, তাহা আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি।

সিদ্ধমार्গ

আমার জীবন যে আমার নহে, ভগবানের, এই মহাসত্যকথাটা মনে রাখিতে পারি না বলিয়াই, আমাদের ক্রমে উৎসাহ নাই, ভোগে সামর্থ্য নাই, সাধনায় আনন্দ নাই। অনন্ত কালকে সম্মুখে রাখিয়া নিঃসংশয়চিত্তে দিনের পর দিন কাটাইয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হওয়া আমাদের পক্ষে যেন সম্ভবপর নহে, প্রতি পদেই চিন্তা সংশয় বৃদ্ধ, কোন্ পথে চলিয়াছি তাহা জানি না—চাঞ্চল্য, অধৈর্য্য, অবिवেকতা এইগুলি আমাদের নিত্য বাধা, গতির পথ জটিল অন্ধকারময়; ঋজু, স্থিতিস্থত দিব্যপথটি হারাইয়া আত্মা ভরত-বর্ষ দিগন্তান্ত, নৈরাশুপূর্ণ হৃদয়ে দিন দিন দুর্গমপথেই যাত্রা করিয়াছে।

অপথে, বিপথে চলার যে ক্রি দুর্গতি, তাহা ভুক্তভোগী পথযাত্রী, আমাদের অবিদিত নাই, কিন্তু বিশাল জাতির এই প্রবল গতিপ্রবাহ, ইহাকে রোধ করিবে কে? কোন্ পথে চলিতে আরম্ভ করিলে আবার আমরা আকাশের আলো দেখিতে পাইব, আবার স্বর্গকিরণ-উদ্ভাসিত সুনির্গীত সুরল সুন্দর পথটি ধরিতে পারিব? মরীচিকাদ্রাস্ত মৃগের মত বহবার বহুদিকে ধাবিত হইয়াছি, পথের আধার নিবিড়তর হইয়াছে, চলিয়াছি কাতারে কাতারে অসংখ্য মানুষ, কিন্তু পরস্পরের প্রতি এমনই অবিশ্বাস, এমনই ঘৃণা, এমনই বিদ্বেষ, জন্মিয়াছে, যে আর কাহারও কথা শুনিতে প্রবৃত্তি যায় না; কাহারও উপদেশ গ্রাহ করিতে ইচ্ছা হয় না; কেহ ত কাহারও প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে না, সহানুভূতি দেখায় না, একপথের যাত্রী হইয়াও আমরা যেন পরস্পরের শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছি, নৈরাশ্রে, অবসাদে আমাদের অন্তরুত্তি কঠোরমূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে, দয়া নাই প্রেম নাই পরহঃসংকাতরতা নাই। আপনাকে বাঁচাইয়া চলাই যেন এ পথের ধর্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মুষ্টিমেয় তাহারি যাহাদের মধ্যে এক নূতন প্রেরণা, নূতন আশা স্থান

সাইয়াছে, দুর্বল তাহার, যাহারা আপনাকে তিল তিল করিয়া জাতির চরণতলে আত্মবলি দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে, অসহায় তাহার। যাহারা আত্মবলে জাতির পরম সহায় যাহা, তাহার সন্ধান করিতে বাহির হইয়াছে। শত উপেক্ষা, শত তিরস্কার, শত লাঞ্ছনা হাসিমুখেই তাহার সহিবে, সহিষ্ণুতার উপরই তাহাদের ভিত্তি, জাতীয় প্রেম তাহাদের শক্তি, ভগবানই তাহাদের একমাত্র সহায়। উলঙ্গ নবজাত শিশুর মত, আজ এই নবোন্মিত নতুন জাতি মর্ত্যসম্পদে একেবারেই বঞ্চিত, ক্ষীণ করুণ কাতর-কণ্ঠে, আত্মহারা জাতির কর্ণে নতুন মন্ত্র ধ্বনিত করিতেছে—
 হে ঋষিপুত্রগণ—এই দারুণ দুঃস্বপ্নের যুগে ভারতের প্রাচীন সনাতন সাধনাকেই সর্বপ্রায়ে অবলম্বন কর, দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া দেখ, তুমিই তোমার সহায়, তোমার মধ্যেই দিব্যপথের সন্ধান রহিয়াছে, তুমিই জৈশ্বর, তুমিই তোমার একমাত্র নিয়ন্তা—আর বিলাস্ত হইও না, আর কাহারও নির্দেশে আত্মজীবনকে অন্ধতম পথে পরিচালিত করিও না, সর্বপ্রায়ে আপনার উপর অগাধ বিশ্বাস স্থাপন কর, আপনাতে সর্বোপেক্ষা অধিক প্রত্যাশাম্পন্ন হও, আপনার পথ আপনি চিনিতে না পারিলে, স্বয়ং ভগবান মূর্ত হইয়া পথ নির্দেশ করিলেও, অন্ধের মত তাঁহার হস্ত ধরিয়া চলিও না; তুমি অন্ধ নও, অজ্ঞ নও, অক্ষম নও, তোমার ভিতর যিনি সুপ্ত আছেন তাঁহাকে জাগ্রত কর, বাহিরের সহায় যত বড়ই হউক তাহা বিষবোধে পরিত্যাগ কর, কেননা ইহা তোমার আত্মসম্পদকে দূর হইতে দূরেই নিক্ষেপ করিবে, অন্তরের ভগবানকে কোন কালে জাগাইয়া তুলিবে না—
 ভারতের সংস্কারদ্রুতি ভক্তিমার্গে মজিয়া আর পরের চরণে আত্মহত্যা করিও না, অহং ব্রহ্ম এই শক্তিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হও।

ভগবান্ সর্বভূতে সমানভাবেই বিরাজ করিতেছেন, মানুষ ভগবানেরই প্রতীক। মানুষের মধ্যে যে সাধনা, যে কর্ম, যে তপস্যা চলিয়াছে, ইহা মানুষের জন্য নহে, ভগবান্ই অন্তরতম প্রদেশ হইতে বাহিরে তাঁহার ঐশ্বর্য বিকাশ করিয়া তুলিবার ইচ্ছা করিতেছেন। সেইজন্য আমরা ত সাধক নহি, আমরা ত কর্মী নহি, আমরা তো আমরা নহি, আমরা ভগবান্, সাধক ভগবান্, কর্মী ভগবান্। স্বাসে প্রস্থাসে ভগবান্কে এমনই নিকট হইতে নিকটতর করিয়া দেখিতে শিক্ষা কর, আপনাকে ভাগবতময় করিয়া তোল, ঠাকুরের সেই অমর উপদেশের উপমা উদ্ধৃত করিয়া বলি—

“বিষ্ণু পরিত্রিতো বিষ্ণুঃ

বিষ্ণুঃ খাদতি বিষ্ণুবে।

কথং হসসি রে বিষ্ণো

সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ ॥

তোমরা বলিবে, ইহা ত ব্যষ্টির সাধনা; ইহা ত তুরীয়ের, ইহা ত ইহজগতের নহে, এই সাধনার দ্বারা মর্ত্যের দুঃখ-দূর হইবে কেমন করিয়া, সর্বং ব্রহ্মৈব জ্ঞান ত ভারতে বহুবার প্রচার হইয়াছে, বহু সাধক ত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছে, পৃথিবীর যে নরকযন্ত্রণা তাহার লাঘব হইয়াছে কৈ ?

এতকাল ভগবান্ ব্যষ্টি লইয়াই আপনার দিব্যঐশ্বর্য্য বিকাশতৎপর ছিলেন, আজ তিনি সমষ্টিসাধনার ইচ্ছাপ্রকাশ করিয়াছেন, শুনিতেছ না, নরদেবের কণ্ঠে তাঁর মঙ্গল বিবাণ কি উদাত্তস্বরে বাজিয়া উঠিয়াছে—“The Yoga that we practise is not for ourselves but for humanity”

প্রথম আপনার মধ্যে ঈশ্বরের বিকাশ অনুভব কর, তারপর দেখ সেই পরমাত্মা সর্বজীব। যখন সর্বজীব, আপনাতে যে সত্তা অনুভব করিবে, সেই সত্তা পরম্পর পরম্পরের মধ্যে দেখিতে শিক্ষা করিবে, তখনই বুঝিবে শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মরাজ্য অচিরে ধরায় প্রতিষ্ঠিত হইবে।

আজ ভারতের জীবনপ্রবাহকে কেবলই কর্ম্মের অন্তর্গত করিয়া মুক্তির উপায় নির্ধারণ বাহারা করিবেন, তাহারা ভারতের জটিল জীবন অধিক-তর জটিল করিয়া তুলিবেন, ইহা নিঃসন্দেহ জানিও—কর্ম্ম হইবে মানুষ্যের চেষ্টায়-নহে, ভগবানের ইষণায়। পাশ্চাত্য সম্রোহনে বিমুক্ত ভারতের বুদ্ধিমান্ জীব ভাবিতে পারেন, আদর্শ উত্তম হইলেও, কোনকালে ইহা সফল হইবার আশা নাই, অতএব আইস-যাহা সম্ভব, যাহা করিতে পারা যায়, তাহাতেই আত্মনিয়োগ করি—জগতের চতুঃসীমা সকলের পক্ষেই অবাধ, দক্ষিণদিকে যাত্রা করিলে কেহই বাধার আঘাতে ফিরিয়া আসিবে না, কিন্তু কোন্ পথ অমৃতের ইহা নির্ণয় করিবার জন্য ভগবান্কেই নেতৃ-রূপে বরণ করিয়া লইবার বিলম্বটুকুতে ধৈর্য্যহীন হইলে, জগতের এই স্নগহং কর্ম্ম তাহার অধিকার নাই ইহা ধ্রুব জানিও।

আমরা আজ করিব কি ? এই বিপুল জাতির জীবন মন্বন করিয়া অমৃত আহরণ করিব। আজ বাহারা আত্মোপলব্ধির অমর মন্ত্রে দীক্ষালাভ

করিয়েছেন তাঁহাদিগকে স্বরণ রাখিতে বলি, ভগবানের ইচ্ছা ব্যাপ্তিজীবনের মুক্তির জন্য নয়, জাতিগত মুক্তিই তাঁহার অভিলাষ, অতএব আমাদের এই আত্মসমর্পণ যোগ জাতিগত সিদ্ধির জন্য—জাতির হৃদয়, অশুদ্ধি, অন্ধতা, সমস্তই আমাদের অসাধারণ ধৈর্য্যসহকারে সহ করিয়া যাইতে হইবে, ভগবানই সাধকরূপে আমাদের জীবন নিত্য নূতন করিয়া গড়িতেছেন, সাধকগণ অনবরত মনে রাখিবেন, যে আত্মা আপনার মধ্যে থাকিয়া কোনও বিশেষ কর্মরত, সেই আত্মাই অন্য সাধকের মধ্যে আত্মা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক কর্ম করিতেছেন, প্রকাশের তারতম্যে আমাদের অন্তরগত মিলনের ব্যাঘাত ঘেন না হয়।

আত্মদর্শী দন্দভোগ করে না। যে আত্মা স্তব্ধ ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া অসংখ্য জীবনের উপর কর্তৃত্ব করিতেছে, সেই আত্মাই আবার মর্ত্তণ্ড-কিরণ-বলসিত কৃষিক্ষেত্রে কঠিন মৃত্তিকার উপর হলচালনা করিতেছে, আমিই যুগপৎ নৃপতিরূপে রাজ্যশাসন করিতেছি, প্রজারূপে রাজকর সংগ্রহ করিতেছি, ভৃত্যরূপে প্রজুর সেবা করিতেছি, বিখনাটোর অনন্ত ভূমিকা বিচিত্র সজ্জায় অভিনয় করিয়া চলিয়াছি। ভারতের কোটি কোটি অধঃপতিত নরনারীর ভিতর এই দিব্যজ্ঞান একদিনে বিকশিত হইয়া না উঠিলেও, আজ আমরা ধীরে ধীরে আইস ব্যাপ্তির পথে অগ্রসর হই—আজ যে দেবজাতি ক্ষুদ্রাকারে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ভারতের এই অমর জ্ঞান প্রতিষ্ঠালাভ করুক, ভগবানের ইচ্ছায় ভগবানের শক্তিতে আমাদের মধ্যে যে দৈবী সামঞ্জস্যের আভাস দেখা দিয়াছে, তাহা মূর্ত হইয়া সমগ্র ভারতে, সমগ্র বিশ্বে এক নূতনজাতির অভ্যুত্থান সম্ভব করিয়া তুলুক, পৃথিবী দেবনিবাসে পরিণত হউক।

রথযাত্রা

আজ রথযাত্রা। রাজপথ জনাকীর্ণ। কেহ রথ দেখিতে আসিয়াছে, কেহ রঙ তামাসা দেখিতে আসিয়াছে, কেহ বা রথ টানিতে আসিয়াছে। যাহারা রথ টানিতে আসিয়াছে, তাহাদের মধ্যেও কেহ কেহ কেবল দড়ি ধরিয়া এদিক ওদিক চাহিতেছে, কেহ পুনর্জন্মের ভয়ে একবার মাত্র স্পর্শ করিতেছে, কেহ কেহ সত্য সত্য প্রাণপণে রথ টানিবার চেষ্টা করিতেছে। রথের চুড়ায় একজন ব্রাহ্মণ অনবরত কঁাসরে বা মারিয়া ঢং ঢং শব্দ করিতেছে, যেন তাহারই ইঙ্গিতে রথ চলিবে, কিন্তু তাহা হয় না, লোকের টানে যখন রথ চলে তখন কঁাসরের শব্দ সে অধিক করিতে থাকে—প্রতিপন্ন করিবার জন্ত, যে ইহা তাহারই আদেশে চলিতেছে। চারিদিকে ফেরিওয়াল, কীর্তনওয়াল, সাদা দৈপতাপরা ষাচক ব্রাহ্মণগণ গামছা ছড়াইয়া পয়সা ভিক্ষা করিতেছে, রাজপথের উভয় পার্শ্বে বারনারী পুরনারী, বৃদ্ধা প্রৌঢ়া যুবতী, স্নন্দরী অস্নন্দরী বহু রমণী কাতারে কাতারে দাঁড়াইয়া। উৎসবক্ষেত্রের ইহারি প্রধান লক্ষণ।

রথ দেখিয়া বাড়ী ফিরিলাম। অধ্যাত্মজগতের কোন্ চিত্র ভারতে এমন মহোৎসবের সৃষ্টি করিল? সমবেত অসংখ্য জনগণের মধ্যে যাহারা রথ টানে তাহারাই দেখিতেছি কর্ম্মী, তাহাদের মধ্যেও একযোগ নাই, একদল উদাসীন তামসিক ভাবাপন্ন, যেন সংস্কারপরবশ রথের কাচি ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে, অপর দল ভারতের বর্তমান সাম্বিক ধার্মিক—পরকালের শ্রেয়ঃ অন্বেষণ করিতেছে, অবশিষ্ট যাহারা তাহারা রাজসপ্রকৃতির—পরস্পরের মধ্যে মিল না থাকিলেও, চীৎকার করিতে করিতে, পরস্পর পরস্পরকে উৎসাহ দিতে দিতে হেঁচকা টানে, রথের গতি আগাইয়া দিতেছে, আর উপরের ব্রাহ্মণ যিনি কঁাসরে বা মারিতেছেন, তিনি ভারতের নেতৃস্থানীয়, জাতির জীবন যখন একটু গতিশীল হয়, তখনই গলা ছাড়িয়া বলেন, ইহা আমার কথায় চলিল, আমিই এসবের কর্তা।

আর সব জনসভ্য তাহার উদ্দেশ্যবিহীন, সময় কাটানই তাহাদের দরকার, সঙ্গে সঙ্গে রঙ তামাসায় আপনাকে ভুলাইয়া, রাজপথ বাহিয়া চলিয়াছে, আর এদিক ওদিক লুকুটুতে তাকাইতেছে।

*

আমাদের জাতীয় জীবনরথখানির অবিকল চিত্র দেখিয়া আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। কয়েকটা লোকের টান যদি না থাকিত, তাহা হইলে রথখানি রাজপথের নর্দমার ধারে পড়িয়া মাটির সঙ্গে মিশাইয়া যাইত। বৎসরান্তে একবার করিয়া ইহার টান হয়, টানের সময় দৃষ্টি পড়ে ইহার চাকা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, চুড়া খসিয়া পড়িয়াছে, রঙ চটিয়া গিয়াছে, প্রয়োজনমত দু'একটা গোঁজা গোঁজা দিয়া একটু রঙ করিয়া, সমস্ত জাতির সম্মুখে রথের টান হয়, তবুও কি উৎসাহ, কি কলরব, কি জয়ধ্বনিতে ভারতের আকাশ মুখরিত হয়!

*

*

*

আমরা আজ এই আত্মরিস্তৃত মহাজাতির মধ্য হইতেই দেবজাতির সৃষ্টি করিতে বসিয়াছি। আমাদের জাতির কোন বিশিষ্ট ধর্ম নাই, বিশিষ্ট কর্ম নাই, বিশিষ্ট বিধি নিয়ম নাই। এমন কোন আচার নাই, কোন বন্ধন নাই, কোন সর্ভ নাই, বাহা মানুষকে ইহার অন্তর্গত হইতে বাধা প্রদান করিবে। সকল মানুষের সমষ্টিশক্তিই ইহার কেন্দ্র, ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ইহার চক্রদণ্ড, আপনাদের মধ্যে সকলকে দেখার যে জ্ঞান, তাহাই ইহার নেমী। এইরূপ চক্রের উপর প্রতিষ্ঠিত যে জাতীয়রথ, ইহার দেবতা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ—আজ আমরা এই রথকে পৃথিবীর রাজপথের উপর দিয়া টানিয়া চলিব, ইহাই আমাদের রথযাত্রা।

*

*

*

তোমরা আমার এই স্বর্ণকিরণপ্রদীপ্ত জীবনরথখানিকে দেখিতে পাই-তেছ কি? ইহার রজতবরণ দীপ্ত রজ্জুগুলি স্পর্শ করিয়াছ কি? না, বিস্ত্রিতনেত্রে অমীর মুখপানে চাহিয়া আছ, স্বপ্নময় বিচিত্র কাহিনী শুনিয়া কেহ বা হাসিতেছ, কেহ বা আমারই মত স্বপ্নঘোরে আপনাকে মাতাইবার জন্ত উন্মাদ হইয়াছ। হে উন্মাদের দল, তোমাদের লইয়াই আমার সোণার স্বপ্নকে সফল করিয়া তুলিব।

*

*

*

আমার এই কল্পনাচিত্রখানিকে পৃথিবীর বুকে ফুট করিয়া তোলা অসম্ভব হইবে না, যদি তোমাদের সহায়তা পাই—সে সহায়তা শুধু কথার নহে, অন্তরেণ অন্তরে যে জ্যোতির্শ্বের পুরুষ আছেন, তাঁহারই সম্মতি তাঁহারই অনুমতি।

*

ধর্ম কি? আত্মস্থিত পুরুষের আদেশ মান্ত করিয়া চলা। সংস্কারাচ্ছন্ন জীবের যে কর্ম, তাহা অন্তরপুরুষের নির্দেশমত বিপুল নহে, তাই আজ তোমাকে সকল সংস্কার পরিত্যাগ করিতে হইবে। রথের দেবতা শ্রীশ্রীজগন্নাথ। শ্রীক্ষেত্রে কে কবে সংস্কার মানিয়া চলে, সেখানে ত জ্ঞাতিবিচার নাই। আর দেবতার আদেশ কি—তঁার হিরণ্ময় রথখানিকে মর্ত্যের কাদামাটির উপর দিয়া টানিয়া আনা। এস আমরা একজাতি, একপ্রাণ, এক ধর্ম ও এক ভগবান্ জানিয়া রথযাত্রা উৎসবে যোগদান করি।

*

*

*

আমাদের এদিক ওদিক চাহিবার আর প্রয়োজন নাই, চতুর্দিকেই আমার মোহিনী মূর্তি বিচরণ করিতেছে, অত্মমনা হইলে সমজোরে টান হইবে না, এস ভগবানের যে আদেশ আজ আমরা পাইয়াছি, তাহা ষোল আনার পূর্ণ করি।

*

*

*

শুধু টান—আর কিছু নয়। পরলোক, সে ভাবনা আমার নয়, ভগবানের। যদি তাঁর ইহপরকাল থাকে, তিনিই তাঁর বন্দোবস্ত করিবেন। তোমার জীবনে যে লীলা প্রকটিত হইতে চায়, তাহাতেই বিভোর হইয়া যাও—এস কোটা কোটা কণ্ঠে সমস্বরে “জয় ভগদীশ” বলিয়া রথে টান দিই, এস হৃদয়ে হৃদয় মিশাইয়া এক সঙ্গে টানি, মনে রাখিও অন্য চিন্তা। আমাদের রাখিলে চলিবে না, শুধু টান, আর উচ্চকণ্ঠে জয়ধ্বনি—“জয় ভগদীশ হরে।”

প্রকাশের চিঠি

মাহুষের সিদ্ধি তখনই—যখন সে দেখে সে ঈশ্বর। ভুক্তি—সর্বভূতে আপনাকে দেখা, এবং সর্বভূতের মধ্যে আপনাকে জাগ্রত করিয়া তোলা। ইহাই এ যুগের সমষ্টি সাধনার একমাত্র ইঙ্গিত।

অবশ্যই আপনাকে পরিপূর্ণভাবে জানা ও পাওয়ার সাধনাই সর্বপ্রথমে করিতে হইবে, তাহার পর আপনাকে জানা ও পাওয়ার সিদ্ধি জ্ঞান দিয়া জাতিকে উদ্ধৃত্ত করিয়া তুলিতে হইবে, ইহাই তাঁহার আদেশ।

আপনাকে জানা ও পাওয়ার সাধনা—আত্মসমর্পণ মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়া। খাসে প্রাধাসে অনুভব করা, যে ভগবানই সাধক, আমি কিছুই—নহি, “আমার জীবন তোমার তরে এই কথাটি মনে রাখা।”

এই মন্ত্রলাভ জীবনের প্রথম প্রভাতেই ঘটয়া উঠে না—মাহুষই সাধকরূপে সাধনার পথে অগ্রসর হয়, মূলেই মত্ত ভুল থাকিয়া যায়, বাহ্যকে নিরসন করিতে হইবে, তাহাকেই বৃহৎ করিয়া তোলার শ্রেষ্ঠ পথ ইহাপেক্ষা আর কি আছে? ভগবানকে না পাইয়া আপনি বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইয়া উঠি, হয়ত পরিণামে পরমজ্ঞান লাভ ঘটিতে পারে, কিন্তু আত্মমুক্তিই হয় তখন জীবনের আদর্শ,—অনন্তকোটি জীবের মধ্যে আমার অবস্থিতির কথা একেবারে বিস্মরণ না হইলেও, তাহাদের স্ব স্ব সাধনার উপরই তাহাদের মুক্তি নির্ভর করে, অতএব মুক্তিবান্ধা জীব-জগতে ঘোষণা করিয়াই জীবনের উদ্দেশ্য শেষ হইয়া যায়।

আমি আমার মধ্যেই তোমায় যদি দেখি, আমার অথও সত্তা যুগপৎ উভয়কে আকার দান করিয়াছে ইহা সত্য অনুভব করিতে যদি পারি, তবে আমার সিদ্ধি তোমার জীবনে কেন না চালিয়া দিতে পারিব? আমার মুক্তি ও সিদ্ধি সমগ্রজাতির মুক্তি সিদ্ধি আনয়ন করিবে—এই অসাধারণ বিশ্বাসে আমার জীবন ভরিয়া গিয়াছে। তুমি যখন আসিলে, তখনই বুঝিয়াছিলাম তুমি এবারও থাকিবে না, এবং থাকার তত প্রয়োজনও নাই। আমার অন্তর, তোমার শত বিরুদ্ধভাবপূর্ণ অন্তরকে জয় করিবার জন্য নিয়ত সংগ্রামরত, তুমিও ইহাতে সম্মত হইয়াছ, তোমার

স্বীকারপত্র পাইয়াই আমি অভিমান করিয়াছি—তুমি আমার শাস্তিপ্রার্থী কেন? দ্রষ্টব্যরূপ অসীম ধৃতিসহকারে আমার খেল দেখিয়া যাওয়াই ত এক্ষণে তোমার একমাত্র সাধনা।

কিন্তু অতীতের প্রভাব একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয় না। জন্মজন্মান্তরের যে ধর্মসংস্কার জীবনের স্তরে স্তরে বিস্তৃত হইয়াছে, তাহার আমূল উচ্ছেদ করিয়া একেবারেই নূতনশক্তি পূর্ণাধিপত্য করিতে পারে না। ইহজন্মেরও আবাল্যসংগৃহীত সাধনস্তূপ পুঞ্জীভূত হইয়া জীবনক্ষেত্রের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, তাহাদেরও একটা প্রচুর শক্তি আছে। তুমি আজ অনুমতি দিয়াছ—কোনও এক নূতন শক্তিকে সাধক অথবা সাধিকারূপে জীবনের পূর্ণতা আনয়নের জন্য, সে শক্তি তোমারই অভিমতে তোমার মধ্যে নিঃসংশয়ে কার্য করিয়া চলিয়াছে, কিন্তু পুরাতনের সহিত তাহার তুর্ল সংগ্রাম তোমাকে কিছু অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবে বৈ কি।

যখন আবেগ ছিল, নবানুসরণের তরল তরঙ্গ যখন প্রাণমন উদ্বেলিত করিয়া প্রবল বন্যার ছায় ছুটিয়াছিল, তখন পুরাতন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল, পরস্পর সম্মিলন হইয়া নূতনকে বিভা-
ড়িত করিবার যড়যন্ত্র করিতেছিল, আশ্রয় উপরের উচ্ছ্বসিত তরল ফেনপঞ্জ বিলীন হওয়ায়, জীবনের সত্য হওয়াটুকু ফুটিয়া উঠিয়াছে, উহা বাহিরের দিক হইতে দেখিলে খুব একটুখানি বলিয়াই বোধ হয়, এই অবস্থায় উহাকে এক আঘাতে দূরীকৃত করা সহজ বোধেই পুরাতন পূর্ণশক্তিতে ইহার উপর ঘা দিতে থাকে, কিন্তু বাহিরের প্রকাশ ক্ষুদ্র হইলেও, ইহার ভিত্তি দৃঢ়বদ্ধ এবং নিত্য বিকাশমান। সুতরাং সংগ্রামই চলিতে থাকে, পুরাতন আর কোন মতেই স্থান অধিকার করিতে পারে না, যতকাল সংগ্রাম ততকালই সাধকের বহিজীবনে অশান্তির লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়, নূতন শক্তি যখন আভ্যন্তরিক রাজ্যগুলিকে পূর্ণভাবেই অধিকার করিয়া ফেলে তখনই পূর্ণশান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

আজ বুদ্ধিতে যে মন্ত্র স্থান পাইয়াছে, তাহা বুদ্ধির সবখানি অধিকার করিয়া, মন প্রাণ ও আমার সমস্তটা অধিকার করুক, আমি তোমাময় হইয়া যাই, আমার মধ্যে তোমাকে এবং তোমার মধ্যে আমাকে এবং এই মন্ত্রে দীক্ষিত সকলের মধ্যেই এই লীলা দেখিতে থাকি, এইরূপ ব্যাপ্তি দ্বারা জগৎ-আত্মময় জ্ঞান লাভ করুক, যাহা প্রচ্ছন্ন তাহা আঁকি

পরিষ্কৃত কর, যাহা গোপন তাহা প্রকাশ করিয়া দাও, যাহা সত্য তাহা মিথ্যার বিচিত্র আরণ্য ভেদ করিয়া উদ্ভাসিত হউক, এক দৈবীসামঞ্জস্যে সর্বত্র ভারতের হৃদয়, তারপর সমগ্র বিশ্ব পরিপূর্ণ হউক, পৃথিবীতে স্বর্গের আলো ফুটিয়া উঠুক।

যাহারা এই অসাধারণ ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের ক্রমশঃই নিবিড়ভাবে একত্র হইতে হইবে, তাঁহাদের ভাষা ভার্য্য দেশভেদে পৃথক হইবে না, মানুষ ত বাহিরের শক্তিবলেই নিয়ন্ত্রিত নয়, অন্তরের শক্তি দিয়াই তাহাদের বিকাশ, এই অন্তরের মিলন সিদ্ধ হইলে, বাহিরের বিষ অনায়াসেই জয় করা যাইবে।

আজ আমার অন্তরে কি দেখিতেছি, আমার সত্তার আনন্দম্পন্দনে আজ তোমার পত্র লিখিতেছি, আমারই সত্তা আমার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আজ দেশ দেশান্তরে ফিরিতেছে, আমারই সত্তা আজ আমার নিকট হইতে অনুমতি চাহিয়াছে; শক্তি চাহিয়াছে, আমারই সত্তা তুমি, তোমারই সত্তা আমি; ভিন্ন সজ্জায় ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকার অভিনয়, জগতের সব লোকের মধ্যে আজই এই জ্ঞান সম্ভবপর না হইলেও তোমার আমার মধ্যে যে ঐক্য, যে প্রেম, যে আনন্দ উছলিয়া উঠিতেছে, তাহা যদি মিথ্যা না হয়, সমগ্র মানবসমষ্টির মধ্যে তাহা একদিন সম্ভব হইবে না কেন? বিশ্বাস কর, সার্থক কর আমাদের মিলনকে—নূতন জগতের আমরাই অগ্রদূত।

আমি তোমায় 'কিলসকি' লিখিতে বসি নাই, তোমার ভিতর থাকিয়া সেই হৃদয় প্রদেশের রসাস্বাদন করিতে চাই; এবং তুমি যদিও ইহা নানা সংস্কারপরবশ সর্বদা অন্তর্ভব করিতে না পার; জানিও আমি নিরবচ্ছিন্ন দ্বারায় তোমারই মধ্যে অবস্থান করিতেছি, তোমার সকল কর্মের ভোগ সে তোমার নহে, আমার—তুমি মুক্ত, তুমি সিদ্ধ, অথও বিশ্বাসে আমাকেই দেখিয়া যাও।

আর কি লিখিব—জগতের সব চেয়ে বড় বিষয় যে মৃত্যু—সেও তোমার সহিত আমার অমর সম্বন্ধের দৃঢ় বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিবে না, আমি যে তোমারই—যাই কর, এই কথাটি সর্বদা মনে রাখিও। আমি হীন হইতে হীন, ভূগাপেক্ষা তুচ্ছ; কিন্তু প্রকাশের ক্ষেত্র পাইলে শত স্বর্গের প্রধর বিকিরণ আমার নিকট হীনপ্রভাতি কেন জানি না! তোমার কাছে আমার আজ অর্কপ্রকাশে আনন্দ হইতেছে, লেখনী ধারিতে চাহে না—তবুও নীরব হইলাম।

তুমি এবার আসিতে পারিবে না—তাহাতে কি আসে যায়? আমরা-
দের আনন্দের মেলা স্বরণ রাখিও। যাহারা আসিতে চাহিয়াছেন তাঁহা-
দের প্রেমস্পর্শ সত্য সত্যই অনুভব করিতেছি, কিন্তু এখনও তাঁহাদের
দর্শন করিবার আমার সময় আসে নাই, অনুগ্রহপূর্বক আর কিছুদিন
তাঁহাদের অপেক্ষা করিতে বলিবে, তোমার মধ্যেই আমাকে দেখিতে
শিখিবার উপদেশ দিও, তোমার বাণীতেই আমার বাণীর স্বাক্ষর শুনিতে
বলিও, এইরূপ করিলে সত্যসাক্ষাৎ সম্ভবপর হইবে, নতুবা এই রক্তমাংসের
চিপি, কেবল হাসি আর খেলা দেখিয়া তাঁহাদের কি হইবে? আমি
তাঁহাদিগকে সর্বান্তঃকরণে ধন্তবাদি দিই, যে এত দয়া তাঁদের, এক সুদূর
দেশে আসিয়া আমার দর্শন দিতে চাহেন, আমি দূর হইতেই তোমার
ভিতর দিয়া তাঁদের আলিঙ্গন দিতেছি—অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করিতে বলিবে,
সময় আসিলেই আমি তাঁহাদের নিজেই আহ্বান করিব। আমার এই
নিষেধে তাঁরা যেন ক্ষুব্ধ না হয়েন, ভবিষ্যতে আরও ভাল করিয়া দেখার
সাধ আছে বলিয়াই এত কথা বলিলাম। আমার ভালবাসা জানিবে।

ইতি—

জীবন-যোগ

১৯০২ সালে যখন স্বামী বিবেকানন্দ মরধাম পরিত্যাগ করিলেন, বাংলার
যনতমসাচ্ছন্ন গগন থেকে যেন শেষ জ্যোতিষ্কটুকুও নিভিয়া গেল—কেবল
সেই গ্রহরাজকে বিরিয়া যে ক্ষুদ্র জ্যোতির্গর মণ্ডলটি দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইয়া
উঠিয়াছিল, তাহাকেই অবলম্বন করিয়া ঠাকুরের দিব্যশক্তি ইত্যন্তঃ কতক-
গুলি কেন্দ্র স্থাপন করিয়া দেশে ধর্মপ্রবাহ বহমান করিয়া রাখিল। যুগ-
প্রবর্তক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাশ্রিত এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মমণ্ডলীগুলি ধর্মপ্রচার
ও সেবাশ্রমপ্রতিষ্ঠাপূর্বক ভারতের সনাতন ভাবসাধনার ধারা কোনরূপে
সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছিল—এমন সময়ে অকস্মাৎ কোথা হইতে নূতন
হাওয়া বহিল, অন্ধকার গগনপটে নূতন আলোকপ্রভা জ্বলিল, বাংলার স্নান-
স্তিমিত ক্ষীণশ্রোত জীবননদে বিপুল বহা গর্জিয়া উঠিল, সপ্তকোটি

নরনারীর শিরায় শিরায় একটা অভাবনীয় বিদ্যাময় শক্তিপ্রবাহ ভরজে তরঙ্গে ছুটিতে লাগিল—স্বামীজির সিংহনাদ দিগন্তের কোলে মিলাইয়া বাইতে না যাইতেই ১৯০৫ সালে নূতন যুগের মঙ্গল শজ্ঞানির্ঘোষ অথও বজের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পৰ্য্যন্ত কম্পিত করিয়া বাজিয়া উঠিল।

সমগ্র জাতির জীবনে সেদিন পটপরিবর্তন ঘটিল। কংগ্রেস বিশ বৎসর ধরিয়া কুশ্লের মত শ্লথ অলস মহুর পদক্ষেপে চলিয়া যে নবজীবন আনয়ন করিতে পারে নাই, কৌন্ অদৃশ্য বিধানে একটা রাষ্ট্রীয় ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া মুহূর্তের মধ্যে তাহার শতগুণ পরিবর্তন সেদিন বাঙ্গালীজাতির জীবনে সম্ভব হইয়া গেল। নিশীথের বিরামশয্যায় যে শুধু মশকদংশনে ছুই একবার হস্ততাড়না কিম্বা বড় জোর পার্শ্বপরিবর্তনের লক্ষণ দেখা-ইতে ছিল, সেই পুণ্য মোহেন্দ্রমুহূর্তে সে একেবারে নয়ন কচালিয়া দৃঢ়পদে দাঁড়াইয়া উঠিল—কোটি কোটি কণ্ঠ সমস্বরে গাহিয়া উঠিল—“বন্দেমাতরম্—আমরা জাগিয়াছি, মরি নাই, আমরা শুধু ঘুমাইয়াছিলাম—আজ দেবতার আহ্বানে সে দীর্ঘ নিদ্রাবোর টুটিয়া গেল।” আকাশ হইতে সেদিন অদৃশ্য দেবকণ্ঠে জয়ধ্বনি উঠিয়াছিল—দেববালায়া অলক্ষিতে জাগ্রতজাতির গলে জয়াশীষচর্চিত মন্দার-মালিকা দোলাইয়া দিয়াছিল।

সত্যই সে ছিল দেবতার অলজ্য আহ্বান—হৃদিস্থিত স্ববীকেশের দিবা করম্পর্শে বাঙ্গালীর মোহাক্ষ নয়নের কুয়াশাবোর একমুহূর্তে কাটিয়া গিয়াছিল।

ইতিহাসের এই যে অপূর্ণ যুগপূর্ণ—প্রকৃতির নিত্যপরিচিত বীর মহুর চিরাগত বিবর্তনধারাকে অতিক্রম করিয়া এই যে অকস্মাৎ কলোচ্ছ্বাসিত উজান জীবনপ্রবাহ—ইহার গূঢ় রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। মানব-জাতির সমষ্টিজীবনে মাঝে মাঝে কচিং কোথাও এমন এক একটা অকল্লিতপূর্ণ সন্ধিক্ষণ আসিয়া থাকে, যখন স্থপরিচিত সকল মানদণ্ডকে পায়ে ঠেলিয়া মানুষ্যের ক্ষুদ্র জ্ঞানের পরিধিগম্য সমস্ত অভিজ্ঞতাপুঞ্জকে উপহাস করিয়া কোথা হইতে নূতন শক্তিপ্রেরণা নামিয়া আসে, জীবন-সাগরের কোন্ গোপন ওপার হইতে এক সম্পূর্ণ অজানা অচেনা নূতন স্পর্শে মানুষ্যের মৃতকল্প চেতনা সহসা সঞ্জীবিত হইয়া উঠে, এক নিঃশ্বাসে সমস্ত জীর্ণ পুরাতন সংস্কারস্তুপ উড়াইয়া দিয়া অপরিচিত নূতন স্বপ্নভাসকে সে সাদরে আবাহন করিয়া লয়, গলকে শতাব্দীর দীর্ঘ যাত্রাপথ একলক্ষে

অতিক্রম করিয়া ফেলে—এই সব বিপ্লবের যুগপরিবর্তনের খণ্ডপ্রলয়ের হুজুয়ে সন্ধিমূর্ত্তগুলির সহিত প্রাকৃত ঐতিহাসিক জীবনধারার একটা আকাশ পাতাল বিভিন্নতা বর্তমান—এখানে আছে অপ্রাকৃতির স্পর্শ, অলৌকিকের আবির্ভাব—লৌকিক দৃষ্টির মাপকাঠি দিয়া এই সব জীবনপর্বের পরিমাপ করা চলে না।

প্রাকৃতির মধ্যে অপ্রাকৃতির আবির্ভাব সত্য সত্য ঘটে—বিরল হইলেও ইহা অসম্ভব নয়—সময়ে সময়ে এমন সব অচিন্তিতের অকল্পিতের উদ্ভাজগৎ হইতে অবতরণের অনিবার্য প্রয়োজনও আছে, নহিলে মানুষের পূর্ণ বিবর্তন একেবারেই সম্ভবপর হইত না। তাহা না হইলে, দেহ হইতে প্রাণ, প্রাণ হইতে মনে ধাপের পর ধাপ অতিক্রম করিয়া প্রকৃতি যতদূর পর্যন্ত উপনীত হইতে পারিয়াছেন—সেইখানেই তাঁহাকে গতি বন্ধ করিতে হইত—ক্রমবিবর্তনসূত্রটিকে এই কয়েকটি গ্রন্থীমাত্র ছাড়াইয়া আসিয়াই ছিন্ন করিয়া দিতে হইত, “এই পর্যন্ত, আর নয়” এই বলিয়া মানুষকে হঠাৎ ক্রকুঞ্চনপূর্ব্বক থমকিয়া দাঁড়াইয়া যাইতে হইত—বাহার লগুন বাইবার কথা তাহাকে স্নেহ প্রণালীর প্রবেশমুখেই সহসা অবরুদ্ধ অবস্থায় অন্তরীণ হইয়া পড়িয়া থাকিতে হইত। কিন্তু মানুষের ভিতর দিয়া প্রকৃতির যে ক্রমশূট সোপান অতিবাহন চলিয়াছে—ছাদশীর্ষে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত তাহার চিরবিরাম কোথাও নাই। সমুদ্রের দুর্গভোরণ যতদিন না বনংকার শব্দে তার সম্মুখে উদবাটিত হইয়া যায়, ততদিন শুধু চলা আর চলা—অরাস্ত পদে দীর্ঘ পথ লঙ্ঘন করিতেই হইবে—অর্দ্ধপথে চিরনিরন্ত হইয়া রহিলে প্রকৃতির গূঢ় অভিপ্রায় ব্যর্থ হইয়া ধূলায় লুটাইবে—তাই মানুষকে উর্দ্ধনেত্রে আকুল হৃদয়ে অনন্ত আকাশপানে চাহিয়া কতশতাব্দী কত যুগ প্রতীক্ষা করিতে হইয়াছে, হয়ত এখনও হইবে—ঐ সূদূরে ঐ গভীরে দিকচক্রবালের সীমারেখার ওপারে অদৃশ্য প্রদেশে অনাবিকৃত পড়িয়া রহিয়াছে সেই রাজমার্গ, সে পথের সন্ধান তাহাকে পাইতেই হইবে—নতুবা প্রকৃতির বরণপ্রভ এই মানুষের এ দীর্ঘ বিজয়যাত্রা অসমাপ্ত পড়িয়া থাকিবে—বিশ্বরাণীর অনন্ত তপস্যার উদযাপন হইবে না।

কিন্তু উর্দ্ধজগতের এই অপ্রাকৃত সন্ধান প্রকৃতির মধ্যে, তাঁহার আশ্রয়িত এই সৃষ্টিসীমার মধ্যে মিলে না—প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া, মানবাত্মার সমুদ্রে উঠিয়া বাইবার প্রয়োজন—কিন্তু কাহার সহায়ে সে

এই উদ্দেশ্যে প্রয়াণ করিবে—কাহার আকর্ষণে সে এই প্রাকৃত ত্রিলোক ছাড়াইয়া, বিশ্বশক্তির সকল গুণী ডিঙ্গাইয়া স্রষ্টার আত্মস্বরূপের স্পর্শ লাভ করিবে—কাহার আশ্রয়ে এই পরিচিত ক্রমবিবর্তনসূত্রটিকে টানিয়া অনন্ত-লম্বিত করিয়া সেই নিগূঢ় রহস্যময় সনাতন পুরুষের সহিত যুক্ত করিয়া ধরিবে? তাই চাই এমনই রূপারূপি, উর্জলোক হইতে ককণার ধারাপাত, মর্ত্যের মৃত্তিকায় স্বর্গের অমৃতের অভিব্যেক, জীবনের মধ্যে যোগশক্তির আবির্ভাব।

প্রকৃতি ধাপের পর ধাপ চড়িয়া নিম্ন হইতে উচ্চতর স্তরে আরোহণ করিতে চাহেন—জড় হইতে জীবন, ক্রমে মানুষ, দেহ হইতে প্রাণ, পরে সচেতন মন—এই তাঁহার ক্রমবিবর্তনের ধারা। এই মনকে-ছাড়াইয়া উচ্চতর স্তরে উঠিবার প্রয়াসও কতবার কতরূপে করিয়াছেন—কিন্তু নিম্নজগতের কঠোর নীতিবন্ধনে তাঁহার সকল চেষ্টা পূর্ণ সার্থক হইয়া উঠিতে পারে নাই। দেহ ও প্রাণের মধ্যে মনের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার আয়োজন ইউরোপের মানবসাধনা প্রচুরভাবে করিয়াছে, এখনও সে সাধনা সম্পূর্ণ হয় নাই। মনকে অতিক্রম করিয়া উচ্চস্তরে উঠিবার প্রয়োজন ভারতবর্ষ যেমন বিশিষ্টভাবে বুঝিয়াছিল, এমন আর কেহ কোথাও করে নাই। ভারতের সাধকবৃন্দ বিশ্বপ্রকৃতির সকল গুণী ভাঙ্গিয়া এক বিশ্বাতীত তুরীয়ার আকর্ষণ চিরযুগ অন্তরে অমৃতভব করিয়া আসিয়াছে—এই বিশ্বভুবন বিপুল স্ব-নিকার মত যে রহস্যময় সত্যের হিরণ্ময় মুখপানি আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহাকে আবিষ্কার করিবার দুর্জয় প্রেরণা ভারতের সমস্ত জীবনসাধনাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে—প্রকৃতির ঘনকন্ড অবগুষ্ঠনখানি উন্মোচন করিয়া, দূর হইতে সূদূরে সকল দেশকালের পরিধিরেখার পরপারে যে অনন্ত পুরুষ বিরাজমান, তাঁহাকেই জানিবার ও পাইবার জন্য ভারতবর্ষ যুগ যুগ মাথা-কাটা তপস্যা করিয়াছে—ভারত-সাধনার সে অনন্ত তীর্থযাত্রা আজিও পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে কি না কে জানে?

প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃত, বিশ্বকে ছাড়াইয়া ধরা ও বিশ্বকে ছাড়াইয়া উঠিবার সাধনা—মানুষের মধ্য দিয়া এই উভয় ধারাই বহিয়া আসিয়াছে—তবে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রণালী ধরিয়া, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পথ অনুসরণ করিয়া। স্থূল হইতে সূক্ষ্মতর-স্তর—এমনই সোপান বাহিয়া যে বিশ্ববিকাশ, ইউরোপের মানুষ সেই বিশ্ববিবর্তনের ক্রমটিকেই ছাড়াইয়া ধরিয়া চলিয়াছে

—সে প্রকৃতিরই উপাসক, বিবর্তনের সাধক, উন্নতিই তাহার জীবন-মন্ত্র। ভারতবর্ষ প্রকৃতিকে, প্রকৃতির ক্রমবিবর্তনমতটিকে আশ্রয় করিয়া তুরীয়ের সন্ধ্যানে চলিয়া গিয়াছে—সান্তকে, প্রত্যক্ষকে, জগৎকে অবলম্বন করিয়া, সময়ে সময়ে এসবকে উপলক্ষ মাত্র করিয়া জগদতীত অনন্ত রহস্যময়ের অন্বেষণে যুগ্মপ্রস্থান করিয়াছে—সে দিব্য অমৃতরাজ্যের স্পর্শ লাভ করিয়া কুচিং কখনও নিম্নস্তরে নামিয়া আসিয়া তাহার সংবাদ দিয়াছে—কখনও সেই মহোজ্জ্বল জ্যোতিঃপুঞ্জের নমন ধামিয়া গিয়া সেইখানেই চির-নির্বাণলাভের জন্ম সমাধিপর হইয়াছে। ভারত তুরীয়ের পূজক, অধ্যাত্মের সাধক, নিত্যসিদ্ধ পূর্ণত্বের সাগরে অবগাহনই তাহার মূল মহামন্ত্র।

তুরীয়ের জন্ম এই সাধনা বিভিন্ন পথ আবিষ্কার করিয়া চলিয়াছে—অদৃশ্যলোক হইতে অজানা প্রেরণা মানুষের ভিতর বিচিত্র ধারায় নামিয়া আসিয়াছে; বিচিত্রক্ষেত্রে বিচিত্রভাবে তাহাকে আকর্ষণ করিয়া উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে—বিশ্বপ্রকৃতিকে ছাড়াইয়া চলিবার এই সকল তপঃপ্রণালীই বিভিন্ন যোগপথ। যোগগহ্বাগুলির প্রত্যেকটিই উর্দ্ধজগতের একটা আকর্ষণের ফল—প্রকৃতির সীমাবন্ধনকে কাটাইয়া উঠিবার তপস্যা। প্রকৃতি তাহার প্রকৃত স্তরে চাহেন যেন আপনার লীলারূপের চতুঃসীমার ভিতরেই ভগবানকে ধরিতে ছুঁইতে রাখিয়া রাখিতে; কিন্তু এই সব যোগ-প্রণালীর ভিতরে তিনি আপনাকে, আপন প্রাকৃতিককেই অতিক্রমপূর্বক অতিপ্রাকৃত স্তরে চলিয়া গিয়াছেন—তুরীয়ের অতিলৌকিক স্পর্শে আহ্বানে আকর্ষণে নিজেকে উল্লঙ্ঘন করিয়া ভগবানকে তাহার ভাগবতস্বরূপেই উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছেন।

তত্রাপি, শূন্য হইতে শূন্যে এই তুরীয়ে প্রেরণা নামে নাই, শূন্য হইতে শূন্যে মানুষকে উড়াইয়া লইয়া যায় নাই—প্রাকৃত যন্ত্র, প্রাকৃত বৃত্তি, প্রাকৃত প্রেরণাকেই আশ্রয় করিয়া অতিপ্রাকৃতের আকর্ষণ খেলিয়াছে—সেই সেইখানেই আসিয়া উহা নামিয়াছে, সেই সেই ক্ষেত্রে হইতে সেই সেই বৃত্তি যন্ত্র প্রেরণাকে ধরিয়াই উহা তাহাকে সমুচ্চে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, প্রকৃতির ক্রীড়নক এই জীব, এই মানুষই প্রকৃতির সীমা লঙ্ঘন করিয়া তুরীয়ের সন্ধ্যানে যাত্রা করিয়াছে, এই মানুষের মানবস্বভাবেরই মধ্যে অতিমানুষকে লাভ করিবার উর্দ্ধপ্রেরণা চিরদিন ক্রীড়াপর হইয়াছে।

বস্তুতঃ, সাধন-রহস্যের সূত্র বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রকৃতি, জীব ও পুরুষোত্তম এই তিনের সহযোগিতা ভিন্ন যোগ অসম্ভব। সহজ ভাষায় যোগসাধনা নির্ভর করে। তিনটি পরস্পর সম্বন্ধে তব্বের উপরে—মানুষ, তাহার জগৎ এবং তাহার ভগবান্। ভগবান্কে বর্জন করিয়া, শুধু মানুষ আর বিশ্বজগৎকে একত্র ছাড়িয়া দ্বাও, উভয়ের উভয়ের মীমার মধ্যে চিরবন্ধই রহিয়া যাইবে, সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া জীবনের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের প্রতিষ্ঠা কোন দিন সম্ভবপর হইয়া উঠিবে না।

চাই ভগবান্। তাঁহারই অপার্থিব করুণা-কটাক্ষপাতে প্রকৃতির অন্ধ চক্ষু উন্মিলিত হইয়া যাইবে, মানুষ তাহার বিচ্ছিন্ন একত্বকে পুনঃসন্মিলিত করিয়া ধরিবে, জগতের মাঝে মানুষ, মানুষের মধ্যে জগৎ আপন আপন সত্যস্বরূপ খুঁজিয়া পাইবে—ঠাকুরের কথায় বলি, বিশ্বজননী রুদ্ধ পথ ছাড়িয়া না দিলে মানুষের মুক্তিসম্ভাবনা কোথায়? ভগবানের অমৃতস্পর্শে অবরুদ্ধ সিংহদ্বার খুলিয়া না গেলে জীবের জীবন সার্থক হইতে পারে না—এই দেহ, প্রাণ, মন, প্রকৃতিবিরচিত এই বিশ্বমন্দিরে মানুষ যদি দেবতার আবাহন করিতে না পারে, সে যদি দৈবী মাতৃশক্তির আশীর্বাদ লাভ করিয়া বরদৃষ্ট হইয়া না উঠে, তবে জগতের সহিত দিব্যসামঞ্জস্যময় সম্বন্ধ কখনও উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে না—ইহা অবধারিত।

ভারতের যোগপদ্ধতিগুলি ভগবান্কে মধ্যবিন্দু করিয়া, তাঁহাকে ঘিরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। মানুষ ভগবানের স্পর্শে আকুল হইয়া তাঁহার সন্ধানে বিচিত্র পথে ছুটিয়াছে। জীবনের নানাক্ষেত্রে এই স্পর্শ সম্ভব। স্তরে স্তরে সজ্জিত যেমন মানুষের জীবনপ্রতিষ্ঠান, স্তরে স্তরে সেই দিব্য স্পর্শে মানুষ উদ্বুদ্ধ হইয়াছে—যোগপথগুলি তেমনি স্তরে স্তরেই বিকশিত। দেহকে কেন্দ্র করিয়া হঠযোগ, মনকে কেন্দ্র করিয়া রাজযোগ, জ্ঞান প্রেম শক্তি এই তিনটি অধ্যাত্মবৃত্তিকে কেন্দ্র করিয়া ত্রিমার্গযোগ। প্রতিস্তরে ভগবানের অমুপ্রেরণা ফুটিয়া উঠিয়াছে—প্রতি স্তরকে আশ্রয় করিয়া মানুষ সেই অনন্ত বস্তুটিকে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহিয়াছে—খণ্ড খণ্ড ভাবে ধরিতে পাইতে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছে ভগবানেরই বিচিত্র বিভূতিপুঞ্জ।

কিন্তু অনন্ত গুণময় ভগবান্। ভারতের সাধনক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ধারায়, এই যে সাধনপথগুলি বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের কোনও একটি স্বতন্ত্রভাবে আজ আর মথট

হইতে পারে না। সাধন-উদ্যানের এই বিচিত্র কুসুমগুলিকে আজ একত্র সমাহৃত করিতে হইবে—মানুষের সকল স্তরকেই সার্থক করিয়া ধরিতে হইবে—যোগপ্রণালীগুলির ভিতরে যে দিব্যপ্রেরণাসমূহ খণ্ড খণ্ড ভাবে দিকশিত হইয়াছিল, সেই প্রেরণারাজি একটি অপূর্ণ অপরূপ মণিস্বত্রে একত্র গাঁথিয়া তুলিতে হইবে। শুধু তাই নয়—এই সমুদয় ভারতীয় যোগপথে মানুষের যে ভাগবত-সাধনা ব্যক্তিজীবনের মধ্যে নিবদ্ধ হইয়া সঙ্কীর্ণ আত্মগোপনপ্রিয় ও বিশ্বমানবের জীবনের পক্ষে নিষ্ফল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাকে সেই কুষ্ঠাসঙ্কুচিত সাধনগহ্বর হইতে বাহিরে টানিয়া আনিয়া ইউরোপের তপোলক সজীব সমষ্টিজীবনশ্রোতের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে। ব্যক্তির যোগসিদ্ধি বিশ্বমানবের সমষ্টিজীবনের মধ্যে সঞ্চারিত ও সম্প্রসারিত হইলে তবেই মানুষের পূর্ণ তপঃসিদ্ধি উপলব্ধ হইবে। মানবের জীবন-যোগের পরিপূর্ণ সফলতা আসিবে সেইদিন।

স্বামী শর্কানন্দের কন্মশীলতা

গত ১৩২৫ মাঘের “উদ্বোধনে” স্বামী শুকানন্দ “আমাদের আদর্শ ও তত্ত্বাত্তের উপায়” নাম দিয়া এক প্রবন্ধ লেখেন। বর্তমান বর্ষের ৫ম সংখ্যা “প্রবর্তকে” তারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হয়। “প্রবর্তকের” সেই আলোচনা পড়ে স্বামী শর্কানন্দ একেবারে “স্তম্ভিত” হয়ে গেছেন। কিন্তু “স্তম্ভিত” হলেও তিনি একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়েন নি। কেননা ঐ “স্তম্ভিত” হবার ফলে তাঁর হাত দিয়ে “আমাদের আদর্শ” নামশীর্ষক এক পঞ্চদশ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রবন্ধ বেরিয়ে গেল। এখানে এসেই স্বামী শর্কানন্দের কন্মশীলতা দাঁড়ি টানি নি। সেই প্রবন্ধটা তিনি আবার বামের “উদ্বোধনে” ছেপে দিয়েছেন।

স্বামী শর্কানন্দ তাঁর প্রবন্ধটা “প্রবর্তকের” প্রবন্ধ লক্ষ্য করেই লিখেছেন, কেননা তাঁর প্রবন্ধের শিরোনামার নীচেই বড় বড় হরফে বহুদূর মধ্যে ছাপা আছে এই কথা ছোটো “সমালোচনার প্রতিবাদ”। কিন্তু ঐ কথা ছোটো ছাপা থাকলেও আসলে তাঁর লেখা প্রবর্তকের প্রবন্ধের প্রতি-

বাদ নয়, কেননা স্বামীজী বার পৃষ্ঠা কলম চালাবার পর নিজেই এসে স্বীকার করেছেন—সন্ন্যাসীই মানবজনমের শ্রেষ্ঠ আদর্শ, স্বামী শুদ্ধানন্দজী “উদ্বোধনে” তাঁর যে প্রমাণ দিয়েছেন “প্রবর্তকে”র লেখক উহার নিরাকরণের চেষ্টা কোনখানেই করেন নাই, কেবল তদ্বিপরীতে কতকগুলি নিজেত মত প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র। সেইজন্ত উক্ত বিষয়ে বিশেষ বলিবার আমাদের কিছুই নাই।” সুতরাং আমরা “প্রবর্তকে” যে “কতকগুলি নিজের মত” প্রকাশ করেছিলাম তা পরিবর্তন করবার বিশেষ কোন কারণ ঘটে নি।

তবে “প্রবর্তকের” কুতূহলী পাঠকবর্গ কোতূহল প্রকাশ করে প্রশ্ন করতে পারেন যে স্বামী শর্কানন্দের প্রবন্ধ যদি “প্রবর্তকের” লেখার প্রতিবাদ না হয় তবে সে প্রবন্ধে তিনি কি লিখেছেন? সেইটেই একটা রহস্য। কেননা স্বামী শর্কানন্দ তাঁর ঐ প্রবন্ধের একপাতে এ জগতে কেবল “ইলেকট্রন” দেখছেন আবার আর এক পাতে এই দুর্ভিক্ষের দিনে দীন গৃহস্বামীর গৃহপ্রাঙ্গণে অভাব অনটনের প্রেতমূর্তির নৃত্য দেখে চোখের জল ফেলছেন। তাই আমাদের মত সোজাবুদ্ধির লোকদের ভ্রাতাভ্রাতৃকা লেগে যায়। সমস্রমে ও ভীতিবিহ্বল চিত্তে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে—

স্বামীজী আপনার কোনটা সত্য? ঐ ইলেকট্রন, না ঐ চোখের জল? ইলেকট্রন যদি সত্য হয় তবে তাঁর প্রবন্ধ লেখা ব্যর্থ। কেননা ইলেকট্রনরূপ কলম দিয়ে ইলেকট্রনরূপ কাগজের ওপরে ইলেকট্রনরূপী কালির আঁচড়ের বিশেষ কোন অর্থ নেই—আর তাঁর যদি ঐ উপরোক্ত চোখের জল সত্য হয় তবে ঐ চোখের জল বন্ধ করবার উপায়—এ সংসার কিছু নয় প্রচার করা নয়—সকল বৈচিত্র্য সকল pragmatism এর অন্তরালে যে এক পরম চিরন্তন আছেন তাঁরই আনন্দ সংবাদে জীবনের আনন্দ জাগিয়ে তোলা—যে আনন্দে দেশবাসী আবালবৃদ্ধবগিতা সন্তোষ করে বলতে পারবে—ঈশাবাস্যমিদম সর্বম্।

উপরে ঐ যে সংস্কৃত শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করা গেল সেটা স্বামী শর্কানন্দের খাতিরে। কেননা আমাদের দেশে এমন একদল লোক আছেন যাদের কাছে প্রাচীন পুঁথি থেকে শ্লোক না উদ্ধার করলে কিছুই সত্য হয়ে ওঠে না—স্বামী শর্কানন্দের লেখা পড়ে মনে হয় তিনি সেই দলের। স্বামী শর্কানন্দ বিদ্বান্ লোক। তিনি তাঁর ঐ প্রবন্ধে প্রাচ্য দর্শন ও আশ্চাত্য বিজ্ঞানের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের পরিচয় আমাদের জানিয়ে

দিয়েছেন—কেবল তাই নয় ওই প্রাচ্য দর্শন ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের যুগ্ম মিলন ঘটিয়ে কিপলিংএর হু'গালে চূর্ণকালী লেপে দিয়েছেন। যা হোক স্বামী শর্কানন্দ আমাদের একটা তর্ক করবার সহজ উপায় দেখিয়ে দিয়েছেন—সেটা হচ্ছে সংস্কৃত শ্লোক তোলা—তঁার ধারণা যে সংস্কৃত শ্লোক জুলেই একেবারে তর্কচ্ছেদ।

ওপরে ঐ যে সংস্কৃতলাইনটুকু উদ্ধার করা গেছে, সেটা ঐখানে এসেই খতম হয়, নি—ওর পরের লাইনেই আবার আছে—“তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা”—কিন্তু থাক সে কথা—কেননা ঐ শব্দ তিনটীর যে কতজনের কত রকমের ব্যাখ্যা আছে তার ঠিক নেই। কেউ কেউ আবার যখন মনের মত অর্থ না মেলে তখন ওরই আগে পাছে ছ'একটা নতুন শব্দ উদ্ভাবন করে নিয়ে সে অর্থকে টেনে বের করেন—একেই বলে বুদ্ধির দিগ্ব্যাজি। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে কিন্তু এই, যে, শাস্ত্র থেকে আমরা সত্য লাভ করি নে—তা থেকে আমরা প্রমাণ তুলি।

“প্রবর্তকে” এই কথা লেখা হয়েছিল—“এই যে জ্ঞান শক্তি প্রেম এ আমার কাঁধে বোঝার মত চেপে গড়ে নি—এ অমৃতের মত আমার অস্তিত্বে বিছিয়ে আছে।” স্বামী শর্কানন্দ তার উত্তর দিয়েছেন—“কিন্তু যাহারা জগতের একটু অভিজ্ঞতা রাখে তাহারা ই বলিবে ইহা বাস্তব জগতের (pragmatic world ?) কথা নহে।” আমরাও প্রতিধ্বনি করি, নিশ্চয় নহে। কেননা ওটা বাস্তবজগতের কথা নহে, ওটা হচ্ছে অন্তরের জগতের কথা। তারপর স্বামীজী ব্যথিত কণ্ঠে তাঁর পাঠকবর্গকে নিমন্ত্রণ করছেন—“আজ ছুতিফের দিনে আইস ঐ দরিত্রের কুটীরে যেখানে দীন গৃহস্থামী ক্ষুৎপিপাসার কঠোর তাড়নে কঙ্কালসার হইয়াছে—পেটে অন্ন নাই, গাত্রে বস্ত্র নাই, গৃহে কপর্দক নাই; অভাব অনটনের প্রেতমূর্ত্তি তাহার প্রাক্ষণের সর্বত্র নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে; গৃহলক্ষ্মীর অলক্ষ্মীর বেশ; ঘরের নন্দলালেরা অস্থিচর্মসার কোটরগত চক্ষু সর্বতোভাবে কুমারশ্রীবিনীন, বুড়ুফার বিকট তাড়নায় আহারের জন্ত কাতর চীৎকার করিয়া উপায়হীন গৃহস্থামীর হৃদয়ে নিরানন্দের বীভৎস রস তুলিতেছে। এখন তাহার কাছে গিয়া যদি বল—“কেমন বল ত বাপু তোমার ভেতর কেমন একটা বিপুল আনন্দ পাচ্ছ, না? কোথায় তোমার দৈশ, দারিদ্র্য—তোমার আছে কেবল বিপুল আনন্দ—কি বল?” তাহা হইলে সেই গৃহস্থামীর শরীরে তখনও

যদি যথেষ্ট সামর্থ্য থাকে ত তোমায় উন্নাদ মনে করিয়া যষ্টির দ্বারা সংবর্দ্ধনা করিবার চেষ্টা করিবে।” আচ্ছা, ঐ অবস্থায় যদি একজন হুটপুট সন্ন্যাসী এসে গৃহস্থামীকে বলেন—“কোথায় মশায় হুর্ভিক্ষ—এই জগৎটা একটা মায়ী, কি বলেন, মশায়? পুঞ্জ পুঞ্জ ইলেকট্রন দেখতে পাচ্ছেন-ত?” তবে কি গৃহস্থামী সেই সন্ন্যাসীকে রসগোল্লা কিনে খেতে দেবেন? আমাদের ত মনে হয় না।

এখন যে নিঃশ্বাসে আমি আমার “ইন্ড্রিয়ের অক্ষমতা”কে বিধ্বস্ত করে জগতে কেবল “ইলেকট্রন” দেখছি—ঠিক সেই নিঃশ্বাসে আবার গৃহস্থামীর গৃহপ্রাঙ্গুণে হুর্ভিক্ষের তাণ্ডব নৃত্য দেখার অবশ্য কোন মানে হয় না। কিন্তু আর যাই হোক সাহিত্যের দিক থেকে তাতে কিছু লাভ বই ক্ষতি নেই। কেননা ওতে মানে হয় না কিন্তু মজা হয়।

এখন ওই যে দেশবাসীর অবস্থা—ঐ রকম অবস্থা যাতে তাদের না ঘটে শর্কানন্দও তার ইচ্ছা করেন, আমরাও তার চেষ্টা করি। তবে তর্ক কোথায়? উপায় নিয়ে। সন্ন্যাসীর দল বলেন উপায় হচ্ছে যে সৃষ্টিকে “প্রজ্ঞা নিজের ‘সৎ’ রঙে রঞ্জিত করিয়াই উহাকে নিজের কাছে ধরে” সেই সৃষ্টিকে “ইলেকট্রনে” পরিণত করা। আমরা বলছি-যে দেশবাসীর আজ যে ঐ অবস্থা, তার কারণ তাদের অন্তরের জ্ঞান শক্তি প্রেমের সৃষ্টি অবস্থা—এই জগৎকে অস্বীকার করা, ব্রহ্মের প্রকাশকে মারা বলে উড়িয়ে দেওয়া—“ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা” ইত্যাদি Catch-phrase হিন্দুর জাতীয়জীবনের ওপরে এমন একটা নিশ্চেষ্টতার ছায়া ফেলেছে যাতে করে তারা তমোগুণের আধার হয়ে উঠেছে—এই হচ্ছে তাদের হুর্দিশার উৎপত্তি স্থান। আমাদের এই কথাটা সাদা বাংলায় বলা হচ্ছে বলে তার কোন মূল্য না থাকতে পারে, কিন্তু জীশোপনিষদে ঐ কথাই আছে—

অঙ্কুতমঃ প্রবিশন্তি যেষ্ববিদ্যামুপাসতে।

ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যামাং রতাঃ ॥৯॥

বলা বাহুল্য এখানে বিদ্যা আর অবিদ্যার ইংরাজী প্রতিশব্দ knowledge আর ignorance নয়—কেননা একসঙ্গে ignoranceএর উপাসনা করা ও knowledgeএ রুত থাকাও যা, আলো ও অন্ধকারের পরস্পরের আলিঙ্গন করাও তাই। তবে বিদ্যা মানে কি? না, Brah-

man in essence—আর অবিদ্যা মানে Brahman in manifestation. এখন এর যে কোন একটা ত্যাগ করলেই অন্ধকার—তার চাইতেও বেশী—উপনিষৎকার বলছেন কেবল অবিদ্যাকে আশ্রয় করলে—যে আধার, কেবল বিদ্যায় রত থাকলে তার চাইতেও বেশী আধার। এ কথাটা যে কতদূর সত্য তা আজকার “বাস্তব জগতে”র দিকে তাকিয়ে দেখলেই ধরা পড়ে—ঈশোপনিষদের ঐ শ্লোকের প্রথম লাইনের আশ্রয়ে ইউরোপের “ইলেকট্রন”পুঞ্জ বাকদের ধূমে আধার হয়ে উঠল—আর ওর ঐ দ্বিতীয় লাইনের পাল্লায় পড়ে’ এ দেশে বছরে তিন শ পয়ষট্টি দিন হা হতাশে পূর্ণ হয়ে আছে। এর উত্তরে কোন সন্ন্যাসী বলতে পারেন যে এই জগৎটাকে “ইলেকট্রন”রূপে দেখলে সব ঠিক হয়ে বাবে—তখন আর থাওয়া পরার দরকার হবে না—তবে তার উত্তরে বলি যে তেমন উদাহরণ এ পর্যন্ত কোন প্রচারক সন্ন্যাসী আমাদের চোখের সামনে ধরেন নি।

উপরে ঐ যে শ্লোকটা উদ্ধার করা হয়েছে, ওটা উপনিষৎকারের কলম ফস্কে বেরিয়ে যায় নি—কেননা ও রকম শ্লোক আরও আছে, যারা ঈশোপনিষৎখানি খুলবেন—তাদেরই চোখে পড়বে। শাণ্ডিল্যও ঠিক ঐ কথাই বলছেন—

তামৈধ্ব্যপরাং কাশ্যপঃ পরহ্যৎ ॥২৯॥

আত্মৈকপরাং বাদরায়ণঃ ॥৩০॥

উভয়পরাং শাণ্ডিল্যঃ শকোপপত্তিভ্যাম্ ॥৩১॥

শাণ্ডিল্যসূত্র ॥

“ইন্দ্রিয়ের অক্ষমতা” বিধ্বস্ত করে’ জগৎটাকে কেবলমাত্র ইলেকট্রন-রূপে দেখতে শিখলে কল্যাণ আসবে না—কেননা ও একটা মিথ্যা দেখা আর মিথ্যার ভিতর দিয়ে কল্যাণ আসতে পারে না। ও যে একটা মিথ্যা দেখা সে কথাও ঐ শাণ্ডিল্যসূত্রেই আছে যথা—

ঐধ্ব্যং তথৈতি চেন স্মাভাব্যাৎ ॥৩৪॥

অপ্রতিবিদ্বং পরৈধ্ব্যং তদ্ভাবাচ্চ নৈবমিতরেষাম্ ॥৩৫॥

“ইলেকট্রন” ত কেবলমাত্র ইলেকট্রন নয়—তাই ছন্দোগ্য উপনিষৎ বলছেন—সর্বং খন্দিৎ ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শাস্ত উপাসীত। এই সর্বং খন্দিৎ ব্রহ্মের একটা ধারণা করার জন্তে গীতাকার গীতার একাদশ অধ্যায়ে

আশ্চর্য্য কবিত্বের সঙ্গে বিশ্বরূপ দর্শনের অবতারণা করেছেন।

অনেকে যে “একমেবাদ্বিতীয়ম্”এর দাঁড়ি টেনে সকল তর্কের গোড়া কাটতে চান—সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ সত্য হয়ে ওঠে তখনই যখন মানি ঐ সর্ব্বং ঋষিদং ব্রহ্ম। কারণ তা যদি না মানি তবে ছোটো জিনিষ পাই এক ব্রহ্ম আর এক জগৎ—সুতরাং একমেবাদ্বিতীয়ম্ মিথ্যা কথা। যদি উত্তরে বল যে জগৎকে কোথায় পাও? সেইটেই ত ভুল ভ্রান্তি hallucination—মান্লেম। তবেও ছোটো জিনিষ পাই—এক ব্রহ্ম আর এক hallucination, কিন্তু সর্ব্বং ঋষিদং ব্রহ্ম মান্লেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ সত্যি হয়ে ওঠে। আসলে ঐ ছ’বাক্য পরস্পরের বিরোধী নয়—ও হচ্ছে একই সত্য ছ’রকমে বলা।

স্বামী শর্কানন্দের মতে জ্ঞান শক্তি প্রেম চিত্তের ধর্ম্ম। এ মতের হয়ত কারণ আছে। কিন্তু ও মত যদি সত্য হয় তবে স্বামীজী যে জ্ঞানের বলে জগৎটাকে মায়া দেখছেন, যে শক্তির সাহায্যে তিনি তাঁর “ইঞ্জিয়ের অক্ষমতা”কে পরাস্ত করে’ চারিদিকে “ইলেকট্রন” দেখছেন তারও উৎপত্তি তাঁর চিত্ত থেকে। কেবল তাই নয় বেদান্তসূত্রের অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা থেকে আরম্ভ করে’ যেখানে বত ঋষি মুখ খুলেছেন সবই চিত্তের তাড়নায়। বেদ যে লোকে বলে অপৌরুষেয়—সেটা শ্রেণ রূপকথা। তারও উৎপত্তি চিত্ত থেকে। বলা বাহুল্য এসব কথা যদি সত্যি হয় তবে চিত্তটা নেহাৎ অবহেলা করবার জিনিষ নয়।

যে আত্মতত্ত্ব আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে প্রাচীন ঋষিরা ঝুড়ি ঝুড়ি গ্রন্থ লিখেছেন, সেই আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে শেষ কথা স্বামী শর্কানন্দ অতি সহজেই শুনিয়ে দিয়েছেন। বজ্রনির্ঘোষ কর্ত্তে স্বামীজী ঘোষণা করছেন—“এখন আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে শেষ কথা এই যে, যদি কেহ সাংসারিক সুখাসক্ত হইয়াও বলেন যে তিনি আত্মদর্শী ত জানিয়া রাখ এই লোক কপটাচারী, মিথ্যাবাদী অথবা বাতুল।” এখন কথা হচ্ছে যে সুখে আসক্তিটা বেচারী সাংসারিক লোকের বাড়ুই বিশেষ করে’ চাপান হয় কেন? সন্ন্যাসী হয়ে কি সুখে আসক্ত হতে পারে না? গেরুয়া রংটা এমন কি Talisman যে তা গায়ে উঠলেই একেবারে দেহ মন প্রাণ সব উল্টে গিয়ে কেবল লিঙ্গশরীর বিরাজ করতে থাকবে। সন্ন্যাসী হয়েও যে সুখে আসক্ত হতে পারে তার প্রমাণ বর্ত্তমানেও পাওয়া যায়, অতীতেও পাওয়া যায়। এ কথা যদি কেউ অবিশ্বাস করেন তবে তিনি ইউরোপে রোমান ক্যাথলিক

fathersদের ও ভারতে বৌদ্ধদের ইতিহাসের পাতা উল্টোলেই এর প্রমাণ পাবেন।

আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে সংসারে থাকলেই যে আসক্ত হয়ে থাকতে হবে এমন কি কোন ঐশ্বরিক আইন আছে? তা যদি থাকে তবে গীতার দশ আনা জুয়োচুরি ছয় আনা সিডিসন—নিকাম কৰ্ম একটা প্রকাণ্ড অধঃপতন—শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন নটনের ভাষায় Prime minister in the kingdom of Lies.

হতো বা প্রাপ্যসি স্বৰ্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।

আর

যোগস্থঃ কুরু কৰ্ম্মাণি সঙ্গত্যক্তা ধনঞ্জয়

এ হচ্ছে গজিকাসেবীর প্রলাপ।

রাগদ্বেষবিষক্লেস্ত বিষয়ানিক্রিয়ৈশ্চবন।

আত্মবশৈর্বাধিযোয়া প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥

এ হচ্ছে একটা “কপটাচারী” “মিথ্যাবাদী” ও “বাতুল”র কথা।

এ দেশে বেশ কিছুদিন থেকে একটা ভার ছড়িয়ে পড়েছে যে সাংসারিক হ’লে তার আর কোন আশা নেই—ইহলোকেও নেই, পরলোকেও নেই। এই ভাবের চাপে আমাদের সমাজের জড়তরত অবস্থা—কৰ্ম্মে উৎসাহহীন—ভোগে ভীতিবিহ্বল। সামাজিক মনের এই অবস্থাকে সন্ন্যাসী তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের দাবী চাপিয়ে চিরন্তন করবার চেষ্টা করে’ এসেছেন—সমাজের এই মনের ভাবকে আশ্রয় করে’ যে কত “কপটাচারী” ও “মিথ্যাবাদী” সন্ন্যাসী (সন্ন্যাসীদের মধ্যে “বাতুল” বড় একটা দেখা যায় না।) সমাজের ভক্তি শ্রদ্ধা ভোগ করে’ আসছেন তার ঠিক নেই। এতে করে’ সমাজমন হীন হতে হীনতর হ’য়ে উঠেছে, কেননা অযোগ্যকে দান করলে দানকারীর মনে একটা তার প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য। ফলে সমাজ উদাসীনতার ভান করে’ ঘরে ঘরে হাহাকারের জেরটাই টেনে চলেছে। এমন দিন ছিল যখন ইয়ো-রোপে অভিজাতবর্গ সাধারণের ওপরে মহা জারিজুরি করত। আজ সে দেশের লোকেরা টের পেয়েছে, যে Capital এর জাঁকজমক Labourএর দৌলতে। আশা করা যায় যে এ দেশে একদিন লোকেরা টের পাবে যে সন্ন্যাসীদের নিৰ্ব্বিশ্বে বেদান্তচর্চা সে ঐ সাংসারিক লোকেরা আছে বলে’। সেদিন হয়ত সন্ন্যাসীদের কাছে অনেক শ্লোকের অর্থ উল্টে যেতে পারে—অনেক অকেজো শ্লোক নিতান্তই দরকারী হ’য়ে উঠতে পারে, চাই কি তাদের কণ্ঠ থেকে

একমেবাবিভীয়মের পরিবর্তে “সৰ্বং খন্দিং ব্রহ্ম”ই সেদিন স্পষ্টতর হয়ে বেরতে পারে।

ভদ্রসমাজে নিজ মুখে নিজের প্রশংসা প্রগল্ভতার পরিচায়ক। কিন্তু সন্ন্যাসীরা সকল বন্ধনমুক্ত। তাই সন্ন্যাসী শর্কানন্দ সন্ন্যাসের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করছেন—এই বলে—“যে ব্যক্তি ভগবানকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁর স্বষ্ট রূপ রস প্রভৃতিকেই বরণ করে সে অব্যভিচারিণী ভক্তিসংযুক্ত ভগবৎব্রতী নহে।” সুতরাং “তুরীয় আশ্রমে”রই সর্বোচ্চ আসন। এতক্ষণে আসল ব্যাপারটা কতকটা বোঝা গেল। কিন্তু ভগবানকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁর রূপ রস প্রভৃতিকে বরণ করতে হবে কেন? “প্রবর্তক” যে তার জন্মদিন থেকে ঠিক এর উল্টো কথা বলে এসেছে তা যিনিই “প্রবর্তক” পড়ে থাকেন তিনিই সাক্ষী দেবেন। এই যে একটা হিন্দুর মনের ধারণা যে হয় সংসার নয় ভগবান, এই ধারণার পরিবর্তন করবার চেষ্টা “প্রবর্তকে” সুযোগ পেলেই করা হয়ে থাকে, কেননা প্রবর্তকের মত যে এই সংসারের সঙ্গে ভগবানের মিলন না ঘটতে পারলে এখানে সেখানে ছ’এক জনা “তুরীয় আশ্রমের” সন্ন্যাসীর দরিদ্র-নারায়ণের সেবা দ্বারা সমাজের দ্রুত দারিদ্র্য দূর হবে না। এ সম্বন্ধে বিশদ করে বলতে গেলে প্রবর্তকে তিন বৎসর ধরে যা বলা গেছে তাই আবার ফিরে বলতে হয়—বলা বাহুল্য তা সম্ভব নয়। তবে এই সংসারে ও ভগবানে মিলন একি একটা আকাশ কুসুম? তা যদি হয় তবে

বিদ্যাধা বিদ্যাধা যন্তরেদোভয়ম্ সহ।

অবিদ্যায়া মৃত্যুং জীত্বা বিদ্যায়াহমৃতমশ্নুতে ॥ জীশোপনিষৎ।

এ শ্লোকের কোনই মানে নেই—তবে গীতার ভিত্তি তৈরী বালির সঙ্গে জল মিশিয়ে—তবে শান্তিলাভ পুড়িয়ে ফেলা উচিত।

স্বামী শর্কানন্দ অশাস্ত্রজ গোড়া মায়বাদীর মতো জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না। কেননা বৈদান্তিকের মতে জগৎ যে একেবারে নেই তা নয় তবে উহা “পরমার্থিকরূপ সং নহে অর্থাৎ পরমার্থিক হিসাবেই উহা অসৎ।” “স্বামী শুদ্ধানন্দের আদর্শ প্রবন্ধে বলেছিলেন যে “নির্কাণলাভই মানুষের পরম পুরুষার্থ কিনা এ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল।” এ আলোচনা কালে স্বামী শর্কানন্দের অনুমোদিত ঐ বৈদান্তিকের মতেরও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাবে—ও মতের কথা এমনি এসে পড়বে।

অভয়-মন্ত্র

দুঃখের কথাই বলিব। বলিয়াছি ত বাহার উপর দাঁড়াইয়া ধর্ম কর্ত্ত আচরণ করিব, তাহাই যদি ভাঙ্গিয়া পড়ে, তত্বকথার আর প্রয়োজন কি? দেশব্যাপী হাহাকার, যে প্রতিদিন ছইমুঠা অন্ন গ্রহণ করিত অতীতের তাড়নায় সে দিবসান্তর আহার গ্রহণ করিতেছে, কেহ কেহ সপ্তর্ষহে ছই একদিন মাত্র অন্নমুষ্টি প্রাপ্ত হয়, বসন ভূষণ বাংলাদেশ ছাড়িয়া গিয়াছে, অস্থি কঙ্কালের প্রেতমূর্ত্তি গ্রামে গ্রামে বীভৎস দৃশ্যের সৃষ্টি করিতেছে, উপায়? একেবারেই নিরুপায়—প্রতীকারের আশা আমাদের কি আছে?

ঘরে আশ্রয় লাগিলে ইতভদ্র-গৃহস্থানী যেমন পথে দাঁড়াইয়া হায় হায় করিতে থাকে, আমাদেরও আজ সেই অবস্থা; কুসুমসুন্দর শিশু খাদ্যাভাবে কদাকার, নিক্ত্য রোরুদ্যমান, তার শীর্ণ বুক মুখের দিকে চাহিয়া বুকভাঙ্গা নিঃশ্বাসে বলিয়া উঠিতেছি—হায়, হায়—অসুখ্যাম্পশ্যরূপা বঙ্গকুললক্ষ্মী অর্দ্ধাঙ্গ চটে ঢাকিয়া, শতছিন্ন বস্ত্রখণ্ডে বক্ষ ও শিরোদেশ আবৃত করিয়া সলজ্জ নৈরাশ্রপূর্ণ দৃষ্টে জিজ্ঞাসা করিতেছে “হাঁগা কাপড় সস্তা কবে হবে? অপদার্থ পুরুষ বজ্রাহতচিত্তে উদাস অশ্রুটস্বরে বলিতেছি—হায়! হায়! দুটমাংসপেশী প্রশস্তবক্ষ যুবকপুত্র দিব্যরাত্র পরিশ্রমে পরিবারমণ্ডলীর উদরপূরণে অসমর্থ, দিন দিন অসুস্থ ও রুগ্ন হইয়া শয্যা গ্রহণ করিল, উন্মত্তের মত শৃঙ্খলহীন কেবলি বলিতেছি—হায়, হায়,—ওরে নির্দম বিধাতা—কোন মহাপাপে সমস্ত জাতিটার বুক এমন জগদল পাথর চাপাইয়া দিলি, কোন গুরু অপরাধে এমন কঠোর শাস্তি বিধান করিলি, পৃথিবীর বুক হইতে আমাদের মুছিয়া ফেলিবার জন্তই কি এই সকল আয়োজন!

কে জানে অলক্ষ্যে বিধাতা আমাদের ভাগ্য কি ভাবে গড়িয়া তুলিতেছেন! তাঁর বিচিত্র সৃষ্টিরচনার গুঢ় রহস্য মানববুদ্ধির অগোচর। কিন্তু

মরিব কি? যদি একেবারে নাও মরি, কঙ্কালসার চিরবার্দ্ধক্য লইয়া জীবন্মৃত অবস্থায় বসিয়া থাকিব? চতুর্দিক হইতে জীবনের সাড়া পাইব, প্রকৃতি নব নব সজ্জায় পৃথিবীর সংবাদ স্ববিরের সম্মুখে ঘোষণা করিবে, আর আমি শক্তিহীন জড়ের মত চিরদিন একটা করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া যাইব? এ বড় কঠোর অত্যাচার! কেন, কি পাপ করিয়াছি, ভগবানের বিন্দুকরণলাভও কি আমার ভাগ্যে নাই?

শুনিয়াছি হিন্দুর বেদান্তে আছে, ভগবান্‌ই বিশ্বসৃষ্টির মূল শক্তি, তিনি ষটে ষটে নিত্য বিরাজমান। তবে আমার আধারেও তিনি আছেন। কে জানে এই কথা স্মরণ হওয়া মাত্র কি অপূর্ণ বিদ্যা-শক্তি আমার সর্ব্বাঙ্গে প্রবাহিত হইল, আমার সম্মুখের কৃষ্ণ যবনিকাখানি উন্মোচিত হইয়া কি দিব্য জ্যোতির্শ্রয় ভবিষ্যৎ চিত্র আমার সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল, কি উন্মাদিনী আশা, কি অলৌকিক উৎসাহ, কি অসাধারণ শক্তি আমার অবসন্ন ক্ষীণ জীবনকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেছে, ভিতর হইতে কে যেন বজ্রনির্ঘোষে আমায় আদেশ করিতেছে—“উত্তীর্ণ জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত”।

উঠিয়া দাঁড়াইলাম, ভোরপর করিব কি? হে আমার অন্তরদেবতা, হে আমার জীবনসর্ব্বস্ব, বাহিরের গাঢ় অন্ধকার আরও নিবিড় হইয়া ঘনাইয়া আসিতেছে, আমার অধঃ উর্দ্ধে চতুর্দিকের কি সৃষ্টিভেদ্য জমাট আধার, আমার অর্দ্ধমৃত জীবনে যদি শক্তি সঞ্চার করিলে, তবে আমার পগ্ন দেখাইয়া দাও, “তমসো মা জ্যোতির্গময়”।

বিকট হাহাকার, অমানিশার ঘনান্ধকারাবৃত বিপুল শ্মশান আমার সম্মুখে, কেহ মৃত, কেহ অর্দ্ধমৃত, কেহ জীবন্মৃত, কোথাও পুত্রশোকা-তুরা রমণীর হৃদয়ভেদী ক্রন্দন, কোথাও পতিহীনীর মর্ম্মস্বন্দ বিলাপধ্বনি, শৃগাল কুকুরের শব্দ লইয়া কলহরব, ভূত প্রেত পিশাচের অস্থিমাংস-চর্কণ-শব্দ, উঃ কি উৎকট কি বীভৎস শ্মশানদৃশ্য—কিন্তু কে আমি, এই ভয়ঙ্কর মৃত্যুলীলাক্ষেত্রে, একাকী দাঁড়াইয়া আর্ত উদাত্তস্বরে অমৃতমন্ত্র উচ্চারণ করিতেছি, পলে পলে, ভূত প্রেত পিশাচের তুষার-শীতল করস্পর্শ স্বপ্নদেশে অল্পভব করিতেছি, হিংস্র স্বাপদকূল ক্রোধগজ্জনে সর্ব্বদাই তাড়না করিতেছে, বুকের মধ্যে কাহার সাহস আমার অভয় দিতেছে—আমি উচ্চৈঃস্বরে কেবলই বলিতেছি—“মৃতোমি অমৃতংগময়”।

হে মহাশ্মশান! অন্ধকারই তোমার লীলার চিরসহচর, তোমার বুক

হইতে এই বিরাট আধার দূর করিয়া দিবার তপস্যা আরম্ভ করিয়াছি, স্তিমিত জীবন-প্রদীপ অমৃতসিঞ্চে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, ভিতর হইতে জাগিবার সাড়া পাইয়াছি, রজনী প্রভাতপ্রায়, তাই যমকিন্দরগণের কোলাহলমাত্রা বৃদ্ধি পাইয়াছে, ঐ দেখ উষারাগীর সীমন্তরেখায় কি উজ্জ্বল সিন্দুরবিন্দুর বিমল প্রভা আধার-গগনের দিক্চক্রবাল উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছে, ঐ শুন স্বর্গস্থ দেববালাগণ প্রভাতারতির পঞ্চপ্রদীপ দোলাইয়া কিনরীকণ্ঠে নবযুগের উদগান করিতেছে।

মৃত্যুতীর্থে আগত অসংখ্য নরনারী, অবসন্ন শরীরে ক্ষীণ বাহুবলে কতক্ষণ বৃত্তক্ষু শৃগাল কুক্কুরের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবে? একবার অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখ জ্যোতির্ময় পুরুষের জাগরণ, দেখ মানবাত্মার অভ্যুদয়, দেখ কি অপার্থিব শক্তিতে তুমি পূর্ণ হইয়া উঠিতেছ, দেখ তোমার নবজীবন দেখিয়া হিংস্রপশু পলায়নোদ্ভূত, দেখ চতুর্দিকে জাগরণের দৃশ্য, অভিশপ্ত আত্মহারা আমরা অনর্থক ক্ষীণ আত্মশক্তির অন্তশীলনে সহস্র বৎসর ধরিয়া বাহ্য করিতে অসমর্থ হইতেছিলাম, আত্মদর্শনে এক মুহূর্ত্তে শরীর মন অভাবনীয় শক্তিসম্পদে পূর্ণ হইয়া উঠিল—এক্ষণে এস মৃতপ্রায় অচেতন জাতির কর্ণে এই অমৃতমন্ত্র প্রদান করি। বাধা বিঘ্ন আত্মবিশ্বাসকেই দৃঢ় করিয়া দেয়, আত্মার জাগরণ যে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, ভূতের ভয়ে সে সন্ত্রস্ত নয়। এস জাতির কর্ণে কেবলই শুনাই—তাহারা মরে নাই, মরিতে পারে না, তাহারা দেহ প্রাণ মন নয়, তাহারা অমর আত্মা, ধনীর মধ্যেও যে আত্মা দীন দরিদ্রের মধ্যেও সেই আত্মা, বিচিত্র সজ্জায় আত্মগোপন করিয়া থাকিলেও, আমরা কিছুতেই আর ভুলিব না—যে এই সকল একই আত্মার ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ—এই আত্মদর্শন যতই জাগ্রত করিয়া তুলিবে, ততই মায়ার আধার দূর হইয়া যাইবে। ঐ হৃর্ত্তিক্ষক্লিষ্ট কৃষকের কর্ণে চুপে চুপে বলিয়া দাও তুমি ঈশ্বর, সে নবশক্তিতে, অসীম বলে হল চালনা করিবে, ঐ জমিদার-পুত্রকে শুনাও সে আর ঐ কৃষক অভেদ, মন্ত্রসিদ্ধি হইলে উভয়ে ভিন্না-বস্তার লোক হইলেও প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ হইবে, ঈশ্বর হইতে জাতিকে যতই দূরে রাখিবে, ততই অজ্ঞান-অন্ধকারে তাহারা নিমজ্জিত হইবে, অজ্ঞানই মৃত্যু, আজ আমাদের চতুর্দিকে যমকিন্দরগণের তাণ্ডব নৃত্যের কারণ আর কিছুই নহে, আমরা ভগবান হইতে দূরে পড়িয়াছি। আজ

এই ভগবানকে হৃদয়ে হৃদয়ে দেখিবার ও দেখাইবার আয়োজন কর, নৃত্য
সৃষ্টি অচিরে বিকশিত হইবে—আজ উন্মাদ হইয়া ঘরে ঘরে গাহিতে থাক—

“যেদিকে ফিরাব জাঁখি তোমারে হেরিতে চাই,

হৃদয়ে হৃদয়ে বস’ হেরিলা প্রাণ জুড়াই—

এস এস প্রাণবঁধু বিরহে রহিতে নারি !

উপায়

জীবন থাকলে তো আর যা কিছু—সাহিত্য কলা বিজ্ঞান দর্শন ধর্ম কর্ম
সব—কিন্তু বাঙ্গালীর এই জীবন নিয়েই আজ বিষম টানাটানি পড়েছে।
আগে এই জীবন রক্ষা করতে হবে, নহিলে হাহাকারপূর্ণ বাংলার আকাশে
বাতাসে আর কোন কথাই থই পাবে না—যেখানে মূল মহাপ্রাণটা নিয়েই
যেন মানুষে হেঁচড়া হেঁচড়ি চলেছে, সেখানে কোন্ স্বপ্ন, কোন্ আদর্শ,
কোন্ স্বপ্ন চাকচর্য্য মানুষ তার মনকে নিরুদ্ভিগ্ধভাবে নিয়োগ করতে পারবে ?
দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট অর্ধনগ্ন কপদিকশূন্য এই জীবন্মৃত কোটা কোটা নরনারীর
পেটে দুই বেলা দুই মুঠা—অন্ন, আর একখানা পরিধেয় বস্ত্রের সংস্থান
করবার কোনও আয়োজন সবেমাত্র আগে করে’ দিতে পারবে কি ? তার-
পর তোমার সাধন ভজন ধর্ম কর্মের কথা তুলতে হয় তুলিও—নতুবা—অন্ন-
বজ্রহীন ঋশানমাত্রী শবের কানে হিরিনাম শুনিবে কি লাভ হবে চাই ?
আর তাও কেই বা শুনবে ?

*

*

*

উপায় কি—কেমন করে’ বাংলার জীবনরক্ষা হবে ? হাটে বাজারে
সমস্ত জিনিষপত্র অগ্নিমূল্যে বিকাইতেছে—নয় টাকা মণ চাউল, আড়াই
টাকা সের ডেজাল সাপের চর্কি, ছয় টাকা জোড়া খুতি—বল দেখি
বাঙ্গালী গৃহস্থ খায় কি আর পরে কি ? বাঙ্গালী বাঁচবে কেমন করে’ ?
শুনতে পাই বাংলার শিশুমৃত্যুর সংখ্যা অতি ভয়াবহ—অগণিত শিশুর দল
শুষ্ক মাদুস্তন টেনে টেনে কতদিন আর টিকতে পারে ? শুধু শিশু কেন,
কিশোর বৃদ্ধ যুবক যুবতী—কয়জন আজ পেট ভরে আহার পায় ? বাংলার
অভিশপ্ত সংসারে কয়জন আজ মান ইজ্জত বজায় রেখে মানুষের মত

উন্নত বৃকে চলতে পারে? হাসি, সুখ, স্বস্তি, কল্যাণ সমস্তই যেন বাংলার ত্রিসীমা থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে—হতশ্রী শ্রানমুখ দৌণ্ডিহীন জীর্ণ-শীর্ণ নরকঙ্কালের সারি—এই শ্মশানমূর্তিই তো আজ সোণার বাংলার সত্য চিত্র।

তারপর বিশ্বজগতের নূতন পুরাতন যত রোগ তাদের খাজনা আদায় করবার জন্য চিরবন্দোবস্ত এমন আর কোন্ দেশে করে' বসেছে? ইউরোপের এই চারি বৎসরব্যাপী প্রলয়ঙ্কর মহাযুদ্ধে শত্রু মিত্র সকল পক্ষ মিশিয়ে যত লোকক্ষয় হয়েছে, বিনাযুদ্ধে শুধু এক সমরজয়ের হাতে তার সমসংখ্যক মানুষ এদেশে পতঙ্গের মত প্রাণ আহতি দিল—কথাটা ভাবতেও প্রথম প্রথম গায়ে কাঁটা দেয় বটে, কিন্তু এমনি আমাদের এসব গা সওয়া হয়ে গিয়েছে, যে আর সে সূক্ষ্মে কোনও উচ্চবাচ্য করবার কোনও দরকারই বোধ হয় না। আর এসব কথা তুলে দুর্ভাবনার ভার বৃদ্ধি করে' লাভই বা কি হবে? উপায়হীন নিরুদ্যম জাতি আমরা—লগাটের লিপি বলে' এসব মেনে লওয়া ছাড়া আমাদের আর কোন্ গতিই বা আছে? বিধাতাপুরুষ যেন যেখানকার যত অন্ধকার নৈরশ্য যত দুঃখ দারিদ্র্য হাহাকার—সমস্ত তিল তিল করে' চয়ন করে' দুর্ভাগ্য-চিত্রখানি যত জমাট নিখুঁত রকমে আঁকতে পারেন—এদেশে তারই জন্ত তাঁর তুলিকা চালনা করছেন—হায় শ্মশানচণ্ডী! কবে তোমার এই মসীময়ী ধুমাবতী মূর্তির সংবরণ করবে?

উপায় কি সত্যি কিছুই নাই? মরুদেশের তপ্ত দমকা হাওয়ার মত আজ দেশের ঘরে ঘরে যে উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস উঠছে—যে করুণ মর্শস্তদ আর্জ-নাদে বাংলার গগন পবন ভরে' গিয়েছে—শুধু অভাব আর অভাব; জীবন্তে অনটনক্লিষ্ট হৃদয়ভার দুঃসহ দাহন, তারপর অকালে দলে দলে চিতার আগুনের মধ্যে জীবন বিসর্জন—বাঙ্গালীর ভাগ্যপটে এই বীভৎস দৃশ্যটুকু ছাড়া আর কিছু কি ভগবান্ আঁকেন নাই—এই স্তম্ভলা ফলফুলভরা শস্যশ্রামলা সোণার দেশের সপ্তকোটি নরনারীকে কি শুধু এমনি ক'রেই তাদের জীবন-রঞ্জন পরিশোধ করতে হবে—আর কি কোনও আশা নাই, আমাদের আর কি কোনও পথ নাই?

হায়, “এমন মানবজমি রইলো পড়ে’ আবাদ করলে ফলতো সোণা।”
 বাংলার সাধককবির মর্মকথা বাঙ্গালীর অন্ধকারময় জীবনক্ষেত্রে বর্ণে বর্ণে
 কি কঠোর সত্য হয়ে আজ ফুটে উঠেছে—বাঙ্গালী, বাঁচতে জানলে না,
 শিখলে না—যে তপস্যায় জীবনের উষর মরুক্ষেত্রে কনকবরণ শস্যসম্পাদে
 সমুজ্জল করে’ তুলতে পারা যায় আজও সেই সাধনকৌশল আয়ত্ত করতে
 পারলে না! দিগ্বিদিক থেকে মানুষের দল এসে এই দেশ হতেই মুঠা
 মুঠা সোণা কুড়িয়ে ভারে ভারে মাথায় করে’ নিয়ে যায়—বাঙ্গালী শুধু
 ‘জুল জুল করে’ চেয়ে থাকে, ঘরে বসে কাঁদে আর উৎসন্ন যায়। যাদের
 হাত আছে, পথ আছে, যাদের ভাগ্য আছে পৌরুষ আছে তারা কাতারে
 কাতারে আসে আর মাছের তেলে মাছ ভেজে ফিরে ঘরে চলে যায়—
 বাঙ্গালী আপন পরিজনবর্গের অঞ্চলপ্রাপ্তে মুখ ঢেকে শুধু দীর্ঘশ্বাস
 আর চোখের জলে ছুনিয়ার দুঃখময় দিনগুলো কোনও রকমে কাটিয়ে
 দেয়। এ বড় চমৎকার রহস্য, প্রকৃতির এ বড় উৎকট পরিহাস বটে!

ভুই রাস্তার ধারে গাছের ছায়ায় কাল যে একপাল মহিষ চরাতে
 এসেছিল—কোমরে একটা কোপীন, হাতে একটা হেঁতাল কাঠোর
 মোটা লাঠি আর সকাল সন্ধ্যা দুই মুঠা ছোলার ছাতু হাতে মেড়ে
 লঙ্কার ঝাল দিয়ে গলাধঃকরণ করে’ই যে পরম পরিতুষ্ট ছিল, আজ এই
 দেখে সেই পথেই ব্রাহ্ম হাঁকিয়ে অল্পগ্রহজিহ্বুক মোসাহেবের দলে পরি-
 বেষ্টিত, চলেছেন উজ্জল মসীবিনিন্দিত লাবণ্যময় নধর পুরুষ—একে
 কি আর চিন্তে পারবে? কিন্তু ওই সেই মহিষপালক রাখাল,
 আজ সে গ্রামের শ্রেষ্ঠ মহাজন, সমস্ত বাজার আজ তাহারই প্রতাপে
 কম্পমান। ওই যে তিলককাটা পাগড়ীবীধা দীনহীন ভিখারীর সন্তান-
 কলিকাতার অন্ধকারময় কুঠুরীখানি ভাড়া করে’ জিলিপির দোকান খুলে
 বসলো—দেখতে দেখতে আজ তারই রাজপ্রাসাদ হিমালয়ের মত মেঘ-
 লোক চূষন করে খাড়া হলো—সেই অট্টালিকার বারান্দায় বসেই কোটী-
 পতি মাড়োয়ারী বণিক লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে ছিনি মিনি খেলছে।
 আশ্চর্য নয়, এই হিন্দুস্থানী মাড়োয়ারী কোটী কোটী টাকার অধীশ্বর
 সওদাগরবৃন্দের পক্ষে বাংলার ধনভাণ্ডা নিয়ে দাবাবোড়ে খেলা রাজ-

ধানীর বিলাসভবনে আর সঙ্কলান হবে না—অচিরে সমুদ্রের লহরী গণনার ছলে কৌতুকময় জুয়াখেলায়, তারা বাঙ্গালীর লক্ষ্মীভাণ্ডার নয় ছন্ন করতে আরম্ভ করবে, এ এমন বেশী বিচিত্র কথা কিছু নয়।

এমন সব হয় কেন, কেমন করে?—জীর্ণ নয়, বিধেয় নয়, ইউরোপীয় সাহেব সওদাগর তো দূরের কথা, ভারতেরই বিভিন্ন প্রদেশবাসী চতুর বণিকের দল যদি তোমাদের এই জীর্ণ কথা ঠেকিয়ে রাশি রাশি কণকপিণ্ড অবহেলে উপায় করে' নিয়ে যেতে পারে, তোমাদের এ কথা বুঝে দেখবার কি আজও একটুও প্রয়োজন হয় নি, কেন এমন সব ঘটে, কোন্ বাহুবল্যার প্রভাবে কি 'মস্তকোশল প্রয়োগ করে' লক্ষ্মীর বরপুত্র যারা তারা তোমাদের চোখে ধুলো দিয়ে বর্ষার জলস্রোতের মত অজস্র স্বর্ণসম্ভার স্তূপীকৃত করেছে—আর তোমরা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লক্ষ্মীছাড়ার দল হা হতাশে জীবন ভরিয়ে শুধু উচ্ছিষ্ট সংগ্রহে তৎপর! নাহুষ তারাও যেমন, তোমরাও তো তেমনি—বুদ্ধি বিদ্যা মেধা প্রতিভা—তাদের চেয়ে তোমরা বুদ্ধিমান বাঙ্গালী জাতি শ্রেষ্ঠ বই নিকৃষ্ট নও—তবে এমন কেন হয়, কেন তোমাদের ঘরে ঘরে বছরের তিন শ পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে একদিনের তরেও নিত্যদুর্ভিক্ষের বিকট নৃত্য বন্ধ হয় না?—এর মানে কি? বলি, এ প্রশ্নের এ ভাবনার কি তোমাদের আজও দিন আসে নি?—

বার (Bar) আর মেডিকেল-কলেজ, শিবপুর আর কলেজের প্রফেসারী—আর বাকী সব শতে শতে সহস্রে সহস্রে কলম পেষণ—এই যাদের জীবিকার সম্বল, তাদের জাগতিক ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল আশাবাদ নয়, এটুকু আমরা সকলেই জানি—কিন্তু কি—আর কি করাই বা সম্ভবপর? ছেলেরা বছরে বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কামারা হয়ে দলে দলে হাজারে হাজারে বেরুচ্ছে—তারা এই বাঁধা পথ কয়েকটি ছাড়া আর কোন পথের আশ্রয় নিতে পারে? বাংলার জীবিকাশিক্ষকের আর অন্য কোন পথটি খোলা আছে? জানি, শত সহস্র কণ্ঠের মৌন উত্তরে শুধু এইটুকুই শুনতে পাব—নেই, নেই, আমাদের সম্মুখে আর কোনও পন্থাই খোলা নেই—আমাদের আর

কোনই আশ্রয় নেই। সত্যসত্যই মানতে হবে, খোলা পথ আমাদের সম্মুখে একটাও মুক্তভাবে পড়ে নেই।

*

*

*

খোলা নেই, কিন্তু খুলতে কি পারি না, খুলতে কি হবে না? কে আর চর্যাচোষ্যলেখপেয়ভরা আহারপাত্রখানি আমাদের মুখের কাছে তুলে ধরবে—পৃথিবীতে কে এমন সদাশয় আছে যে মরের থেমে এসে আমাদের জন্ত বনের মোষ তাড়াতে লেগে যাবে? তা হয় না, হবে না, তা হওয়া উচিতও নয়, ক্ষুণ্ণ সিংহের মুখের গহ্বরে জীবন্ত হরিণ আপনি এসে যদিও প্রবেশ করা সম্ভব হতো তাতে সিংহের দারুণ ক্ষতি বই একটুও লাভ হবে না। আমাদের আপন জীবনপথ আপনাদেরই কেটে নিতে হবে—আমাদের “মল্লবাস্থের তহবিল” ভেঙ্গে অস্ত্রে কেন আমাদের অন্নরস্নেহ সংস্থান করে দিতে যাবে, দিলেও আমরা তাদের তাকবৃত্তে দিব কেন? উপায় নেই আজ দেখছি, পথ নেই আজ বুঝছি—কিন্তু এই যে আমাদের রয়েছে হস্তগত দেহ প্রাণ মন—এই যে রয়েছে আমাদের অন্তরের মধ্যে প্রেম, শক্তি, স্পর্ধা, বীৰ্য্য, উৎসাহ—মস্তিষ্কের ভিতরে এই যে রয়েছে ছাইচাপা আশুনের মত দীপ্ত জ্যোতির্ময় প্রতিভা—আর শোন, চুপে চুপে গভীরে গোপনে অন্তরের অন্তস্তম চিদাকাশে তৃতীয় কর্ণটুকু পেতে, একাগ্র শ্রদ্ধায় ভরপুর আপূর্ণ শ্রবণময় হয়ে—শোন—আছেন ভগবান—দূরে নয়, বাহিরে নয়, সপ্তলোকের পরপারে নয়—কিন্তু এই জীবনমন্দিরের প্রাকোষ্ঠে প্রাকোষ্ঠেই আছেন আমাদের জ্যোতির্ময় অনন্ত ঠাকুর—আর সেই ব্রহ্মবরুণের সহিত আমরা একত্রে অভিন্ন।

*

*

*

এই অদ্বৈত মহাজ্ঞানের সিদ্ধি এলেই আমরা অনন্ত শক্তির আধার হয়ে উঠবো—বেদান্তের মন্ত্রসিদ্ধ সিংহনির্ঘোষের উপরই জাতির সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। শাস্ত্রে উপদেশে ধ্যানে ধারণায় এই ব্রহ্মমন্ত্র সত্যভাবে লাভ করা যায় না—তপসিদ্ধ ভাগবতসাধকের প্রেমস্পর্শেই এই শক্তিময় সিদ্ধমন্ত্র দীপ্ত অনলের মত নবোদিত তরুণ জাতির জীবন-কুণ্ডে অগ্নি উঠবে।

*

*

*

গজলিকা প্রবাহ মুখে গতানুগতিক বীধাপথের যাত্রী দল নয়—চাই অটুট ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন প্রতিভাবান সাধকের একটা দৃঢ়বদ্ধ একহৃদয় সমষ্টি—সংখ্যার মুষ্টিমেয় হ'লেও নিভৃততপঃক্ষেত্র থেকে গোপন স্পর্শে উদ্বুদ্ধহৃদয় এমনই সর্বভ্যাগীর দল জাতির জন্ত নূতন নূতন কর্মপথ মুক্ত করতে দিকে দিকে ঘাড়া করবে, উদীপ্ত প্রতিভার খনিজ দিয়ে এই শুদ্ধচরিত্র সর্বসহিষ্ণু কর্মীকূল নব নব জীবিকার প্রণালী উৎকীর্ণ করবে—তারাই ভারতের অপামর সাধারণকে দেবত্বের দীক্ষিত করে তাদের মধ্যে অবরুদ্ধ কর্মপ্রতিভা ফুটিয়ে তুলবে—ভগবানের শুদ্ধ যজ্ঞস্বরূপ ইহাদেরই সাধনার দেশজননী ফুলে ফুলে শত্ৰুসম্পদে রজতচিত্র কনক আভরণে বিভূষিতা হীরকমুকুটমণ্ডিতা রাজরানীবেশে আবিভূতা হবেন।

যুগ-সাধনা

যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল। জগতের সর্বত্র পুণ্যতনের বনিয়াদ ভাঙিতে আরম্ভ করিয়াছে। ঘটনাপরম্পরার পশ্চাতে যে সকল শক্তি কার্য্য করিতেছিল, উহার শীঘ্রই পৃথিবীর বর্তমান অভিনয়ের উপসংহার করিলে। যুদ্ধ কালে নূতন সৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল না, মানুষের মন সমরসমস্যায় ব্যাপ্ত ছিল, মানবমনের স্বাধীন ইচ্ছা সাময়িক কঠোর বিধান অতিক্রম করিয়া মূর্ত হইয়া উঠিতেছিল না, অতঃপর চতুর্দিকেই নূতন শ্রোত প্রবাহিত হইবে, নূতন পরিবর্তনের আভাস পৃথিবীর সর্বত্রই পরিদৃষ্ট হইতেছে, এই নবজাগরণযুগে কি নূতন সৃষ্টি দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হয়, তাহার জন্ত বীর চিত্তে আশাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইবে।

আজ সন্ন্যাস জগৎ উন্নতির পথে ধাবমান। কোন্ চিন্তাধ্বজ জগদাধীর যুদ্ধি সন্নিবিষ্ট, কোন্ কার্য্যপ্রণালী অবলম্বনে তাহার সাফল্যলাভ করিতে পারে, সেই সকল চিন্তা, সেই সকল পথ আমাদের অবগত্ত হইতে হইবে। কিন্তু বড়ই হৃৎথের বিষয়, বাঙ্গালী এই সকল চিন্তা হইতে এখনও বিয়ত রহিয়াছে, সুদূর দেশের মুষ্টিমেয় একদল নবীন শাস্ত্র ও সমাহিত চিন্তে নূতন মন্ত্রে দীক্ষালাভ করিয়া অসাধারণ বৈদ্যসহকারে,

এই নূতন দর্শন অধিগত করিবার সাধনা করিতেছে, কিন্তু অধিকাংশ লোকই গভীর মনোবা ও অমোঘ অন্তর্দৃষ্টি লাভের পথটা ছাড়িয়া, বাহিরের আবর্তে হাবুডুবু খাইয়া মনে করিতেছেন, তাঁহারা কিছুর করিবেন, চাক্ষুণ্য ও আবেগময় বাঙ্গালীর জীবনের ইহাই বিশেষ লক্ষণ।

ইহাতে আমরা আশ্চর্য্য হই নাই। বাঙ্গালী মস্তিষ্কবল হারাইয়া ফেলিয়াছে। শক্তিপ্রদ পুষ্টিকর খাদ্য হজম করিবার সামর্থ্য তাহার নাই, উগ্র তীব্র বাঁঝাল কিছুই রসায়ন না দিলে কোনও খাদ্য বাঙ্গালীর কাছে রুচিকর হয় না।

সম্প্রতি দেশে ভই রকম চিন্তাস্রোত প্রবহমান। একটা রাজনীতি-চর্চা, অপরটা ধর্মসাধনা। এই ধর্মশাস্ত্র অনুশীলনের মৌলিক প্রতিভা ও সামর্থ্যও ভারতবাসী হারাইয়াছে।—দেশের মনোবা সেই চিরাগত চিন্তাপুঞ্জ রোমন্থন করিতেই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে—ভাব্যকারগণের বুদ্ধিযন্ত্রে পরিপাক হইয়া হিন্দুর ষড়দর্শনের যে চিরপরিচিত তত্ত্ব উহাই এক্ষণে একমাত্র উপাদেশ খাদ্য, উৎকৃষ্ট ধর্মতত্ত্ব। নূতন জীবনদর্শ, নূতন চিন্তা, নূতন যোগপন্থার কথা শুনিলেই বাঙ্গালীর মাথা ঘুরিয়া যায়, এইগুলি একেবারেই হুর্ক্ষোধ্য বলিয়া পরিত্যক্ত হয়।

ইউরোপের অবস্থা একেবারেই বিপরীত ধরণের। তাহাদের প্রতিভা-মন্দিরের দ্বার অর্গলমুক্ত, যে কোন নূতন চিন্তা, নূতন দর্শন, নূতন সাহিত্য আত্মক না, অবাধে উহা গৃহীত হয়, সহস্র সহস্র লোক উহা বুঝিয়া কাজে লাগাইবার জন্ত উদগ্রীব হইয়া উঠে, কারণ আর কিছুই নহে, উহাদের বুদ্ধিবৃত্তি সজাগ আছে, অন্তর ও বহির্জীবন আরও বিকশিত করিয়া তুলিবার জন্ত উহারা পৃথিবীর জ্ঞান আকর্ষণ করিতে চাহে, পুরাতনের জীর্ণমন্দির দাগ্‌রাজি করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে উহারা রাজী নহে, নব নব প্রেরণা ও সত্যরাশিকে আলিঙ্গন করিয়া নিত্য নূতন সজীব মানুষের মত পৃথিবীর বুকে বাস করাই উহাদের জীবনের উদ্দেশ্য—আধমরা হইয়া বাঁচিয়া থাকা, আর একেবারে মরিয়া যাওয়া এ দুয়ের মধ্যে অধিক পার্থক্য যুরোপ দেখে না। আমাদের মনের অবস্থা কথঞ্চিৎ পরিমাণে যখন উহাদের মত জীবন্ত হইয়া উঠিলে, তখনই আমরা জগতের যাহা কিছু নূতন যাহা কিছু ফলপ্রদ তাহাকেই আলিঙ্গন করিয়া জাতীয় জীবনকে অধিকতর শক্তিশালী করিয়া তুলিতে পারিব।

আমরা আমাদের জাতির এই বুদ্ধিবৃত্তিকে সজাগ করিয়া তুলিতে চাই।
বাঙ্গালী মস্তিষ্কচালনার পথে একেবারেই যাইতে চাহে না, অধ্যয়নরত
যুবকছাত্রগণ, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই কলেজের আবশ্যকীয় পুস্তক ভিন্ন
অপর কোন পুস্তক পড়িতে প্রস্তুত নহেন, ইউনিভারসিটির ছাড়পত্র গ্রহণ
করিবার জন্য যন্ত্রের মত যতটুকু চাকা ঘুরাইলে চলে ততটুকু পরিশ্রমই
শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করেন, বাজে খরচের ভয়ে গবেষণাপূর্ণ নূতন কোন
নিগূঢ় সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হন না, ইহাতে বুদ্ধির যে তীক্ষ্ণতা যে
সজীবতা তাহা হ্রাস হইয়া যাইতেছে।

বাঙ্গালীর এই নষ্টপ্রায় মস্তিষ্কশক্তিকে জাগাইয়া তুলিবার জন্যই আমরা
নূতন দর্শন, নূতন যোগপ্রণালী জাতির সম্মুখে খুলিয়া ধরিতেছি ইহা যে
সহজে গৃহীত হইবে না তাহা আমরা জানি, কেননা বাহ্য নূতন তাহা
গৃহীত হওয়া সময়সাপেক্ষ। তবে যাহারা এই অধ্যাত্মযোগ গ্রহণ করিয়া-
ছেন, যাহারা আমাদের কথাগুলি লইয়া নিবিষ্টচিত্তে আলোচনা করিতেছেন
তাঁহারা যদি এতদ্বারা উন্নত হইয়া উঠিতে পারেন তবেই আমাদের উদ্দেশ্য
সিদ্ধ হইবে। বাস্তবপক্ষে কিন্তু আমাদের এই যোগ একেবারেই নূতন
নহে, অতি পুরাতনকেই পুনরানয়ন করা হইয়াছে, তবে ইহা এত প্রাচীন
যে মানুষ একেদারেই ইহা ভুলিয়া গিয়াছে। আমরা যদি পাশ্চাত্যমুসরণে
রাজনীতির কথা কহিতাম, শঙ্কর ও বৌদ্ধশাস্ত্রের অঙ্ক অল্পকরণে শাস্ত্র-
ব্যাখ্যা করিতাম, হয়ত অনেকেই আমাদের কথা বুঝিতেন, কিন্তু আমাদের
এই যোগ দর্শন উন্নয়নপ্রভাববর্জিত বলিয়া, অনেকের নিকট ইহা আবর্জী
বা ফারসীর মত দ্রবোদ্য।

আমাদের যোগ ও জীবনের কথা বুঝিতে হইলে বাঙ্গালী পাঠকবর্গকে
অভিনিবিষ্টচিত্তে ইহা অধ্যয়ন করিতে হইবে, সর্বপ্রথমে বাঙ্গালীর স্তম্ভ বুদ্ধি-
বৃত্তিকে জাগাইয়া তুলিতে চাই, নব নব চিন্তাপ্রবাহে বাঙ্গালীর বুদ্ধি
পরিপূর্ণ হউক, সকলেই অসাধারণ প্রতিভাশালী হইয়া উঠুন ইহাই আমা-
দের ইচ্ছা। আমরা দেখিতে পাই, কেবল ভয়ের জন্যই যে বঙ্গীয় যুবকগণ
অরবিন্দ বাবুর “আর্য্য” ও আমাদের “প্রবর্তক” পাঠে অনন্যোযোগী-
এরূপ নহে, এগুলি পাঠ করিতে হইলে পাঠককে বিশেষ ভাবে মস্তিষ্ক চালনা
করিতে হইবে, চিন্তাশক্তিকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে, অল্পসময়জীবনে এই-
গুলি উপদ্রব বলিয়া মনে হয়, অবসরকালে বাংলা মাসিকের লঘুপাক

চুটকী গল্প ও অগার রঙ্গরহস্যময় উপজ্ঞান পাঠে পাঠকগণ যেরূপ তৃপ্তি পাইবেন আমাদের আয়োজনটিমূলক নূতন দর্শনশাস্ত্র সেরূপ তৃপ্তিপ্রদ হইবে না, কিন্তু মন ও বুদ্ধিকে এরূপ অলসভাবে ছাড়িয়া দিলে ক্রমশঃই আমাদের যে কিরূপ শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইবে তাহা ভাবিতেও ভয় হয়।

রাজনীতিক ক্ষেত্রে মানুষ হইবার জন্ত একটা নূতন সাধনার আবশ্যক হইয়াছে, নির্ভীক চিত্তে রাজবিধির তীব্র সমালোচনা করা, আবশ্যক হইলে প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স অবলম্বন করা প্রভৃতি—এগুলিও বাঙালীর বুদ্ধিতে আশ্রয় পাইতেছে। বিষয় বিশেষ জটিল নহে,—বদেশী যুগের স্বত্বপাত হইতেই এরূপ মানুষ হইবার পথ আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং ইচ্ছা করিলে যে কেই ইহা অবলম্বন করিতে পারেন। স্বয়ং প্রকৃতি মানুষ সৃষ্টির জন্য নানা ঘটনার সৃষ্টি করিতেছেন, পৃথিবীতে মানুষ না হইতে পারিলে দাঁড়াইবার আর স্থান নাই, সারা জগতে মানুষ হইবার যে সাধনা চলিয়াছে ভারতে তাহার শ্রোত তত ধরপ্রবাহ নহে বলিয়া হতাশ হইবার কিছুই নাই—প্রকৃতি নিজেই মানুষ গড়িবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

আমরা দেখিতেছি—জগতে আজ এক নূতন শ্রোত দেখা দিয়াছে, এই শ্রোতে অবগাহিত হইয়া পৃথিবী নূতন মূর্তি পরিগ্রহ করিবে। জগৎদাসী পুরাতন পরিচ্ছদ পরিহার করিয়া নূতন সজ্জায় নূতন বেশে, এক উন্নতযুগের সন্ধিক্ষণে উপস্থিত, জগতের যে দেশ, যে আতি আজ অতীতকে ছাড়িয়া ভবিষ্যৎ স্বর্ণযুগের মানুষ হইয়া উঠিতে পারিলে, তাহারাই সমগ্র জগতের নেতৃস্থানীয় হইবেন।

পৃথিবীর অন্তরে অন্তরে যে সাধনার কথা, যে অভিনব চিন্তার ধারা প্রবাহিত হইতেছে, আমরা তাহারই আভাস দিয়া আসিতেছি; যে প্রণালী অবলম্বন করিলে জগৎ মহাসিদ্ধি লাভ করিবে, আমরা সেই পন্থাই দেখাইয়া আসিতেছি; অবশ্যই সর্ববিদিত স্পৃষ্ট কারণ সকলের জন্ত আমাদের সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি নাই, সরল অভিন্যক্তির অভাবে আমাদের কথাগুলি যথেষ্ট স্বচ্ছ ও সহজ হয় নাই, একেবারে বর্ণহীন অরঞ্জিত হইয়াছে, উত্তেজনাআবেগময় বাঙালীর চিন্তা-বিনোদন করিবার মত কথা আমরা কহিতে পারি নাই, তবুও যতটুকু বলিয়াছি—বাহারা আমাদের কথা বুঝিতে চাহেন, বাহার নিবিষ্টচিত্তে

ধারাবাহিক “প্রবর্তক” পাঠ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা তাঁহার ছত্রে ছত্রে যাহা করিতে হইবে তাঁহার দিব্য ইঙ্গিত পাইতে পারেন।

অতঃপর, আমরাগিকে যাহা করিতে হইবে, উহা তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে :—

প্রথম, প্রত্যেক মানুষকে ব্যষ্টিভাবে নূতন যুগের জন্ত দেবচরিত্র লাভ করিতে হইবে, যে ভবিষ্যৎ দেবমানবজাতিকে জন্মান করিবার জন্ত মেদিনীর আজ গর্ভযন্ত্রণা উপস্থিত, তাঁহার যোগ্য নূতন চরিত্র গড়িয়া তুলিবার সাধনা গ্রহণ করিতে হইবে।

দ্বিতীয়, এমন সাধক সকলকে অবিচ্ছিন্ন প্রেমস্থজে একত্র সম্মিলিত করিয়া একটি দৈব সামঞ্জস্যের দেবসংস্কার গড়িয়া তুলিতে হইবে। ইহারাই হইবেন দেবজাতি—ভাবী সত্যযুগের অগ্রদূত।

তৃতীয়, তাঁহারা এইরূপ নবযুগের পুরোহিত হইবেন, এই উদ্যোগস্থ স্বর্ণযুগের বিজয়সিন্ধুর ললাটে আঁকিয়া তাঁহারা অতঃপর সমস্ত পৃথিবীর লোককে এই জাতির নেতৃত্বাধীনে আব্বান করিয়া আনিবেন—বিশ্বমানব-জাতির সমষ্টিসাধনার রাজপথ তাঁহাদিগকেই প্রদর্শন করিতে হইবে।

ভঙ্গলী অহঙ্কারপরবশে যে কর্মসাধনের জন্ত জগদ্ব্যাপী মহা অশান্তির সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছিল, ভারতবর্ষকে তপঃশূন্য হইয়া সেই মহাকাব্য সাধন করিতে হইবে, পশুবলেন্দ্রে, অধ্যাত্মশক্তির সাহায্যে।

আমরা দেখিতে পাই, এই কৃতযুগের জন্ত ভারতবর্ষই বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে, বিশেষতঃ বাংলাদেশ ওতপ্রোত ভাবে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মপ্রবর্তক-গণের সাহায্যে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছে, সম্মুখে স্বর্ণ স্বয়ংগ—বাঙালী গভীরভাবে এই বিপুল দায়িত্বপূর্ণ কথাটা উপলব্ধি করিবে কি ?

বাঙালীর সম্মুখে আজ কঠোর কর্মক্ষেত্র, বাঙালীকে মানুষ হইতে হইবে না, বাঙালীকে দেবতা হইতে হইবে, বাঙালীর আজ জাতি নাই, ধর্ম নাই, বাঙালী শতবর্ষ ধরিয়া একবার হিন্দুধর্ম ছাড়িয়া খ্রীষ্টান হইয়াছে, আবার ব্রাহ্ম হইয়াছে, আবার হিন্দু হইয়াছে, বাঙালীকে এখনও বহু পরিবর্তনের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, কিন্তু তাঁহাকে একেবারেই প্রাচীন আদর্শকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, অতীত ও বর্তমানের দিক হইতে দৃঢ়-চিন্তে ভবিষ্যতের দিকে মুখ ফিরাইতে হইবে, পশ্চাতের আর্জনাৎ, ভীতি, আত্মীয়স্বজনের মায়াক্রন্দন সমস্তই অটল হৃদয়ে উপেক্ষা করিয়া চলিতে

হইবে। দুইটি বিষয় হইতে বাঙালীকে সাবধান হইতে হইবে; একটা পাশ্চাত্য রাজনীতিক চর্চা, অপরটা বৌদ্ধপ্রভাবদুষ্ট জীর্ণ পুরাতন ধর্ম-সাধনা। এই দুইটির প্রভাবাচ্ছন্ন হইলে পৃথিবীতে বাঙালীর আর স্থান হইবে না।

উপসংহারে অতি সম্ভরণে আমরা আর একটা কথা বলিতে চাহি, বাঙালীর জীবনতন্ত্র বিদ্যাপ্রসক্তিপূর্ণ হইয়া আজ যে এমন অপূর্ণ রক্ষার তুলিয়াছে, তাহার কারণটুকু তুলিলে চলিবে না; আজ মনে রাখিতে হইবে বাঙালীর জরাজীর্ণ অস্থিকঙ্কালে ভগবান্ রামকৃষ্ণ যে মন্ত্রশক্তি সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন তাহা অমোঘ, সাধক বিজয়কৃষ্ণ যে প্রেমপ্রবাহে বাঙ্গালী জাতিকে অভিষিক্ত করিয়া তুলিয়াছেন তাহা অব্যর্থভাবে কর্মসাধন করিবে।

কিন্তু আমাদের ভয় হয়, রামকৃষ্ণ মিশন তাঁহাদের সাধু উদ্দেশ্য সত্ত্বেও; আচার্য্য শঙ্কর ও মহাত্মাগী বুদ্ধের মানবহিতৈষনা ব্রতকেই জাতির জীবনে আদর্শস্বরূপ না স্থাপন করেন, ঠাকুরের শক্তিসাধনার কথা প্রচার অপেক্ষা শঙ্করের ত্যাগধর্মকে প্রচার করিতেই ইহাদের উৎসাহ অধিক দেখা যায়, অবশ্য শ্রীমা ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ সারদানন্দ প্রভৃতি ঠাকুরের অঙ্গীভূত যাহারা তাঁহারা বর্তমান থাকিতে অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে এই বুদ্ধ শঙ্করের প্রভাবদুষ্ট একদেশদর্শী ত্যাগ-ধর্মকে ভাঙ্গিয়া দিতে নূতন জাতিকে পুনর্বার না সংগ্রাম করিতে হয়। নির্বন্ধাট সহজ মানবসেবা-ব্রত উচ্চ আদর্শ বটে, কিন্তু উহাই পূর্ণাদর্শ নহে, জগৎ যে পূর্ণ সাধনা চায়, বাঙালীকে তাহাই লাভ করিতে হইবে ও বিশ্বকল্যাণের জন্ত অগ্রদূত হইয়া আলোকবর্তিকা হস্তে সেই চরম পূর্ণসিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে হইবে—বাঙালী, তোমাদের সম্মুখে বিপুল কর্মক্ষেত্র—উঠ জাগ হতাশ হইও না।

সাপেক্ষের ডায়েরী

কোন কাজটী আমি করি আর কোন কাজটী ভগবান করেন, এ সকল ত আমি জানি না, আমি জানি, আমি কিছুই করিনা, বাহা কিছু ঘটে সকলই তাঁর ইচ্ছায়। তাই যখন কৰ্মক্ষেত্র হ'তে বার্থ মনোরথ হয়ে ফিরে আসি, আর পথের লোক বিজ্ঞপ হাস্যে টিটকিরি দিতে থাকে তখনও তা হেসে উড়িয়ে দিই, আর সাফল্যের মুকুট মাথায় পরে যখন আমার চারিদিকে জয়ধ্বনি শুনে পাই তখনও তা জ্ঞেপ করি না, আশা নৈরাশ্র সাফল্য বিফলতা এ দুয়ের কোনই পার্থক্য দেখতে পাই না, কেননা আজিকার বার্থতাই কল্যাণে কাজ করিব, তাঁর জ্ঞান আহরণ করে, আজিকার নৈরাশ্রগর্ভেই আশা যে চিরদিন অপূর্ণ থেকে যায় এমন আমি কোন দিনই দেখি নাই।

সত্যই আমি এক অভূত লোক। যা আছে তাকে ভেঙ্গে দিয়ে এগোনিক যেন আমার কৰ্ম, অপরাধী আমি নই, আমার যিনি চালিয়ে নিয়ে বেড়ান—তিনি। জীবনের ভারি বোঝাটী অলক্ষিত কোন এক পুরুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে খুব যে চালাকীর কাজ করেছে, বাহির থেকে অনেকেই এই কথাটী ভাবতে পারেন, সেইজন্য সর্বাগ্রে এর একটা ক্ষুদ্র কৈফিয়ৎ দিতে চাই।

আমার জীবন একেবারেই যে আমার নয়, ইহা ভগবানের—কথাটী প্রথম কাণে এসে যখন পৌছল, তখন যেন হাঁপ ছেড়ে বাচলুম, আর ও শুন্লুম, এই মন্ত্র স্বীকার করে নিলে, জীবনের সকল দায় ভগবানের ঘাড়ে গিয়ে চেপে বসে, মানুষকে আর বিশেষ কষ্টভোগ করতে হয় না, সুখ দুঃখ হর্ষ বিষাদ স্তুতি নিন্দা ও সকল দ্বন্দ্ব মনে আর স্থান পায় না, হাতের কলমটী বিনা বিরোধে আমার হাতে যেমন অবাধে চলেছে, জীবনও তজ্ঞপ আর একজনের হাতে সচ্ছন্দে চলতে থাকবে, চেষ্টা করতে হবে না, বুদ্ধি খাটাতে হবে না, হাজারটা এ চে একটাও হয় না—তারপর দারুণ মনঃকষ্ট—এ সব আর ভোগ করতে হবে না, অলস বাঙ্গালীর জীবনে এর চেয়ে বেশী সুখ আর কি ঘটতে পারে, বিনা আপত্তিতে

দব ছেড়ে এই সাধনাই সুবিধার বলে' গ্রহণ করলুম।

সাধনার প্রথম প্রভাতেই খুব জোর করে' বললুম “তয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি”—এই কথাটা যে ফস্ করে' উচ্চারণ করে' ফেললুম—কে সে উচ্চারণ করলে এই তত্ত্ব নিয়ে বিষম ভাবনায় পড়া গেল। কিছুতেই স্থির হ'ল না, এটা আমি করলুম কি ভগবান করালেন—বিছানায় পড়ে' দুঘণ্টা ধরে' এই এক বিষম দন্দ। গৃহিণী তর্জন গর্জন করে' বললেন—“এখনও বিছানায় পড়ে' ? আজ আর কাজ হবে না বুঝি !” যেমালুম বললুম “কাজ কর্ম করার ত করো”—গিন্নি ঈষৎরোধে উত্তর করলেন “কে করাবে” ? আমি উত্তর দিলাম—“ভগবান” গৃহিণী “ভূতে পেয়েছে” বলে' ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বাস্তবিকই ভূতে পেয়েছে। বেলা বাড়তে লাগলো, ভগবান কিছুতেই তুললেন না, গৃহিণীর তর্জন গর্জন ক্রমশঃই প্রথর হয়ে উঠতে লাগলো, ভগবানের কথা ভুলে' গেলাম, ভয়ে ভয়ে গাত্রোত্থান করলুম, যথাবিধি শৌচাদি সেরে আবার ভাবনা—ভাইত লোকটা আমায় পাগোল করলে দেখছি, চেষ্টা না করলে এক পাও যে নড়ে না।

তারপর ক্ষুধা, কাজ কর্ম সেদিন মাথায়, আহাঙ্গাদি সমাপন করে' ঐ ভাবনা, সবই যদি আমি করতে থাকবো, তবে ভগবানকে মধ্যে চুকিয়ে একি বিড়ম্বনা, সে দিন এমনই করে কেটে গেল, মাঝে মাঝে “তয়া হৃষীকেশ” ইত্যাদি মন্ত্রটা উচ্চারণ করেছিলুম, নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কর্ম আর করা হল' না, ব্যবসা বাণিজ্য সে দিন আর দেখা হল' না, পৈতৃক ঠাকুর দেবতা এক ফোঁটা গঙ্গাজল পেলেনা, বাড়ীসুদ্ধ লোক ভূতে পেয়েছে বলে ক্ষেপাতে লাগলো, রাত্রে শুয়ে একেবারেই মতলব উল্টে ফেললুম, ভগবান টগবান মিছে, নিজেকেই সব করতে হবে।

যেমন প্রতিদিন প্রভাত হয়, আজও সেইমত হল, একবার নিদ্রাভঙ্গ মাত্র মনে আসলো “তয়া হৃষীকেশ,” ইত্যাদি, কথাটা চাপা দিয়ে রোক করে' উঠে পড়লুম, যথারীতি শৌচাদি সেরে খুব জোর করে' সন্ধ্যাহিকে বসে গেলুম, বুকের মধ্যে যেন একটু শক্তি পেলুম, সারাদিন অম্মরবৃত্তির পর বাড়ীতে এসে ক্লান্ত শরীরে শয়ন করে' আবার ঐ ভাবনা, আচ্ছা ঐ বুজুককের দল বলে কি ? ভগবানের হাতে সব ছেড়ে দিলে একদণ্ডও ত চলেনা, দূর ছাই ও কথা আর ভাববো না, সেদিন ঘুমিয়ে পড়লুম।

আবার সকাল হ'ল, উঠেই একবার খানিকক্ষণ শুয়ে দেখি, ভগবান শরীরটা চালান কি না; কোথায়? নিজে না নড়লে কেউ নাড়া দেয় না, বাজে কথাটা ছেড়ে দিয়ে আবহমান বা কাল করে' আসছিলাম তাই করতে থাকলাম।

নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম কর্মে অধিক করে' জোর দিলুম, হিন্দুর মনো-তন সাধনা ত এই, শালগ্রাম শিলা সন্নিবিষ্ট ভগবান, মচন্দন-তুলসীপত্র ভক্তিসহকারে নারায়ণের মাথায় চাপালুম, করজোড়ে বললুম “নারায়ণ, কি তুমি, কোথায় তুমি, জীবনের অর্ধেক কেটে গেল, তোমার সাড়া আজও পাত পাতা গেল না, তুমি কি ঐ শিলার মধ্যে আছ, প্রহ্লাদের ফটিক স্তম্ভ ভেদ করে' যেমন মূর্ত হয়ে উঠেছিলে, একবার চতুর্ভুজে দেখা দাও না, ত্রিতাপজ্বালা ঘুচে যাক”—হায়রে, ভগবান কি এত সহজে দেখা দেয়!

এই সময় মাঝে মাঝে মনে হতে' লাগলো—হয় ভগবানকে একেবারেই পাওয়া যায় না, যদিও পাওয়া যায়, তা সে জন্ত যে কঠোর সাধনা করতে হয়, তা আমাদের দ্বারা সম্ভবপর নয়, আর নয় তা সেই একে-বারেই নেই, তার জন্ত এইসব ছেলেখেলা দ্বারা না করে' তাদের সঙ্গে আমাদের খুব বেশি যে প্রভেদ তাও নয়, বরং তার শক্তি সম্পদে আমাদের চেয়ে-চের বেশী বলবান্ ধনবান্। তবে এইরূপে বৃথা সময় নষ্ট না করে' ব্যবসা বাণিজ্যে মন দিই, অর্থ থাকলে অনেক ধর্মার্থ এসে হাজির হবে।

শান্তি কিছুতেই নেই, সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে অতিষ্ঠ হয়ে একটু আনমনা হয়েছি, হঠাৎ মনে হ'ল “স্বয়ং স্বযীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিয়ন্তোহস্মি তথা করোমি”, সেদিন যেন একটা নূতন অনুভূতি আমার সম্বন্ধে ভরিয়ে দিলে, যেন মনে হ'ল, আজ পর্যন্ত যা সব করেছি সবই স্বযীকেশের নিয়োগে, এই যে আমি করি এইটাই যত গৌলের সৃষ্টি করে—ওগো প্রভু! এই অনুভূতি এই স্মৃতিটুকু চিরজাগ্রত করে' রেখো, এই মুহূর্তের চিন্তাটুকু আমার অন্ধকার হৃদয়ে যে আশার আলো জ্বালিয়ে তুলেছে, নিরবচ্ছিন্ন ধারায় এই কথাই মনে হোক, আমার সকল কর্ম তোমারই জন্ত, না না, শুধু তোমার জন্ত আমি করি না তুমিই কর, তুমিই কর্তা, আমি যে তোমার যত্ন মাত্র।

মনে মনে জুপে' যেতে লাগলুম—আমি যন্ত্র। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে যন্ত্রের গত উঠে বসলাম, যন্ত্রের মত নিত্যকর্ম সমাধা করলুম, যন্ত্রের মত কাজ কর্ম করতে লাগলুম, আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি দেহ তুমি প্রাণ, আমি জীব জড়, তুমি রক্ত, শক্তি, এই আমি তুমির একটা মধুর তরঙ্গে সে দিনটা কেটে গেল, যেন কোথা হ'তে অজস্র বিশ্বাসধারায় আমি স্নাত হয়ে আমার জায়গায় ভগবানকে বসাতে দ্বিধা বোধ করলুম না, সকল কর্মের ভিতরই তাঁর অঙ্গুলিসঞ্চালন অন্তর করতে লাগলুম, তিনি বাহ্য ইচ্ছা করেন তাহাই আয়ত্ত করতে হয়, আমি যে চিন্তা করি, আমি যে এক দিন সন্ধ্যাহ্নিক করি, একদিন করি না, একদিন অলস হ'য়ে থাকি একদিন উৎসাহসহকারে কর্মক্ষেত্রে বীরের মত কার্য্য করি, এ সবই তাঁর ইচ্ছায়, তিনি আছেন ব'লেই আমি আছি, তাঁর ইচ্ছাতেই আমার বেঁচে থাকা, তাঁকে আর শালগ্রাম শিলায় দেখতে প্রবৃত্তি হল' না, তাঁকে বাহিরের কোন স্থানটুকুতে রেখে তৃপ্তিবোধ করলুম না, অন্তরের অন্তরে, আমার অতি নিকটে তিনি আছেন, তাঁকে ছেড়ে আমি এক মুহূর্ত্তও থাকি না, মনে মনে গাইতে লাগলুম, চক্ষু মুদে গাইতে লাগলুম—

—“আদরিণী শ্রামা মাকে, যতনে হৃদয়ে রেখে,

তুমি দেখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ না দেখে।”

ওগো, এত নিকটে, এত সহজে তোমায় পাওয়া যায়, আর আমি এতদিন তোমায় খুঁজে খুঁজে হতাশ হ'য়ে ফিরছিলুম, তুমি না থাকলে আমার থাকা হ'ত কৈ? এই সহজ কথাটা এতদিন বুঝি নাই কেন। ইহাই আশ্চর্য্য বোধ হ'তে লাগলো।

আমি ত আনন্দে বিভোর হলুম, দুই দশদিন কাটল ভাল, তারপর এক বিপদের ধাক্কায় আমার স্রুথের অগ্ন ভেঙ্গে গেল, হয়ত তোমাদের এই অসার প্রলাপ ভাল লাগছে না, হয়ত তোমরা “প্রবর্তকের” পাতা বন্ধ করে' ভাবছ, এ আবার কি বাজে বকল! কিন্তু শোন, আমার স্রুথ হ্রুথের ইতিহাস শোন, সংসারে অনেক বাজে কথা শুন্তে হয়, জীবনের অনেক সময় বাজে খাতার লিখতে হয়, আমার এমন জমাট সাধন বিধাতার একটি আঘাতে শতধা বিদীর্ণ হয়ে চূর্ণ হয়ে গেল, ভগবানের দান বলে' কুম্মকুম্মর শিশুপুত্রটিকে বন্ধ করে' কত স্রুথ হতো,

কালের কঠোর দংশনে সে বৃন্তচ্যুত হয়ে শুকিয়ে গেল, শেলয়িক কুরঙ্গের মত আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়লুম, একবারও ভাবতে পারলুম না, এ সব ভগবানের কাজ, কিছতেই মন প্রবোধ মান্‌লো না যে ভগবানের যজ্ঞ আজ পুত্রশোকাভুর হয়েছে, এ যেন পোষাপাখীর বাধাক্ষক বলা, বিড়ালের আক্রমণে আর্জুকন্দন।

তারপর আত্মীয়স্বজনের সাহায্যে একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে, আবার ভাবলুম এ কি নির্গম ঘটনা, কোথায় ভগবান, তিনি চিরআনন্দময়, আমার শরীরে যদি তাঁর স্থান থাকে, তবে ইহা আনন্দনিলয় হয় না কেন? অনেক সাধু সন্ন্যাসীর পায়ে আছড়ে পড়লুম, অনেকে অনেক উপদেশ দিলে, সাধনার কথাই বললে, বিনা সাধনায় সংসারময়া অতিক্রম করা যায় না, স্ত্রী পুত্র মায়ার সৃষ্টি, মৃত্যুপরীবের মত ঐগুলি পরিত্যাগ করতে হয়, সংসার-যজ্ঞগা হ'তে মুক্তি পেতে হ'লে, যোগ সাধনা করতে হয়, সংসারে থেকে এসব হয় না, যদিও হয়, তা সংসারী জীবের তেমন অবসর কৈ? সাধন ভজনের জন্ত দীর্ঘ সময় দিতে হয়।

একে একে ব্যবসা বাণিজ্যের ভার আমার কোন এক আত্মীয়ের হাতে ছেড়ে দিয়ে, যোগসাধনায় প্রবৃত্ত হলুম। প্রথমেই আসন প্রাণায়াম নাড়ী শুদ্ধিতে মনোযোগ দিলুম, পুঞ্জস্বতি বৃকের কলিজা জ্বলিয়ে দিত, দুই হাতে বৃক চোপে ধরে, পূরক কুস্তক রেচকের অভ্যাস আরম্ভ করে দিলুম। দারুণ শীতে সর্কাজ প্রাণিত করে' দর দর ধারে ঘর্ম নির্গত হ'ত, সাধনা খুবই অগ্রসর হচ্ছে, দশ পনের বিশ মিনিট আধ ঘণ্টা কুস্তক অভ্যাস হ'ল, চিদাকাশে কত যজ্ঞ হিরণ্য বর্ণে চিত্রিত হয়ে উঠল, এইটা মূল্যবান, ঐটি মণিপুর, ঐটি বিন্দল, দেখতে দেখতে মস্ত হঠযোগী হয়ে উঠলুম।

হায়সে মানবসংস্কার, অতি ক্ষুদ্র রেখাও তার বিপুল প্রভাব প্রদর্শন করতে বিরত হয় না, হঠাৎ আবার মনে পড়ে' গেল, "হুয়া হুযীকেশ যদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি"—হাঁ হাঁ, হুযীকেশ না করালে কি আর করছি? হুযীকেশই সকল কর্মের আদিপুরুষ! হুযীকেশই আমার পুত্র সংহার করেছেন। এ জীবন হুযীকেশের জন্তই তা।

কিন্তু দারুণ সংশয় উপস্থিত হ'ল, যদি হুযীকেশের জন্তই এ জীবন তবে জীবনের সকল ঘটনা আমার বলে' মনে হয় কেন? শোক দুঃখ

আমি ভোগ করি কেন? কার্য যদি তাঁর তবে ফলের ভাগী আমি হ'ব কেন? হাঁ এই কথা বুঝতে পারি না বলেই ত এ কঠোর সাধনা অবলম্বন করেছি। ইহাতে কি হবে, এ ত সংসারকে ছাড়বার পথ জীবনকে পরিত্যাগ করবার পথ। না, হৃষীকেশ এই পথই দেখিয়েছেন, তাঁর বিনা ইচ্ছায় একথণ্ড তৃণ দণ্ড করবার সামর্থ্য পুণ্ড্রবৈদ্যনরেরও যখন নাই তখন আমার কথা ছেড়ে দাও, এ হৃষীকেশের ইচ্ছা; আর হৃদয়ের প্রয়োজন নাই, বহুদূর এসেছি, আর ফেরবার ইচ্ছা নাই, খুব আনন্দে আছি, আনন্দের পথই ত ভগবানের পথ, শ্রবণ আমার কৃষ্ণ হোক, চক্ষু আমার বহির্দর্শনে বিমুখ হোক, জগদ্বীর নিরানন্দ আমায় যেন দেখতে না হয়, আমি আনন্দের পথ পেয়েছি।

ক্রমশঃ

তিলকের জন্মোৎসব

আসমুদ্রহিমাচল ভারত সেদিন তিলকের জন্মোৎসব সম্পন্ন করিল। বাঙালীও সে উৎসব হইতে একেবারে আপনাকে বিযুক্ত রাখে নাই—বিভিন্ন বাগানের সভায় বাংলার হিন্দুমুসলমান নেতৃবৃন্দ এই আজন্ম দেশভক্ত গুরুবাসিংহের চরণে বাঙ্গালীর ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিয়াছেন—তিলক তো শুধু মহারাষ্ট্রের নহে, শুধু দাক্ষিণাত্যের নহে—ভারতের প্রতি জনপদ প্রতি প্রদেশ অনন্তরত্নগর্ভা আমাদের দেশমাতৃকার এই বরণ্য সন্তানের পূজাগোরবে সমুজ্জ্বল।

তিলকের নূতন করিয়া কি পরিচয় দিব? ভারতের নরনারীর হৃদয়ে মহারাষ্ট্রসিংহের এই অনন্তসাধারণ প্রতিষ্ঠার কারণ খুঁজিতে দূরে যাইতে হইবে না। বিদ্যায় পাণ্ডিত্যে মনীষায় তাঁহার নাম জগৎবিশ্রুত—তাঁহার ব্যবহারশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞের সমতুল্য, তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভা মহামাষ্ট্রীয় সাহিত্যজগতে অতুলনীয়, তাঁহার অকপট কর্মনিষ্ঠা, দৃঢ়তা, স্বাধীনচিত্ততা; তেজস্বিতা, বিশাল ধবলগিরির মত তাঁহার অমল স্বল অপূর্ণ চরিত্রবল—ভারতের রাষ্ট্রসাধনার একটা বিপুল মুখ্য স্তম্ভ-স্বরূপ। কিন্তু তিলকের স্বদেশবাসী তাঁহাকে যে গভীর শ্রদ্ধাভরে হৃদয়

সিংহাসনে উচ্চ প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছে—তাহা এইসকল গুণাবলীর জন্তই কেবল নয়। ধনসম্পদ কিম্বা উচ্চ আভিজাত্য, ব্যবহারিক-জীবনে কৃতিত্ব কিম্বা রাজানুগ্রহ অথবা মনোমুগ্ধকারী বাগ্মিতা—যে সকল অসার নিমিত্তের উপর এদেশের জননেতৃমণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে, তাহার কোনটী তাঁহার জন্ত এই লোকপ্রিয় শ্রদ্ধাসন রচিয়া দেয় নাই। অপূর্ব আত্ম-প্রতিভা, উচ্চ জীবনব্রত, আর সেই ব্রতসম্মীপে অকুণ্ঠ আত্মনিবেদন ইহাই—তিলকের বিশেষত্ব—ইহাই তাঁহাকে সমগ্র দেশের অসাধারণ শ্রদ্ধা-গৌরবের অধিকারী করিয়া তুলিয়াছে। তিলক আপনার বলিতে কিছুই রাখেন নাই, জীবনের অত্ম সমস্ত কামনা বিসর্জনপূর্বক অপূর্ব এক-নিষ্ঠাভরে আপনাকে সর্বভোভাবে স্বদেশের সেবায় ডালি দিয়াছেন—স্বদেশজননীর চরণমূলে এমন অধঃ-অনবদ্য আত্মদান ভারতের নেতৃ-মণ্ডলীর মধ্যে কয়জনের চরিত্রে দেখিয়াছি?

তিলকের মত প্রতিভাসম্পন্ন প্রতিভূ দেশভক্তের জীবনে তাঁহার স্বদেশেরই সমষ্টিসাধনা প্রতিফলিত হইয়া উঠিয়াছে। কর্মজীবনের প্রথম প্রভাতে একদিকে শিক্ষা আন্দোলনে যোগদান করিয়া অন্যদিকে “কেশরী” পত্রের জন্মদানপূর্বক এই মহারাষ্ট্রগুরু তাঁহার প্রদেশবাসীকে নব বিশ্ব-সন্নিবেশের মধ্যে নূতন জীবনের আশ্বাদ দিতে তাহাদের নূতন মস্তিষ্ক দীক্ষিত করিতে চাহিয়াছিলেন। সে দীক্ষা সফল হইয়াছিল। তারপর যখন তাহাদের রাজনৈতিক নবচেতনার কথঞ্চিৎ উন্মেষ ঘটিল—তখন দেশের অন্তরতর আত্মাকে প্রবুদ্ধ করিবার প্রয়োজন অনুভব করিয়া দাক্ষিণাত্যে গভীরতর সাধনার হ্রস্পাত করিয়া দিলেন। লোকপ্রিয় শিবাজী ও গণপতি উৎসবসমূহের মধ্য দিয়া উপরের চপল তরঙ্গচূড়া হইতে রাষ্ট্রসাধনাকে সনাতন ভাবসাধনার গভীরতলে বহিয়া লইয়া গেলেন—তাঁহাঙ্গ শিক্ষায় মহারাষ্ট্রজাতি সে সজীব প্রাণময় ভাবের প্রবাহে অবগাহন-করিয়া যে শক্তিশাল্য করিল তাহা তাহাকে একাধিক সঙ্কটযাত্রার মধ্য দিয়া জয়োল্লাসে উত্তীর্ণ হইবার সামর্থ্যদান করিয়াছে। বস্তুতঃ, ইতিপূর্বে দেশের বহু চিন্তাবীর, সাহিত্যলেখক ও ধর্মনেতৃবৃন্দ ভারতের জাতীয়জীবনকে গভীর পথে পরিচালন করিবার সঙ্কেত করিয়া গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রথমে তিলকেরই হস্ত প্রতিভা রাষ্ট্র আন্দোলনকে নূতনরূপে চালিয়া জাতীয় ভাবানুগত করিবার প্রয়াসে তাঁহাকে হস্তক্ষেপ কয়াইয়াছিল।

এই অমর জাতির মর্মান্বোধের পরতে পরতে যে দীর্ঘ ভাবসাধনার অক্ষয় স্মৃতি স্তবকে স্তবকে পুঞ্জীকৃত, যে সাধনশক্তি তিল তিল করিয়া তাহার চিত্ত মন বুদ্ধি অহঙ্কারকে রচিয়া তুলিয়া আজও তাহার নাড়ীতে নাড়ীতে শক্তি সঞ্চারপূর্বক লক্ষ দুর্যোগ বাক্সা সঙ্কটের মধ্যেও তাহাকে বিশ্বমঞ্চে বিশ্বত রাখিয়াছে, যে অথও আয়ুশ্রোতঃ কোন্ অচিন্ত্য মহামুহুর্তে ব্রহ্মকমণ্ডলু হইতে বিনির্গত হইয়া বিশ্বের অনন্তবৈচিত্র্যসাগরে একটা অপূর্ণ বিশিষ্টতা-মণ্ডিত করিয়া তাহার ঐতিহাসিক তরঙ্গধারাকে গড়িয়া তুলিয়াছে, যুগের পর যুগ তাহাকে নব নব রসসন্ধারে পরিপুষ্ট করিয়া আসিয়াছে—সেই মূলজীবনধারার সহিত সংযোগস্থত্র আবিষ্কার করিতে না পারিলে, ইতিহাসের গঙ্গাশ্রোতকে অবলম্বন করিয়া জাতীয় অন্তশ্চেতনার সেই পূত গোমুখী উৎসের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ লাভ করিতে না পারিলে জাতির নব অভ্যাস সর্বদাই ব্যর্থ হইতে বাধ্য। তিলক এই কথা একদিন মর্মেমশ্বে বুঝিয়াছিলেন—তাই অতীতের মঞ্জবা হইতে উৎসৃত পীযুষধারার আশ্বাদনানে ঊনবিংশ শতাব্দীর শুষ্ক অসার চপল আন্দোলকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন।

কর্মজীবনের তৃতীয় পর্বে স্বদেশী আন্দোলনের বহুতাত্ত্বনা মহারাষ্ট্রকুল-তিলক এই একনিষ্ঠ সাধককে সমগ্রভারতের পুরোভাগে নেতৃত্বপূর্ণ অগ্রসর করিয়া দিয়া গেল। বহিষ্কার আন্দোলন হইতে আরম্ভ করিয়া সুরাটের দক্ষযজ্ঞ পর্যন্ত তাঁহার কার্যকলাপ ভারতইতিহাসের অদ্বীভূত ঘটনাপুঞ্জ-রূপেই লোকের চিরস্মরণীয় থাকিবে। উত্তরোত্তর তিনটি অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়া তাঁহার জীবনের এক একটি কর্মপর্ব সমাপ্ত হইয়াছে, রাজদণ্ডের কঠোর হইতে কঠোরতর আঘাত তাঁহার উপর পতিত হইয়াছে আর বিধাতার বজ্রলিপিকা বেন দীপ্ত হইতে দীপ্ততর জয়চিহ্নে তাঁহার ভক্তের উন্নত ললাট আশীষলাঙ্ঘিত করিয়া দিয়াছে। প্রতিবার অগ্নিশুদ্ধ হইয়া জলন্ত হিরণ্ময়রূপে তিনি বাহির হইয়াছেন, আর তাঁহার কর্ম-গরিমা দেখিতে দেখিতে মহারাষ্ট্র হইতে সমগ্র দাক্ষিণাত্য প্রদেশে, দাক্ষিণাত্য হইতে সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তৃতীয় কারাবন্ধন ভোগের পর যখন মেঘমুক্ত দীপ্ত চক্রে মত তিনি দেশে পদার্পণ করিলেন, অথও ভারতবর্ষ তৎক্ষণাৎ জাতীয় জীবনের অগ্রদূতরূপে তাঁহাকে বরণ করিয়া লইল।

আজ ভারতের রাষ্ট্রগগনে দুইটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক দেদীপ্যমান—তিলক ও গান্ধী। যে রাষ্ট্রযজ্ঞের পুরোহিত তাহার আশা সম্ভাবনা প্রচুরতর—সমস্ত দেশ এই ঘোর দুঃসঙ্কটের সময়ে আশাপূর্ণ নেত্রে তাঁহাদের পানে চাহিয়া রহিয়াছে—উদগ্র আগ্রহভরে তাঁহাদের প্রতি পদক্ষেপ গণনা করিতেছে—কিন্তু তবুও জানি না কোন্ বিধাতার অভিশাপে উভয়েরই প্রতিভাহারা আজ ঘনক্লম্ব কুহেলিকাছায়ায় সমাচ্ছন্ন। ভারতের জীবনদৈবতা যেন তাঁহাদের প্রতিভা-মন্দিরের সিংহদ্বারে অবিশ্রান্ত করাঘাত করিয়াও অর্গলবন্ধ দেখিয়া বারম্বার ফিরিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন—কোন্ বহির্শক্তি তাড়নার তরঙ্গচ্ছায়ায় পড়িয়া তাঁহারা হাবডুব খাইতেছেন—তাঁহাদের উভয়েরই গভীর তপোবল কি যেন কিসের ছায়াপাতে দীপ্ত জ্যোতিষ্ময় জলন্ত পাবকের মত জলিয়া উঠিতে পারিতেছে না—ভারতের অগ্নিময়ী তপঃশক্তির আলামালাময় বিজয়সিন্ধুর ললাটে অঙ্কিত করিয়া তাঁহারা জাতির পুরোভাগে দাঁড়াইয়া শ্রেষ্ঠ পথটির নির্দেশ কিছুতেই করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। লোকমাত্ৰ তিলক ও মহাত্মা গান্ধী উভয়ের কর্মসাধনায় কই ভারতের সেই তপঃ-প্রতিভা-সমুদীপ্ত নিগূঢ় ইষণাটুকু স্পষ্ট পরিষ্কৃত অমোঘরূপে ফুটিয়া উঠিতেছে ?

ভারতবর্ষের দেবপুরুষের যে ভাগবত-ব্রত এখনও রহস্যময় অধ্যাত্ম-গহবরে উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে—বুদ্ধির হিরণ্যয় কিরণজালে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষাগুলি এখনও তাহার সত্য সন্ধান পাইবার জন্ত উন্মুখ হইয়া উঠেন নাই—ইহাই সর্বোপেক্ষা পরিতাপের বিষয়। জাতির বিপুল জনসমুদ্রের কথা দূরে থাকুক—এই জাতীয় জীবন-তরলীর যে কয়জন শ্রেষ্ঠ কর্ণধার দৃঢ়হস্তে তরীচালনায় নিযুক্ত—তাঁহারাও ভারতের সেই সর্বোৎকৃষ্ট তপোমুদ্রে দীক্ষিত হইয়া অথও নবপ্রেরণার অধিকারী হইয়া উঠিতেছেন না—দেশের ঘনঘটাচ্ছন্ন জীবনে যে আজ সত্য পথ সত্য গতিনির্দেশের অভাব ঘটিবে—ইহা আর বিচিত্র কি ? এই স্তব্ধ আশানিরস্ত আধার জীবনপথে নূতন স্বপ্ন, নূতন আশা, নূতন শক্তির বিজয়-নিশান উড়াইয়া উদ্ভাস্ত আত্মহারা জাতির অন্ধনয়ন উন্মিলিত করিয়া দিবে, মানুষ্যের মানবগৌরবটুকু অধিকার করা শুধু নয়, দেবতার দিব্য-প্রতিভা পুনরর্জ্জন করিবার পথ প্রদর্শন করিবে, অলোকসামান্য বিদ্যা-

স্পর্শে ভূভারতে অপূর্ণ দেবমানবজাতিকে গড়িয়া তুলিবে—কই কোথায় তুমি নূতন যুগের কর্ণধার—কবে তোমার জলদগভীর আহ্বান-সঙ্গীত-স্বর-সঞ্চারে লক্ষ লক্ষ নয়নারীর হৃদয়ে হৃদয়ে বাজিয়া উঠিবে—কবে তোমার নব-সাধনার নন্দনা-প্রপাত লক্ষ পথে লক্ষ প্রবাহিকায় বহিয়া চলিবে—চিহ্নিত দেবজাতির জীবন-সমুদ্র মন্বনপূর্বক যে অমৃত উথিত হইবে, ধারায় ধারায় তাহা মানবজাতির দ্বারে দ্বারে বন্টন করিয়া দিবে? বাঙ্গালী আজ তোমারই আশাপথ চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে—তোমারই চরণে পূর্ণহৃদয়ে তাহার জীবন-অর্থা উৎসর্গ করিবে।

নব কুষ্ঠাশ্রম ও বিদ্যালয়—উনিতে স্বকল্প হয়, ভারতবর্ষে অন্যান্য দেউলক্ষ কুষ্ঠরোগী নিদারুণ রোগযন্ত্রণায় হ্রঃসহ জীবনভার বহিয়া মরে। এই বিপুল রোগীসংখ্যার মধ্যে কয়জনই বা বিভিন্ন খ্রীষ্টান কুষ্ঠসেবাশ্রমসমূহে আশ্রয় পায়, কয়জন সূচিকিৎসা লাভ করে? তবু সহৃদয় মিশনারীগণের কৃপাবল্লভে যে কয়েকটা কুষ্ঠসেবালয় পরিচালিত, তাহাদের জ্ঞাত তাহার দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন সন্দেহ নাই। সম্প্রতি পণ্ডিত কুপারাম একটা নূতন কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতেছেন—“অমৃতবাজার পত্রিকায়” পীযুষকান্তি বাবু ইহার সাহায্যকল্পে একখানা বিশদ আবেদনপত্র প্রচার করিয়াছেন। এই আশ্রমের বিশিষ্ট বিশেষত্ব এই, যে ইহাতে সূচিকিৎসা কুষ্ঠরোগের স্বদেশীয় আয়ুর্বেদানুগত প্রণালীতে অব্যর্থ চিকিৎসার ব্যবস্থা হইবে—পণ্ডিত কুপারাম চিকিৎসার অমোঘতা প্রমাণিত করিতেও প্রস্তুত আছেন। উপরন্তু তাহার জীবনসন্ধ্যায় তাহার বিদ্যা উৎসাহী ছাত্রবৃন্দকে শিক্ষা দিবার জ্ঞাত একটি বিদ্যালয় খুলিতে চাহেন। পণ্ডিত মহোদয়ের এই উদ্দেশ্য সফল হইলে, ইহা শুধু এই নিরুপায় কুষ্ঠগ্রস্ত রোগীগুলির পক্ষে স্বর্গাগত ভ্রমত প্রলেপস্বরূপ হইবে না, পরন্তু পৃথিবীর বক্ষে ইহা এমন এক অপূর্ণ নব প্রতিষ্ঠান হইবে—যেখানে দলে দলে সুদূর পাশ্চাত্য দেশ হইতেও চিকিৎসার জন্য রোগীগণ আসিবে—“What a glorious day would it then be for India to have patients even from the western countries for the purpose of having their leprosy cured here!” আমরা আশা করি দেশের ধন-কুবেরগণ পীযুষকান্তিবাবুর আবেদন-সার্থক করিয়া তুলিতে কৃপণতা করিবেন না।

মর্ম্ম-ব্যথা

সই কে বলে পিরীতি ভাল
হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়া

কাঁদিতে জনম গেল।

কাঁদিব, কাঁদিয়া, কাঁদিয়া পাজর খসিয়া যাউক, হৃদয় শীতল হইবে। আজ তোমাদের জিজ্ঞাসা করি, কেহ কি হাসিতে হাসিতে কাহারও সহিত পিরীতি করিয়াছ, কাহারও তপ্তহৃদয়ে অজ্ঞাত অশ্রু ঢালিয়া দিয়াছ, কাহারও মিলন আকাঙ্ক্ষায় গোপনে বসিয়া গুমকিয়া গুমরিয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়াছ, কাহাকেও তৃপ্তি দিবার জন্ত জীবনের সব দেয়টুকু কাহারও চরণে কখনও উৎসর্গ করিয়াছ কি? যদি এমন কেহ করিয়া থাক তবেই আমার মর্ম্মব্যথা বুঝিবে, আমার নয়নাঙ্গারে তোমাদের আখিজল মিশাইয়া, করুণার ধারাপ্রপাত স্রষ্টি করিতে পারিবে।

আজ নয়নজলে ধরণী অভিষিক্ত করিব, কেবল কাঁদিব, কাঁদিয়া কাঁদিয়া নির্মল হইব, কাঁদিয়া কাঁদিয়া বজ্রের মত কঠিন হইব, কাঁদিয়া কাঁদিয়া তোমার চরণকমল ধৌত করিয়া দিব, তোমায় ভালবাসি, কিন্তু বিনিময়ে কি দিয়াছ, শুধু ক্রন্দন, গগনভরা ক্রন্দন, সাতকোটি বাঙালীর অশ্রু উপহার তোমায় লইতে হইবে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া আখিতারা যেদিন পাথর হইয়া যাইবে, সেদিন অবিরল বারিধারার পরিবর্তে হৃৎথের খর্ব্বণে অনল উৎপাদন করিব, সাতকোটি সন্তানের রোধনেত্র পৃথিবী জ্বালাইয়া দিবে, সে দিন বুঝি প্রলয় আসিবে, হতাশ প্রেমিকের হৃদয়বহি তখন কি দিয়া নির্দোষিত করিবে, কাহারও বারিবিন্দুপাতে ভীষণ অনর্থের তখন আর প্রতীকার হইবে না।

আমরা কাদিব। আমাদের হৃদয়সাগর শুষ্ক করিয়া অশ্রুবরিষণে আবার হৃদয় প্লাবিত করিব, ব্যথিত জীবনগুলি লইয়া একত্র হইব, সমব্যথী না পাইলে যদি কাদিতে সাধ না যায়। তুমি যতদিন কঁদাইবে, ততদিন কাদিব, তোমার দেওয়া অশ্রুটুকু যতদিনে নিঃশেষ না হয় ততদিন কাদিব, তারপর! কাদিতে কাদিতেই কি জীবন শেষ হইয়া যাইবে, কেবল ক্রন্দনের খায়া বহাইতেই কি আমাদের স্বজন করিয়াছিলে, তাই যদি হয়, তবে এমন শক্ত করিয়া গড়িলে কেন? এমন বিচিত্র স্বপ্নে বিভোর করিলে কেন? এমন বিমোহিনী আশায় উদ্ধৃত্ত করিয়া তুলিলে কেন? পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ ত শুধু কান্নার সমুদ্র, আমাদের তার সঙ্গে মিশাইয়া সমুদ্রের মাত্রা আর একটু বৃদ্ধি করিলে না কেন?

সকলের শেষ আছে, দুঃখের অন্ত আছে, চিরদিন ক্রন্দন করিব না, একদিন চক্ষের জল শুখাইয়া যাইবে, একদিন নয়নতারকায় বিদ্যুৎ-স্পৃষ্ঠি প্রকাশ পাইবে, একদিন ক্রন্দন ছাড়িয়া, দুঃখের পরপারে সারা পৃথিবীটাকেই হয়ত ঠেলিয়া আমাদেরই লইয়া যাইতে হইবে। জরাজীর্ণ হৃদয় বাঙালী কাদিতে কাদিতে এ কি স্নমহৎ কর্মপ্রেরণা অনুভব করিতেছে, কি বিপুল আশার বিদ্যুৎ-মালা তাহাদের বেড়িয়া বেড়িয়া নৃত্য করিতেছে, কি অলৌকিক অন্তরবল অশ্রুপ্রবাহের তলে তলে সঞ্চয় করিতেছে, আজও কাদিতেছি, কালও কাদিব, কিন্তু চিরদিন কাদিব না, কাদিয়া কাদিয়া নাটাতে ভাসিয়া যাইব না, পূর্বের শেষ আছে, আমাদের ক্রন্দনও শেষ হইল বলিয়া।

দেখ বিশ্বের দিকচক্রবালে, কুহকিনী আশার চিত্র নহে, মহাদেবীর দিবা মূর্তি, বীরেন্দ্রকেশরীপৃষ্ঠে আবিস্কৃত, বিজয়মঙ্গল শঙ্খধ্বনি জগৎদ্বাসীর কর্ণকুহরে কি বজ্রনির্বোধে প্রবেশ করিয়া মর্ম্মতল কাঁপাইয়া তুলিতেছে, যে ক্ষুদ্র, যে তুচ্ছ, যে হেয়, যে উৎপেক্ষিত, সেও উন্নত বন্ধ বিস্তার করিয়া নবশক্তির পরিচয় দিতেছে, পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত, অতল, ভূতল, অন্তরীক্ষ, চরাচর বিশ্ব মহাশক্তির জাগরণবার্তা ঘোষিত হইতেছে, পুরাতনের ধ্বংসকার্য্য স্রাব্যরূপে সম্পন্ন হইতে না হইতে, বর্তমানের অদৃঢ় প্রতিষ্ঠানটাকেও উপাড়িয়া ফেলিবার আয়োজন চলিয়াছে, শুদ্ধশক্তির ভিত্তির উপর ভবিষ্যতের স্বর্গরাজ্যটিকে সুদৃঢ় করিবার জন্ত জগতের সমগ্রশক্তি একযোগে মিলিত হইবার কৌশল অব্যবহ

করিতেছে, কি অভিনব অপূর্ব যুগসন্ধি, কি স্বপ্নাভীত অভাবনীয় সৃষ্টি-চাতুর্য, ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছার প্রতিকূলে বিপুলশক্তি দ্বয় জয়গী প্রভৃতি মধ্য যুরোপের শক্তিবৃন্দ বিধাতার একটা নিঃশ্বাসে ভগ্নসাৎ হইল, বর্তমানের শক্তিসমষ্টি, পরমেশ্বরের শুভ ইচ্ছা অনুগতন করিয়া না চলিলে, জগতের সমুখে যে কি ভীষণ প্রলয়দৃশ্য সমুপস্থিত হইবে তাহা তৎক্ষণ মনীষী মাঝেই লক্ষ্য করিতেছেন।

আজ আমরা অশ্রুপ্লুত চক্ষে সমগ্রবিশ্বের বিপুল পরিবর্তন দেখিয়া যেমন স্তম্ভিত হইয়াছি, সেইরূপ তাঁর মহতী ইচ্ছার সঙ্গে হৃদয় মিলাইয়া নবযুগের নূতন শ্রোতে ভাসিয়া চলিবার জন্ত তপস্তা করিতেছি; বিনা সাধনায় এই নিগূঢ় রহস্য উপলব্ধি করিবার সম্ভাবনা নাই।

হে ভগবান, কাদিতে বলিয়াছ—কাদিতেছি, স্বপ্নবিভোর হইয়া এক-দিন চাহিয়াছিলাম শক্তি, বীৰ্য, কর্মপ্রেরণা, স্বপ্নের মতই বাঙালীকে তাহা দান করিয়াছিলে, কল্লতর তুমি কাহাকেও বঞ্চিত কর না, কিন্তু সে জাগরণ তোমার ইচ্ছানুগত হয় নাই, তাই দ্বিগুণ দুঃখে কর্মক্ষেত্র হইতে বিমুখ হইয়া তোমারই মুখ চাহিয়া বসিয়া আছি; অশ্রুপূর্ণ নয়নে তোমার সঙ্কেতপ্রতীক্ষার অটুট ধৈর্য্যে—হৃদয় বাধিয়া লক্ষ লক্ষ হিন্দু পৃথিবীর দারুণ দুঃসময়ে কেবলই জপিতেছি তপঃ তপঃ তপঃ। ভারতের এই তপস্যা ভারতেরই মুক্তির জন্ত নহে, আমরা স্পষ্টই দেখিতেছি, বিশ্বের মুক্তি ভারতের অমোঘ বীৰ্য্যে সম্পাদিত হইবে।

আমরা আজও কাদিব, কাদিয়া কাদিয়া আপনার জনের সহিত—হৃদয় মিলাইব, হুঃখী যে, মর্ম্মপীড়িত যে, উপেক্ষিত নির্ধ্যাতিত যে, অশ্রু দেখিয়াই তাহাকে চিনিব; দুর্ব্বলের বল শ্রীভগবান, আত্মের আশ্রয় লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ—বাহার গর্ব্ব আছে ঐশ্বর্য্য আছে, সম্পদ প্রতিপত্তি আছে, সে ত কাদিবে না, সেত ভগবানের চরণাশ্রয় করিবে না, ভগ্নো অশ্রু, আর একবার হৃদয় প্লাবিত কর, অজস্রধারে আমাদের ভাসাইয়া দাও, তোমায় দেখিয়া আমরা মনের মানুষ রাখিয়া লই।

এইবার আইস, পিরীতির নগর নির্মাণ করি, পিরীতির মন্দিরে বাস করিতে থাকি, পিরীতি দেখিয়া পৃথকী করি, এইবার পিরীতির বন্ধনে আমা-দিগকে বাধিতে শিক্ষা করি—যে ঐক্য, যে প্রে, ময়ে শক্তি, মানুষের মধ্যে জাগ্রত হইলে, বিশ্বের মঙ্গলসাধন সম্ভবপর হয়, তাহা এই পিরীতি

সাধনেই হইবে। পিরীতির বন্ধন নিমিষে টুটিয়া যায় না, কাঁদিয়া জীবন গোয়াইলে পিরীতি টুটে না, হাসিয়া হাসিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিলে পিরীতি লঘু হইয়া পড়ে মা, পিরীতি সাগরে যে রসের উৎপত্তি তাহা অমৃত, বাঙালীকে শক্তিশালী হইতে হইলে এই অমৃতেই অভিষিক্ত হইতে হইবে। কে আছ অতৃপ্ত, ব্যথিত, নৈরাশ্যাক্রুর, এস নবসঞ্জীবনী স্রুধা আকণ্ঠ ভরিয়া পান করি, অবসাদ দূর করিয়া ভাগবত ইচ্ছায় পরিচালিত হই।

ধর্ম-প্লাবন

ধর্মপ্লাবনে দেশ ডুবিয়া গেল। শুনিতে পাই বাংলার গ্রামে গ্রামে নাকি অবতারের আবির্ভাব হইয়াছে। ভক্তের অভাব নাই, স্ব স্ব দলের অবতারকে প্রচার করিয়া তোলার কোনই ক্রেতা হইতেছে না। কিম্বাচর্য্য-মতঃপরম্!

ধর্ম কি? এবং ধর্মসাধনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নবীনগণের নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে কি না? লক্ষ্য স্থির না হইলে জীবনের গতি তিষ্ঠ্যক ও শ্লথ হইয়া পড়িবে, চাই একটা স্পষ্টতা, একটা সত্যদৃষ্টি।

ভগবানের ভক্ত হইয়া যে আনন্দ তাহাই কি মানবজীবনের উচ্চতম আদর্শ, অথবা ভগবানের সহিত এমন ভাবে মিশিয়া যাওয়া চাই, বাহাতে পুনর্জন্ম আর না ঘটিতে পারে—ইহাই কি সাধনার চরম উদ্দেশ্য? এই দুইটি লক্ষ্য ছাড়া বর্তমান ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে অপর কোন মহত্তর লক্ষ্য পরিদৃষ্ট হয় না।

*

*

*

বাহারা ভক্ত তাঁহারা অতীত পুরুষগণের নাম কীর্তন, পূজা, প্রসাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন, কেহ শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, কেহ বুদ্ধ, চৈতন্য, শঙ্করের ভক্ত, কেহ বিজয়কৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের ভক্ত। আজ আবার দেখিতেছি অসংখ্য রাম গ্রাম হরি অবতার সাজিয়া বসিয়াছেন, আর ভক্ত-মণ্ডলী আপন আপন অবতারের গুণকীর্তনে, ঢঙ্কানিনাদে বাংলাদেশ কাঁপাইয়া

তুলিয়াছে; স্বদেশীয়গণের উত্তেজনা-শ্রোত আজ অবতারণা করিতেছে।
প্রবলবেগে ধাবমান; হরি হরি, এ জলতরঙ্গ রোধিবো কে ?

ভারতের অপর এক শ্রেণীর সাধক ভগবানের সহিত আপনার ভেদকে
স্বাতন্ত্র্যকে বুচাইয়া, তাঁহাতে লয় হইয়া যাইবার জন্ত প্রতীক্ষা করিতেছেন;
স্ব স্ব ক্ষেত্রানুসারে ইহাদের সাধনা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের, কেহ গুহাবাসী
কেহ বনবাসী, কেহবা লোকবহুল জনপদে আশ্রয়লাভের জন্ত নানাবিধ জন-
হিতকর কার্যে নিযুক্ত; ভগবানের সহিত মিশিয়া যাওয়া—আত্মনির্বাণই
ইহাদের জীবনের লক্ষ্য।

ভারতবর্ষে ধর্মপ্রধান দেশ। স্বামীজি বলিয়াছেন, ধর্মই ভারতের মূল-
শক্তি, এই ধর্মকে জাগাইয়া তুলিতে না পারিলে ভারতের মুক্তি নাই,
কাজেই বাংলার রাজনীতিকক্ষেত্র যখন দুর্গম কর্তৃকাকাণী হইয়া পড়িল,
দেশের নবীন দলই ধর্মক্ষেত্রটিকে আয়ত্ত করিতে ছুটিয়াছেন। সেদিন একটি
যুবক আমাদের নিকট আসিয়া পড়িয়াছিল, ইংরাজী স্কুলের তৃতীয় শ্রেণী
পৰ্যন্ত পড়িয়াই ইহার মধ্যে ধর্মোদ্দীপনা আগিয়া উঠিল, কাজেই একখানি
ঠাকুর দামকুন্ডের ছবি বগলে পুরিয়া মাঝে মাঝে ছবিখানির দিকে তাকায়
আর কাঁদিয়া আকুল হয়; কাশীর সেবাশ্রমে অধিক পরিশ্রম, ভয়দেহে
বেলুড়ের মহাপুরুষগণের সহিত বাস করিয়া একটু ভজন সাধনে স্বচ্ছন্দে
নিযুক্ত থাকিবার প্রয়াস করিয়াছিল, বরাহনগরের মধ্যে ইহাকে পাঠাইয়া
দেওয়া হয়, সেখানে থাটিয়া খুটিয়া থাইতে হয়, সাধনার বিষ হয়, মঠের
সন্ন্যাসীগণের ভিন্নস্বভাবজন হইয়া বেচারার মনের দুঃখে বাহির হইয়া পড়িয়াছে,
আমাদের গৃহপ্রাচীরসংলগ্ন ঠাকুরের ছবিখানার দিকে উদাসনে তাকা-
ইয়া সে বসিয়া থাকিতে চায়—অতি নিরীহ ভালমাসুয়, পৃথিবীর কোনও
সংবাদই সে রাখে না—এই প্রচণ্ড জীবন-সংগ্রামের দিনে সে শুধু ভাব-
বিভোর চিন্তে ঠাকুরের পদাশ্রয়ে শান্তির আকাঙ্ক্ষী। ভক্তটি হৃদয়বান—সে
ঠাকুরকে ভালবাসে সন্দেহ নাই—কিন্তু—হায়—আমাদের আদর্শ, ধর্ম কি
মোহনকে এইরূপ ভাববিহীন নিরাক্রান্ত ভক্ত করিয়া তুলিবার জন্তই? স্বামীজি
ভারতবর্ষকে ধর্মসাধনার পথে প্রবর্তিত হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। এই-
রূপ আবেগময় জীবনই যদি ধর্মজীবন হয়, তবে প্রার্থনা করি, হে ভার-
তের ধর্মকেশরী, এরূপ ধর্ম হইতে অন্ততঃ বাংলা দেশকে রক্ষা কর।

বাংলার ঘরে ঘরে আজ যে হাহাকার উঠিয়াছে, সংসারসংগ্রামে অস-
মর্থ অকর্মণ্য অপদার্থ অনেক যুবকই তোমার স্মৃতি আন্তানার যদি
সময়মত হুটী হুটী প্রসাদ পায়, তবে দেশের দুর্গতির আর পরিসীমা
থাকিবে না।

*

আমরা ধর্মকেই চাই। ভবিষ্যতের জন্ত আমাদের জীবন, অতীতকে
নির্মমভাবেই ছাড়িয়া দিতে হইবে, বর্তমান ধর্মপ্রভাবও অতীতের শক্তি-
বিজড়িত, সেইজন্য বর্তমান হইতেও আমাদের সাবধান হইতে হইবে,
আমাদের দেখিতে হইবে, সমগ্র বিশ্বে ভগবানের কি ইচ্ছা মূর্ত হইয়া
উঠিতেছে, বাহিরের বিকাশগুলিকে ধীরচিন্তে লক্ষ্য করিতে হইবে, তারপর
তার নিগূঢ় কারণটিকে অবধারণ করিবার জন্য গভীর অনুধ্যান করিতে
হইবে, ভগবানের মঙ্গল উদ্দেশ্যটাই জীবন দিয়া বাহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়া উঠিতে
পারে তাহার জন্য তপঃপরায়ণ হইতে হইবে।

ভুল হইতে হইবে না, আমি স্বয়ং জৈশ্বর, এই চিন্তা মানুষের মনে
জাগাইয়া দাও, গ্রামে গ্রামে মঠ বা আশ্রমের প্রয়োজন নাই—গৃহস্থের
আবাসগৃহখানিকেই আশ্রম করিয়া তোল—আর লয়ের পথ লইয়া কি
করিবে, ভগবানের ইচ্ছা হইলে প্রলয়ের অগাধ জ্বলে সারা বিশ্ব একদিন
লয় পাইবে, তার আগে একটা ক্ষুদ্র জীবনের নির্বাণপ্রার্থনা কেন?
যে অনন্তস্থত্রে তোমার জীবন গ্রথিত, তুমি খসিয়া পড়িলে আবার এক
জীবন স্তব্ধ হইয়া শোভা সম্পাদন করিবে, তাঁর বিচিত্র লীলার ইচ্ছা
সমানভাবেই রহিয়াছে, ইহার মধ্যে তোমার আবার নির্বাণলাভের ইচ্ছা
জাগ্রত হইল কেন? পরমেশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে আপনার জীবনকে যোগ-
যুক্ত করিয়া ধরাই তোমার ধর্মসাধনার মূলমন্ত্র হউক।

*

বাঙালীর যে সরল আত্মসাধনা তাহার অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে
বাংলার তথাকথিত বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়গুলি—কোথাও অজ্ঞান অষ্ট-
প্রহর কীর্তনস্রোত, কোথাও কোনও জগদগুরু অবতার গড়িয়া তুলিবার
আয়োজন, কোথাও আবার কোন মহাপুরুষের স্বন্ধে কালী, দুর্গা, আন্না-
পার পয়গম্বরের রহস্যময় ভর—অন্যত্র আবার লোকালয়ের মাঝে মুহম্মদ-
ভাবসমাধির কদরৎ প্রদর্শন—পূর্ব পশ্চিম—বাংলা দেশে আজ ধর্মের

এমনই নানাপ্রকারের বিচিত্র ঐচ্ছিকালিক (mystic) রহস্যাত্মিনয় চলি-
রাছে। সরল অজ্ঞানান্ধকারময় নিকোঁধ জনতাকে মুগ্ধ করিবার এমন
সুগম পন্থা আর কি আছে—বাংলার আবেগময় নরনারীর তরল মনো-
বৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করিবার এমন সহজ উপায় আর নাই—এই সব ধর্ম
লইয়া শিশুখেলা করিবার দিনের আজই অবসান হইয়া যাউক। মনে
রাখিও পুরাতন ভক্ত হইয়া, চক্ষু বহিয়া অবিরল অশ্রুপাতে যে বিন্দু
আনন্দ তাহার চেয়ে অধুরন্ত আনন্দ আপনার হৃদয়েই জঁধরকে লক্ষ্য
করিয়া, তাঁর হস্তে বজ্রের মত পরিচালিত হওয়ায়—তিনি ইচ্ছা করিলে
আমি নিকীর্ণলয়ণ পাইতে পারি, অষ্টসিদ্ধিও লাভ করিতে পারি।

সারা জগতে তিনি কি লীলা প্রকট করিয়া তুলিয়াছেন, তাহাই
গভীর চিন্তে অবধারণ কর, জ্ঞানদৃষ্টি দিয়া তাহার বিশ্ব-অভিপ্রায়টি বুঝিয়া
লও, জীবন দিয়া তাহার ইচ্ছাটিকে পরিপূর্ণ করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ হইয়া
উঠ—ধর্মসাধনার নামে বিশ্বলীলার প্রতি অন্ধভাবে চক্ষু মুদ্রিয়া অলস স্বপ্ন-
ঘোরে মজিয়া রহিলে তোমার ধ্বংস অনিবার্য, আপনার পায়ে ভর দিয়া
দাঁড়াও, পরের মুখের দিকে চাহিয়া আপনাকে একেবারে হীন করিয়া
ফেলিও না। আবার ভগবানের জগদ্ব্যাপী ইচ্ছাশ্রোতের বিরুদ্ধধর্ম আচরণ
করিয়া ভারতবর্ষ যদি লয়-অশেষণ-তৎপর হইয়া উঠে—তাহা হইলেও গভীর
হইতে গভীরতর অন্ধকারেই তাহার গতি অনিবার্য।

দেখ, দেশের কস্মক্ষেত্রগুলি শক্তির অভাবে শাশানে পরিণত হইয়া
উঠিতেছে, ভগবানের ইচ্ছা কি যে জগতের মধ্যে তোমরাই তাঁর নাম
করিয়া কেবল অধঃপাতে যাও? ভগবানকে বকে করিয়া মঠ গড়িতে
হইবে না, ভগবানকে বকে করিয়া আশ্রম সৃষ্টি করিতে হইবে না, ভগ-
বানকে ষোল আনা উৎসর্গ করিয়া নবযুগের সম্যাসী তোমার নিপুণ
চিকিৎসক হইতে হইবে, সূচত্বর ব্যবসায়ী হইতে হইবে, স্থাপত্যবিদ্যা-বিশারদ
হইতে হইবে, উত্তম রাসায়নিক হইতে হইবে, কণ্টসহিষ্ণু কৃষক হইয়া
হলচালনা করিতে হইবে—আবার তুমি হইবে সম্যাসী, বুদ্ধ শব্দের রঞ্জিত
বস্ত্রখানির মোহ হইতে মুক্ত হও। আমরাও একদল সম্যাসীর সৃষ্টি করিতে
চাই—সে মুক্তি পাইবার জন্য নহে, ভক্ত হইয়া আনন্দ অমৃতভব করিবার

জন্ম নহে, ভগবানের মর্ত্যলীলাকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য—যে দেশ ডুবিয়া গিয়াছে, যে জাতি অধঃপাতে গিয়াছে, তাহাকে আবার উন্নত করিয়া তুলিতে হইলে, ভোগপরায়ণ স্বার্থপর সংসারী হইলে চলিবে না, সেইজন্য ধীর, ভ্যাগী, দৃঢ়সঙ্কল্পপরায়ণ অসংখ্য সন্ন্যাসীই চাই, কিন্তু বাংলার উদীয়মান তরুণ, তোমরা আপনহারা হইও না, অতীত বা বর্তমানের যে চিত্র তাহা অবিকৃত নহে, বাহা শুদ্ধ সত্য তাহা তোমার দস্তার ভিতরেই রহিয়াছে, তোমার শুদ্ধির উপরই তাহার বিকাশ নির্ভর করিতেছে, তুমি পরমুখাপ্রেক্ষী না হইয়া পরের চরণ না ধরিয়া, অন্তরের মধ্যে যে দিব্যপুরুষ নিত্য অবস্থিত তাঁর অপমান না করিয়া, একবার উঠিয়া দাঁড়াও, তোমার আত্মার জাগরণ হউক, সকলের আত্মাকে জাগ্রত করিয়া তোলা, ভগবান্ সাজিয়া দেশের অপরিণত মন্তকগুলি চর্চণ করিয়া ধর্মের নামে পৈশাচিক-লীলা ক্রিয়া ইঞ্জরালের অভিনয় সংহরণ কর—বরং বিষয়ী ভাল, ধর্মব্যবসারী হইতে দেশের রক্ষা হউক—এই আমাদের ইচ্ছা।

কর্ম-কথা

অনেক কিছু করিবার আছে, সেগুলিতে হস্তার্পণ না করিয়া কেবল তত্ত্বকথা कहিলে শুনিবে কে? কাজের কথা কি আছে তাহাই বলা হউক, আমার উদ্দেশ্যের সহিত যদি মিল হয়, তবে আমি ইহাতে যোগদান করিতে পারি।

বর্তমান যুবককর্মীদের ইহাই কথা। সত্যই ত আমাদের সম্মুখে কত কাজ, কত অসংখ্য শিক্ষিত লোক ইহার জন্ত প্রয়োজন, সেগুলির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া কেবল ভাগবততত্ত্ব প্রচার করিলে কি হইবে, এই যে যুরোপের কর্মদক্ষতা, ইউরোপ কি ভগবান্ মানে না, না ভগবান্কে বিশ্বাস করে না, না উহাদের মধ্যে ভগবদ্ভক্ত কেহ নাই? সাহিত্য, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, রাজনীতি সকল বিষয়েই যুরোপ যেরূপ উন্নতি করিয়াছে, ভারতবর্ষকে উহার মত হইতে হইলে, কৃত্রিম ধরিয়া যে কর্ম-তৎপর থাকিতে হইবে তাহার ঠিক কি? আজও যদি অকাজে তাহা

জাতিতে ভারতের নবপ্রাণ বিমোহিত থাকে, তাহা হইলে এ জাতির মুক্তির আশা আর নাই বলিলেও চলে।

কর্মক্ষেত্রেই প্রথম স্থান দেওয়া হউক। ভগবান্, তিনি ত আছেন, তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে পূজা দিলেই তিনি সন্তুষ্ট থাকিবেন। এক্ষণে কি করিতে হইবে তাহারই আলোচনা করা যাউক।

সর্বপ্রথমেই শিক্ষার কথা। জগতে উন্নতিসোপানে যাহারা আরোহণ করিয়াছেন, তাহারা সকলেই শিক্ষিত, শিক্ষার বলেই তাঁহাদের দেশ এত উন্নত। আমাদের দেশে উপস্থিত শতকরা পাঁচজন লোক শিক্ষিত, ২০ কোটা ব্রিটিশ প্রজার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে যে সামর্থ্যের প্রয়োজন, তাহা যে আমাদের নাই একথা বলি না, তবে আমাদের সে স্মরণ নাই, এবং এই স্মরণের সৃষ্টি করিতে হইলে, শিক্ষাপ্রচার উপস্থিত স্থগিত রাখিয়া, শিক্ষাবিস্তারের উপযোগী শক্তি ও তাহার প্রয়োগ করিবার ক্ষেত্র নির্মাণ করিতে হইবে। এই কর্মে যথেষ্ট ধৈর্য্য চাই, ত্যাগ চাই, অনন্তমনা বিশাল সমষ্টিশক্তির সাহায্য চাই, ফলে দাঁড়াইল, আমাদের ধৈর্য্য লাভ করিতে হইবে, ত্যাগী হইতে হইবে, অসংখ্য ধৈর্য্যশীল ত্যাগী ব্যাটিকে একত্র করিয়া সুদৃঢ় শক্তিশালী সমষ্টির সৃষ্টি করিতে হইবে।

এইরূপ যে কোন জাতীয় কর্মই বিশ্লেষণ করিয়া দেখ, দেখিবে সর্বত্রই আমাদের মানুষ হইতে হইবে, এবং কেবল মানুষ হইলেই হইবে না, মানুষগুলিকে একত্র করিতে হইবে, এবং যে কোন উদ্দেশ্য লইলেও অসাধারণ ধৈর্য্যসহকারে প্রতি পদে ত্যাগ স্বীকার করিতে করিতে আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে।

বলিতে পার, জগতের সকল দেশ কি কর্ম করিতে করিতেই মানুষ হইয়া উঠে নাই, এবং কর্মক্ষেত্রে থাকিয়াই কি ঐক্যলাভ করে নাই, ভারতে তাহার বিপরীত করা হইবে কেন? ইহার উত্তর দিব না, বর্তমান ঘটনারাজি আমাদের চক্ষে আঙ্গুল দিয়া যাহা নির্দেশ করিতেছে তাহা যাহারা লক্ষ্য করিতেছেন না, এইরূপ অদূরদর্শী অস্থিরচিত্ত লোক লইয়া কোনও দেশের যে কর্মসাকল্য লাভ হইতে পারে এমন বিশ্বাস আমাদের নাই।

যুরোপে ও ভারতে অনেক বিষয়ে প্রভেদ আছে। ভারতের সভ্যতা কৃতি আচার ব্যবহার প্রাকৃতিক নিয়ম, সমস্তই যুরোপ হইতে বিভিন্ন,

যুরোপ যে পথে চলিয়া কিছু করিয়াছে, সে পথে চলিতে হইলে ভারতকে ভাঙ্গিয়া গড়িতে হইবে, এবং এইরূপ জাতীয় বৈশিষ্ট্য নষ্ট করিয়াও যে আমরা যুরোপের মত হইতে পারিব, সে আশাও কল্পনাময়, স্মরণ্য হইতেও পারে নাও হইতে পারে, এইরূপ সংশয় লইয়া ভারতীয় চরিত্র পরিবর্তনে কোন মনীষী সম্মত হইবেন না, বরং জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার জন্ত প্রতিকূল শ্রোত এমন বহিবে, যে নূতন সৃষ্টি হওয়া দূরে থাকুক, সংস্কারক ও রক্ষণশীলের মধ্যে অবিরাম সংগ্রামে আমাদের সকল যজ্ঞই গুণ্ড হইবে।

বাংলার সে যুগ যে আসে নাই, এরূপ নহে, একদিকে রাজা রাম-মোহন রায়, অপর দিকে রাজা রাধাকৃষ্ণ দেব বাহাদুর যে সংগ্রাম করিয়াছিলেন, বাংলার জাতীয় উন্নতির ইতিহাসে তাহা চিরস্মরণীয় থাকিবে। তারপর প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া কেবল সংস্কার লইয়াই, জাতির মহামূল্য সময় ও শক্তি একেবারে অযথা নষ্ট না হইলেও, জাতির প্রাণে সৃষ্টিসামর্থ্য যে বিশেষ বিকশিত হইয়া উঠে নাই একথা স্বীকার করিতে হইবে। তারপর ঠাকুর পরমহংসের অভ্যুদয়ে শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মধ্যে সংস্কারসাধনের প্রয়াস অনেকাংশে হ্রাস পাইয়াছে, এক্ষণে সংস্কারের তেমন আবশ্যকতা নাই, বিলাতপ্রত্যগত কোন বাঙ্গালীর সমাজে স্থানাভাব ঘটে না, আহাঙ্গারদির রুচিভেদে এখন কেহ বড় কাহাকেও ঘৃণা করে না, এমন দিন আসিতেছে সামাজিক আচারব্যবহারে পার্থক্যসত্ত্বেও পরস্পর একযোগে জাতীয় কর্মে যোগদান করিতে কুণ্ঠাবোধ করিবে না। সংস্কারকদল বক্তৃতার সংঘর্ষে যে আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিলেন, স্বামীজী অধ্যাত্মবলে তাহার সামঞ্জস্য আনিয়া দিয়াছেন, সংস্কারকদল পাশ্চাত্যের অনুকরণপ্রয়াসী হইয়া ভারতীয় চরিত্রে আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, স্বামীজী ভারতীয় চরিত্র অব্যাহত রাখিয়া জগতের শ্রেয়ঃ যাহা তাহাই অনুপ্রবেশিত করিয়া দিয়াছেন, আজ ভারতবর্ষ, ভারতবাসী থাকিয়াই জগতের জ্ঞান আহরণে উদ্যোগী হইয়াছে, ভারতের পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে, জাতীয়ত্ব বজায় রাখিয়া পাশ্চাত্যের শিক্ষা আপনাদের ব্যবহারে লাগাইবার শ্লোকশল আয়ত্ত করিয়াছে, এ অবস্থায় সংস্কার লইয়া আর নূতন গুণগোজ সৃষ্টি করিবার তেমন প্রয়োজন নাই, বাংলার হই একজন মনীষী নিতান্ত সংস্কারপরবশ, বাংলার সামাজিক সংস্কারের উপরই অধিক জোর দিয়া বলেন, এই

সকল পরিবর্তন না ঘটিলে, জাতীয় উন্নতি সম্ভবপর নহে, আমরা এ কথা অস্বীকার করি, সামাজিক কোন বিধানই আমাদের উন্নতিপথের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়ায় নাই, কর্মক্ষেত্রে বাংলার জাতিভেদ কোন কর্মেই বিঘ্ন উৎপাদন করে নাই, অসবর্ণ বিবাহ না হওয়ার জাতি যে দুর্বল হইয়া আছে এমন লক্ষণও দেখা যায় না, জাতি যে নিস্তেজ-রুগ্ন, সে কেবল শিক্ষার অভাবে, এই শিক্ষা ভারতীয় শিক্ষা, যে শিক্ষার মানুষের মন উদার হয়, মানুষ জাতির জন্ত সর্বস্ব ত্যাগ করিতে পারে, দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া উদ্দেশ্য সকল না হওয়া পর্যন্ত অটল পদে কর্মক্ষেত্রে শত নিষ্ঠা-তন হাসিমুখে সহ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। ভারতের সম্মুখে যদি কিছু করিবার থাকে, তাহা এই শিক্ষাবিস্তার।

পূর্বেই বলিয়াছি কর্ম করিতে হইলে সর্বপ্রথমে কর্মীকে অসাধারণ চরিত্র লাভ করিতে হইবে, এবং কর্মীগণকে একত্র করিয়া এক বিপুল সম্ভার সৃষ্টি করিতে হইবে, তবেই সম্মুখের সকল 'বিঘ্ন, সে বত বড়ই হউক' না, কর্মীবৃন্দের যদি চরিত্র থাকে, তাগ থাকে, ধৈর্য থাকে, ঐক্য থাকে তাহা অপসারিত করা হুংসাধ্য হইবে না।

২৩ কোটি নরনারী অন্ধতমসচ্ছন্ন, ইহাদের সম্মুখে জ্ঞান-বর্তিকা আলিয়া ধরিতে হইবে, ইহা ত অবিসংবাদী সত্য, কিন্তু এই কর্মের জন্ত যে সকল প্রচেষ্টা চলিতেছে, তাহা কতদূর সফল হইবে, তাহা ভবিষ্যত কথা, কেননা, কর্মক্ষেত্রে যাহারা আছেন, তাঁহারা বুঝিতেছেন, সহকর্মীদের সঙ্গে প্রতিপদে মতবিরোধ ঘটায়, মনের কতখানি জোর কমিয়া যায়, কতখানি উৎসাহ অকারণ 'স্তিমিত হইয়া পড়ে। কিন্তু যদি এমন একটা সঙ্কল্পপরায়ণ জাতির অভ্যুত্থান হয়, বহু হইলেও, চিত্ত যাহাদের এক, উদ্দেশ্য যাহাদের অভিন্ন, শক্তি সম্পদ একই কেন্দ্রগত, তাহা হইলে উহা ক্ষুদ্রাকার হইলেও বৃহৎ কর্ম সাধন করিবার স্পর্ধা তাহাদের পক্ষে সম্ভব একথা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন।

এক্ষণে কথা হইতেছে এরূপ সংঘ সম্ভব হইবে-কি না? আমরা সকল কর্মক্ষেত্রেই কমিটির গঠন দেখিতে পাই, ইহা পাশ্চাত্যের অনুকরণে, অধিক সংখ্যক সভ্যের মতানুবর্তিতায় কর্ম এখানে সম্পাদিত হয়, কিন্তু সকল সভ্যের মনের জোর এখানে খেলিতে পায় না, এতদ্ব্যতীত যাহারা একমত-তাঁহাদের-জীবনের-ষোল আনাও হয়ত বিশিষ্ট কর্মটির জন্ত উৎস-

সর্গীকৃত নহে, এইজন্য সর্বক্ষেত্রে হয় আধা, না হয় সিকি, না হয় অতি সামান্য, মাত্র উদ্দেশ্য সিদ্ধির লক্ষণই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

ভারতের অৱস্থা বড়ই শোচনীয়। ভারতের রাষ্ট্র, শিক্ষা, সমাজ, বাণিজ্য সর্বক্ষেত্রেই এমন সব লোক চাই, যাহারা দিবারাত্র পরিশ্রম করিবেন, যাহাদের উদরপূরণ ভিন্ন অন্য কোন বিলাস বা ভোগ থাকিবে না, যাহারা অত্যন্ত পরিশ্রমী, উদার, প্রেমিক। ভারতের বর্তমানকে সমুন্নত করিয়া তোলা সাধারণ লোকের কর্ম নহে—আমরা এইজন্যই বলি, ভারতের কাজ যাহারা করিতে চাহেন, তাঁহাদের একেবারেই সন্ন্যাসী হইতে হইবে, তাঁহাদের গৃহ নাই, জীপুত্র, পিতামাতা, ধন সম্পদ, মান অপমান নাই, তাঁহারা মাতৃভূমির কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া একেবারেই সন্ন্যাসী হইবেন।

এক্ষণে এই সন্ন্যাসী গড়িতে হইলে, সর্বপ্রথমে আমাদেরকে ব্যষ্টি গঠনের জন্য উপযোগী শিক্ষা প্রবর্তন করিতে হইবে, সমগ্র ভারতবাসী কিছু সন্ন্যাসী হইবে না, স্তত্রাং উপস্থিত আমরা যে তত্ত্বালোচনা করিতেছি, তাহা কেবল তাঁহাদেরই জন্য, যাহারা ভারতের নূতন কর্মক্ষেত্রে দাঁড়াইবার স্পীক্ষা রাখেন, আমাদের ভাগবততত্ত্বপ্রচার বীর সাধকের জন্ত—চর্কণের জন্য নহে।

এই যে সমষ্টি, যাহার অন্তর্গত হইয়া বহু ব্যষ্টি অবস্থিত করিবে, তাহাদের মধ্যে একপ্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, কোন বিশিষ্ট কর্মটাকে পুরোভাগে রাখিয়া চরিত্র গঠন করিলে অবস্থা ও কালভেদে কর্মের রূপ পরিবর্তিত হইবে, ব্যষ্টির চরিত্রও ভিন্নমুখী হইয়া পড়িবে, আজ পর্যন্ত সমগ্র জগতে যে সকল সমষ্টিশক্তি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার নিত্য পরিবর্তনের কারণ কি ইহাই নহে?

কিন্তু মানুষ যদি আত্মসত্তাটাকে অবলম্বন করিতে পারে, যে সত্তার কালভেদে পরিবর্তন নাই, অবস্থাভেদে রূপের কোন পার্থক্য ঘটে না, এবং সেই সত্তার স্নমহতী ইচ্ছাটাকে উপলব্ধি করিয়া, ভাগবত কর্মসম্পাদনে এইরূপ আত্মদর্শীসহযোগে যদি কোন সংঘ সৃষ্টি করে, তবে তাহার নাম দেবসংঘ এবং এইরূপ দেবজাতির সম্মিলনের উপরেই ভারতের ভবিষ্যৎ কর্ম যে একান্তপক্ষে নির্ভর করিতেছে, তাহা নিঃসন্দেহ।

কর্মকে সূচাঙ্গরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে, সর্বপ্রথমে জানা কর্তব্য এই

কর্ম ভাগবতইচ্ছাসমূহ কি না? ভাগবত কর্মে প্রত্যাবাস্য নাই, এবং এইরূপ জানিতে হইলে, ভগবদনুভূতির প্রয়োজন আছে, কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত না হইয়া আমরা সর্বপ্রথমেই আমাদের ময়ো ভগবানকেই জাগ্রত করিয়া তুলিতে চাই, আপনার মধ্যে তাঁহাকে জাগ্রত করিয়া, আমাদের সংস্পর্শে যাহারা আছেন, তাঁহাদের মধ্যেও এই জ্ঞান উদ্ভূত করিয়া তুলিব, তারপর এই সমষ্টির আয়তনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে ইহার কর্ম-শক্তির বেগ নিত্য প্রবল হইবে, তাহা নিঃসন্দেহ—সে বেগ কোনও ঘটনায়, কোনও অবস্থায়, কোনও বাধার প্রতিহত হইবে না।

বিচিত্র কল্পনা, বিচিত্র স্বপ্নে বিভোর হইয়া নূতন বাঙ্গালীর নিকট আমাদের আদর্শ স্থাপন করিতেছি, বাহিরে দাঁড়াইয়া ইহা স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতে পারে, অন্তরতম পুরুষের স্পর্শে নবজীবন লাভ হইলে, দেখিবে, ভারতের আর অন্য গতি নাই, ভগবানকে দূরে রাখিয়া একপদ অগ্রসর হইলে দশ পদ পিছাইয়া আসিতে হইবে; একথা দ্রব জানিও।

প্রবর্তকের বক্তব্য*

জগৎটা 'তুচ্ছ' মিথ্যা নয়, এটি হইতেছে 'অনির্কটনীয়' মিথ্যা অর্থাৎ বক্ষ্যাপুত্রের মত মিথ্যা নয়, ইহা হইতেছে রজ্জুতে সর্পভ্রমের মত মিথ্যা। অজ্ঞ কথায়, জগৎ একান্ত মিথ্যা নয়, ইহার মধ্যে খানিকটা সত্য আর খানিকটা মিথ্যা, ইহা সত্য মিথ্যায় মিশ্রণ; ব্রহ্মই কেবল নির্জলা সত্য। সত্য—বিশুদ্ধ সত্য হইতেছে তাহাই যাহা আছে ছিল ও থাকিবে, যাহা নিত্য। জগৎ মিথ্যা, একেবারে নাই বলিয়া নয়, কিন্তু আছে ক্ষণিকের জ্ঞান এই বলিয়া, উহা পরিবর্তনশীল, আজ আছে কাল নাই, এই বলিয়া। জগৎ যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ খুবই আছে, তাহা সত্যই, কিন্তু যখন নাই

*আমাদের সম্পাদকীয় বিভাগে কিছু গোলমালের জ্ঞান এই প্রতিবাদ ও উত্তর ছাপাইতে বড় বেশী বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। স্বামীজী ইতিমধ্যে তাঁহার প্রতিবাদ উদ্বোধনে পত্রস্থ করিয়াছেন। ত্রুটির জ্ঞান স্বামীজীর নিকট আমরা কমাপ্রার্থী।—প্রবর্তক সং।

তখন একেবারেই নাই, তাহার কিছুই নাই। ব্রহ্মের পক্ষে কিন্তু এককম পরিণাম বা পরিবর্তন মোটেও সম্ভব নয়, তাহা আছে, চিরকাল আছে। শঙ্করাচার্যের মায়াবাদের এই মূল কথাটা আমরা নাকি আধুনিক ভোগবাদীর দল বুঝিতে পারি নাই; না বুঝিয়া থাকি, স্বামীজীর কৃপায় আজ বুঝিলাম, সে জন্ত তাঁহাকে বহুল ধন্যবাদ দিতেছি।

যাহার পরিবর্তন হয় না, যাহার প্রমাণ ত্রিকাল অবাধিত তাহাই (পারমার্থিক) সত্য; যাহার পরিবর্তন হয়, যাহার প্রমাণ ত্রিকালবাসিত তাহা এক সময়ের জন্ত (ব্যবহারিক) সত্য হইলেও, তাহা (পারমার্থিক) সত্য নয়, তাহা মিথ্যাই। সত্য মিথ্যার কষ্টিপাথর আমাদের চেনা ছিল না, স্বামীজী কষ্ট করিয়া এই কষ্টিপাথর চিনাইয়া দিয়াছেন সে জন্ত ভূয়ঃ প্রণতোহস্মি।

কিন্তু যে কথাটা আমরা বুঝিতে পারিলাম না তাহা এই, পরিবর্তনশীল হইলেই জিনিষকে মিথ্যা নাম দিব কেন? এ কথা স্বীকার করিলাম, সত্য হইতেছে তাহাই বাহা সৎ, বাহা আছে। কিন্তু আছে—কোথায়, কি ভাবে? স্বামীজী বলিতেছেন, সংবস্ত থাকা চাই ত্রিকালের মধ্যে, সমভাবে; তবেই তাহা সৎ নতুবা অসৎ। ব্রহ্ম অর্থাৎ অস্তি এই বস্তুটি সকল জিনিষ সকল কালের মধ্য দিয়া ব্যক্ত হইতেছে, ইহাই সূত্রাং সত্য। জগৎ, জাগতিক বস্তু এ রকম অব্যাভিচারী নয়, সূত্রাং তাহা মিথ্যা। আমরা কিন্তু স্বামীজীর এ কথায় সম্পূর্ণ সায় দিতে পারিতেছি না। প্রথমতঃ, আমরা বলি, সংবস্ত স্বয়ংসিদ্ধ, ত্রিকালের অতীত, দেশ ও কালের মধ্যে তাহার প্রকাশ বা জাগ্রত অবস্থা তাহার সত্যতার প্রমাণ নহে। এই প্রকাশ সত্যতার একটা আন্তঃবঙ্গিক ব্যাপার হইতে পারে, কিন্তু উহা তাহার অন্তরান্বীতি নহে। জগৎ আজ আছে কাল নাই, জাগতিক বস্তু সকল নশ্বর—হউক; দেশ ও কালের মধ্যে আজ ইহার প্রকট কাল লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, তাই বলিয়াই ইহার একেবারে নির্দ্বন্দ্ব বা লয় পায় কি? ইহাদের অস্তিত্ব কোথাও কোন ভাবেই কি থাকে না? আমরা বলি থাকে, থাকে বলিয়াই স্থলে জাগ্রতে দেশে কালে ইহাদের একান্ত বিলোপ দেখি না; প্রলয়ই জগতের শেষ কথা নয়, প্রলয়ের পর নবসৃষ্টি ত অব্যর্থ নিয়ম। এই নবসৃষ্টি হয় কেন, হয় কোথা হইতে?

নাম রূপের পরিবর্তন হয়, একটা বিশেষ নাম বিশেষ রূপ যায় বটে কিন্তু আসে আর এক বিশেষ নাম বিশেষ রূপ। নাম রূপের একান্ত ধ্বংস ত দেখি না; এমন কি, আমরা বলি বিশেষ নাম বিশেষ রূপেরও ধ্বংস হয় না, তাহা অপ্রকট হয় মাত্র, তাহা থাকে 'কোথাও স্তব্ধ' হইয়া। একটা ঘট ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছি আর বলিতেছি দেখ ঘট আর নাই, উহা নখর, মায়া মিথ্যা—কিন্তু ভাঙ্গিয়া ফেলিলেই কি উহার অস্তিত্ব বিলোপ করিতে পার? ঘট ভাঙ্গিয়া ফেল আর না ফেল, মানুষ চিরকাল ঘট দেখিয়াছে, দেখিতেছে ও দেখিবে। ঘটের একটা সত্য সত্তা আছে কোথাও, তাই এইরকম হয়। গাছ শুকাইয়া মরিয়া যাইতে পারে, কিন্তু বীজ কোথাও রহিয়া গিয়াছে—সেই বীজ সুবিধা পাইলে অব্যর্থভাবে আবার দেশে কালে মুঞ্জুরিত হইয়া উঠিতেছে। সৃষ্টির একান্ত শেষ নাই, তাহা চিরকাল চলিয়া আসিতেছে,—কালের দিক দিয়া দেখিলেও এ জ্ঞান ত নিত্য—ত্রিকাল অব্যাহতই।

সং, অস্তি জিনিষটি আছে একটি চেতনার সহিত জড়িত একীভূত হইয়া। 'আমি আছি,' ইহার সহিত আমি যে আছি তাহার জ্ঞানও অব্যর্থভাবে সংশ্লিষ্ট। থাকার সাথে সাথে থাকার একটা চেতনা আছে, সেই চেতনার মধ্যে থাকাকাটা আবার জাগিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্মরণে থাকার প্রমাণ আমরা খুঁজি চেতনারই মধ্যে। কিন্তু চেতনার অনেক পর্দা, অনেক স্তর। মায়াবাদী যখন বলিতেছেন, পার্থিব জিনিষ আজ আছে কাল নাই তখন তিনি তাঁহার জাগ্রত চেতনা, স্থূল জ্ঞান, ইন্দ্রিয়া-বুভূতির সম্পর্কে একথা বলিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনিই কি স্থূলবাদী নহেন? বাহ্যজগতের পরিবর্তন জরামুক্ত্য, দেখিয়াই তিনি ঠিক করিয়া ফেলিতেছেন না—সব নখর, কিছু নাই, 'বিলকুল বুটা' ? আমরা বলি, 'আছে' বলিতে বুঝায় না যে জাগ্রত চেতনাতেই আছে আর সেখানেও আছে একইভাবে একই নামে ও রূপে; জাগ্রতে সব সময়ে থাকি বা না থাকি সেটা আসল কথা নয়, আসল কথা হইতেছে আরও বড় গভীর একটা চেতনার আছি কি না। এই বড় চেতনাটি হইতেছে—স্বামীজীও বলিয়াছেন—প্রজ্ঞা। এই প্রজ্ঞা দিয়া বাহ্যকে ধরি তাহাই সং। এই প্রজ্ঞারই মধ্যে আছে জগৎ বীজরূপে।

স্বামীজী যে ইহাও স্বীকার করিবেন আমরা তাহা আশা করি না।
কলভঃ তিনি বলিতেছেন প্রজ্ঞা জিনিষটা নিজে নিজে সং সত্য কিন্তু

প্রজ্ঞার মধ্যে আছে বাহা, প্রজ্ঞাকে বিরিয়া প্রজ্ঞার মধ্যে প্রতিকলিত—
‘প্রজ্ঞারূঢ়’—বাহা তাহা প্রজ্ঞার সত্যতার রঞ্জিত হয় মাত্র কিন্তু সত্য নয়।
কেন? কারণ যখন শুধু প্রজ্ঞার দিকে তাকাই, বস্তু-হইতে বিষয় হইতে
মুখ ফিরাইয়া প্রজ্ঞার নিজের সত্যার মধ্যে ডুবিয়া যাই, তখন সেখানে
বিষয় বস্তু অর্থাৎ এই জগৎ কিছু দেখিতে পাই না, সব লোপ
পায়,—বিশুদ্ধ ঘনীভূত সেই চেতনার মধ্যে পাই কেবল একমেবা-
দ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম। “প্রজ্ঞার এই অবস্থার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেন নির্বি-
কল্প জ্ঞানী”। কিন্তু এই সাক্ষ্যের এই প্রমাণের অর্থ কি? আমরা
বলিতে চাই ইহাতে এইটুকু মাত্র বুঝা যায় যে প্রজ্ঞার একটা শক্তি বা
বৃত্তি আছে বাহার জোরে সকল ডুবিয়া কেবল নিজের অস্তিত্ব বা
form টুকু সম্বন্ধেই সচেতন হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া
প্রজ্ঞার বিষয় বা contents সকল যে তখন কোনভাবেই থাকে না
বা সে সব ভুল মিথ্যা এ কথা প্রমাণ হয় কিরূপে? এ সকলও সত্য,
প্রজ্ঞারই অঙ্গীভূত। আমার যখন ইচ্ছা হয় তখন আমি নিজেকে ছড়াইয়া
বহুরূপে দেখি, যখন ইচ্ছা হয় তখন সব সম্পূর্ণ করিয়া নিজের মধ্যে
ডুবিয়া থাকি; নির্বিকল্প সমাধি চেতনার এক ভঙ্গী আর জাগ্রত সমাধি
চেতনার আর এক রকম ভঙ্গী—দুইটাই সমান সত্য। উপনিষদেরই একটি
উদাহরণ লইয়া আমরা বলি, উর্গনাভের নিজের ভিতরেই আছে তাহার
সমস্ত জালখানি, ইচ্ছা করিলে সে নিজে নিজেই থাকিতে পারে, আবার
অন্তরূপ ইচ্ছা হইলে সে ভিতরে নিজের বাহা আছে সব বাহিরে বিক-
শিত করিয়া তুলিতে পারে। উর্গনাভটাই শুধু সত্য, আর তার জালটা
মায়া মিথ্যা—একথা বলার সার্থকতা কি?

কিন্তু গোড়ার কথা এই, মায়াবাদী যে বলেন জগৎ নাই, সত্যতাই
নাই, তাহার কারণ তিনি প্রতিষ্ঠিত নিজের ব্যক্তিগত অহং-এর চেতনার
উপর। একটা অহং আপনার প্রজ্ঞার আলোককে নিজের মধ্যে নিহিত
করিয়া রাখিয়াছে, কাজেই জগৎ তাহার সম্মুখে, শুধু তাহারই সম্মুখে,
ফুটে উঠে নাই। কিন্তু এটি accident মাত্র। সে অহং-এর কাছে
না থাকিতে পারে কিন্তু জগৎ তবুও আছে, তাহা নিত্যই। আর সে
অহং-এর কাছে নাই শুধু জাগ্রতে, তাহার প্রজ্ঞার চেতনায় সে জগ-
তের আর কিছু না থাকুক possibility নিত্যই আছে। তাই আমরা

ঘলিয়াছিল। মায়াবাদীর মূল কথা এই আমি আছি আর জগৎ নাই। তিনি তর্কে বলিতে পারেন ব্রহ্ম আমি তুমি নাই, তাঁহার শেষ উপলব্ধিও হইতে পারে ব্রহ্ম যুগ্মদ্বন্দ্বের অতীত কিন্তু এটি আসল কথা নয়—তাঁহার শেষ উপলব্ধি অমরজিত হইয়াছে তাঁহার গোড়ার আরম্ভের আলোকপাতের ভঙ্গীতে। কারণ আসল কথা এই, মায়াবাদী তুরীয়া দৈতাতীত সত্য পৌছিয়াছেন শুধু সত্যের একটি ধারের উপর ভর করিয়া। আমি, অহং এই জ্ঞান এই চেতনা এই সত্যকে একান্ত করিয়া ধরিয়া, অহংএর ভিতর দিয়া ভবে অহংএর ওপায়ে গিয়া পড়িয়াছেন। তিনি যে অল্প সকল অহংকে, যুগ্মকে প্রথম হইতেই “নাকচ” করিয়া দিয়া রাখিয়াছেন। তিনি যদি আমি তুমি যুগ্মদ্বন্দ্বের উপর সমান জোর দিয়া উভয়কে সমান সত্যরূপে ধরিয়া উঠিয়া চলিতেন; তবে তাঁহার শেষ উপলব্ধি আর এক রকম হইত—ব্রহ্মকে শুধু অক্ষর স্থাণু হিসাবেই সত্য দেখিতেন না, দেখিতেন ক্ষর চঞ্চল হিসাবেও তাঁহার এক সত্য—পারমার্থিক সত্যই আছে।

আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সহায়ে জগৎকে “নাকচ” করিয়া স্বামীজী সন্তুষ্ট হন নাই, আধুনিক জড়বিজ্ঞানের তীক্ষ্ণ শরজালে তাহাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বিজ্ঞানও নাকি আজকাল জোরগলায় বলিতেছে—জগন্নিখা! কারণ বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত, জগতে জড়ের পশ্চাতে আছে, জড়ের আসল সত্তা হইতেছে জৈব বা ইলেকট্রন। স্মৃতির মানুষ যদি সে রকম চক্ষু পাইত বা সে রকম এক অনুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করিতে পারিত, তবে জড়জগৎ সে মোটেই দেখিত না, দেখিত শুধু ইলেকট্রনের সমবায়। জড় যাহা সেটা আমাদের বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি, উহারই অক্ষমতার ফল। আবার এই স্বক্ষ চক্ষুকেও অতিক্রম করিয়া যদি অধ্যাত্মদৃষ্টি আমরা পাই, তবে দেখিব সেখানে জগৎ বলিয়া কোন সত্তাই নাই, আছে শুধু এক অদ্বিতীয় অক্ষর ব্রহ্ম।

ঠিক কথা, শুধু অধ্যাত্ম দৃষ্টির সম্মুখে ব্রহ্ম, শুধু স্বক্ষ চক্ষুর সম্মুখে শক্তিতরঙ্গের খেলা, শুধু ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে জড় কুটির উঠিয়াছে। আমরা ইহাও স্বীকার করি, ইন্দ্রিয়ের মূল স্বক্ষ অনুভূতি, স্বক্ষ অনুভূতির মূল অধ্যাত্ম; জড় দাঁড়াইয়া আছে শক্তির উপর, শক্তি দাঁড়াইয়া আছে ব্রহ্মের উপর। কিন্তু মায়াবাদী যেমন সৃষ্টির এই বিভিন্ন পর্দাকে কাটিয়া পৃথক করিয়া দেখিতেছেন, ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কেবল নিরুদ্ধ ধর্মই

লক্ষ্য করিতেছেন আর একটিকে পরম সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া, অল্প সকলকে মিথ্যা মায়া বলিয়া অক্লেপে 'নাকচ' করিয়া দিতেছেন, আমাদের সে ভ্রঃসাহস নাই। মানুষ যে চেতনার স্তরে প্রতিষ্ঠিত, তদনুরূপ এক সত্যই তাহার সম্মুখে প্রচিয়া উঠিতেছে। কিন্তু এককালে একটি মাত্র স্তরের চেতনার মধ্যে যে মানুষকে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে, এমন কথা কি আছে? হয় শুধু জড় চক্ষু লইয়া থাক আর না হয় শুধু অধ্যাত্মদৃষ্টি লইয়া থাক, হয় তুমি পণ্ডিত নতুবা তুমি একেবারে দেবতা, হয় একেবারে স্বর্গ না হয় নরক, এ রকম একৈক গতি যে মানুষের তাহা ছানরা মাদনি না। মানুষ সকল স্তরকে এক সাথে জড়াইয়া থাকিতে পারে, সকল চেতনার যুগপৎ সম্বন্ধ হইয়া উঠিতে পারে। এক দিকে স্থায়ী সনাতন ব্রহ্ম আর একদিকে চঞ্চল পরিবর্তনশীল জগৎ—এই উভয় উপলব্ধিই অপূর্ব সামঞ্জস্যে বিধৃত হইয়া মানুষের মধ্যে যুগপৎ থাকিতে পারে। স্বামীজী যে কলমকে কলম দেখেন না দেখেন শুধু ব্রহ্ম, আমরা সেখানে দেখি, অধ্যাত্মদৃষ্টির সম্মুখে সে কলম ব্রহ্ম আবার একই সময়ে হৃদয় অনুভূতির সম্মুখে তাহা ইলেকট্রন বা ঈশ্বরগুণ্ডা আর স্থূল চক্ষুর সম্মুখে নামরূপধারী জড় কলমটি—এই তিন চেতনা সমানভাবে আমার মধ্যে জাগ্রত, ফুট।

আমরা মানি, ব্রহ্ম, অতীন্দ্রিয় তুরীয় হইতেছে মূল, উহারই চৈতন্তে জগৎকে বস্তুকে দেখিতে হইবে—তবেই জগতের বস্তুর অন্তরাখ্যা হইতে দেখিতে পারিব। আর এই ভঙ্গীতে দেখিলে জগৎ বস্তু আর একভাবে আমাদের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতে পারে। 'Things are not what they seem'—মানিলাম; কিন্তু ইহা হইতে তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত করা 'Things are not', এরকম লজিক আমাদের পক্ষে এক দুঃখিগম্য শাস্ত্র। উপরের চেতনা খুলিয়া গেলে, নীচের চেতনা যে তাহার আভাস অনুসন্ধান হইয়া উঠে, তাহা মানি। কিন্তু সেজন্ত নীচের চেতনাটা যে একেবারেই লোপ পায় তাহা মানি না। ব্রহ্মের চেতনা লইয়া আমরা জগতের চেতনাকেই ফুটাইয়া তুলিতে পারি। তাহা যখন পারি, তখন জগৎ একান্ত মিথ্যাও নয়; অনির্বিচনীয় মিথ্যাও নয়, পরম পারমার্থিক সত্যই হইয়া উঠে। জগৎ বল ব্রহ্ম বল, আর জড় ইলেকট্রন অধ্যাত্ম বল—ইহাদের মধ্যে সংঘর্ষের সম্বন্ধটাই একমাত্র সত্য নয়; সম্মিলনের সম্বন্ধটাই

সত্য। একটি থাকিলে আর একটি যে থাকিতে পারে না তাহা নয়, ইহার যুগপৎ মিলিয়া মিশিয়াও থাকিতে পারে। অবশ্য যদি আমি সংঘর্ষের দ্বন্দ্বের দিকটাই বড় করিয়া দেখিতে চাই, যদি কোন একটিমাত্র চেতনার মধ্যেই ভুবিনা থাকিতে চাই, তবে তাহা আমি করিতে পারি— কিন্তু আবার না করিলেও পারি।

আর আমাদের মত, এই না করাটাই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। আমরা যে বলিয়াছি, মার্যাবাদী চক্ষু বুজিয়া, নাক কান বন্ধ করিয়া, মনে বুদ্ধিতে চিন্তে অমানুষিক দিগ্বাজী খান তাহা শুধুই বাগবৈথরী নয়। এ কথায় আমরা বুঝাইতে চাই এইটুকু যে মার্যাবাদী সহজ ভাব সহজ ভঙ্গিমাটি অনুসরণ করেন না। 'Pragmatic' বা চাষাভুষার 'unsophisticated mind' এর attitude হইতে আমরা এ কথা বলি নাই। কারণ, আমরা বলি, ব্রহ্মের একমেবাদ্বিতীয়্যের ধর্মই হইতেছে প্রকাশ আপনাকে ছড়াইয়া বিকশিত করিয়া দেওয়া—স পর্য্যগাৎ, তাই ত সৃষ্টির স্রষ্টি, তাই ত স্থলের স্রষ্টি। ভুল বা অবিদ্যা আসে তখনই যখন আমরা মনে করি তুরীয় হইতে উদ্ভূত স্থল, তুরীয় হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া ও তুরীয়কে বিনষ্ট করিয়াই তবে স্থলাবস্থা প্রাপ্ত হয়। বৈদান্তিক উদাহরণ, ব্রহ্ম জগৎ হইয়াছে ছদ্ম হইতে দধির মত নয়, রজ্জু হইতে সর্পের মত— এই analogy দ্বারা প্রকৃতপক্ষে এইটুকু সত্য স্মৃতিত হয়, যে ছদ্ম হইতে দধি হইলে ছদ্মের যেমন আর অস্তিত্ব থাকে না, থাকে শুধু দধিএর অস্তিত্ব, সেই রকম কিন্তু ব্রহ্ম হইতে জগৎ উদ্ভূত হইলে ব্রহ্মের যে আর অস্তিত্ব থাকে না তাহা নয়; রজ্জুকে সর্পবৎ দেখা গেলে, সর্পও যেমন দেখা যায় আর রজ্জুও যেমন অবিকলই থাকে, সেই রকম জগৎকে উৎপন্ন করিয়া ব্রহ্মও অবিকৃত অবস্থাতেই থাকে। Pragmatic, unsophisticated প্রাকৃতজন শুধু দেখে দধি, স্রষ্টির শেষ স্তরটি, ইহার অতীতে আর কিছু আছে কিনা জানে না, আছে যে তাহা বিশ্বাসও করে না— ইহাই অবিদ্যা। কিন্তু অস্ত্রদিকে আবার ব্রহ্মের বিকাশ বা 'পর্য্যগমনে' সম্মত এই জগৎকে যিনি নাকচ করেন তাহারও আছে অবিদ্যাময়ই এক বিদ্যা। তিনি শুধু মূলকেই সত্য বলিয়া ধরিয়া আছেন কিন্তু কাণ্ডকে শাখাপ্রশাখা ফলফুলকে মিথ্যা মায়া বলিয়া নাক মুখ কুঞ্চিত করিতেছেন। ব্রহ্মের মূল অপরিবর্তনীয় সমভাবে বর্তমান, স্তবরাং ইহা পারমার্থিক সত্য আয়

কাণ্ড শাখাপ্রশাখা ফলফুল নিত্য বদলাইতেছে সুতরাং অসত্য বা অন্ধৈক সত্য
এ কথা বলার সার্থকতা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না।

সজাগ হইয়া চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিলে অর্থাৎ pragmatic বা unsophisticated হিসাবে নয়, আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দিয়াই দেখিলে আমরা দেখিব আছে যাহা তাহা numerical unity নহে, তাহা হইতেছে multiple unity—আমি multiple, তুমি multiple, ব্রহ্ম multiple, জগৎ multiple—এই multiplicity এক অপরূপ unityকে গড়িয়া ধরিয়াছে। এইটাই আসল সত্য। তবে তুমি, আমি, তোমার আমার বা অস্তিত্বের একটি অংশ কাটিয়া লইয়া তাহারই মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চাই—তবে তাহা যে না পারি তাহা নয় কিন্তু সেটা দিগ-বাজীখেলা ছাড়া আর কি? এই দিগবাজী অনেকে পছন্দ করিতে পারেন, অনেকের পক্ষে বা সাধনার কোন অবস্থায় কাহারও-কাহারও প্রয়োজ্য হইতে পারে কিন্তু সেইটাই যে একমাত্র আদর্শ, তাহাই যে সৃষ্টি-রহস্যের চূড়ান্ত মীমাংসা তাহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না।

বেদান্তোক্ত শাশ্বত সত্যকে আমরা নাকচ করি নাই। সেই শাশ্বত সত্যই যে আপন সত্তার রসায়ণ দিয়া ফলফুলে সুশোভিতা এই সৃষ্টি এই জগৎকে গুঞ্জরিত করিয়া তুলিয়াছে। শাশ্বত সত্য নিগুণ নহে, এই-জন্ত যে সে আবার সগুণও। এই সগুণত্ব যে বিকারেরই ধর্ম তাহা নহে, উহাও নিত্যধর্মই। স্বামীজী তাঁহার গভীরতম উপলব্ধির মধ্যে তাঁহার নিগুণ ব্রহ্মেরও মধ্যে অস্তি ভাতি প্রিয় এই গুণত্রয়ের সন্ধান পাইয়াছেন—আমরাও আমাদের সকল চেতনার পশ্চাতে পাইয়াছি সেই এক মৌলিক চেতনাত্তর, শক্তি জ্ঞান প্রেম। তবে তিনি কেন বলিতে চাহেন, তাঁহার ‘অস্তি ভাতি প্রিয়’ হইতেছে নিত্য-শাশ্বত ‘চিং’এর ধর্ম আর আমাদের জ্ঞান শক্তি প্রেম হইতেছে অনিত্যের, চিন্তের বিকারের ধর্ম?

স্বামীজী আমাদেরকে pragmatic অথবা প্রাকৃতজ্ঞান বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন; অথচ আমরা যখন বলিয়াছি আমাদের অন্তরতম সত্য হইতেছে অমৃত, আমি দীন নই দরিদ্র নই—আমি শক্তিমান আমি জ্ঞানন্দময়, তখন তিনি যে বলিয়া উঠিয়াছেন ভুল, মিথ্যাকথা—blasphemy, সেটা কি প্রাকৃতজ্ঞানেরই কথা নয়? স্থূলচক্ষে তিনি দেখিতেছেন জগৎ হৃৎখে দারিদ্র্যে দৌরব্যো অজ্ঞতার ভরা, বাহু ইন্দ্রিয় এই সাক্ষ্যই

দিতেছে, স্তবরাং তাহা সত্য, একান্ত সত্য, এ কথাটি জ্ঞানী সন্ন্যাসীর মুখে কত-
দূর শোভা পায় তাহা আর আমরা বিচার করিতে চাই না। সে যাহা
হউক, আমরা বলি মানুষকে দেখা যায় দুঃখী, কারণ তাহার অন্তরের
সত্তা এই দুঃখেরই মধ্যে আনন্দ পাইতেছে। মানুষকে দেখা যায় দুর্বল
কারণ ভিতরের বলকে সে ক্রমে ফুটাইয়া তুলিতে চাইতেছে। মানুষ
অজ্ঞানময় হইয়াছে, কারণ সে জ্ঞানের সাধক। তুরীয়ে ব্রহ্মে যে জ্ঞান যে শক্তি
যে আনন্দ তাহাকে স্থলে জাগ্রতেও প্রকট করিয়া ধরিতে হইবে, এই জগত্
ত স্থলের জাগ্রতের অজ্ঞান অশক্তি নিরানন্দ। অমৃত আমি, মর্ত্য হইবার ক্ষমতা
ও ইচ্ছা আমার হইয়াছে এই মর্ত্যেরই মধ্যে অমৃতকে শরীরী করিয়া ধরিতে।

মায়াবাদী জগৎ দেখিতেছেন না, তিনি দেখিতেছেন কতকগুলি ক্ষণ-
বিক্ষণসী দ্রব্যসমষ্টি। তিনি রথ দেখিতেছেন না, দেখিতেছেন শুধু চক্র
ধূর চূড়া উপস্থ; তিনি পেঁয়াজ দেখিতেছেন না, দেখিতেছেন শুধু খোসা।
অথবা তিনি যদি অরণ্য না দেখিয়া দেখেন শুধু বৃক্ষ লতা গুল্ম, তাহাতেও
আমাদের আপত্তি করিবার কিছু নাই। তিনি জ্ঞানী স্বীকার করি; কিন্তু
তিনি অজ্ঞানী। স্বামীজী পদে পদে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া তাঁহার বক্তব্য
বলিয়াছেন, উপসংহারে আমরাও শাস্ত্রবাক্যই উদ্ধৃত করিয়া বিদায় লইতেছি—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি ঘেহৃদ্যামুপাসতে।

ততো ভূয় ইব তে তমো যউ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥

স্বদেশী

মানুষের স্থল প্রয়োজন সর্বাঙ্গে মিটাইতে হইবে—স্থলেই আমাদের প্রতিষ্ঠা।
এই প্রথম প্রয়োজনটি সম্পূর্ণ করিতে না পারিলে উচ্চ চিন্তা উচ্চ
প্রতিভার অনুশীলন করিবার অবসর ঘটিতে পারে না—মানুষ অন্নবস্ত্রের
চিন্তা করিবে, না ধর্ম দর্শন ভাবসাধনায় কালাতিপাত করিবে? তাই
সর্বপ্রথম এই জড় প্রয়োজনের ক্ষেত্রে স্বেপ্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে।
ভারতবর্ষ জাতিহিসাবে একদিন এই স্থল প্রতিষ্ঠানটিকে উপেক্ষা করিয়া
স্বল্প অধ্যায় সাধনাকেই বলবতী করিয়া তুলিয়াছিল। প্রকৃতিও এই শাস্ত্র

উদারচিত্ত ধর্মপিপাসু জাতিকে শান্তি-সুশীতল তপোবনের ছায়ায় সহজেই মরজীবনবিমুখ অধ্যাত্মরসপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু কালের কঠোর হস্ত অচিরে এই স্বথবপ্নবোর ভাঙ্গিয়া দিল। স্থূল প্রকৃতি প্রতিশোধ লইলেন— উপেক্ষার প্রতিফল চক্রবৃদ্ধি শুদশুদ্ধ শতগুণ আদায় করিলেন।

আজ প্রাণ লইয়াই আমাদের সরচেয়ে বোরতর সমস্তা। জীবনরক্ষা করিতে হইবে—অন্নবস্ত্রের প্রশ্নই এখন দেশের বড় প্রশ্ন—প্রাণের এই মূল উপজীব্য দুইটির সংস্থান না করিলে জাতির সুমুখ প্রাণ সমূলে বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে। বিশাল জাতির সমস্ত চেতনা আজ প্রাণের পদতলে পড়িয়া লুপ্ত হইতেছে—হয় জাতির প্রাণরক্ষা কর, নচেৎ জাতীয় মনের স্বত্তি মুক্তি কল্যাণ নাই। তাই মহাত্মা গান্ধী এবং ডাক্তার রায়ের মত দুইজন প্রতিভাশালী উচ্চব্রত মনীষী সন্ন্যাসীকে এই অন্নবস্ত্রের সমস্যা সমাধানে সর্বাঙ্গতঃ করণে আত্মনিয়োগ করিতে দেখিয়া আমরা উৎফুল্ল হইয়াছি।

প্রফুল্লচন্দ্রের কথা এখন আমরা কহিব না—রসায়ণগারের পরীক্ষামণ্ডপ ছাড়িয়া অন্নপ্রসার সমাধানকল্পে তাঁর প্রথম বক্তৃতা মাত্র আমরা গুনিলাম— এই প্রস্তাবনার গৌরচন্দ্রিকায় তাঁর কর্মনীতির কিছু আভাস পাই নাই— ভবিষ্যতে পাইব। এই আশায় প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম। তপস্বী গান্ধী ভারতের অগ্র প্রান্ত হইতে স্বদেশীষজ্ঞের পুনঃ প্রবর্তন করিতে চাহিতেছেন—বাংলা একদিন প্রথম আগরণের নবানুগাগভরে একাকী যে কার্যে কাঁপাইয়া পড়িয়াছিল—গান্ধী এবার তাহার ভারতবাসী আয়োজন করিবার জন্ত কটবন্ধন করিয়া লাগিয়াছেন। তাঁহার আরক্ত স্বদেশী-ব্রতের সফলতা দেখিবার জন্ত নিরন্তর বস্ত্রসঙ্কটে দুর্দশাপন্ন লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী উদগ্রীব রহিয়াছে। তাঁহার উদ্দীপনাময় প্রস্তাবনাগত্রে তাঁহার কল্পিত কর্মপ্রণালীর নির্দেশ পাইলাম। স্বদেশীসাধনে বস্ত্র-সঙ্কট দূর করিয়া দেশের অর্থ-সম্পদ দেশেই রাখিবার তিনটি উপায় আছে—একটি কলকারখানার প্রতিষ্ঠা—ইহা তাঁহার মনঃপূত নহে; উপরন্তু ব্যয়সাধ্য এবং দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ। দ্বিতীয়, বিদেশীর স্বত্রে স্বদেশীয় পরিশ্রমে বস্ত্রবয়ন—ইহা মন্দের ভাল—ইহারই জন্ত তাঁহার দ্বিতীয় স্বদেশী পণ। কিন্তু কোটা কোটা ভারতবাসীর বস্ত্রবয়নার্থ বিদেশীয় স্বত্রে এত প্রয়োজন দেখিলে বিদেশী ব্যবসায়ীগণ অচিরে তাহার মূল্য বৃদ্ধি করিয়া দিবেন, ফলে স্বদেশীয় শ্রমজাত যতটুকু লাভ ঘটিবে, তাহা এইভাবে অল্প মুখে সরই

বাহির হইয়া যাইবে। তাই ভাবিয়া চিন্তিয়া গান্ধী তৃতীয় উপায়টিকেই স্বদেশী সাধনার রাজপথ বলিয়া দেখাইয়া দিতেছেন—স্বদেশেই সূত্র উৎপাদন করিয়া স্বদেশীয় হস্তে তাহার বয়ন করাই তাহার সম্পূর্ণ অমুমোদিত পন্থা—এই পথে চলিলে সহস্র সহস্র শ্রমজীবীর স্বাধীন জীবিকার উপায় হইবে, শতসহস্র দরিদ্র বিধবার স্বগৃহে স্নানসংস্থান সম্ভব হইবে। উপরন্তু ইহাতে খুব প্রচুর মূলধনেরও প্রয়োজন নাই। চাই শুধু দুইটি জিনিষ—প্রথম একদল স্বেচ্ছাসেবক—গান্ধী বলিতেছেন, ইহারা উচ্চ শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান না হইলেও চলিবে, কারণ উচ্চশিক্ষা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা ইচ্ছা-সাপেক্ষ নহে, কিন্তু সততা ও অধ্যবসায়শীলতা সকলেরই ইচ্ছানিহিত ও এই গুণগুলিরই সর্বাধিক প্রয়োজন। এই স্বেচ্ছাসেবকগণ নিজেরা কিছু কিছু সময় ক্ষেপণ করিয়া সূত্রকর্তন ও বস্ত্রবয়ন করিতে পারেন অথবা এইরূপ করিবার জন্ত লোক সংগ্রহ করিতে পারেন। এইরূপ স্বেচ্ছাসেবক কিছু মিলিলেই অনতিকাল মধ্যে সহস্র সহস্র টাকার কাপড় প্রস্তুত করিয়া তুলিতে পারা যাইবে। কিন্তু সর্বোপরি প্রয়োজন হইতেছে শুদ্ধ স্বদেশপ্রেম—বিলাসিতাকে বলি না দিলে স্বদেশী-ব্রতের উদ্বাপন অসম্ভব—প্রথমেই তো মসলিনের মত সূক্ষ্ম সূত্র বস্ত্র নিষিদ্ধ হইয়া উঠিবে না—মোটী কাপড় বাহা যেমন উৎপন্ন হয় তাহাতেই পরিতুষ্ট না হইলে চলিবে কেন?

সংক্ষেপে আমরা গান্ধীর কর্মের কল্পনা বিবৃত করিলাম—প্রস্তাব ভাল কি মন্দ সে সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতে চাহি না—ফলেই কর্মের প্রকৃষ্ট পরিচয়। কিন্তু বাঙ্গালী এ বিষয়ে কিছু ভুলভোগী—বাংলার নিকট এ সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা লইবার আছে। চতুর্দশ বর্ষ পূর্বে বাঙ্গালী যে জীবনযাত্রা আরম্ভ করিয়াছিল তাহার চতুরঙ্গের মধ্যে স্বদেশী/একটা অঙ্গ ছিল। দীর্ঘ চতুর্দশ বর্ষের অভিজ্ঞতার আলোকে বাঙ্গালী আজ স্পষ্টরূপেই বলিতে পারে কেন তাহার সে স্বদেশসাধনা সফল হয় নাই। স্বেচ্ছাসেবক কর্মীরদল এবং দেশবাসীর স্বদেশপ্রেম—বাহ্যর উপর ভরসা করিয়া গান্ধী আজ স্বদেশীব্রতে হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন—এই উভয় বস্তু মণ্ডল করিয়াই বাঙ্গালীও কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিল—অভাব ঘটিয়াছিল ঠিক কোথায়—কোনখানে? প্রকৃতপক্ষে গান্ধী আজ সত্যগ্রহ মন্ত্রে যে নিজের প্রতিরোধকল্পনাও দেশকে দান করিয়াছেন, বাঙ্গালী তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিতে ক্রটি করে নাই।

এই সব পরীক্ষার ফলে আমরা বাঙ্গালী আজ কি বুঝিয়াছি, কি অজিত-
জ্ঞতাধনে ধনী হইয়াছি? বাংলার অকালবোধন সহসা ভাঙ্গিয়া গেল—
কেন কিসের জন্ত? একটা গভীর মূল্যবান কথা হইতেছে এই—স্বেচ্ছা-
ব্রত কর্মীর কথাই বল আর স্বদেশের নরনারীর স্বদেশ-ভক্তির কথাই
বল, সত্যগ্রহ, passive resistance এ সবই ভাল হইতে পারে, কিন্তু
সবের আগে হইতেছে মানুষ, মানুষই তো কর্ম করিবে, মানুষই তো আত্মত্যাগ-
পূর্বক স্বদেশভক্তির পরিচয় দিবে—কিন্তু আমাদের দেশে এই মানুষ কি
পূর্ণ প্রস্তুত অবস্থাতেই রহিয়াছে? গান্ধী স্বয়ং যেমন সর্বভাঙ্গী স্বদেশব্রত-
তপঃসাধক, তেমন সহকর্মী প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছেন কর্মজন—যাহারা
তাহার আদেশবাক্য নির্দোষভাবে সম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারেন? সত্যগ্রহ-
সাধনার ফলে পঞ্জাবে যে দুখটনা ঘটয়া গেল—তাহার কথা না হয়
ছাড়িয়াই দিলাম—কিন্তু মানুষ তো চাই যাহারা সত্যসত্যই মহৎ ব্রতে
দীক্ষিত হইয়া মহৎকর্ম সাধন করিবেন? শুধু প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়া
শুধু কর্মের লাভ লোকসান হিঁসাব বুঝিয়া, সহৃদয় অধ্যবসায়শীল কর্মযত্ন
কয়েকটি এই মুহূর্ত্তে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবে—ইহা এমন বেশী কথা
কিছুই নয়, এরূপ কর্মীর দল সুলভ সন্দেহ নাই—এবং তাহাদিগের
উচ্চশিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান না হইলেও চলিতে পারে—সময়ে সময়ে অজ্ঞতা-
ভরে বিষম অনর্থ সৃষ্টি করিয়া বসিবার সম্ভাবনা থাকিলেও বাধাহীন
পথ পাইলে ইহারা কর্মরথখানিকে কিছুদূর টানিয়া লইয়াও যাইতে পারে।
কিন্তু বৃহৎ জাতীয় যজ্ঞ সুসিদ্ধ করিবার জন্ত প্রগাঢ় সাধনা উচ্চপ্রতিভা
এবং কর্মগত সম্পর্কস্বত্বটুকু ছাড়া সাধককুলের মধ্যে এক গভীরতর স্বর্গীয়
প্রেমবন্ধন—এই সব তপোলভ্য দেবসম্পদ না অধিগত হইলে চলিবে কি?
বলিতে পার, কর্মপথে চলিতে চলিতেই কর্মী-চরিত্রে এই সব গুণের
বিকাশ ঘটিবে—ইহাই গতানুগতিক পথ, ইউরোপের নিকট হইতে এই
কর্মধারাই আমরা অস্থিমজ্জার অনুপ্রবিষ্ট করিয়া লইয়াছি—বাংলাদেশ
এই পন্থায় চলিয়া এই চতুর্দশ বর্ষ মর্মে মর্মে জর্জরিত হইয়াছে
বলিয়াই আজ নূতন পথ আবিষ্কার করিবার জন্য এমন একাগ্র তপোরত
হইয়াছে। অবশ্য ভারতের অন্যান্য প্রদেশ যদি বাংলার সেই অভিজ্ঞতা-
স্তরে উপনীত হইবার জন্য সেই সব পরীক্ষার পর পরীক্ষার ভিতর
দিয়াই অগ্রসর হইতে চায় তাহাতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না—
কিন্তু বাঙ্গালীকে আজ একনিষ্ঠভাবে অনন্যদৃষ্টি হইয়া তাহার আবিষ্কৃত
সাধনপথেই চলিতে হইবে—সেই পথই অমৃতত্বের পথ—সে নূতন পথে
তাহাকে আবার একবার একাকীই অগ্রদূতরূপে যাত্রা করিতে হইবে—
বাংলার সিদ্ধির উপর সমস্ত ভারতের জীবনসাধনা নির্ভর করিতেছে।

প্রবর্তক—৪র্থ বর্ষ, ১৬শা সংখ্যা

১৫ই ভাদ্র ১৩২৬

আত্মসমর্পণের দীক্ষা

পাঁচ হাজার বৎসরের আবর্জনাশূণ্য অপসারিত করিয়া বেদ ও উপনিষদের অমূল্য মণিরত্নরাজি সংগ্রহ করা যে কি দুঃসাধ্য ব্যাপার, তাহা সনাতনধর্মপ্রচার-প্রয়াসী সঙ্কল্পপরায়ণ তপোনিরত সাধকবৃন্দ মধ্যে মধ্যে উপলব্ধি করিতেছেন। সংগ্রাম ত কেবল নিজের সঙ্গে নহে, সংগ্রাম অতীত ও বর্তমানের সর্ববিধ প্রভাবের সঙ্গে, সংগ্রাম সমাজের সঙ্গে, প্রচলিত ধর্মনীতির সঙ্গে, সংগ্রাম প্রতি মুহূর্তের সঙ্গে—সংগ্রাম করিয়াই অতীত ও বর্তমানের কুক্ষি হইতে ভারতের সনাতন ধর্মকে উদ্ধার করিতে হইবে।

আত্মপ্রাণের যে স্বভাব, তাহাকে জয় করিয়া মনের বিস্তৃতি যদি সম্ভব হইত, তাহা হইলে এমন কঠোর বিরোধের প্রয়োজন হইত না, জাতির সমষ্টিপ্রাণশক্তি নূতনের বিরুদ্ধে, সুতরাং আধ্যাত্মিককে আর্থ্যের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম ঘোষণা করিয়া দিতে হইয়াছে।

সম্মুখেই যে বিপুল বিশ্ব, তাহা আর কিছুই নহে, জাতীয় প্রাণ-শক্তির রক্ষণশীলতা। প্রাণ চায় আত্মরক্ষা করিতে, নূতনকে জীর্ণ করিয়া প্রাণের বশীভূত করিতে পারিলে প্রাণ চরিতার্থ হয়, কিন্তু নূতনের শক্তি অসাধারণ হইলে প্রাণকেই পরাজিত হইতে হইবে, এই পরাজয় সংসিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ভারতের বিপুল কর্ম মূর্ত্ত হইয়া সমগ্র বিশ্বে বিস্তৃত হইয়া পড়িবে না।

প্রাণের ধর্মকেই ত ভারতবর্ষ শ্রেয়ঃ বলিয়া অবলম্বন করিবে না, মনও আজ যাহা ধারণ করিয়া আছে তাহাও শেষ নয়, বুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া তুরীয় সত্তা দিয়াই যেদিন সমস্ত তরিয়া উঠিবে, সেইদিনই গুহা-নিহিত ভারতের সত্যধর্ম প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

প্রাণকে, মনকে, বুদ্ধিকে তপঃগুরু করিয়া তোলাই—ঐগুলিকে জয়

করা। এই তপস্যাই জীবনের প্রথম কার্য। “তপসা চীয়েত ব্রহ্ম” তপঃ-দ্বারাই ব্রহ্মের সৃষ্টিরচনা।

এই তপস্যা এমন কিছু নয়, যাহা জীবনের মমতা রাখিয়া চলিবে, জীবনকে বাঁচাইয়া বাঁচাইয়া চলিলে তপস্যা কোণঠাসা হইয়া পড়িবে, সত্য তপস্যা জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে, শেলিহান বৈশ্বানরের মত আপাদমস্তক অগ্নিদগ্ধ করিয়া উহাকে পরিপুঙ্ক্ত করিয়া তুলিবে, জীবনের একটা মুহূর্ত্ত, একটা ক্ষণ, একটা পলকও যদি বিশ্বস্তির কুহক-আবরণে ঢাকিয়া রাখ, জানিবে, ঐ অতিক্ষুদ্র সময়টুকুর মধ্যে মৃত্যুশেল সংগোপিত রহিল, তোমার মরণ অনিবার্য, অমৃতভাণ্ড আহরণ করিতে পারিলেও তোমার যাটে আসিয়া ভরাডুবি হইবে।

আত্মসমর্পণ যোগ, কেবল সঙ্কল্প করিলেই উহা সিদ্ধ হয় না; ভগবান্কে আপনার মধ্যে নিত্যপ্রতিষ্ঠ উপলব্ধি করিতে হইবে। ইহার জন্ত কতকগুলি সংযম আচার নিত্যকর্মই যথেষ্ট নহে, এইগুলিই ত আমাদের সর্বনাশ করিয়াছে, পাশ্চাত্যের ধর্ম যেমন রবিবারে গির্জার উপাসনাতেই পর্যাবসিত, ভারতের ধর্মও তদ্রূপ সন্ধ্যাহিক, গায়ত্রীজপ, শাস্ত্রবিধি প্রতিপালনেই আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছে, হিন্দু বলিলে আমরা বুঝি আচারী ব্রাহ্মণকে, তা সে ব্রাহ্মণ বিচারালয়ে নিত্য মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া উপজীবিকা সংগ্রহ করুক, আর বিধবার সর্বস্ব আত্মস্বাং করুক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না, ঋগ্বেদীয় অথবা তান্ত্রিক সন্ধ্যাবন্ধনাদি যথারীতি করিলেই সাত খুন মাপ, সে ধার্মিক!

এ একটা মস্ত concession। ধর্ম লইয়া এমন বিড়ম্বনা সনাতন হিন্দুচরিত্রে সুফল প্রসব করিবে না, আমাদের হৃদিশাও তাই অসীম।

আমরা পূর্ণ যোগ চাই। প্রাণের জন্য কর্ম, অন্তরের জন্য ভক্তি, বুদ্ধির জন্য জ্ঞান। এই ত্রয়ীর সাধনাতেও অনুরূপ দেখাইলে চলিবে না। জীবনের সকল কর্মে, মনের সকল তরঙ্গে, বুদ্ধির সকল চিন্তায় ভগবান্কেই স্মরণ রাখিতে হইবে, যে মুহূর্ত্ত তুমি পরমেশ্বরকে বিশ্বস্ত হইবে, জানিও, সেই মুহূর্ত্তই তোমার সর্বনাশের কারণ, অতএব আত্মসমর্পণে ছেদহীন অবকাশহীন স্মৃতিকেই জাগ্রত করিয়া রাখা চাই।

ইহা কি সম্ভব? ভগবান্কে পাইতে হইলে, সম্ভব অসম্ভব দেখিয়া চলিবে না কি? জগতে আর এমন কি কঠোর সাধনা আছে, যে সাধনা

ভগবৎ-লাভ অপেক্ষা কঠোরতর।

মনুষ্যাণাং সহস্ৰেষু কশ্চিদ যততি সিদ্ধয়ে।

যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥

সহস্র সহস্র মনুষ্য মধ্যে কেহ আত্মজ্ঞানলাভে প্রয়াস করেন, প্রয়াসকারী-
গণের বহু সহস্রের মধ্যে কেহ আত্মজ্ঞান লাভ করেন, বহু সহস্র আত্ম-
জ্ঞানীগণের মধ্যে কেহ পরমাত্মস্বরূপ আমার বস্তুতঃ জানিতে পারেন।

আমরা ব্যাপকভাবে আত্মসমর্পণযোগ প্রচার করিতেছি, সুশ্রুতকোটি
বাংলার নরনারীর মধ্যে শতজন অবৈতজ্ঞানীর সন্ধান পাইবই, এ আশা
দুর্বাশা নহে। কিন্তু আপনার সহিত ভগবানের পরিচয় স্থাপন করিতে
হইলে, অধুনা প্রচলিত খণ্ডসাধনা উপযোগী হইবে না; যে সাধনায় যুগ-
পং মানুষ তুরীয় সত্তার সর্বাদ্ব ভরাইয়া তুলিতে পারে, সেই সাধনাই
আত্মসমর্পণযোগ। এই আত্মসমর্পণসাধনতত্ত্ব পাশ্চাত্যের নহে—ইহা ঋষিযুগের,
অপৌরুষেয় বেদ এই মহা অবৈত সাধনারই উদাত্ত বক্ষার।

জীবনের একটা মুহূর্ত ভগবান্ ছাড়া হইলে, আত্মসমর্পণ সাধনার
বিষয় হয়, বিশেষ নামে তাঁর স্মরণ করিলে, সাধারণ কথার সময়
তাহা হইতে দূরে মনে হয়, তাই সাধক রামপ্রসাদের অন্তর্ভুক্তি
সম্বল করিয়া লও, “যত শুন কর্ণপুটে সকলই মার মস্ত বটে,” আহা—শয়নে
ভগবানের সান্নিধ্য হইতে দূর বোধ হইলে মনে রাখিও—“আহার করি
মনে করি আছতি দিই শ্যামা মারে, শয়নে প্রণামজ্ঞান নিদ্রায়
করি মাকে ধ্যান,”—পুণ্যতোয়া ভাগীরথীতীরে আমাদের পূর্ব সাধকগণ
যে তপস্যা ভবিষ্য সন্তানগণের জন্ত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই আত্মসমর্পণ
সাধনা; ইহা নূতন নহে, ইহাই বর্তমান যুগধর্ম।

আত্মসমর্পণযোগ শিম্বোদরপরায়ণ ভোগীর জন্য নহে, আত্মসমর্পণ-
যোগীর যে ভোগ তাহা ভাগবত ভোগ, আত্মসমর্পণযোগীর চিন্তা ভগবানের,
প্রেম ভগবানের, কর্ম ভগবানের, নিত্যস্মরণে জীবনযন্ত যখন বিমল
ও নিষ্কলুষ হইয়া উঠে, তখন স্বভাবতঃই সত্য মানুষ প্রকাশ হইয়া পড়ে।
অবৈতজ্ঞানই ভারতের মূল শক্তি, মানুষ যে ভগবান্ হইতে আপনাকে
পৃথক করিয়া দেখে; ইহাই তাহার ভ্রম, যাহা সত্য সেই মন্ত্রে বিশ্বাস
স্থাপন করিয়া, সাধক স্বাসে প্রস্থানে যখন ব্রহ্মমন্ত্র জপিয়া যাইতে পারিলে,
তখনই আত্মসমর্পণযোগের চরম সিদ্ধি।

বাংলার নূতন সাধকগণকে আমরা হৃদয়ের সব জোর দিয়া আহ্বান করি—শ্রেয়ের পথে, সত্যের পথে; মানুষকে পরিচালিত করিবার দিব্য উপায় আমাদের সম্মুখে—রক্ষণশীল যুগের আচারবহুল ধর্ম কর্ম দূরে নিক্ষেপ করিয়া একবার প্রাণ-ভরিয়া বল “ভগবান, চেষ্টা করিয়া তোমার পাইব না, তোমার চরণে সকলই দিলাম, আজ হইতে তুমিই সাধকরূপে আমার জীবনযজ্ঞ উদ্বাপন কর।” তারপর শুন, কি মধুর আশ্বাস, কি অমৃতশীতল কণ্ঠের সান্ত্বনা—

“অহং স্বাম্ সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।”

সিদ্ধ-মন্ত্র

বাংলার বিকট শ্মশানক্ষেত্রে চারিদিকে মৃত্যুর মশাল জ্বলিয়া বসিয়া আছে—জরা-ব্যাধি-ভূভিক্ষাপীড়িত কোটি কোটি নরনারীর করুণ আর্তনাদ কর্ণ বধির করিয়া মর্মে বাজিতেছে—ঘন অন্ধকারে দিশেহারা নয়ন—আত্মলিপ্ত অগণন মানুষের দল আমরা—আজও পথ খুঁজিয়া পাইলাম না। ঘোর অমারজনীর উপকূলে দাঁড়াইয়া বীভৎস শ্মশানসাধনার শেষ অঙ্ক দেখিবার জন্ত আকুল হৃদয়—একটি একটি পলকে যুগযুগান্তর গণনা করিতেছি—ক্লান্তপদ অবসন্নতরু অসংখ্য যাত্রী নিরাশহৃদয়ে থেয়াবাটে সতৃষ্ণ নয়নে অনন্ত আকাশ পানে চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতেছি—ওগো, কে আছ কর্ণধার—এই জমাট অন্ধকারভরা বৈতরণীর কালো জল চেলিয়া পারে লইয়া যাইবে? নিরুপায়কে উপায় বলিয়া দাও—পথহারাকে পথ দেখাইয়া দাও—জ্ঞানাজ্ঞানশলাকায় সপ্তকোটি বাঙ্গালীর অন্ধনয়ন উন্মিলিত করিয়া দাও—ওগো করুণার অসীমজলধি, ওগো মহাশক্তির অনন্ত প্রসবণ, ওগো অমৃতত্বের অফুরন্ত উৎস—অজস্র প্লাবনে বাঙ্গালীর জীবনের সব অস্থল মলামাটি আজ ধুইয়া দাও—সত্যের প্রেমের শক্তির শুদ্ধ আধারস্বরূপ জগজ্জয়ী দেবজাতিরূপে বাঙ্গালী নবজীবন লাভ করুক।

*

*

*

এ নবজীবনের মন্ত্র কোথায় পাইব? শাস্ত্রের কত পত্র উন্টাইয়া, জীর্ণ

পুথির কত কীটদষ্ট অক্ষর উদ্ধার করিয়া সে বিদ্যামন্ত্র সংগ্রহ করিব ? আমার সোণার বাংলার জীবনে এই যে প্রবল ধর্ম্যাগ্রহের যজ্ঞকুণ্ড জলিয়া উঠিয়াছে কোথা হইতে তাহার সমিধ আহরণ করিব ? কোন্ মঠে মন্দিরে গির্জায় মসজিদে, কোন্ পুণ্যসলিলার পূত তীর্থোদকে, কোন্ পীরপয়গম্বর সাধুমহাত্মা ফকিরসেন্টের চরণমূলে আমার জীবন-রহস্যের সত্য সমাধান খুঁজিয়া পাইব ? স্বর্গরাজ্যের গুপ্তসন্ধান কে আজ আমায় বলিয়া দিবে ? কোন্ বরেণ্য স্বর্গদূত আজ গগনাসন হইতে ধীরচরণে নামিয়া আসিয়া আমার কর্ণমূলে গোপন রহস্যমন্ত্র ফুকারিয়া যাইবে—গভীর জলদম্ভ্রে মর্মে মর্মে মুক্তির বিজয়বাণী কে আজ বাঙ্গালী জাতিকে শুনাইতে পারিবে ? কোথায় খুঁজিব, কোথায় ফিরিব, কাহার জন্ত কোথায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরিব—না আর স্বর্গমন্ত্য আলোড়ন করিয়া কোথাও কাহারও ব্যর্থ তালাস করিতে চাহিব না—আমার সত্যগুরু আমারই অন্তরের মণিকোটায়—ওগো হৃদিস্থিত স্বীকেশ, আজ বাংলার হৃদয়ে হৃদয়ে প্রকট হইয়া সহস্রকমলে জ্যোতির্ময় সহস্র প্রদীপ জ্বলাইয়া তোল—আজ মন্দিরে মন্দিরে তোমার আবাহন করিব—সহস্র সহস্র হৃদয় পাতিয়া তোমার জন্ত সহস্র সহস্র স্বর্গ-সিংহাসন বিছাইয়া দিব—সহস্র সহস্র কর্ণে তোমার অমোঘ মন্ত্রাঘোষণা শ্রবণ করিব—শতসহস্র নয়ন মেলিয়া তোমার অশ্রান্ত বেদমন্ত্র অধ্যয়ন করিব—ওগো জাতির জীবনগুরু, আজ তোমার মহাশাস্ত্র তরুণ বাংলার অন্তরে বাহিরে বর্ণে বর্ণে ফুটিয়া উঠুক—প্রতিজনের কণ্ঠে অগ্নিময় মাতৃনাম বিরাজ করুক—“মা যে পঞ্চাশ বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম ধরে ।”

মহাগুরু এই অনন্তমন্ত্রে আজ এস বাঙ্গালী আমরা নবদীক্ষা গ্রহণ করি—এস এই দিবালোকের মত স্পষ্ট অশ্রান্ত নব পথ চিনিয়া লইয়া এই সহজ সাধনে প্রবৃত্ত হই—তবু প্রাণ মন সবটুকু নিঃশেষে ঢালিয়া দিই—এই কূলে কূলে উচ্ছ্বসিত ভরাবোবনের উদাত্ত উৎসাহ সবটুকু একত্র করিয়া একখানি অখণ্ড রক্তকমলের মত অনন্ত ঠাকুরের চরণমূলে নিবেদন করি । কেন এক কণিকা অন্ধকার জীবনের কোন কোণেও লুকাইয়া থাকিতে দিব—কেন একবিন্দু জীবনরস অহংপূজায় অগচয় করিব—কেন ব্যর্থ আড়ম্বরের একটু কোলাহলে দেবমন্দিরের শান্তিভঙ্গ করিব ? স্থির-সলিল অমৃতগঙ্গা কেন একটুকু কলুষিত বাসনার ভাঙনাম এখনও আবিণ করিয়া তুলিব ?

না—আজ আর হৃদয়ের উত্তেজনা নয়, প্রাণের ভোগতৃষ্ণার উত্তাল উৎফেপ নয়, রক্তকণিকার বিন্দুপরিমাণ উন্মত্ত অন্ধ নৃত্য নয়—আজ শুধু অগাধ শ্রদ্ধার প্রশান্ত ধৈর্য্য, অনন্ত ধৈর্য্যের অকুণ্ঠ সাহস—আজ শুধু অটল হৃদয়ের অটুট সঙ্কল্প, অনাবিল প্রেমের আকুল উৎসর্গ, দিবা প্রতিভার অনির্ব্বাণ জ্যোতিঃ—আত্মার আত্মহারা পূর্ণ আত্মনিবেদন—এই আমাদের তপস্যার একমাত্র মণ্ডল, এই আমাদের পূজার একমাত্র বিধি, এই আমাদের সাধনার একমাত্র ব্রত। সপ্তকোটি বাঙ্গালী! এস অনন্ত-হৃদয় অনন্ত-সঙ্কল্প অনন্ত-কর্ম্ম হইয়া সর্ব্বাগ্রে এই মহাব্রত বিধিপূর্ব্বক উদ্‌যাপন করি।

*

*

*

জপ তপ আসন প্রাণায়াম কুস্তক চিত্তশুদ্ধি ধ্যান ধারণার কি প্রয়োজন—সাধন ভজনের তুমুল আয়োজনে শুধু অহঙ্কারের মাত্রাবৃদ্ধি করিয়া কি হইবে—ব্যর্থ ভারসূপ বহিয়া বহিয়া শুধু অনর্থক জীবনক্ষয় করিতে প্রবৃত্ত হইবে কেন? ভাই বাঙ্গালী, আজ বিশ্বাস করিয়া লও—তোমার কোনও উগ্রসাধনা, কোনও উৎকট তপস্যার আচরণ করিতে হইবে না—ভগবান্কে জানিবার জন্ত পাইবার জন্ত কোনও ব্রত পূজা ক্রিয়া অহুষ্ঠান করিবার প্রয়োজন নাই—এই যে আমাদের ঘটে ঘটে শ্রীভগবান্ অধিষ্ঠিত, এই যে সহস্রনেত্র, সহস্রমুখ, সহস্রকর্ণ, সহস্রবাহু অনন্তদেব আমাদের অগ্রে পশ্চাতে বামে দক্ষিণে—লক্ষ হৃদয়ে এই যে তাঁহার প্রেম-যমুনা বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, এই যে লক্ষ আননে তাঁহার অমৃতহাস্য ফুটিয়া উঠিবার জন্ত উন্মুখ—স্বপ্ন নয়, কল্পনা নয়, দিবা নেত্রে এই যে আজ প্রত্যক্ষ করিতেছি—বাংলা জুড়িয়া তাঁহার রাজসিংহাসন পাতিবার আয়োজন চলিয়াছে—জনে জনে তাঁহারই মহিমাগান করিতে করিতে অলস স্বপ্ন-শয্যা ছাড়িয়া জাগিয়া উঠিতেছে—বাংলার কালরঞ্জনী প্রভাতপ্রায়—ওই দ্বারে দ্বারে মঙ্গলঘট প্রতিষ্ঠিত হইতেছে; ওই মন্দিরে মন্দিরে বিজয়-শঙ্খ বাজিয়া উঠিতেছে—নবোখিত দেবজাতি আজ সহস্র দীপ আলিয়া প্রভাতারতিপূর্ব্বক কি মহনীয় বিরাট পূজায় উদ্‌যাত!

*

*

*

প্রজ্ঞামৌন ধ্যাননেত্রে আমার এ সত্যস্বপ্ন তোমরাও দর্শন কর—
বল ভগবান্ দূরে নহেন—বল অহং ব্রহ্ম অহং ব্রহ্ম—তুমি আমি সে—

সকলে সেই অভিন্ন ভগবান্—সেই এক অদ্বিতীয় অখণ্ডনীয় ব্রহ্মস্বরূপ।
এই শৈলকিরীটিনী কাননকুন্তলা জলধিধৌতচরণা মহিমাময়ী মায়ের বিপুল
গন্ধিরে—অতুলস্বধামায় এই অপূৰ্ণ মাতৃকণ্ঠে, লক্ষ সন্তান সেই আত্মভগবান্
সেই Self-God, সেই নরনারায়ণের মহাপ্রেরণা অর্থে মর্মে অনুভব
কর—মুক্তি নয়, ভুক্তি নয়, লয় নয়, মোক্ষ নয়—বল ঔকালী, ঔকালী—
শক্তিরাগীর শক্তিপ্রেরণায় তোমার সমস্ত স্রষ্ট ব্রহ্মবীর্ষ্য উবুদ্ধ হইয়া উঠুক—
তোমার সকল যন্ত্র, সকল তন্ত্রী, সকল স্তর ভরিয়া উঠুক নব ভাবে নব বিজ্ঞা-
ধারার কলোচ্ছ্বাসে—নূতন বুদ্ধি, নূতন মন, নূতন হৃদয়, নূতন প্রাণ—থরে
থরে নূতন মালা গাঁথিয়া মাতৃকণ্ঠে দোলাইয়া দাও—তোমার রক্তশ্রোতে
উজান বহুক, তোমার ইজিয়কুল পর্যন্ত নূতন আলোকে নূতন ভঙ্গিমায়
দর্শন স্পর্শন আশ্বাদন করুক।

তারপর! তারপর, অর্গল ভাঙ্গিয়া অনন্ত অভিসার—এই দেব-আশীর্বাদ, এই
অমৃতপ্রবাহ, এই করুণার নর্গদা-প্রপাত—এই গিরি উপকূলের সীমার অভ্যন্তরে
ক্ষুদ্র-আশ্রভাণ্ডারে লুকাইয়া রাখিলে চলিবে না—এই অগ্রগীতরূপ দেবজাতিকে
বাহির হইতে হইবে বিশ্বের মুক্ত উদার রাজপথে—মাথায় করিয়া তাহার
অতুল দিব্য সন্তান—ভারে ভারে প্রেমের অবদান জগতের দ্বারে বহিয়া
লাইয়া যাইতে হইবে—বিশ্বের বিভিন্ন জাতিকে তাহার আশ্বাদদান করিতে
হইবে—বাস্তবালীর নবসাধনা তাহার আপনার জন্ত নহে—বাস্তবালীর তপস্যা
ভারতের জন্ত—ভারতবর্ষের সাধনা বিপুল মানবপরিবারের জন্ত—উৎসর্গ-
মন্ত্রে যে যজ্ঞের আরম্ভ, উৎসর্গেই তার চরম বিকাশ—ভূরনয়ন যে ভগ-
বান্ ভুবন ভরিয়াই তাহার উদ্বোধন করিতে হইবে—আমাদের ব্রত, যোগ,
তপস্যা, সাধনা—সমস্ত তাহারই চরণে শেষ অঞ্জলিদান করিয়া, প্রগতি-
পূর্বক অনন্তকোটি কণ্ঠে একসাথে ধীরোদাত্ত মন্ত্রসঙ্গীত তুলিব—ও
নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

সহজ সাধন

ভগবান্ একমেবাদ্বিতীয়ম্—কিন্তু তিনি আপনাকে বহুবিচিত্র বিকাশে ছড়াইয়া দিয়াছেন। বিভিন্ন প্রকাশে যে তিনি খণ্ডীকৃত একরূপ নহে, বংশী-ধ্বনির মূৰ্ছনার মত নানা ভঙ্গিমায় লীলারত। এই অনন্ত লীলার প্রভাবে তিনি বশীভূত নহেন, ইহা তাঁহার ইচ্ছা; ইচ্ছা হইলেই একটি সুরে, একটি রেখায়, একটি অগ্নিশিখায় তিনি আপনাকে সংস্থত করিতে পারেন, ইচ্ছা করিলে স্থাবরজঙ্গম অনন্তসৃষ্টি একটি হিরণ্ময় অণ্ডে সংস্থাপিত করিতে পারেন, অথবা অনন্ত জ্যোতির্ময়ে, কিম্বা অসীম বিকট অন্ধকারে, আপনার বিরাট রূপকে সংহরণ করিতে পারেন, আবার সে কিছুই নয়, চৈতন্যের পরপারে, কল্পনাভীত শব্দহীন, অরূপের মধ্যে আত্মগোপন করিতেও পারেন। ইচ্ছাময় তিনি, তাঁর অমোঘ ইচ্ছার প্রকাশস্বরূপ এই যে শব্দস্পর্শরূপরসময়ী পৃথিবী, তাঁরই সত্য সত্যময়ী, ইহাকে কোন্ মূৰ্খ মায়া বলিয়া উপেক্ষা করিবে?

মায়া—ইহা ভাগবত রসায়ণ, এক অবৈত নিগুণ অবাঙ মনসোগোচর বহু, ভিন্ন, গুণাদিভূষিত ও বাক্য-মনের গোচর হইয়াছেন। সবধানিকে, অনন্ত-ভিন্ন-সৃষ্টি-রাজিকে, অপ্রসর হৃদয়রাজ্যে ধারণ করিতে না পারিলেও, যতখানি আঁকড়িয়া ধরি, তাহা তাঁরই রূপ, তাহা তিনি; অনন্তকে সান্ত্বনের মধ্যে কি ধরা যায়? অনন্ত অনন্তের মধ্যেই লীলারত।

কিন্তু শরীর মন বুদ্ধি অনন্ত ব্রহ্মের স্বরূপনির্ধারণে অসমর্থ হইলেও, মানবের চৈতন্য অনন্ত-বিস্তৃত, বিশ্বকে আপনার ভিতর-ও সারা-বিশ্বে আপনাকে অনুভব ও প্রত্যক্ষ করা অসম্ভব কিছু নয়। চৈতন্য দিয়াই সৃষ্টির রচনা, বুদ্ধির গাণ্ডী অতিক্রম করিলে অনুভব করিব সেই আত্মচৈতন্যে বিশ্বলীলার যে ভূমানন্দ, তাহা আধারে আধারে অনুভূত ও নিত্য আনন্দিত হইতেছে।

সৃষ্টির যে আনন্দ, তাহার ভোক্তা স্বয়ং ভগবান্। মায়া ভাগবত ইচ্ছা-কেই রূপ দিয়াছে, অতএব মায়া অপরিত্যজ্য। সেই মায়াই পরিত্যাগ করিতে হইবে, যাহা চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করিয়া, বুদ্ধিকেই বড় করিয়া

তোলে, বাহা ভেদকে সত্য, অহংকে প্রেষ্ঠ আসন দৈয়।

আমরা স্বভাবতঃ এই মায়াতেই আচ্ছন্ন। এই কুহক হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে হইবে, আমরা যে মিথ্যা, জগৎ যে অলীক এই জ্ঞান পয়া জ্ঞান নয়, আমরাও সত্য, জগৎও সত্য এই জ্ঞানকে খাড়া করিয়া তুলিতে হইবে, নব্যযুগের ইহাই সাধনা।

মুক্তি চাহিতেছে কে? কাহার আদেশ জীবনের স্তরে স্তরে প্রতিধ্বনিত? এই যে বাহিরের দিক হইতে আপনাকে ভুলিয়া, শোকে দুঃখে নানা বন্দনয় অবস্থায় জীব পরিজাহি চীৎকার করিতেছে, এ কাহার ইচ্ছায়? সম্মুখের ঐ পিপীলিকাটি আহার অব্যবধে ক্রত ধাবিত, উহা কাহার প্রেরণায়, পিপীলিকা তাহা নিশ্চয় জানে না, পিপীলিকার জানার প্রয়োজন যতটুকু, ততটুকু প্রজ্ঞা উহাতে প্রতিষ্ঠিত, তার উপর আরত রহিয়াছে এক অচ্ছেদ্য অচ্ছিন্ন কঠিন আবরণ, উহা ভেদ করা পিপীলিকার সাধ্য নাই, কিন্তু এই আবরণের উপর দাঁড়াইয়া পরাংপর পুরুষ পিপীলিকাজীবনের যে আনন্দ তাহা উপভোগ করিতেছেন। মানুষের প্রজ্ঞা সীমাবদ্ধ করিয়া, শ্রীভগবান যখন খণ্ডতা ও অন্ধতার আশ্বাদ উপভোগ করেন, তখন বসিতে হইবে, মানবমূর্তি সৌষ্টব্যবান ও সৃষ্টি হইলেও, কীট ও পতঙ্গজীবনের সহিত তাহার বড় প্রভেদ নাই। গুণাধিকো জীবনবৃত্তি অধিকতর ক্ষুট ও পরিদৃশ্যমান মাত্র।

তারপর উপর হইতে কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া, পুরুষের জ্ঞান-গর্জনে যখন জীবপ্রকৃতির কর্ণগোচর হয়, তখন আসে তার একটা ব্যাকুলতা, উপরের আকাশ ভেদ করিয়া স্বপ্নরাজ্যে উপনীত হইবার বলবতী ইচ্ছা, জাগ্রত হইয়া উঠে। স্মরণ তুরীয়ে উপনীত হইবার আদেশ না আসা পর্য্যন্ত মানবপ্রকৃতি সবথানি চেতনার আশ্বাদে উদ্ধুদ্ধ হইয়া উঠে না, কিন্তু মানুষ সর্বানন্দ লাভ না করিলেও, পরমাত্মার আনন্দে বিগ্ন হয় না, তাঁর সর্বব্যাপী চৈতন্য সকল অবস্থাই আনন্দের জন্ত সৃষ্টি করেন, মানুষ যখন বর্বর অসভ্য কাণ্ডজ্ঞানহীন তখনও বিশ্বপতির আনন্দ, আবার মানুষ জ্ঞানে বিজ্ঞানে আচার ব্যবহারে সুসঙ্গতিপূর্ণ হইয়া উঠিলেও তাঁর সমান আনন্দ, একবার নীচের আনন্দ, একবার উপরের আনন্দ, একবার এ পারের ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশের খম্বধমে অন্ধকার, একবার ওপারের কোটি চন্দের নির্মল জ্যোৎস্না, একবার অজ্ঞানের খেলা আরবার

জ্ঞানের খেলা, ওতপ্রোত এই লীলাই চলিয়া আসিতেছে।

ভগবানের আদেশ না আসিলে, জীবের উর্দ্ধগতি আরম্ভ হয় না, ইহাকেই আত্মার জাগরণ বলে। আজ বাঙালীর আত্মা জাগিয়া উঠিয়াছে, উপর হইতে কাহার আহ্বান শুনা যাইতেছে, অতএব বাঙালীকে উর্দ্ধগতি লাভ করিতে হইবে, শঠতা কপটতা পরশ্রীকাতরতা দুর্বলতা প্রভৃতি নীচের কদর্য ভোগ হইতে উদ্ধৃত হইয়া তাহাকে উপর হইতে বর্ষিত জ্ঞান প্রেম ও আনন্দে পরিপ্লুত হইতে হইবে, তাই বাংলার যৌবনশ্রী যেন দিন দিন ক্ষুদ্রতর হইয়া উঠিতেছে।

আমরা জাগিয়াছি, পথের ঘে কোলাহল তর্কবিতর্ক গণ্ডগোল, এসব নবজীবনের পরিচয়; যতই আমরা অগ্রসর হইব, ততই বিশ্বয়ে আনন্দে আমাদের বাকরোধ হইয়া আসিবে, শক্তি আমাদের সর্বশরীরে হিল্লোলিত হইয়া উঠিবে।

সাধক ত আমরা নহি, মন্ত্র ত মানুষের দেওয়া নহে, ভগবান সর্ব-
শ্রুতে, সর্বক্ষেত্রে, বাণী যেখান হইতেই আসুক না, তাহা পরাংপর
পুরুষের নিকট হইতেই আসিয়াছে; আমাদের জাগরণ ভগবানের আদেশেই,
এ বিশ্বাস যত দৃঢ় হইবে, গতির বেগ ততই বৃদ্ধি পাইবে।

তারপর ভগবানের পথানুসরণ করিতেছে কে? সেও ত ভাগবত
প্রকৃতি। আমি কে? কিছুই নহি-তা! যতক্ষণ আদেশ পৌছায় নাই,
ততক্ষণ ভূতের নৃত্য, অন্ধকারে যেমন ভয় রাজত্ব করে, আলো জ্বলিলে
তাহা পলাইয়া যায়, ইহাও তজ্জপ। ভগবান কতকটা চেতনা নীচে রাখিয়া
স্বাকীর্ষ্য চাপা দিয়া রাখিয়াছিলেন, চেতনা ত মধ্যবন্ধনে ছিন্ন হয় না
সুতরাং ভগবান সবই ভোগ করিতেছিলেন, সে একরকমের আনন্দ, আর
নীচেকার অন্ধ প্রকৃতি, উপরের আবরণে জীবন অসীম হইতে
ভিন্ন বোধ করিয়া এক নকল রাজার সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছিলেন, এই
রাজাই আমি, এ ছায়ার রাজা আলো পড়িলেই মিলাইয়া যায়, আমি ত
মিলাইয়া গিয়াছি, কিন্তু দেহরাজ্যের প্রতি যত্নে নকল রাজার ছাপ
পড়িয়া যে সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে, তাহা ত সহসা দূর হইয়া যায় না,
কাঁধে আজ উন্নত দেবজীবনের আগমনস্থানা মহাবিপ্লব বলিয়াই
অনুভূত হইতেছে। আজ অহঙ্কার জীবনের রন্ধে রন্ধে বহু হইয়া তুমুল
বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছে; কিন্তু অমুমন্তা স্বয়ং ভগবান, প্রকৃতি কর্ম-

সাঁদিকা, এই চেতনাটুকুই আমাদের মুক্তি সন্নিকট করিয়া দিবে।

সাধনার গরিমা, মুক্তির চেষ্টা প্রভৃতি যখন আধারকে ভোলপাড় করিয়া দেয়, তখন জানিবে, মানুষ অসময়ে জাগিয়াছে, ভগবানের মন্ত্র এমনও আসিয়া পৌছায় নাই, তখন মানুষকে উপায়ের আন্ধান ভেদ করিবার জন্য অনেক কৌশল অবলম্বন করিতে হয়, অনেক কিছু করিতে হয়, তখন ঐবৈজ্ঞানিক জীবনই ক্ষতিলাভ করে, মানুষের অভিজ্ঞতা তখন তাহাকে পণ্ডিত করিয়া তোলে, পরজ্ঞ ভাগবত ইচ্ছা না হওয়ার, ভূমানন্দে জীবন ভরিয়া যায় না। আজ ষাঁহাদের জীবনে উপর হইতে আদেশ আসিয়া পৌছিয়াছে, তাঁহারা ই আপনাদের তিতর মহাশয়কে দর্শনলাভ করিয়া, প্রকৃতির হস্তেই সকল সাধনা ছাড়িয়া দিবেন—ইহারা ই আত্মসমর্পণ-যোগী।

সাধকের ডায়েরী

(২)

প্রাণাশ্বাসের মতো দিন দিন বাড়তে লাগলো, সংসারের কোন কাজেই আর মন দিতে পারি না, থেকে থেকে বুক হলে উঠে, দমকে দমকে নিঃশ্বাস ভারি হয়ে কেমন একটা অজানা আনন্দ হয়, দৃষ্টি স্থির ও উদাসীন, সাধারণ লোকের সঙ্গে আমার অনেকখানি পার্থক্য বৃদ্ধি লাগলুম, ঠিক এই সময় আবার এক নতুন রিভ্রাট সব মাটি করে দিলো। একদিন অতি প্রত্যুষে শৌচাদি শেষে সাধনঘরটিতে প্রবেশ করতে বাব কি, গৃহিণী একেবারে কাপড়ের খুঁট ধরে দৃঢ় স্বরে বললেন, “খুব সাধন ভজন করছ, আমরা খাই কি?” আমি ত আকাশ থেকে পড়লুম, গভীরভাবে উত্তর দিলুম কেন; কারবার থেকে টাকা আসছে না?” তারপর একটানা কক্ষগুরে এই কথাগুলি কানে এসে পৌছিল, “মাস দুই তিন টাকাকড়ি পাওয়া যায় নি, ব্যবসার অবস্থা ভাল নয়, দেখাছিনি হয়েছে, কারবার হয়ত তুলে দিতে হবে।”

তখন একেবারে চক্ষুস্থির। এমন বাধা কারবার, এরকম জরুরি কারণ কি? যাই হোক তখনকার মত কোন গতিকে গৃহিণীর হাতে

ছাড়িয়ে আসন করে' বসলুম, কিন্তু সে দিন আর চিত্ত স্থির হ'ল না, থেকে থেকে কেবলই ঐ কথা, কারবারটা নষ্ট করলে দেখছি, লোকটা নিশ্চয় কিছু হাতিয়েছে প্রভৃতি।

মধ্যাহ্নে যে আত্মীয়টির উপর কারবারের ভারার্পণ করে' নিশ্চিত হয়েছিলুম, তারে ডেকে পাঠালুম, তার চেহারা দেখেই বুঝলুম, বেশ ছ'পয়সা করেছে, তারপর আমার মাথা আর মুণ্ড, ব্যবসার যে হিসেব শুনলুম, তাতে এই আখেরী চৈত্র মাসেই বা পান্তারি শুটোতে হয়। একদিকে সাধনার আকর্ষণ, আর একদিকে সাংসারিক কর্তব্য, কি মহাপাপ করেছিলুম, সংসারী লোকের পক্ষে ধর্মসাধনা কোন মতেই সম্ভব নয়, আবার কারবারে মনোযোগ দিতে হ'ল, প্রাণায়ামের মাত্রা কমে' আসতে লাগলো, সাধন ভজনের তীব্র সংস্কার সর্বদা হা হা করে' টিটকারী দিতে লাগলো, জীবন যে একেবারেই অধঃপথে গেল, একথা আমি নিজেই বুঝতে পারলুম। তখন আর কি করবো, আবার সেই পুরাতন মন্ত্রটাই এই অবস্থায় একমাত্র সাহায্য হ'য়ে দাঁড়াল, আকাশপানে চেয়ে, খুব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে মাঝে মাঝে বলতে লাগলুম--স্বরা স্বরীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি"।

যার কোন সম্বল নেই, কোন উপায় নেই, যে অকৃতী। অধম, ভগবানের বলই তার পরম বল। যাদের তোমরা সংসারী বলে' উপেক্ষা কর, অথচ যাদের উপর ভর দিয়ে জগতের বৃহৎ ও মহৎ সৃষ্টিগুলি দাঁড়িয়ে আছে, তাদের নিরালয়ে তপস্যা করা চলে না, সংসার ছেড়ে বৈরাগী হওয়া সম্ভব হ'য়ে উঠে না, কাজেই শ্রীভগবানের চরণাশ্রয় ভিন্ন তাদের আর দ্বিতীয় উপায় কি হ'তে পারে? যারা ভারতের তেত্রিশ কোটি লোকের মধ্যে বত্রিশকোটি নিরানব্বই লক্ষ, তাদের যদি ধর্মসাধনের কোনই উপায় না থাকে, তা হ'লে এ সৃষ্টির ধ্বংস হওয়াই ভাল, এবং পৃথিবীর সব ভারটুকু এদের মাথায় না চাপিয়ে যারা সংসারকে কঁাকি দিতে পেরেছে তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

কিন্তু ভগবানের করুণা হ'তে জগতের একটি কুমি পর্যন্ত বঞ্চিত নয়, সবাই তাঁর সমান করুণায় প্রতিদিনই উন্নতির পথে অধিরোহণ করছে, আমিও সংসারের সকল কাজের মধ্যে তাঁর অপার্থিব করুণার আশ্বাদ পেতে লাগলুম, একে একে চেষ্টা করে' উন্নত হবার সব ক্রিয়াগুলি ছেড়ে

যেতে লাগলো, যত জোরে যত অধিক বিশ্বাসে মনে হ'তে লাগলো—
হে প্রভু! তুমি কখনও তোমার পথ হ'তে আমায় বিমূখ করবে
না, আমি একান্ত শরণাগত, তোমার প্রীতির জন্তই আমার এই
সংসারযাত্রা। এই কথা বলা ছাড়া আমার আর উপায় ছিল কি?
কিন্তু দয়াময় ভগবান আমার এই মস্তেই পরিতুষ্ট হ'তে লাগলেন, যতই
আমি আমার কথা ভুলে তাঁর খেলা জীবনের মধ্যে অনুভব করতে লাগ-
লুম, ততই ভীলমন্দের আঘাত আমার আগেকার মত তেমন জোরে আর
বিদ্ধ করলো না, যেন আমাপেক্ষা অধিক শক্তিমান কোনও পুরুষ
আমার নিত্য দোসর হ'লেন, যেন আমার মধ্যে থেকেই কে আমার চালিয়ে
যেতে লাগলেন।

যখন হিসাবপত্র নিয়ে মাথা ঘামাতুম, যেমনি একটু ক্লান্তি আসতো
অথচ কর্ম অপরিহার্য তখন মনে হ'ত “মচ্ছিত্তঃসর্বভূগাণি যৎ-
প্রসাদাৎ তরিষ্যসি,” চিত্ত অমনি কোন অপৌরুষেয় শক্তির সঙ্গে সংলগ্ন
হয়ে গিয়ে হুদয়ে অধিক শক্তি অনুভব করতুম, যথা নিযুক্তোহস্মি, কর্মে তখন
খুবই আনন্দ হ'তো, কারবারের হিসাব আর নারায়ণের মাথার মচন্দন
তুলসীপত্র দেওয়া এত্বয়ের প্রভেদ বড় দেখতুম না।

তোমরা একটু হাসবে, তা হাস। আমার তিনি যে কর্মে নাচা-
তেন আমি তাতেই নাচতে আরম্ভ করে দিলুম, এই রকম মানসিক
অবস্থার ফলে, এই দাঁড়াল, যে ক্রমে স্পষ্ট অনুভব হ'তে লাগলো, আমি
ছইটা, একটা মুক্ত একটা বদ্ধ, একটা সর্ব ঘটনার সর্ব কর্মে সদানন্দ-
ময়, আর একটা ঘটনাবিশেষে কর্মবিশেষে সুখী ও দুঃখী। অথচ
সকল রকম কর্মই করে যেতে হয়, কাজেই যে আমিটা স্বন্দ্র বোধ
কর'তো, সেটা ধীরে ধীরে সরে গিয়ে একপাশে দাঁড়াল, এবং আর
একটা আমি, আমার সব কাজগুলো করে যেতে লাগলো।

এই সময় আমার কারবারের অবস্থা খুব ভাল হয়ে উঠলো, একটা
বন্ধু আমার সহকারী ছিলেন, তিনি ধীরে ধীরে আমার কাজের অনেক
ভার গ্রহণ করতে লাগলেন, আমার বাইরের কাজ অপেক্ষা ভিত-
রের কাজ তখন খুব বেড়ে গেছে, যে আমিটা আমার মধ্যে অব-
স্থান করে ভূতের মত কেবল খেটে যাচ্ছিলেন, তার অদ্ভুত কর্মশক্তি
দেখে, আমার পুরাতন আমিটা প্রথম প্রথম একটু মজা অনুভব করে-

ছিল, কিন্তু তার আবার পুরাতন অধিকার ফিরে পেতে সাধ গেল, সে এক তুমুল সংগ্রাম।

ঠিক এই সময়েই আমার ব্যবসায়ের অধিকাংশ কার্যভারই আমার বন্ধুটি নিজের স্বক্কে তুলে নিলেন, কর্মক্ষেত্রে উদাসীনের মত বসে বসে, ভিতরের এই গজকচ্ছপের লড়াই দেখতুম আর কখনও হাসতুম আবার কখনও বিষয়বিশ্কারিত নেত্রে অধ্যাত্মজগতের বিচিত্র রহস্য দেখে স্তম্ভিত হ'য়ে যেতুম।

এই সময়, আমার মনে হ'তো, আমি তখন তিন টুকরা হয়ে গেছি, এক টুকরা মৃত, যে পুরাতনকে ঠেলে রেখে, আমার সকল কর্ম নিজের হাতেই গ্রহণ করেছে, আর পুরাতন টুকরা দাঁড়িয়ে থেকে থেকে স্বাধিকারের জন্য তুমুল সংগ্রাম বাধিয়ে দিয়েছে, আর আমি সে এক অপূর্ণ চেতনা, এই রহস্যময় খেলার সাক্ষী ও ভোক্তা অথচ নির্লিপ্ত, নিশ্চেষ্ট, সর্বপ্রকার বাসনাবিরহিত।

ঠিক আপনার মধ্যে এই রকম অনুভূতি যখন জাগ্রত হয়ে থাকতো, তখন খুব আনন্দ হ'তো, এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এমন বিরাট অভিনয় দেখতে পেলে কার না মজা লাগে, কখন কখন স্বপ্ন ভেঙ্গে যেতো, আশ্চর্য্য হয়ে ভাবতুম, সত্য কি স্বপ্ন দেখি, ভেবে মস্তিষ্ক বিকৃত হ'ল না, কি?

কিন্তু ক্রমশঃই অবস্থা স্পষ্ট হয়ে উঠলো, সফল বুঝি সিদ্ধ হ'লো। হৃষীকেশের ইচ্ছার কোন এক সুরমহতী শক্তি আমার জীবনক্ষেত্রে আবির্ভূতা, তিনি অবিচ্ছিন্ন ধারায় দেহযন্ত্রের অভূতপূর্ব পরিবর্তনে তৎপর, অন্তরের দিকে অবিরত দৃষ্টি রাখায়, যে সংগ্রাম অভিনয় দেখতে লাগলুম, যে সকল অতাবনীয় ঘটনা অন্তরে অন্তরে সমুদ্ভূত হয়ে অন্তরে মিলিয়ে যেতে লাগলো, সেগুলি মানুষের জীবনে সম্ভব কি না তা ভাবতেও পারি না, জীবনের মধ্যে এই দেবাসুরসংগ্রামের ভীষণ কাহিনী শোনার যদি আপনারদের দৈর্ঘ্য থাকে, তবে শুনুন।

আমি যে হৃষীকেশকে আমার হৃদয়রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করবার সাধনা করেছিলুম, সে সফল সিদ্ধ হওয়া প্রাণায়ামের কার্য নয়, আমার মনে হয়, কোনও সাধন ভঙ্গনের সাহায্যেই কারু ভাগ্যে তা কোন দিনই সফল হবে না, স্বয়ং হৃষীকেশের ইচ্ছা না হ'লে ইহা এক প্রকার অসম্ভব।

মানুষের বর্তমান যে জীবন, তা বাহিরের অনুশাসনে অনেক সংযত ও দেখতে মানুষের মতই, কিন্তু ভিতর এখনও পশুত্ববর্জিত নয়, ভিতরের স্বাধীনতা ঘোরণা কর, দেখবে, অন্তর কি উৎকট গরলে পরিপূর্ণ, তার একবিন্দু গরল যদি মানুষের গড়া ধর্ম নীতি সমাজ প্রভৃতির দৃঢ় বাধ অতিক্রম করে গড়িয়ে পড়ে, তখন পশুতে আর মানুষে কেবল রূপের পার্থক্য ছাড়া আচার ব্যবহারে দুয়ের মূলা তুল্য রোধ হবে।

বেদেরা সাপের বিষদন্ত উৎপাটন করে যেমন লোকালয়ে তামাসা দেখিয়ে বেড়ায়, মানুষের ক্রুর স্বভাব সমাজপুরুষের শাসনদণ্ডে শাসিত, হিংস্র পশুকে পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থায় পেয়ে লোকেরা যেমন দর্শনস্থ অমৃতভব করে, আমরাও আমাদের পশুত্বকে বেড়ার বাঁধনে বেঁধে রেখে বন্ধুত্বের প্রীতি, সহোদর সহোদরার অমুরাগ, জনক জননীর মেহ প্রভৃতি উপভোগ করছি।

মানুষ একেবারেই পশু। মানুষকে বিশ্বাস কর না, মানুষ সিদ্ধ না হ'লে, মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব কখনও স্থখ পাবে না, মানুষের দল বেঁধে পৃথিবীর কোন কার্যই সুসিদ্ধ হবে না, যদি মানুষকে মানুষ করে তুলতে না পার। আমি আত্মপরিচয় যেমন পেয়েছি তেমনই বলছি, হৃদয়-কোরকের প্রতি দলে পশুত্বের তীব্র সংস্কার এখনও নিঃশেষে মুছে যায় নাই।

এখন আমার দীর্ঘ অবসর। মাঝে মাঝে মনে হয় এ কি হচ্ছে, কিছু না করলে জীবন কি উন্নত হয়? একটা আশ্চর্য্য এই—আমার কোনও ইচ্ছাটাই বাস্তব হয় না। যেমন মনে করা আমার কিছু করতে হবে, অমনি দেখি অধ্যাস্তদৃষ্টিহারা হ'য়ে, আবার প্রাণারাম করতে বসে গেছি। দু-দশদিন প্রাণারাম করে, আমার অধ্যাত্ম সাধনার তুলনায়, ইহার কল অতি অল্প বলেই বোধ হ'ল, তখন দৃঢ় চিন্তে ঠিক করলুম, না, নিজের জ্ঞান কোন চেষ্টাই করবো না, ভগবানকে নির্ভর ক'রেই থাকবো, তিনি যা করান তাই করবো, এ জীবন তাঁরই, তাঁর ইচ্ছামত গড়ে উঠবে, এমন তেমন হবার ইচ্ছাটা বাসনা বৈত নয়।

বস্তু একেবারেই আগাধা মানুষ। আমি বরাবরই এইটী লক্ষ্য করে চলেছি, যে আমার ইচ্ছার উপরই সব নির্ভর করে, এই ইচ্ছাটা বে

কর্ম্মে দৃঢ়সংলগ্ন হইয়, সেই কর্ম্মই কে যেন করিয়ে দেয়; যে কন্সার, তার কোনও কর্ম্মই আসক্তি নাই, আমার ইচ্ছানুযায়ী হ'য়ে চালাতেই তার আনন্দ, তা না হ'লে, এত বিপরীত রকম ইচ্ছা আবহমান কাল ধরে' সে করতে পারে? কিন্তু মাঝখান থেকে কে একজন কিছুই করে না, অথচ সবেরই যেন সে কর্তা, এ কর্তাময়ী করায় তার যে বেশী সুখ তা নয়, বরং দুঃখের মাত্রাই অধিক সহিতে হয়, তবু কর্তাময়ীর একটা মোহ তাকে পাগল করে' রেখেছে। এখন আমার ইচ্ছা এই কর্তাটিকে মাঝ থেকে সরিয়ে দিয়ে, যে আমার সকল কর্ম্ম সম্পাদন করে, তার সঙ্গে আলাপ করা।

এই একমাত্র ইচ্ছাটি দৃঢ়প্রতিষ্ঠ না হওয়ায়, মাঝে মাঝে আবার নানাবিধ কর্ম্মে জড়িয়ে পড়ি, সে সকল কর্ম্মের সূচীপত্র আর দেবো না, এই “গায়ে মানেনা আপনি মোড়ল” কর্তাটিকে সরাসরি গিয়ে অবস্থান্তরের ইতিহাস আলোচনা করবো।

“প্রবর্তকের আদর্শ”

ভগবানের এই মর্ত্য-বিকাশ সফল করিয়া তুলিবার জন্য মানুষের ভিতরে আজ প্রেরণা আসিয়াছে। এই বাণী এই মন্ত্র ভগবানেরই আদেশমন্ত্র। মানুষের বুদ্ধিকল্পনা এ প্রেরণার জন্মদান করে নাই—এ আদর্শ মানুষ নিজের বুদ্ধিচাতুরী কিবা জ্ঞানোত্তেজনা দিয়া রচিয়া তুলে নাই—মনঃ-কল্পিত বিমোহিনী মায়াপ্রতিমা গড়িয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরে নাই—বরং এই আদর্শই অভাবনীয় বিচিত্রবেশে নামিয়া মানুষকে জড়াইয়া ধরিয়াছে—ধীরে ধীরে তাহার সমস্তখানি অধিকার করিতে চাহিতেছে—সমস্ত জীবন প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া আপন অনিবার্য সফলতা সুরিত করিয়া তুলিবার পথটুকু খুঁজিতেছে। এ অবস্থায় নূতন প্রেরণা বাহাদের জীবনক্ষেত্রের একটা ক্ষুদ্র কোণ মাত্র আশ্রয়রূপে পাইয়া সেই বিন্দুপরিমিত স্থানেই আপন বিজয়পতাকা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করিয়াছে—তাহাদের বিরুদ্ধে চিরাগত সমস্ত দেশ-কাল পাত্র যুদ্ধঘোষণা করিবে, ইহা অপ্ৰত্যাশিত নয়—নূতনের নবাকণ-

যজ্ঞিত দীপ্তি জ্যোতিঃপ্রভায় সমস্ত অতীত ও বর্তমানের জীবন-যুগপ্রভাব-বিস্তৃতি
হইয়া চারিদিক হইতে এককণ্ঠে আর্তনাদ করিয়া উঠিবে, ইহা সম্পূর্ণভাবেই স্বাভা-
বিক। নিশ্চয়ই ফেব্রুয়ারি চাঁদকারধ্বনি অন্ধকারগর্ভ-চরিত্র্য নবউষারই জন্ম-
সংবাদ ঘোষণা করে। অতীত-মৃতকর অবসানপ্রায়—কিন্তু তার শুষ্ক অস্থিকঙ্কাল
এখনও ভারতের হৃদয়গহ্বরে কোটরে কোটরে বর্তমান—বহুক্ষেত্রে বহুরূপে অতীত
আদর্শপ্রভাব এখনও প্রস্তরক্ষা করিতেছে। অতীতের প্রাণশক্তি নবজন্ম গ্রহণ
করিতে প্রবৃত্ত হইলেও তাহার শৃঙ্খলইয়া বঁধারা এখনও টানাটানি করিতেছেন
—তাহাদের পক্ষে নূতনের আলোকস্পর্শ হুঃসহ। নূতনের প্রতি যেরতর সন্দেহ
লইয়া ইহার ক্ষণে ক্ষণে তির্যাক্ষনেত্রে চাহিয়া তাহার কথা অর্থভাব মর্মে সম্বন্ধে যা
হয় একটা দ্রুত বিকৃত ধারণা করিয়া লইতেছেন আর আপনাপনি অনন্ত আশঙ্কায়
অস্থির হইয়া উঠিতেছেন—না জানি আজ এই নূতনের হস্তে জাতিব্রূ কি ভীষণ
অনর্থই না ঘটতে পারে!—এ দৃষ্ট কণ্ঠগর্জনক বটো!

অদ্বৈত-বেদান্ত ভারতের চির আদর্শ। শুধু ভারতের কেন, সমগ্র
মানবজাতির জীবনসমস্তার একমাত্র সমাধান ইহারই মধ্যে নিহিত—
স্বামী বিবেকানন্দ সিংহনির্বোধে পাশ্চাত্যের ধর্মসভায় তথাকার শ্রেষ্ঠ
মনীষীমণ্ডলীর কর্ণে এই বাণীই ঘোষণা করিয়াছিলেন—দিন আসে নাই
প্রতীচ্য মুক্ত হইলেও সে মঙ্গলসাধনা জীবনে গ্রহণ করিতে বিলম্ব ছিল—
এখনও রক্ত বিলম্ব কে বলবে? আরীসাদক ফিরিয়া আসিলেন, দেশের
প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্যন্ত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিলেন—ভারতের
ব্রহ্মবীর্ষ উদ্ধ করিবার জন্ত জীবনের শেষ নিষেধপাত ত্যাগান্ত আপনার
সবটুকু তপঃশক্তি ঢালিয়া দিলেন। সহসা মৃত্যুর নিশ্চয় হস্ত তাহার নখর শরীর
অকালে খুলিয়া লুটাইয়া দিল—হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত শুষ্ক সমী-
রণে সেই মহাপুরুষের অমর তপঃধাস হাহাকার করিয়া ঘুরিতে লাগিল।

স্বামীজী কি মরিয়াছেন—সেই হিমচালের মত শুষ্ক মহিমামণ্ডিত তপঃ-
সাধক, যিনি জানিতেন, মর্মে মর্মে সঙ্কল্প পোষণ করিতেন—কিছু না হই
অন্ততঃকোটা Baccillিরূপেও মানুষের অস্থিমজ্জায় অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া
অদ্বৈত সত্য তাহার সমস্ত ভেদবুদ্ধিকে নিঃশেষে গ্রাস করিয়া ফেলিবেন—
ক্ষুদ্র মাংসপিণ্ডধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অমর ভাবসত্তা কি লুপ্ত হইতে
পারে? ঠাকুর রামকৃষ্ণের সেই মঙ্গলপূত সিংহশিঙা যিনি সেই মহাশঙ্কর
চরণোপান্তে সাধকজীবনের কোহিল্লরসদৃশ আশ্রয়-সমাধিপর্বাণ্ড চিরজলাঞ্জলি দিয়া

ছিলেন, তাঁহার তপঃসাধনা কি দেহপাতের সঙ্গে সঙ্গে মুছিয়া নিশ্চয় হইয়া যাইতে পারে? হায়, আজ সেই বীরকেশরীর অমর তপোবল কোন্ কুদ্দ-
গিঞ্জরে কে গভীবদ্ধ রাখিতে চাহিবে? কে কোন্ গণনাবদ্ধ সাধনপর্যায়ে তাঁর
অসমাপ্ত অনন্ত প্রকাশ অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবার স্পর্শ করিবে?

ভারতের তপঃপ্রকাশ বিচিত্র রহস্যময়—আজও তাহার সমস্ত রহস্য
অনুস্তম্ভ। স্বামীজীর অমর সত্তা কত যুগযুগান্তরের তপঃসমুদ্র মন্বন করিয়া
বিবেকানন্দরূপে ফুট হইয়াছিল কে বলিবে? তাঁর অনন্ত ভবিষ্যৎপ্রকাশ
আদর্শশতদলের দলের পর দল খুলিয়া কি অপূর্ণ রূপে নিত্য বিকশিত করিয়া
অগ্রসর হইবে—তাহারও সীমা নিরূপণ করিতে কে সাহস করিবে? ভার-
তের জীবনরাগিনী বুদ্ধের কণ্ঠে যে পদ্য বাজিয়াছিল, শঙ্করের কণ্ঠে ঠিক
সেই পদ্য ঝঙ্কত হয় নাই—ভারতের ভিন্ন ভিন্ন যুগপ্রবর্তক সনাতন
জীবনসঙ্গীত বহু বিচিত্র সুরে গাহিয়া গিয়াছেন—তাঁহাদের একের সঙ্গে
অপরের ভঙ্গিমাগত কত প্রভেদ! পূর্বের সঙ্গে পশ্চাতের, প্রাচীরের
সঙ্গে অর্ধাচীরের কত বিরুদ্ধতা—একে অন্তর্ভুক্ত করিতেছেন,
পূর্বগত মহাজন পরবর্তী মহাজনের হস্তে প্রতিষ্ঠাচ্যুত—কিন্তু এ
পরম্পরখণ্ডন কি পরম্পরের প্রতি অন্ধ বিদ্বেষ অশ্রদ্ধ অবজ্ঞার ফল?
যে একটি অথও করুণাশ্রোতঃ বিস্ফোদপন্ন হইতে ঝরিয়া যুগে যুগে
মর্ত্যের মরুক্ষেত্রে নব নব অমৃতধারা বহিয়া আনিয়াছে—বিচিত্র রূপে বিভিন্ন
বিগ্রহে সে তপঃপ্রবাহ ঘনীভূত হইয়া প্রকাশ পাইলেও তাহা পর-
ম্পর বিচ্ছিন্ন নহে। ভারতের নিগূঢ় তপঃরহস্য অবগত না হইলে
একথা হৃদয়ঙ্গম করি কেমন করিয়া—যে এই সাধনপ্রবাহ এক অন-
বচ্ছিন্ন অখণ্ডনীয় নিত্য বিকাশমান অনন্ত ধারাশ্রোতঃ—ভারতের
সনাতন আদর্শ যুগেযুগে ফুট হইতে ফুটতর হইতেছে—যুগের পর যুগ
ভিন্নভিন্ন যুগপ্রচারকগণের মধ্য দিয়া সেই একই মহাদর্শ ক্রমবিকশিত
হইতেছে—এই যে পরম্পরখণ্ডন ইহা উন্নতির আশ্রয়খণ্ডন নয়—আপনার
অনন্ত রহস্য পূর্ণ হইতে পূর্ণতররূপে ফুটাইয়া তুলিবারই ইহা বিচিত্র
আয়োজন—বলা বাহুল্য এ রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা গভীর সাধনসাপেক্ষ।

আমাদের এত কথা বলিবার প্রয়োজন কি? একদল তরল সাহিত্য-
সমালোচক প্রবর্তকের পৃষ্ঠায় নুতন আদর্শের সৌরভ পাইয়া ধূনার গন্ধে
মনসার মত দ্বিগুণ হইয়া উঠিয়াছেন—অতীতের জীর্ণপরিচ্ছদমুক্ত ইহার।

অতীতের শুধু বাহ অবয়বটুকু দেখিয়াই পরিভূষ্ট, সাধনলব্ধ অস্তিত্বের অভাবে অতীত ও বর্তমানের অন্তঃপ্রেরণার সহিত আসন্ন ভবিষ্যতের নবসাধনার নিগূঢ় যোগসূত্র আবিষ্কার করিতে ইহারা অক্ষম—ভারতের জীবনাদর্শের একটি পর্যায়েরই ইহারা আপন বহির্দৃষ্টি নিবন্ধ রাখিয়াছেন—অন্তঃপ্রবীষ্ট হইয়া গভীর সাধনরহস্য অবগত হইবার মত প্রতিভা, ধৈর্য্য, স্বযোগ ইহাদের নাই। ভারতের জীবনসাধনার একটি নূতন সূর্য্যপ্রকাশ দেখিতে ইহারা আদৌ প্রস্তুত নহেন—ইহারা স্বামীজীর প্রগাঢ় ভক্ত সন্দেহ নাই, কিন্তু স্বামীজীর যতটুকু আদর্শ তাঁর প্রকাশিত কথা বার্তা রক্ততা বা ক্রিয়ানুষ্ঠানের মধ্যে মূর্ত্তিবদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার অতিরিক্ত কেহ কিছু নূতন কথা বলিলে, নূতন আদর্শের এক চুল নূতন ব্যাখ্যান করিলেই তাঁহারা খড়্গগহস্ত হইয়া উঠেন, রুঠেনেত্রে সে সবার মধ্যে “একটা নূতন কিছু” করিবার মোহে আগ্রহ্যার অর্থহীন কথার মালা মাত্র দেখিতে পান আর সমালোচনার শাণিত অস্ত্র অন্ধভাবে যথাতথ্য সঞ্চালিত করিয়া সে বাচালতার খণ্ডন করিতে চাহেন—লঘুভাবে একের কথা অপরের স্বক্ষে চাপাইয়া ছুরিকা চালনা করিলেন কি না উত্তেজনার বোকে তাহাও দেখিবার অবসর ঘটে না। প্রাচ্যের “নারায়ণের” পৃষ্ঠায় “প্রবর্তকের আদর্শ” সমালোচনা পাঠ করিয়া বুঝিলাম সত্যোক্তনাথ মজুমদার মহাশয় এই শ্রেণীরই একজন সমালোচনাজীবী গৌড়া বিবেকানন্দভক্ত।

স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের অন্তরের মণিকোটার কোন উচ্চ শ্রদ্ধাসূত্রে প্রতিষ্ঠিত তাহা না হয় নাই প্রকাশ করিলাম, সত্যোক্তবাবুর তুলনায় হয়ত স্বামীজী সঘন্থে আমরা গভীরভাবেই অজ্ঞ—তাঁহার সমালোচনার তীব্র কবাঘাতে আমাদের অন্ধ নয়ন উন্মিলিত হইবে কি না বলিতে পারি না, হইলে তাঁহার নিকট আমরা পরম কৃতজ্ঞ রহিব সন্দেহ নাই—কিন্তু স্বামীজীকে আমাদের নিজের চোখে দেখিয়া বুঝিতে বুঝাইতে গিয়া যদি না বুঝিতে বুঝাইতে পারিয়া থাকি, তবে সে প্রয়াসে সংবদ্ধ অসংবদ্ধ আরও হই চারি কথা কহিলে সমালোচক মহাশয়ের চক্ষে প্রগল্ভ বাচালতা প্রকাশ হইলেও বোধ করি তাহা অমার্জনীয় অপরাধ হইবে না।

লেখক প্রবর্তকের আদর্শ বিচার করিতে গিয়া দুইটি প্রবন্ধ বাছিয়া লইয়া বলিয়াছেন—“উহার মধ্যে প্রথমের প্রাচীনের প্রতি অতীতের প্রতি একটি বিদ্রোহের স্বর স্বতঃই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ

করে কারণ লেখকের মতে পূর্বের সমস্ত আদর্শগুলিই বোধ হয় খণ্ড ও অন্তর্ভুক্ত।" মুজারাকস দায়ী হইতে পারে, কিন্তু সমালোচক মহাশয় অভাব "ত্রৈলুপি পরিবর্জন করিয়া উহাদের সত্যের পরিপূর্ণ করিয়া তোলার ইত্যাদি" এই কথাগুলি কিভাবে পড়িয়া কি বুঝিয়াছেন বলিতে পারি না—কারণ ঠিক ঐরূপ কথাই কি মানে হয় আমরা বুঝি না—ঐ কথাগুলি ঠিক ঐ ভাবে আমরা বলিও নাই—বলা বাহুল্য এখানে বক্তমান মানবচরিত্রেরই খণ্ডতা ও অন্তর্ভুক্ততার কথা উল্লেখপূর্বক উহাকেই দেবসত্যের পরিপূর্ণ করিবার কথা আমরা কহিয়াছি। সমালোচকের মতে আমরা একই প্রবন্ধে ঘন ঘন মতপরিবর্তনের মধ্য দিয়া, বিবেকানন্দ যে বলিয়াছিলেন "আমরা প্রকৃতিকে সাহায্য বা পরিপুষ্ট করিতে জন্মি নাই বরং উহাকে জয় করিতে জন্মিয়াছি"—এই কথাটিরই প্রতিবাদ করিতে চাহিয়াছি। ঘন মত পরিবর্তন! আশ্চর্য্য বটে! সত্যোক্তবাবু গভীরভাবে আমাদের প্রবন্ধটির অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়াছেন কি না সে সম্বন্ধে আমরা ঘোরতর সন্দেহান হইয়া পড়িলাম। "এড়াইয়া বা ছাড়াইয়া যাওয়া যখন লেখক মহাশয়ের আদর্শের অনুকূল নহে, তখন সম্ভবতঃ জয় করিয়া স্বপক্ষে আনিই লেখকের মত। কিন্তু কয়েক লাইন পরেই লেখক বলিতেছেন—"জয় নহে, প্রকৃতি অপরায়ে।" কাজেই সাধ্য হইয়া তাঁহাকে প্রকৃতির সহিত সন্ধিস্থাপন করিতে হইয়াছে। তিনি বুদ্ধি মন প্রাণের মধ্যে গভীর টানিয়া তাঁহার সাধনক্ষেত্র নির্মাণ করিয়াছেন। তাঁহার এই সাধনপথে সন্দাই সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হয়।"

সমালোচক মহাশয় দেখিতেছি সত্যই রচনাশিল্পের সকল রহস্য হৃদয় জয় করিতে অক্ষম। নতুবা কোন কথাই কার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তাহা সব একসঙ্গে তাল পাকাইয়া এমন অদ্ভুত পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া তুলিবেন কেন? "আমরা" এই শব্দটা সত্যোক্তবাবুর মাথা ঘুলাইয়া দিয়াছে, দেখিতেছি—প্রস্তাবনার স্থানবৈশিষ্ট্যজ্ঞান (context-বোধ) বোধ হয় তাঁহার কিঞ্চিৎ অল্প—তাই তাঁহার এই সহজ কথাটা বুঝিতেও এমন বিষম শব্দবিশ্রম ঘটিয়াছে। রচনাজোতে স্বল্প ভাবপারস্পর্য্যে (Sequence of ideas) জীবৎ রেখাপরিবর্তন কোথায় কখন ঘটিতেছে সমালোচকের চক্ষু সে সমস্ত এড়াইয়া গেল—তাঁহার স্থূলদৃষ্টির অবলম্বে সমস্তই স্তূপীকৃত হইয়া একঘননের পিণ্ড অপরের স্বন্ধে ন্যস্ত হইল। প্রকৃতি অপরায়ে ধারণা করিয়া সতর্ক গভীর সাধনক্ষেত্রে সাধনেনার সহিত সন্ধিস্থাপন করি-

যাচ্ছে কে? পর্বমাস্ত্রাভের পথে অন্তরায়গুলিকে হরণ-ধ্বংস করিয়া, নয় অতিক্রম করিয়া, নয় নিগৃহীত করিয়া শঙ্কর হইতে বিবেকানন্দের যুগ পর্যন্ত যে মানুষ ছুটিয়াছে সেই মানুষই নয় কি? “আমরা প্রকৃতির সহায়তা গ্রহণ না করিয়া ইহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াই চলিয়াছি—স্বাভাবিকভাবে জীবন আমাদের অবসর, সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ পর্যন্ত পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত অবধি কথাটিরই প্রতিধ্বনি তুলিয়াছেন—এখানে “আমরা”, “আমাদের” এই সর্বনাম-গুলি নারায়ণের লেখকের চিত্তে কি তুমুল সর্বনাশেরই না সৃষ্টি করিয়াছে,—অথচ “আমাদের বাহা কিছু সমস্তই যদি সেই সত্যরূপের আবরণ হয়, তবে তাহার একান্ত নিরসনই শ্রেয়ঃ” এই বলিয়া প্রবন্ধ-রস্তুে যে প্রস্তাবনাটিকে উপস্থাপিত করা হইয়াছে, তাহারই Logical জের চতুর্থ অনুচ্ছেদের শেষ লাইন পর্যন্ত চলিয়াছে—এতদূর পর্যন্ত প্রতিপাদ্য শুধু একই কথা—সেই একই আমরা, সেই তুমি আমি সে যে ভারতের মানুষ আমরা—আমাদের বাহা কিছু সমস্তই যদি আমাদের সত্য স্বরূপের আবরণ মাত্র হয়, যদি ইহাদের প্রকৃতি এমনই হয় যে কোন ক্রমেই বর্তমান স্বভাব হইতে ইহাদিগকে ছাড়াইতে পারা যায় না, তবে সে প্রকৃতিকে অপরাধের বলিতে হইবে, তবে তাহাকে, পৃথিবীকে, মর্ত্যের এই নিয়ম স্বভাবকে জয় করিবার আকাঙ্ক্ষাকে ছরাকাজ্জা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়াই উপায়, ভাগবতরাজ্যের সহিত উহার যখন কোনই সম্বন্ধ নাই, যখন উহা কেবল মায়া, কেবল মিথ্যা, কেবল পাণ আর ভ্রম—তখন উহা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য—সমালোচক মহাশয় ইহা স্বীকার করুন আর নাই করুন, যে কেহ আমাদের জাতীয় ইতিহাসের অবনতি-মুখী যুগ-পর্বের কিছু সংবাদ রাখেন, সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, শঙ্কর হইতে, না এ কথা বরং কমাইয়াই বলা, বুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া বিবেকানন্দের যুগ পর্যন্ত বহু শত বৎসর ধরিয়া আমরা ভারতবাসী এই সহজ পথটিকেই আশ্রয় করিয়া আসিয়াছি—মর্ত্য প্রকৃতি দেবাত্মার পক্ষে অসহনীয় অপরাধের ভাবিয়াই উৎকট অক্ষমতামূলক বৈরাগ্যপথকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া ইহজগতের খেলাকে যত তাড়াতাড়ি পারা যায়, গুটাইয়া ফেলিতে কঠোর সাধন-পরায়ণ হইয়াছি—হাঁ, এ জাতীয় অপরাধে জাতিহিসাবে “আমরা” সকলেই অপরাধী—স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত। “আমরা” শব্দে সত্যেন্দ্রবাবু বিভ্রান্ত হইলেন কেন, context-ভেদে স্পষ্ট অলস্ত চিত্র অঙ্কিত করিবার জন্ত আত্মপরিচয়ের প্রয়োগ এমন Self-identification মূলক শব্দকোশল যে সাহিত্য-জগতের নিত্য-প্রসিদ্ধ রীতি—তাহা কি তিনি একেবারেই

অনবগত ? সত্যেন্দ্রবাবুর সন্তোজ ভাষা আছে, তাহা খুব স্পষ্ট এবং শাণিত—কিন্তু এরূপ কাঁচা সাহিত্যজ্ঞান লইয়া সমালোচনাছুরিকা ব্যবহার করিতে সাহসী না হইয়া বরং অধিকতর নিরাপদ ক্ষেত্রে বিচরণ করাই তাঁহার পক্ষে শুভকর ছিল—কাঁচা হাতে অল্পশব্দ বিপজ্জনক !

সত্যেন্দ্রবাবু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন—স্বামীজির বৈরাগ্যকে আমরা অকুমতামূলক বলিয়াছি বলিয়া—আরও তাঁহার আশঙ্কা, বুঝি “প্রবর্তক” রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির সহিত যোগদানপূর্বক Hegel, Comte আদি পাশ্চাত্য পণ্ডিতের Pragmatic দর্শনের অনুপ্রেরণায় প্রচুর ভোগ-বাদকে জাতীয় জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে উদ্যুত হইয়াছে। সত্য না কি ? মজুমদার মহাশয়ের লেখনীমুখে এই নূতন সংবাদ পাইয়া আমরা কৃতজ্ঞতাপ্লুত হইলাম—“প্রাচীন যোগপদ্ধতি যদি প্রকৃষ্ট হইত, তবে এই হাজার হাজার বৎসর উপনিষদের ধর্মমাত্র করিয়াও হিন্দুজাতি এমন হীন, দুর্বল, স্বার্থপর কেন ?” — এমন প্রশ্ন যখন আমরা করিয়াছি তখন আমরা যে একান্ত অদৈবতীতিগ্রস্ত—সে সন্দেহে আর কোনও সন্দেহই রহিল না। অহো সমালোচক—এসব ঘোরতর আতঙ্ক কোন উর্বর মস্তিষ্কের প্রসূত স্বপ্নপিণ্ড ? “প্রবর্তকের” লেখকের বুদ্ধি-সহায়ে স্ব-উচ্চ অদৈবত গিরিশিখরে আরোহণফলে শিরোঘূর্ণন অবশ্যস্তাবী হইতে পারে—কিন্তু সমালোচকের মস্তিষ্ক কিসের বোরে ঘূর্ণমান বলিতে পারি না—নতুবা এই তিন বৎসরের “প্রবর্তকের” পক্ষে পক্ষে ছত্রে ছত্রে অদৈবত বেদান্তের মন্ত্র-নির্বোধ শুনিতে, অকম হইবেন কেন ? শাস্ত্রের রাশীকৃত অক্ষর ও শ্লোক উদ্ধৃত না করিয়াও যে অদৈবত অনুভবের জলদধোষণা সম্ভবপর—একথা বাঁহাদের ধারণাতেই আসে না, হয়তো সমালোচকমহাশয় তাঁহাদেরই শ্রেণীভুক্ত।

লেখকের পাঁচ পৃষ্ঠাব্যাপী বৃহৎ গবেষণা পাঠ করিয়া এইটুকুই শুধু বিখ্যাসাম—যে তিনি “প্রবর্তকের” আদর্শ ও সাধন বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারেন নাই—এরূপ অনভিজ্ঞ লেখককে না বুঝিয়াই অল্পপরিচালনার অধিকার সুযোগো “নারায়ণ”-সম্পাদক মহাশয় বোধ হয় অসতর্ক মুহূর্তেই দিয়া ফেলিয়াছেন—সত্যসত্য এরূপ দায়িত্বহীন অজীর্ণ-উদ্গারে নারায়ণের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করা ছাড়া আর কিছুই হয় নাই। ভারতের জাতীয় জীবনের সম্মুখে আজ চারি বৎসর ধরিয়া “প্রবর্তক” শুধু অদৈবত ধর্মই আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আসিতেছে—মানবজীবনের সেই শ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত, ভারতের সেই সত্যকোহিন্দুর—ঠাকুর রামকৃষ্ণ বাহা জীবনে ফুটাইয়াছিলেন, স্বামীজির উদাত্ত কণ্ঠে বাহা সুরসপ্তমে দিগ্দিগন্ত কাঁপাইয়া নাকিয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহা জাতীয় জীবনে সুসিদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে—শুধু, বিবেকানন্দ যে অদৈবত অনুভবের মণি-ভাণ্ড হইতে মুঠা মুঠা রত্নকণা ইতস্ততঃ বিশৃঙ্খলভাবে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন—আজ তাহাকে গুছাইয়া সুসংহত সুশৃঙ্খল করিয়াই জাতীয় জীবনে মূর্তিদান করিতে হইবে—অধ্যাত্মতত্ত্বের চরম উপলব্ধির শক্তিমন্ত্রেই ভারতজীবন নবগঠিত করিয়া তুলিতে হইবে—ইহাই সেই মরণপূত জাতীয়তাবোধ—যাহা প্রচার করিবার জন্ত “প্রবর্তকের” জন্ম ও কর্ম—“The Sanātan Dharma—that is for us our Nationalism” আর

সে নব যুগধর্ম কি ? “The awakening of God in the three hundred millions of our people.”

বিবেকানন্দ এই মহামন্ত্রই অলিখিত ভাবরূপে শ্রীরামকৃষ্ণের চরণমূলে পাইয়াছিলেন—এই মহাধর্ম প্রচার করিবার গুরুভারই তাঁহার উপর অর্পিত হইয়াছিল—তাঁহার ব্রত তাঁহার পক্ষে বড় কঠোর হইয়াছিল—কারণ বৃদ্ধশব্দের মন্ত্র-প্রভাব তাঁহার ভিতরে তখনও জাগ্রত ছিল—সে পূর্বপ্রভাবকে সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ আত্মসাৎ করিয়া নব যুগশক্তিকে পূর্ণ জন্মদান তাঁহার পক্ষে একরূপ অসম্ভবই হইয়া পড়িয়াছিল। বাজারে পুস্তকাকারে স্বামীজির অন্তরাত্মাকে সমস্তখানি পাওয়া যায় না—শুধু বুদ্ধি পাণ্ডিত্যের সাহায্যে কে স্বামীজির কতটুকু পরিচয় পাইবার আশা করেন ? না, অমন করিয়া মহাপুরুষের অবমাননা করিতে নাই—অন্ধা-বান্ প্রেমিকসাধক স্বামীজির প্রতি ভক্তির দোহাই দিয়া অমন করিয়া তাঁহার ঘোর অমর্যাদা করিবার চেষ্টাসাহস করেন না—তিনি গভীর সংযম-পূত চিত্তে সেই জন্মদায়ী ধর্মবীরের অন্তঃপরিচয় লাভ করিতে জানেন। শঙ্করের মন্তিষ্ক, আর বুদ্ধের হৃদয় ?—হাঁ, শঙ্কর বুদ্ধ স্বামীজীর অন্তরে অন্তরে জাগ্রত ছিলেন, তাঁর রক্তমাংসে অস্থিমজ্জার তাঁদের পদচিহ্ন আজীবন চিরজাগরুকের ছিল—তাঁহারা অন্তরে অন্তরে চিরদিন এই আজন্মব্রহ্মচারীকে আকর্ষণ করিয়া আসিয়াছেন—দেখ নাই সারাজীবন তাঁহার অন্তঃগুহায় কি ঘোরতর দ্বন্দ্বসংগ্রাম, তাঁহার সমস্ত হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করিয়া তুলিয়াছিল—দেখ নাই আর একদিকে ঠাকুরের দিব্যপ্রভাব অবাধ্যসন্তানকে নীলাসাগরে ভাসাইয়া রাখিবার জন্ত কি প্রবল-ভাবে টানিয়া রাখিয়াছিল—আর শাসনকৃৎ প্রমত্ত তুরঙ্গের মত তাঁহার সমাধিমুখী মহীয়ান আত্মা অন্তরের অন্তস্তম তলে কি অনন্ত মর্মবেদনার আমরণ অশ্রুপরি-প্লুত ছিল ! শেষজীবনে পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের সে গভীর মর্মজনন বধন নিতান্ত হৃদয় ফাটিয়া একটু আধটু অভিব্যক্ত হইয়া পড়িত তখনই তাঁহার মানসকল্প সাধিকা নিবেদিতা স্বন্দৃষ্টিবোগে তাহা ধরিতে পারিয়া তাঁহার অপূর্ণ শ্রীশঙ্ক-চরিত্রচিত্রে উহার সামান্য নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। হনিয়ার পরপারে দূরে হৃদয়ে কেন্ন অনন্তলোকে মুক্ত রাজহংসের মত উড়িয়া চলিয়া যাইতে তাঁহার অন্তরাত্মা চির আকুল ছিল—তাঁহার প্রেমাম্পদ গুরুভাতৃবৃন্দও ইহার সাক্ষা-দান করিতে পারেন—পুস্তকসম্বল জ্ঞানদৃশ সমালোচক বাচালতা বলিলে চলিবে কেন ? বস্তুতঃ, “স্বামীজী প্রাচীন শঙ্কর ও বৌদ্ধ প্রভাবে আপনাকে কিছু পরি-মাণে হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন”—ভারতের নব যুগধর্ম তাঁহার মত সর্বোৎকৃষ্ট আধারেও পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতে পারে নাই—সেই জন্তই সে অতীতপ্রভাব-সম্পন্ন আধারঘট অত দ্রুত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ভারতের মহাশক্তি নতুন বিগ্রহে তাঁহার আবাহন করিতে চাহিয়াছিলেন কি না, কে বলিবে ?

পূর্ণ যুগধর্ম মানবজাতিকে দান করিবার জন্ত ভারতবর্ষকেই ভগবান্ চিহ্নিত করিয়াছেন—ভারতবর্ষেই দেবজাতি প্রথম গড়িয়া উঠিবে—তাই প্রকৃতির অলঙ্কার প্রেরণায় এই ভারতেই দেবজীবনলাভের মত্যাগ প্রথম আবিস্কৃত হইয়াছে—

সেই পথই অধ্যাত্মযোগ—পূর্ণ জীবনযাত্রের জন্যই চাই পূর্ণযোগ । নূতন জাতিকে
 অদ্বৈত বেদান্ত মাথায় করিয়া রাখিতে হইবে—কিন্তু বৈরাগ্য-মার্গই তাহার অবার্য
 সনাতন মার্গ নহে । ইহা প্রচলিত ভোগবাদ নয়—না, আমরা যন্তুত্যাগপথও যেমন
 মানি না, প্রাকৃত শিশোদরপরায়ণ ভোগপথকেও তেমনি খণ্ড পথ বলিয়াই জানি—
 ত্যাগ ভোগ এ উভয়ই তো পথ মাত্র, উপায়কে লক্ষ্যস্বরূপ করিয়া তুলিতে আমরা
 চাহি না—যে দিব্যজীবনের মন্ত্র ভারতের জাতীয় পতাকাকে অলঙ্কৃত করিবে—
 তাহা ত্যাগও নয়, তাহা ভোগও নয়, তাহা উৎসর্গ—আত্মনিবেদনই ভারতের
 সেই অধ্যাত্মযোগপথ, সেই রাজমার্গ, যাহার উপর দিয়া চলিয়াই মানবজাতি
 মর্ত্যের রেখায় রেখায় অমৃতত্বকে শরীরদান করিয়া তুলিতে সমর্থ হইবে । ‘এ
 মহাতপস্কার পথ ক্ষুরধার নিশিত এবং চূর্ণম—সমস্ত প্রকৃতি আমাদের বিরুদ্ধে
 তবে কি আমাদের আশাকল্পনা স্থগ্নই রহিয়া যাইবে ? না, ইহাবাদী ভোগমত্ত ইউ-
 রোপের মত প্রকৃতিকে কলে কৌশলে কোনরূপে প্রতারণিত করিয়া তাহার সহিত
 আপোষ বন্দোবস্ত কিছু আদায় করাই আমাদের লক্ষ্য নয় ; আবার মারাবাদী
 যিনি প্রকৃতিকে এড়াইয়া, পাশ কাটিয়া, তাহাকে মায়াময়ী বলিয়া উড়াইয়া
 দিতে চাহেন, আমরা তাহার মত প্রকৃতির অতীত হইয়া চলিয়া যাইতেও
 চাহি না । আমরা প্রকৃতির মধ্যে থাকিয়াই প্রকৃতিকে জয় করিব, প্রকৃতির মধ্যেই
 আপনাকে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করিব, কিন্তু কাহার বলে, কিসের প্রেরণায় ? আমরা
 যে জানি বাহ্যতঃ প্রকৃতি আমাদের শত্রু বটে কিন্তু তাহারই অন্তর্নিহিত এক শুণ্ড
 দিব্য প্রকৃতি আছে—মানুষী প্রকৃতির অন্তরালে এক মহত্তর নিগূঢ়তর ভাগবত
 শক্তির ইষণা রহিয়াছে—সেই ভাগবত ইচ্ছার সাহায্যে এই নিম্নস্বভাবকে
 বিজিত করিয়া মর্ত্যে স্বর্গলোকের প্রতিষ্ঠা করিব । প্রকৃতি দিয়াই প্রকৃতি জয়—
 নতুবা ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগত প্রয়াসেরই বা সাধ্য কি ? তাই আত্মসমর্পণই
 আমাদের প্রকৃষ্ট সাধনপথ । এ পথে কি দ্বন্দ্ব নাই ? আছে—কিন্তু মানুষকে
 সাধককে সে ঘোর সংগ্রাম সাধন করিতে হয় না—ভগবান্ স্বয়ং এই যোগের
 সাধক—তিনিই আপন মহাশক্তিরোগে আপন সিদ্ধি বাহিরে প্রকটিত করিয়া
 তুলিবেন—সত্য সত্যই শ্রীকৃষ্ণ আপনি এই অধ্যাত্মযুদ্ধের সেনাপতি—তিনিই
 সারথী, আবার তিনিই বীরযোদ্ধা পার্থ, তিনিই রথ, চক্র, বিজয়ধ্বজা—তিনিই
 গাভী, ক্ষুরধার শরপুঞ্জ তাহারই বিভূতিমালা । আর নূতন যুগের সন্ন্যাসী ?—
 সে শুধু ইহবিমুখ মুক্তিপিপাসু পরারপুষ্ট সেবকমণ্ডলী নয়—সে জনে জনে
 এমনই আত্মপ্রতিষ্ঠিত—নূতন যোগের দীক্ষিত সাধককুল—তাঁহার ভাগবত
 যন্ত্রস্বরূপ হইয়া ভগবানেরই সিদ্ধসম্পদ আপন জীবনের ভিতর দিয়া জাতির জন্য
 আকর্ষণ করিয়া আনিবেন—বলিয়াছি তো তাঁহার ধর্মপ্রচারের ভেঁপু মাত্র
 নয়, তাঁহার ভগবানের সর্ব-ঐখ্যাদ্যপ্রকাশের মুক্তদারস্বরূপ । ইহার পার্থিব
 স্বর্গের প্রতিষ্ঠাত্ত্ব—বিশ্বের অসংখ্য বন্ধনমারো অসংখ্য প্রেমহুত্রে বিজড়িত অসংখ্য
 কল্পশ্রোতে ধাবমান হইয়া ইহার বিশ্বসংসারে চিরমঙ্গলযোষণাই করিবেন—কে
 বাতুল, ইহাদের হস্তে অমঙ্গল আশঙ্কায় আপনাকে বৃথা বিপদান্ত করিয়া তুলিতেছ ?

প্রবর্তক—৪র্থ বর্ষ, ১৮শ সংখ্যা

১৫ই আশ্বিন, ১৩৩৬

দুর্গোৎসব

শরতের খণ্ডচন্দ্র অনন্ত নীলিমায় ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে, বর্ষাষাৎ তরুপল্লব-বিমল জ্যোৎস্নাপুলকে উদ্ভাসিত, প্রকৃতির অনিন্দ্যসৌন্দর্য্য অব্যাহত, মানুষ্যের স্মৃতি হৃৎথে ইহার ত্রাস বৃদ্ধি নাই। চিরযৌবনা প্রকৃতিরাগীর লাবণ্যপ্রভায় উচ্ছ্বসিত হৃদয় লইয়া কিসের অন্বেষণ করিতেছি। যেন আজ বুকভরা দৈন্ত্রে কাতর হইয়া, ঘরের বাহিরে আসিয়াছি, মানুষ্যের তাপিত প্রাণের হৃৎসহ-যন্ত্রণাভার সহিবার আর তো শক্তি নাই, উদাস লবুচিতে নদীতীরে, শ্মশানে, মানুষ্যের অগম্য অরণ্যে পরিভ্রমণ করিতেছি, আজ যেন উন্মাদ হইয়া গিয়াছি, লোকালয়ের বিবাক্ত বায়ু শ্বাসে প্রশ্বাসে গ্রহণ করিয়া জীবন জর্জরীভূত, আজ একটু মুক্তির বাতাস চাই, প্রকৃতির অপার্থিব সুষমায় জীবন মেলিয়া একটু অমৃত আহারণ করিব, নতুবা আর তো বাঁচি না।

পথে আসিতে আসিতে কত কথা শুনিলাম, লোকালয়ের কত ব্যক্তি অব্যক্ত শব্দ কর্ণকুহরে শব্দিত হইল। বঙ্গে দুর্গোৎসব, কাল মহামায়ার সপ্তমী পূজা শেষ হইয়া গিয়াছে, আজ অষ্টমীর নিশা, পূজাবাড়ী হইতে লানাইয়ের করুণ-রাগিণী শ্রুত হইতেছে—দরিদ্র পল্লীপথে আমি একা, উভয় পাশে জীর্ণ পল্লীবাস, বর্ষায় ঘরের দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, জীর্ণ মনুষ্যমূর্তি অক্ষুট জ্যোৎস্নার মণ্ডলাকারে বসিয়া হৃৎথের কথা কহিতেছে, মাঝে মাঝে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস, বালকবালিকাগণের ক্ষীণকণ্ঠে রোদনধ্বনি, প্রেতমূর্তি রমণীগণ শতগ্রন্থীমলিনবসনাবৃত্তা, বিবসনা হইলে অস্থিকঙ্কাল ভিন্ন রক্তমাংসের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখিতে পাইবে না। বড় জোরে পুথার বাজনা বাজিয়া উঠিল, উলঙ্গ শিশুপুত্রগণ আর্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিল, মেঘ-ময়ী জননীগণের শুষ্ক গণ্ড বহিয়া বড় কণ্ঠে হুই ফোঁটা অশ্রু ঘরিয়া পড়িল, পুরুষগণ নির্বাক হইয়া ভয় দাঁড়ায় শয়ন করিল, আত্মবিক্ষেপ ঘন পত্রপুঞ্জের অন্তরালে খণ্ডচন্দ্র সরিয়া দাঁড়াইল, দরিদ্র পল্লী আধারময়,

পূজার আনন্দে সেথায় শুধুই অশ্রু, শুধুই তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস আর সন্ধ্যার
তপ্তগৃহে প্রবেশ করিয়া বাজনা বাজাইয়া দিল, হু-হু-হা-হা।

এ আমি কোথায়? প্রকৃতির সে যৌবন-চপল মধুর হাস্য কৈ? সে
মুনোহারিণী সুষমাময়ী সুলক্ষী কোথায় গেল? এ যে বিরাট আঁধার,
ক্লান্ত প্রভঞ্নের ভৈরব তাল নদীতরঙ্গে, বৃক্ষকাণ্ডে, জীর্ণ গৃহে আছাড়িয়া
আছাড়িয়া পড়িতেছে, আকাশের চাঁদ ডুবিয়া গিয়াছে, সারি সারি অশ্বখ
রটবৃক্ষ বিকট দৈত্যের মত দাঁড়াইয়া, পথহার্য পথিক আমি আজ কোথায়
চলিয়াছি?

আকাশে নক্ষত্র নাই, পৃথিবীর বুকে গৃহস্থের প্রদীপ নাই, খদ্যোভের
ক্ষীণ আলোকটুকু পর্যন্ত ভিন্নিত, পাকাইয়া পাকাইয়া ত্রিভুবনের অন্ধকার
আজ আমার বেড়িয়া ধরিয়াছে, বল দেখি আমি উন্মাদ কি না?

এ নিবিড় তমসাপুঞ্জ ভেদ করিয়া, আমার জীবনের আশা-বিদ্যুৎ
ঝকিয়া উঠিবে কি? বাণেশ্বর আশা ও যৌবনের উদ্যম, বান্ধকোর অভিজ্ঞ-
তায় নিস্ত্রত ও নিস্তেজপ্রায়; আত্মশক্তির শাণিত অঙ্গে চিরদিন এই ঘোর
অনিষ্টা বিদীর্ণ করিয়া, নবায়নের রথিপ্রবাহ বহিয়া আনিবার জন্য সংগ্রাম
করিয়াছি, তুণ আজ শূণ্য, হৃদয় ঘাতপ্রতিঘাতে অবসন্ন, রিক্তবল বুদ্ধের
ধননী বহিয়া আজ এ কি অমর শক্তি জাগিয়া উঠিল, আজ এই ঘোরাক-
কারময়ী মহারজনীর কোলে বসিয়াই শরসাধনা করিব, দৈবশক্তির অমর
প্রভাবে আবার নবযৌবন লাভ করিব, বাংলার সপ্তকোটাকর্ষ আনন্দ-
সঙ্গীতে ধ্বনিয়া তুলিব।

এ দেখ অনন্ত আঁধার ভেদ করিয়া, স্বর্ণপ্রতিমা বঙ্গজননী! সপ্তকোটি
সন্তানের দিসপ্তকোটি যুক্তকর উদ্ধে উত্তোলিত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাঁকিয়া
বল “সর্বমঙ্গল-মঙ্গলো, শিবে সর্বার্থসাধিকে”। সপ্তকোটি বাঙ্গালী! এস আজ
এই মুগ্ধী হউক চিন্ময়ী হউক দশভূজার চরণতলে বসিয়া, আমরা এক
হইয়া যাই, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী জননীর বীর সন্তান আমরা, মায়ের নিকট
হইতে জ্ঞান শক্তি প্রেম যাচিয়া লই, এস ভক্তিপুলকিতচিত্তে, ভায়ে
ভায়ে আলিঙ্গন করি।

এ তো আমার স্বপ্ন! সিংহবাহিনীর আবাহন আমরা তো বহুদিন ধরিয়া
করিয়া আসিতেছি, আজ সে উৎসবক্ষেত্র হইতে সরিয়া আসিয়া, এ বিকট আঁধার-
প্রেমে একা বসিয়া কি ভাবিতেছি, কতবার তো এই সঙ্গীত গাহিয়া গাহিয়া

গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ফিরিয়াছি—তখনও বাংলার এমন দারুণ অকাল আসে নাই, তখন ধনী দরিদ্র সকলেই, দেবীপূজায় একই অঙ্গনে নববস্ত্র পরিধান করিয়া মাগের চরণতলে মাথা নত করিত, তখনও বাঙ্গালীর প্রাণে ধানের মরাই শোভা পাইত, মাথার চুল এমন রুম্ম থাকিত না, গায়ের রঙ এমন মলামাটিতে ঢাকিয়া পড়িত না, তখন বাঙ্গালীর শ্রী ছিল, শক্তি ছিল, হর্ষ ছিল, কিন্তু ছিল না কি?

বাঙ্গালী সপ্তকোটিসন্তানপালিনী জননীকে ভুলিয়া গিয়াছিল, মায়েস মূর্তি লইয়া তাহারা তো পূজা করে নাই, মায়েস চরণে হৃদয়ের ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি তো তাহারা প্রদান করে নাই—তাহারা করিয়াছিল উৎসব, বসাইয়া দিয়াছিল একটা মেলা, অহং-ঐশ্বর্যের একটা প্রদর্শনী—সে গরিমার ঠাট্টা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সে শূন্যগর্ভ উৎসব-রঙ্গ শেষ হইয়াছে। আজ আবার মহামহিমাময়ী বঙ্গজননীর নূতন-সিংহাসন রচিয়া তুলিতে হইবে, দশপ্রহরণপারিণী শত্ৰুবিমর্দিনী মহামায়ার পূজার জন্য সপ্তকোটি সন্তানকে এক হইতে হইবে, এই একত্র হইতে হইলে আমাদের হৃদয় হইতে ঘৃণা হিংসা জাতিবিদ্বেষ দূর করিয়া শুদ্ধা ভক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে, সপ্তকোটি সন্তানের হৃদয়ের ভক্তিপ্রসূত যে মহাতাব যে মহাশক্তি, তাহাই বঙ্গের ভূগোঁসব। আজ এই মহাষ্টমীর ঘোরা রজনীর নিরঞ্জন শ্মশানে বসিয়া আমি যে মায়েস রূপ প্রত্যক্ষ করিতেছি, হে বাঙ্গালী! সে চিন্ময়ী দেবীপ্রতিমাকে বাংলার মাটিতে গড়িয়া তুলিতে পারিবে কি? এই অসীম অন্ধকারে যে হিরণ্যময়ী মূর্তি-ভুবিয়া আছে তাহাকে মাথায় করিয়া বাংলার ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে কি? যে বীর, যে সাধক, যে আত্মজয়ী, সেই জননীর সন্ধান পায়, এস আমরা এই বীরাষ্টমীর পুণ্যরজনীতে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষালাভ করি, এস আমাদের মাথায় তর করিয়া জননীকে বঙ্গের হৃদয়-সিংহাসনে নামাইয়া আনি, দেখ সিংহবাহিনীর দক্ষিণে বাংলার শ্রী-সৌভাগ্য-লক্ষ্মীরূপিনী মহাদেবী, বামে বিদ্যা-বিজ্ঞান-বাণীময়ী বাণীমূর্তি, মহাসিদ্ধিরূপী গণেশ ও দ্বিসপ্তকোটি ভূজবল মূর্তিমান কান্তিকেরূপে বিরাজিত। বাঙ্গালী! তোমার কিসের অভাব?

কিন্তু কৈ তোমাদের অন্তরের বল, কৈ তোমাদের অটুট শ্রদ্ধা, কৈ তোমাদের হৃজয় সঙ্কল্প? বাংলার স্রুপ্ত চৈতন্যকে জাগ্রত করিয়া তুলিবার জন্য, এই পুণ্য তিথিতে, এই রজনীর মহাসন্ধিক্ষণে, এস আমরা, আমরা

চিন্ময়ী দেবীমূর্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলি, এস বাংলায় দুর্গোৎসবের মহামেলয়
বসাইয়া দিই, এস ভক্তিগদগদ কণ্ঠে গান করি—

“বাহতে তুমি মা শক্তি,

হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,

ভোম্মারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।

স্বংহি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী।

কমলা কমল-দল-বিহারিণী

বাণী বিদ্যাদায়িনী, নমামি বাং,

নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং

সুজলাং সুফলাং মাতরং

বন্দেমাতরম্।

জীবন-সূত্র

মানুষের হৃদয়খানিই পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে জটিল রহস্যময় জিনিষ—কত কি সে
চায় চায় আবার চায় না। সত্য, মুক্তি, প্রেম—এত প্রাণের জিনিষ তো, কিন্তু
এ সব সহজে সরল হৃদয়ে কে চায়? মুক্ত স্বচ্ছন্দভাবে অবস্থান করিতে মানুষের
হুঁষ্টা সরস্বতী যেন তাহাকে কিছুতেই দেয় না—সাধাসিধে পথে সোজা
সুজি চলা তার বুদ্ধিতে সহজে আসে কই? সাধনার সোজা সরল পথ
সহস্র সংশয়ে বাঁকিয়া যায়। বুদ্ধি কুটিল চিন্তার উর্গনাভজালে জড়িত
হইয়া পড়ে, জীবন হইয়া উঠে জটিল সমস্যাপূর্ণ, মুক্ত আনন্দ-উৎস রুদ্ধ
হইয়া গিয়া শুষ্ক দীর্ঘশ্বাসে হৃদয় ভরিয়া যায়—মানুষের সহজ আনন্দময়
আত্মা যেন সাধ করিয়া হাজার বন্ধনের সোপার খাঁচা রচনা করিয়া
স্বচ্ছায় তার বেড়াফালে আপনাকে জড়াইয়া ফেলে, দিন দিন জটিলতর
প্রশ্নপুঞ্জে অভিভূত হইয়া নাতানাবুদ হইতে থাকে। আশ্চর্য্য এইটুকু,
নিজের হাতেগড়া কারাগারে এমন সাধরে নিজের বন্দীদশা নিমন্ত্রণ করিয়া
আলিঙ্গণে, জিজ্ঞাসা করিলেই সেই মানুষই অগ্নানমুখে উত্তর দিতে ছাড়িবে
না—কই সে তো চাহে না বন্ধন, চাহে না কঠোর শৃঙ্খল, সে তো

পিঞ্জর ও কাঁরাগারি ভাঙ্গিয়া চিরদিন বাহির হইতেই চাহিয়াছে—মুক্তির
অন্তাই তো তার সমস্ত প্রাণমন ব্যাকুল। মুক্তি, মুক্তি, মুক্তি! হায়
আত্মপ্রবঞ্চনা—ভাবের ঘরে চুরি না থাকিলে, মানুষ, তোমার মুক্তি প্রতি-
শ্রদ্ধ করিবে কে?

চাই চাই আবার চাই না, পাই পাই তবু পাই না—এইটুকুই হয়ত
জীবনের সৌন্দর্য্য। যদি কবি হইতাম, হয়ত বলিতাম, যে, সহস্রবেদনা-
ভরা হৃদয়ের এই লুকোচুরি খেলা—এই তো স্রুশা, এই তো কবিত্বের রহস্য-
উৎস। যদি শিল্পী হইতাম, হয়ত এই প্রহেলিকার ধ্যানেরে মজিয়া থাকি-
তাম—কিন্তু দূরগত সঙ্গীত-লহরী শুনিয়া উৎকর্ণ মুগশিষ্ট যেমন ননবনাস্তরে
মুগ্ধচিত্তে ছুটিয়া বেড়ায়, বিশ্বভুবনময় তেমনি আতিপাতি করিয়া গায়কের
অমূল্যধ্বনে ফিরিতাম, ছন্দে সুরে বর্ণে রেখায় তার কল্পরূপ ফুটাইতে
চাহিতাম। তত্ত্বদর্শী দার্শনিক হইলে হয়তো ভাবিতাম, আধ-আলো আধ-
আঁধারঘেরা এই তো বিদ্যাঅবিদ্যাময়ী মায়া, সত্য মিথ্যার মিশ্রণময়
এই তো মতিলয়। হইতাম যদি বৈজ্ঞানিক, তাহা হইলে স্বাক্ষ-
স্বাক্ষতর বস্তুচক্ষু নির্মাণ করিয়া শাবিত যুক্তির অন্ত্রে এই রহস্যব্যুহ
খণ্ড খণ্ড করিয়া চিরিয়া দেখিতাম, হয় সমস্তকে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসময়
বস্তুতন্ত্র আকারে প্রমাণপ্রত্যক্ষ করিতে চাহিতাম, না হয় বাহা কিছু
ইন্দ্রিয়গোচর যুক্তিগ্রাহ্য হয় না, সে সমস্তকেই কুহেলিকাময় অসার কল্পনা-
মাত্র বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া নিশ্চিত হইতাম। আমাদের অন্তরের
মধ্যে যে সাধক আছেন, তাঁর কিন্তু এই জীবন-রহস্য মুগ্ধ ও বিমূঢ় হইবার
কিছুই নাই। এই অপূর্ণ জীবন-জগৎ যাহার লীলাকৌতুক, সাধক সেই
লীলাময় ঠাকুরের চরণে মাথা নমিত করিয়া আত্মনিবেদন করেন—ওগো
আনন্দময় সাধব—আমি ধর্ম্মও জানি না, অধর্ম্মও জানি না, পদে পদে
জ্ঞান অজ্ঞান পাপপুণ্য বিচার করিয়া চলিতে চাইও না, পারিও না—
ভালমন্দের দ্বন্দ্ব, সুখ দুঃখের কলহে আর আমার হৃদয়কে ক্ষত বিক্ষত
করিয়া তুলিব না—বন্ধনের আশঙ্কাও যেমন, মুক্তির আকুল পিপাসাও
তেমনি, দুই হাতে অঞ্জলি পুরিয়া তোমার চরণে চিরসমর্পণ করিয়া দিলাম—
আমার ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সবটুকুর ভার তুমিই গ্রহণ কর—তোমার
ইচ্ছাসমুদ্রে আমার তৃপ্তবোধের মত ভাসিতে ডুবিতে নাচিতে খেলিতে, আন-

সের কোতুকরসে চিরবিভোর হইয়া ফিরিতে দাও—আমি আজ উৎসর্গীকৃত,
আজ আমি পূর্ণনিবেদিত।

*

*

*

সেই আত্মসমর্পণযোগ—এ তো সেই পুরাতন কথা—পুনঃ পুনঃ সেই
একই কথা—বিনাইয়া বিনাইয়া তোমরা কও কেন? একই কথার বার
বার পুনরাবৃত্তি করিয়া কি লাভ কি ফল হইবে? হে ক্রান্ত-সাধক!
সহস্রবার একই মন্ত্র একই কণ্ঠে উচ্চারণ করিলাম, আমি কিন্তু আজও
এতটুকু ক্রান্ত হইলাম না—লক্ষ লক্ষ দিবসজননী একই সঙ্গীত ফুকারিয়া
কাটাইলাম—আজিও তো আমার কাণে সে অগাধ রাগিণী পুরাতন
হইয়া গেল না! আমার উৎসর্গের নিবন্ধধারা আজিও তো তেমনি
অশ্রান্তধারে ঢালিয়া দিতেই সাধ যায়, আমার হৃদয়-তরুর একটি একটি
রক্তকুসুম আজিও তো তেমনি অক্রান্ত হস্তেই ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া দেবতার
পদে লুটাইয়া দিতে ইচ্ছা করে, তেমনি তেমনি তেমনি করিয়াই আমার
চির-আরাধ্য ঠাকুরের সঙ্গে কণ্ঠে কণ্ঠে মিলাইয়া মহোল্লাসে উদাত্ত মন্ত্র
ধ্বনিয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা আমার আকুল করিয়া তোলে—হৃদয় আমার
জন্ম-জন্ম সহস্র রসনা মেলিয়া অমৃতরস অন্বেষণ করিল, কিন্তু কণ্ঠ
আমার আজও শুষ্ক ভূবাতুর, পিপাসা আমার আজও অপরিভূক্ত—নহিলে
আরও সুধাধারা, আরও সোমরস, আরও উন্মাদিনী অমিয়বৃষ্টির আশায়
চাতকের মত আজিও আমি উর্ধ্বনেত্রে তাকাইয়া রহিব কেন? সাধ যে
মিটে না, পুরাতন যে সে হয় না, আমার অনন্ত ঠাকুরের আকুলকরা
মুরলীরব যে আজও সমানভাবেই আমায় আহ্বান করিতেছে—চল চল
আমার গুরু, প্রভু, সখা—আমায় সঙ্গে লইয়া তোমার অনন্ত লীলাযাত্রায় চল
—ছুইজনে অসীম-উল্লাস-ভরে নিমেষে কত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিব—কোথাও
কখনও আমি যদি ক্রান্তচরণে ভুলে লুটাইয়া পড়ি, তুমি আমায় কোলে
তুলিয়া লইও—তোমার অগ্নিময় তপশ্বাসে আবার আমার অন্তর
ভরিয়া দিও; আমায় জাগাইয়া তুলিও—তুমিও যদি কোনও দিন পথের
ধূলয় আমার দৃষ্টিছাড়া হইয়া যাও, আমি আমার অশ্রু-সলিল ঢালিয়া
তোমার পথশ্রান্ত চরণদ্বিগু হইয়া দিতে ছুটিয়া আসিব—তোমার সাথে
আবার মিলিব, নয়ন মুছিয়া তোমার হাত ধরিয়া আবার চলিব। আমার
উৎসর্গভাও তো আজিও শূন্য হইয়া ফুরাইয়া যায় নাই—আমার দেবতাও

যেমন- নিত্য নূতন, আমার পূজাও তেমনি অশেষ অফুরন্ত—আজও উৎসর্গের কথা, কালও উৎসর্গের কথাই কহিব—উৎসর্গের পশরা মাথায় বহিয়াই চিরদিন বিশ্বপথে ফিরি করিব—এই একটি আনন্দের গানেই আমি আমার জীবনবেদের অনন্ত পৃষ্ঠা জন্ম জন্ম ভরাইয়া তুলিব।

* * *

এই কঠোর কর্মজগতে, এই সহস্র অভাব ও প্রয়োজনের আন্তর্জনন-ভরা জীবনক্ষেত্রে, শুধু এই কথা ও গান, শুধু এই ভাব ও ভাষার কলোচ্ছ্বাসে কি হইবে? অন্ন বস্ত্র স্বাস্থ্য সম্পদের নিদাক্ষণ অভাবে যে জাতির দেহ মন আজ জীর্ণ শীর্ণ, ভাবের গীতলহরী শুনিয়া তাহার কি প্রয়োজন পূরণ হইবে, সপ্নের অবদানে তাহার কোন্ ক্ষুধা মিটিবে? যে দেশ আজ অধঃপতিত, চিন্তাভারে অবসন্ন, তার জাগরণ কি এই স্বপ্নসঙ্কীতে সুসিদ্ধ হইবে? একি সম্ভব? ক্ষুধায় অন্ন মিলিবে, রোগে পথ্য চিকিৎসা জুটিবে, কপর্দকহীনের শূন্তভাণ্ডার পরিপূর্ণ হইবে কি এই কুহেলিকাময় স্বপ্নমস্ত দিয়া? ভাবের সোণার কাঠি ছোঁয়াইয়াই উপকথার রাজকন্ডার মত এই জীবনমৃত্যু দেশরাগিকে কি জিয়াইয়া তুলিতে চাও—ভাবিয়াছ বুঝি বাস্তব জীবন, সে এমনই তুচ্ছ তরল উপভাসমাত্র না কি? স্বপ্নমুগ্ধ প্রচারক, একটু অপেক্ষা কর, দেখিবে পৃথিবীর অস্থির কক্ষালে ঠেকিয়া এখনই তোমার ভাবের ইন্দ্রপুরী সব চূরনার হইয়া যাইবে—এ কল্পনার ভুবন নয়, এ প্রস্তরকঙ্করময় বাস্তব ভূগোলক—পাগল এখানে কল্পনার সুবর্ণ-প্রাসাদ কয়দিন টিকিতে পারে? এখানে চাই শক্ত কঠোর বস্তুতন্ত্র কাজের কথা—সে কথা কই?

* * *

হাঁ, এস কাজের জগতেই প্রবেশ করি—এস কর্মোৎসাহক কাজের লোক, প্রবল কর্মোৎসাহ লইয়া; এস কর্মসমুদ্রেই ঝাঁপাইয়া পড়ি। কর্ম করিতে কে প্রস্তুত আছে, এস ভাবের কথা সিকায় তুলিয়া রাখিয়া বাস্তব কাজেই হস্তনিয়োগ করি। দেশে কাজের অভাব নাই—বল কি করিবে, কি করিতে চাও? শিক্ষাবিস্তার?—এই অজ্ঞতার পীঠস্থানস্বরূপ ভারতের কোটি কোটি জনারণ্যের চিত-গহবর হইতে ভারে ভারে অন্ধকারস্তূপ খুঁড়িয়া বাহির কর—শিক্ষাপ্রচারের আর এমন বিপুলক্ষেত্র কোথায় আছে? রাষ্ট্রসিদ্ধি? বাও দলে দলে বিশাল প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর লইয়া নরম গরম

কর্মীর দল, সুদূর খেতবীপে আবার ভিক্ষাঞ্জলি পাতিয়া উপবিষ্ট হও—
মুষ্টিভিক্ষা মিলে নাই—কিন্তু এখনও মিলিতে পারে! অথবা উগ্র উত্তেজনা-
ময় কর্মক্ষেত্রে সৃষ্টি করিয়া শতে সহস্রে তাহাতে স্বাধীনতা পড়িয়া নতন
নৃত্যরঙ্গে মাতিয়া যাও—উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হয়ত হইলেও হইতে পারে! ব্যবসা-
বাণিজ্য? শত শত বাণিজ্যপ্রতিষ্ঠান, শত শত সমবায়মণ্ডলী অবিলম্বে
সংস্থাপন করিয়া দেশ ছাইয়া ফেল, অথবা দলে দলে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়া
মাড়োয়ারী ভাটিয়া গুজরী বণিকের পদাঙ্কানুসরণে প্রবৃত্ত হও—জাতির
লক্ষ্মীশ্রী হয়তো ফিরিয়া আসিলেও আসিতে পারে। অন্ন বস্ত্রের হুঃসঙ্কট
দূর করিতে হইবে? রাজসরকারের নিকট পণ্যসামগ্রীর মূল্য পরিমাপ
করিয়া দিবার জন্ত সহস্রবার আবেদন কর, অর্দ্ধ পূর্ণ স্বদেশীভবনের পুনঃ-
প্রচার আরম্ভ করিয়া দাও—আশাপূরণ হয়ত হইলেও হইতে পারে!

সবই করিতে হইবে, বুঝিলাম, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে পারি—কি—
এ সমস্ত করিবে কে? করিবার মানুষ কাহার? তাহাদের চরিত্র কেমন,
তাহাদের যোগ্যতা কিরূপ? কর্মীদের পরম্পরের ভিতরে অন্তরগত সম্বন্ধ
কতটুকু নিবিড় ও গভীর? স্বদেশীযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত অসংখ্য
কর্মতরঙ্গ সৃষ্টি করিয়া আসিতেছি, অসংখ্য কর্মপ্রবাহে আমরা ভাসিয়াছি
—কর্মব্রত অসংখ্য মানুষ দেখিলাম—কিন্তু যে দৈবকরণা পাইয়াছিলাম তাহার
অনুপাতে করিলাম কতটুকু? জাতির মৃতপ্রাণে যে বিপুল প্রেরণা জ্বলিয়া উঠিয়া-
ছিল, তাহা কিসের জন্ত এমন ছলছাড়া হইয়া অকালে নিভিয়া গেল? একই
ভ্রম হইবার না করিয়া এস সর্বপ্রাণে অবেষণ করি, আমাদের জাতীয়যজ্ঞ কিসের
অভাবে নষ্ট হইয়াছিল। এস সর্বপ্রথমে খুঁজিয়া বাহির করি, কোথা
হইতে নিখুঁতভাবে তাহার সত্য আরম্ভ করিতে হইবে। কর্মতরুর মূল
বীজটুকুর অবেষণ করা—ইহাই কি স্বস্থ মস্তিষ্কের সর্বশ্রেষ্ঠ গোড়ার কাজ
নয়? দেখ, আমিও কাজ করিতেই চাই, তুমিও কাজ করিতে চাও—
কিন্তু তবু তুমি আমি মিলিয়া বহুকাল একসঙ্গে কাজ করিতে পারি না
কেন? একযোগে কাজ করা দূরে থাকুক, ঠিক একই সঙ্কল্পে উপনীত
হইতেও অসমর্থ হই কেন? তারও গোড়ার কথা, তুমি আমি মিলিব
কেন, তুমি আমার কে, আমিই বা তোমার কে? দেশ-দশ-জগৎ-সেবা
সবেরই আগের কথা হইতেছে এই, তোমার সঙ্গে আমার সর্বপ্রাণে সত্য

স্বধৰ্ম্মটুকু আবিষ্কার করিয়া ফেলিতে হইবে, তোমার মধ্যে আমার স্থান কোথায়, আমার মধ্যে তোমার স্থান কোথায়? আদৌ কোনও স্থান আছে কি? যদি তাহা থাকে, যদি তোমায় আমি জানিতে ও পাইতে, আমার তুমি জানিতে ও পাইতে পারিয়া থাক, তবেই তোমায় আমার মিলিয়া নূতন সৃষ্টির জন্মদান করিতে পারিব—মিলনের ফলেই নব সৃষ্টির উদ্ভব—জন্ম-বিজ্ঞানের মত কৰ্ম্মবিজ্ঞানেরও এই অকাট্য মহাহুত্র—তোমায় সঙ্গে আমার পূৰ্ণসম্মিলন না ঘটিলে আমাদের ভিতর হইতে কোনও মহাকর্ষের উদয় অসম্ভব। এইখানেই আরম্ভ—তোমায় আমার জানা পাওয়া, এই তো মূল কৰ্ম্মহুত্র—আদিরস ধরিয়া যেমন সকল রসের উদ্ভব, তেমনি এই আদিহুত্র ধরিয়াই সকল বিচিত্র কৰ্ম্মধারা অবহেলে ফুটাইয়া তুলিব—মানুষের সঙ্গে মানুষের সত্যযোগ না হইলে সত্যকৰ্ম্ম সম্ভবে না, মানুষের সঙ্গে মানুষের হৃদয়-সম্মিলন না ঘটিলে বজ্রদূত কৰ্ম্মসংঘ গড়িয়া উঠে না, এমন দিব্য ভ্রাতৃসংঘ না হইলে, কিছুতেই ভারতের যজ্ঞ হুসম্পন্ন হইবে না। আর কত করিয়া বলিব বুঝাইব—ভারতের কৰ্ম্মের এই প্রকৃষ্টতম পন্থা—এই জগুই তো যোগসাধনার প্রয়োজন—এইজগুই তো তোমায় আমার আত্মনিবেদন—ভগবানের মধ্যে পরস্পরের স্বতন্ত্র ‘অহং’ মিলাইয়া দিয়াই পরস্পরকে অখণ্ডভাবে জানিব ও পাইব। পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব যুগে যোগ ছিল ব্যাধিসাধনা, ব্যাধি-মুক্তির জন্ত তপস্শ্রমাদি—আজ ভগবান্ দেবজাতির মহাসাধনা আরম্ভ করিয়াছেন, মানুষের সমষ্টি-মুক্তি সমষ্টি-সিদ্ধির জগুই আত্ম-সম্পর্ক যোগ নূতনভাবে অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

তত্ত্ব-সাধনা

(৪)

এই সকলই আমরা পাইয়াছি, পাইতেছি কিবা পাইতে চলিয়াছি—প্রকৃতি-সিদ্ধ আমাদের শরীর প্রাণ, মন বুদ্ধি এবং অধ্যাত্ম সত্তা। চাই এক্ষণে যোগ। যোগের দ্বারাই প্রকৃতির এই বিপুল তপস্যা পূর্ণ হইবে।

ভগবানের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্তই যোগ। কে মিলিবে? প্রকৃতি-রাণী তাঁহার জীবন-স্বামীকে কণ্ঠে পূজার মন্দার-মালা পরাইয়া দিবেন—এই গুপ্ত প্রেরণাই তাঁর অন্তরে অন্তরে প্রবহমান, এই প্রেরণার বশেই তাঁহার সৃষ্টিরচনা। জীব এই সৃষ্টির মধ্যবিন্দু—অনাদি অনন্ত সংসার-তরুর শ্রেষ্ঠ ফল—প্রকৃতিও নিত্য, জীবও নিত্য—নিত্য জননীর নিত্য সন্তান। তরু যেমন শাখাপল্লব পত্রপুষ্প সমস্ত ফুটাইয়াও ফল ধারণ করিয়াই পূর্ণবিকশিত হয়, সতী যেমন পতির চরণে তনু প্রাণ মন সর্বত্র উৎসর্গ করিয়াও সন্তান-কোড়ে জননী সাজিয়াই স্বামীকে পূর্ণপরিভূষ্ট করেন—তেমনি আদ্যা বিশ্বদেবী যতক্ষণ না অপূর্ণ মাতৃরূপে স্নেহকোড় স্নশোভিত করিয়া স্বামী-সকাশে উপনীত হইতেছেন, প্রাণেশ্বরের চরণপদ্মে আপনার সেই শ্রেষ্ঠ প্রেমোপহারটুকু আনিয়া ঢালিয়া দিতে পারিতেছেন, ততক্ষণ তাঁহার পূর্ণ সার্থকতা নাই। মহামাতার শ্রেষ্ঠ পূজা সন্তানের ভিতর দিয়াই সম্পন্ন হইবে। প্রকৃতি-জীবের ভিতর দিয়াই দেবতার সহিত যুক্ত হইবেন। যোগে তাই ত্রয়ীর প্রয়োজন। চিরবিরহিণী জগৎ-রাণী অনন্ত ঠাকুরের অভিসারে চলিয়াছেন—লক্ষ্য পূর্ণ সম্মিলন—কিন্তু জীবই শিবশক্তির সেই মিলন-সূত্র—জীবই যোগ-যন্ত্র।

হিন্দু-সন্তান এই নিগূঢ় লীলারহস্য মর্মে মর্মে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল—অসংখ্য সাধনপথ ধরিয়া সে লীলা চরিতার্থ করিতে চলিয়াছিল। ইহারই জন্ত সে যুগে যুগে তপস্যা করিয়াছে—আসন প্রাণায়াম, ধ্যান ধারণা, জ্ঞান ভক্তি, ভোগ কর্ম, সকল পথ সকল সূত্র ধরিয়াই প্রকৃতির চরম সত্তীষ্টটুকু সিদ্ধ করিবার জন্ত জন্ম জন্ম প্রাণপাত সাধনা করিয়া আসিয়াছে—হিন্দুর সে তপস্যা অতুলনীয়—ভগবানের জন্ত এমন কোনও কঠোর

ভক্ত সাধন নাই যাহা সে করে নাই—সকল অগ্নিপরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া আজ সে যেখানে আসিয়া উপনীত, সেখানে দাঁড়াইয়া দেখ—তার সাধনা সিদ্ধপ্রাপ্ত মহাসিদ্ধি তার করতলগত হইবার জন্যই অলক্ষিতে প্রতীক্ষা করিতেছে।

বিভিন্ন যোগগুলি খণ্ডে খণ্ডে পুনরভ্যাস করিয়া আর তাহার অনর্থক কালহরণ করিবার আবশ্যক নাই। সেই সকল খণ্ডসিদ্ধি আজ তাহার ভগ্নভাষ্যান্তরগত অধ্যাত্মসম্পাদ—এই পৈতৃক ধর্ম্মার্থধোর সেইই অপ্রতিদ্বন্দ্বী উত্তরাধিকারী—কেবল আত্ম-অধিকার পুনঃস্বরণপূর্বক তাহা বুঝিয়া পড়িয়া লওয়াই একমাত্র প্রয়োজন। ভারতবর্ষের মহাত্মা আজ এইটুকুমাত্র—আপনার করগত যোগসিদ্ধিরাজি সম্বরণপূর্বক বিশ্বমানবের কল্যাণে তাহা বিধিপূর্বক উৎসর্গ করিতে হইবে।

তাই আমাদের ধর্ম্মসম্পদের একবার যাচাই প্রয়োজন। যুগযুগান্তরের তপোলব্ধ কি অমূল্য মূলধন আমাদের অধ্যাত্মভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া রাখি-
য়াছে? প্রকৃতির সাধারণ দানগুলির যেমন একটা হিসাব নিকাশ করিয়া
জাইয়াছি, তেমন আমাদের করগত যোগৈশ্বর্য্যসমুহও একবার পরিদর্শন
করিয়া লইতে হইবে। কারণ প্রকৃতপক্ষে এইগুলিই হিন্দুর সত্য জাতীয়-
সম্পদ। এই মূলধন খাটাইয়া আরও অগ্রসর হওয়াই তাহার জীবন-
বাণিজ্যে সফল আত্মবিস্তার করিবার একমাত্র পথ।

খুব সংক্ষেপেই বলি, আমাদের সাধন-ভাণ্ডারে যে সকল মহামূল্য নিধি
সংগৃহীত হইয়াছে—তাহা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—বৈদিক
ও তান্ত্রিক। আসমুদ্রহিমাচল সমগ্র ভারতে এই দুইপ্রকার যোগদীক্ষাই
প্রচলিত—বৈদিক ও তান্ত্রিক, এই দুই দীক্ষামস্তের অনুশাসনে বিংশকোটি
হিন্দুর ধর্ম্ম কর্ম্ম সমাজ জীবন সমুদয় নিয়ন্ত্রিত হইতেছে।

বৈদিকসিদ্ধি পঞ্চখণ্ডে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়—বুদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া
শরীর পর্য্যন্ত জীবনের পঞ্চযন্ত্র—এই পঞ্চ যন্ত্রের পঞ্চ ধর্ম্ম—জ্ঞান প্রেম ও
শক্তির সিদ্ধি, এবং অন্তঃকরণ ও বহিঃকরণের সিদ্ধি—পঞ্চযোগ-পথে এই
পঞ্চসিদ্ধি অধিগম্য। একদিকে এই সকলের সমবয় প্রয়োজনীয়। ইহার
সবিস্তার আলোচনা আমরা নানাস্থানে করিয়াছি। অতীত তান্ত্রিক
যোগসিদ্ধি—উহারও দুইটা ধারা, দুইটা পর্য্যায়—এক্ষণে উহারই একটু
সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণের প্রয়োজন।

তত্ত্ব দুই ধারায় চলিয়াছে—যেন একটি অক্ষর হইতে দুইটি কিশলয় উৎপত্ত। ভগবানের দুইটি স্বভাব (Self-aspect) অবলম্বন করিয়া তন্ত্রের বাম ও দক্ষিণমার্গ। চৈতন্য ও আনন্দ—জীবনের, সত্তার, সংস্করণ ভগবানের এই দুইটি দিক—যেন একই বিহঙ্গের যুক্ত পক্ষপুট—চৈতন্যের দ্বারা পরিয়া দক্ষিণাচার, আনন্দকে আশ্রয় করিয়া বামাচার। তাই দক্ষিণাচার জ্ঞানমুখী জ্ঞানাপ্রিত, বামাচার আগাগোড়া অনবচ্ছিন্ন ভোগময়।

উত্তম, মধ্যম ও অধম—এই অধিকারীভেদে তন্ত্রের দিব্য, বীর ও পশুভাব। যাহারা স্থলজীবনের মধ্যেই অন্ধভাবে অবরুদ্ধ, তাহাদের জন্ম পশুভাবের সাধনক্রম। দেহ প্রাণ ছাঁড়াইয়া যাহাদের চেতনা মনের স্তরে উঠিয়াছে, পশুজীবনকে সংযত করিয়া যাহারা মনে পৌঁছিয়াছে, তাহাদের বীরাচারে অধিকার—মন লইয়াই মাহুষ—এই জীবন-যুদ্ধে বীরযোদ্ধার মত বীরভোগ্যা বহুধরার সকল বিষয় সুবলে আকর্ষণ করিবার জন্ম ইহার। প্রকৃত—জীবনের উগ্রমধুর সকল রস সন্তোষ করিবার ইহার স্পর্ধা রাখে। বাংলার কুলবধু মজাইয়া রজনীর অবগুণ্ঠনের আড়ালে যে সকল রক্ততিলক-ধারী রক্তবস্ত্রপরিহিত কদ্রাক্ষপরিশোভিত ভৈরব-সাধকের বীভৎস লীলা এখনও ঘরে ঘরে গোপনে প্রবাহিত, তাহারা নামে বীরাচারী হইলেও, প্রকৃত তান্ত্রিক পরিভাষায় ঘোরতর অধমাচারী। এই সকল হীনপ্রাণ ভৈরবভৈরবীকুলের অধিকাংশই আবার ভেকধারী কপট ছদ্মভূত—সাধনা তাহাদের কণার কথামাত্র—ধর্মের দোহাই দিয়া জঘন্য দুষ্ক্রিয়। তাহাদের একমাত্র প্রবৃত্তি—ইহারা বিকট ব্যাভিচারপরায়ণ, ঘোর ভণ্ড, পাষাণের দল।

প্রকৃত বীরাচারী তান্ত্রিক এমন ভীকু অনাচারী নয়—ইহারা ভোগী বটে, কিন্তু স্পর্ধিত বীরভোগী—ইহারা তেজস্বী ও বীরাবান—চাঁদরায়, ফেদাররায় প্রভৃতি বীরহৃদয় হিন্দুর্বাদনাবৃন্দ অধিকাংশই প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক গুরুগণের মন্ত্রশিষ্য—অনেকে স্বয়ং উৎকৃষ্ট বীরসাধকও ছিলেন। প্রবল রজোগুণসম্পন্ন বীরাচারী শক্তিসাধক সিদ্ধাই-উপার্জনের প্রলোভনে পড়িয়া অনেক সময়ে অতি গর্হিত নৃশংস আচরণে প্রবৃত্ত হইলেও, সাধারণতঃ ইহাদের শক্তিমন্ত্রে সমাজে ভোগসামর্থ্য সঞ্চিত হইত—মাহুষ দেবতা না হইলেও এবং নির্মমহৃদয় দ্বানবে পরিণত হইবার প্রচুর সম্ভাবনা থাকিলেও, এই শ্রেণীর তন্ত্রসাধনা বাংলার হিন্দুসমাজে মহাযোচিত তেজঃ বীৰ্য শক্তি সাহস স্পর্ধার সংরক্ষণ ও অনুশীলনে কথঞ্চিৎ সহায়তা করিত। তন্ত্রের

পঞ্চাচার সর্বসাধারণের জন্ত—সমাজের হীনস্তরে যে অলস তমোপূর্ণ অব-
সাদগ্রস্ত পশুজীবন, আচারনিষ্ঠার অনুশাসন পূজাহোম ভোগরোগ অনুষ্ঠান-
বহুলতার সাহায্যে তাহাকে একটু চঞ্চল ও জাগ্রত করিবার প্রচেষ্টা
উহার মধ্যে ছিল, এ অনুমান অসম্ভব নয়। কলিযুগে পশুভাব ও দিব্য
ভাবের নিষেধ আছে; তাহার কারণ অব্বেষণ করা দুঃকর নয়—প্রবল
কলির পূর্ণপ্রভাবকালে মনুষ্যসমাজের শাস্তি-শৃঙ্খলাটুকু ভাঙ্গিয়া যায়—
এ প্রচণ্ড বিপ্লবের অগ্নিময় যুগ—এ যুগে দিব্যভাবের সমুচ্চ সামঞ্জস্য
এখনও অনাগত এবং পঞ্চাচার যে অধস্তন তামস ত্ত্বের উপযোগী,
উহাও চূর্ণ হওয়ায় তাহারও প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। কলিযুগ একেবারে অধমযুগ
নয়, কারণ ইহা প্রকৃতপক্ষে চক্রাবর্তনের যুগ, ঘোর বিপ্লবের মধ্য দিয়া
জড়ত্বের স্তূপ চূর্ণ করিয়া সত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার ইহাই তাণ্ডব
নৃত্যময় রুদ্ধ সন্ধিকাল। কলির জন্ত তাই তন্ত্রের ব্যবস্থা এবং তন্ত্রের বীরা-
চারই হিন্দুশাস্ত্রে প্রশস্ত বলিয়া নির্দেশিত হইয়াছে।

বীরাচার উদ্দাম প্রবৃত্তিকে উচ্ছৃঙ্খলভাবে ছাড়িয়া দিয়া, সমাজের
সমস্ত গুপ্ত ভোগবৃত্তি সমস্ত লেলিহান বাসনার মুখে ইন্ধন যোগাইয়া রজঃ-
গুণকে পরিশুদ্ধ করিয়া লইতে চায়। যে সব ক্ষুব্ধিত ভোগ-তাড়না
মানুষের প্রাণে হৃদয়ে মনে লুক্কায়িত, তাহাদের জাগাইয়া তুলিয়া, তাহা-
দের লক্ষ লক্ষ সহস্র শিখার সম্মুখে সহস্র ভোগ্য উপকরণ ধরিয়া, কাম-
নার অনলকুণ্ডে রাশি রাশি যত্নাতিদানে উহাকে পরিতৃপ্ত করিয়া,
মানুষকে শুদ্ধ ও মুক্ত করিবার বিস্তৃত আয়োজন—ইহাই বীরাচার সাধনা।
উদ্দেশ্য, ভোগের তর্পণেই যোগের পথ পরিস্কৃত করিবে, প্রবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত
করিয়াই নিবৃত্তির শান্ত স্বপ্না ফুটাইয়া তুলিবে—ভোগঃ যোগায়তে, সম্যক
হৃদ্যতঃ স্বকৃত্যয়তে, মোক্ষায়তে চ সংসারঃ।

এইজন্ত পঞ্চমকার লইয়া বীরাচারীর সাধনা; মানুষের যতগুলি হৃদয়
ভোগলালসা আছে—মদ্য মাংস মৈথুন প্রভৃতি—তাহাদের পূর্ণ চরিতার্থতাই
তাহার অনুষ্ঠান। সর্বোৎকৃষ্ট আহাৰ্য্য পানীয়, সর্বশ্রেষ্ঠ রূপযৌবন
সন্তোগ করিয়া তন্ত্রের বরদৃষ্ট সাধক জীবনের সিদ্ধি হস্তগত করিতে
চাহিয়াছিল। এ যেন অনেকটা জর্মনীর মন্ত্রগুরু নীটশের ভোগবাদেরই
আদি হিন্দুসংস্করণ—“The best food, the purest sky, the
loftiest thought and the fairest woman”—বীরাধিকের এই

সমুদয়ই যোগ্য ভোগোপকরণ। তবে পাশ্চাত্য দানব এই ভোগমদে প্রমত্ত হইয়া দুইহাতে তাহা বাঁটিয়াই জীবন শেষ করিতে চায়—ইহা ছাড়া সে আর কিছু জানে নাই বুঝে নাই; হিন্দুতান্ত্রিক এই সহস্রমুখ ভোগ-প্রদীপ জালিয়াও শক্তিরাগীর অঙ্গুলিনির্দেশের উপর দৃষ্টিস্থির রাখিবার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়াছিল—যে দৃষ্টিভ্রষ্ট হইবে, সে যোগাচ্যুত হইয়া নিরয়-গর্তে পড়িবে—হিন্দু সাধক জানিত এ পতনসম্ভাবনা সুপ্রচুর, তত্রাপি আদ্যাশক্তির করুণাকটাক্ষ লক্ষ্য করিয়া চলাই তাহার মূল অভিপ্রায় ছিল। পাশ্চাত্য ভোগবাদী এই গুপ্ত সন্ধানটুকুই অনবগত—কি জন্মনীর প্রচণ্ড রণচণ্ডীর উপাসনা, কি কৃষিয়ার দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য ভৈরব-রুদ্ৰ সাধনা, সর্বত্রই শুধু এই অন্ধ মত্ত আত্মহারা ভোগ-পূজা—হিন্দু কিন্তু ভোগসমুদ্রি মন্থন করিয়া অমৃত আহরণ করিবার পথেই ছুটিয়াছিল।

তন্ত্রের সর্বোৎকৃষ্ট স্তর হইতেছে দিব্যভাব—সিদ্ধ-কৌল মাতৃসাধক সংখ্যায় খুব মুষ্টিমের হইলেও, ইহারাই তন্ত্রের সত্যমূর্তিটির অধিকারী, ইহারাই উত্তম সাধক। মহাদেবীর রূপাসিদ্ধ এই শ্রেষ্ঠ সাধককুল দক্ষিণা-কালীর দিব্য মহাশক্তি সম্বতনে সংরক্ষণ করিয়া আসিয়াছেন—একদিন তাঁহাদেরই তপঃশুদ্ধ শক্তির বিহ্ব্যৎ-প্রভাবে বিশ্বমানবের সাধনা পূর্ণ ও সফল হইবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ যে ভাগবত শক্তি মূর্তিপরিশ্রুতপূর্বক অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, জগদ্বাসী এখনও তাহার সিদ্ধ প্রকাশের খুব অতন্ন পরিচয়ই পাইয়াছে।

দিব্যভাবের সিদ্ধ সাধক দেবীর বরাশীর্ষাদে অপূর্ব সিদ্ধির অধিকারী—তাঁহার জীবন সকল বেদবিধির পার, সমুদয় শাস্ত্রবন্ধন ত্রিষাষ্টাঙ্গের রহিত—তাঁহার সাধনাও অভাবনীয় বিচিত্র। সে সাধকের সাধনার প্রকরণ উপকরণও সবই অভিনব—পঞ্চমকার ঐসখানে পরিবর্তিত, অপার্থিব নৃতন মহিনায় মণ্ডিত—জগজ্জননীর বরপুত্রের চক্ষে সমস্ত নারীজাতি অখণ্ড মাতৃরূপে আবিভূতা, মাতৃনামের ঘনীভূত মহামৃত ভোজনে তাঁহার রসনা দিবানিশি পরিভূত, সহস্রদল হইতে অজস্র ধারে নিত্যক্ষরিত অনন্ত সুধারস আশ্বাদন করিয়া মাতৃপ্রেমোন্মত্ত সিদ্ধ সন্তান আত্মহারা পাগল—দিব্যসাধক ভাগবত ভোগসমুদ্রে ভাসমান। তাঁহারই ভোগ প্রকৃত যোগ। যতে, তাঁহারই সমস্ত দৃষ্টি স্মৃতিরূপে পরিণত, তাঁহারই সংসার পরম-মোক্ষপ্রদ, কারণ তাঁহার নিকট যোগ ভোগ, পাগপুণ্য, সংসারমোক্ষ

সমস্তই নিশাইয়া এক হইয়া গিয়াছে

“ঘুচে যাবে সব ভেদাভেদ

রহিবে না মনের খেদ

ওরে শত শত সত্যবেদ তারা আমার নিরাকার।”

অথও সচ্চিদানন্দময়ী মাতৃশক্তির দিব্য পূজায় হিন্দুজীবন এই যে অপূর্ণ
ঐশ্বর্য সম্পদ লাভ করিয়াছে, সমগ্র পৃথিবীমণ্ডলে তাহার তুলনা কোথায়?

অন্ন-সমস্যা

যখন গুণিলাম কেবল জুলাই মাসে, ভারতবর্ষ হইতে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন
দেশে এককোটি বাবটিলক্ষ নব্বই হাজার মণ চাউল রপ্তানি হইয়াছে,
তখনই আমাদের দুর্দশার কারণ বুঝিতে আর বাকী রহিল না।

মোকামে চাউল নাই, এই কথা বাংলার গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে
রটিয়া গেল, চাউলব্যবসায়ীগণ, যে চাউলের মূল্য ছিল ৩, ৭, উহা
১০, ১১ টাকায় বিক্রয় করিতে লাগিল, স্থানে স্থানে টাকায় তিন
সের করিয়া চাউল বিক্রয় হইয়াছে; লুটের ভয়ে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট হাটে
হাটে ফিরিয়া চাউলের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে লাগিলেন, রেশুন হইতে
চাউল আমদানি করা হইল, গভর্ণমেন্ট বাহিরে চাউল রপ্তানি বন্ধ করিয়া
দিলেন,—চাউলের মূল্য কিছু কমিল বটে, কিন্তু দরিদ্রদেশের পক্ষে ইহাও
যে অগ্নিমূল্য, আবার কি ৩, ৪ টাকায় এক মণ চাউল মিলিবে না?

এমন আশা আর আমরা করি না। কিন্তু জীবনের আশা ছাড়িতে
পারিব না, আমাদের বাঁচিতে হইবে, কি খাইয়া বাঁচিব, তাহার যোগাড়
আমাদেরই করিয়া লইতে হইবে। বৎসর বৎসর অনাহার-অন্নাহার-প্রযুক্ত
কীট পতঙ্গের মত কত লোক মরে, তাহার সংবাদ করজন রাখে?
যাহারা রাখেন, তাঁহারা কেবলই আতঙ্কে হাহাকার করেন; আর সর্ব-
নাশের কথা তুলিয়া, মানুষ যাহাতে সমর্থ নয় তাহার চেষ্টা করেন;
কিন্তু কেবল এইরূপ করিলে, আর বড় সফল ফলিবে না। অতএব এক-
দল লোককে কথা ছাড়িয়া কার্যক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইবে।

বাহারা এই কর্মে হস্তক্ষেপ করিবেন, তাঁহাদের কেবল খুদ্বি ও শারীরিক বল থাকিলেই যথেষ্ট হইবে না, খুব বড় চরিত্র-বল থাকা চাই, কেননা একে তো আমাদের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন, তাহার উপর চতুর্দিকেই প্রতিকূল ঘটনা, এরূপক্ষেত্রে সহজে কার্য্যসিদ্ধি হওয়া সম্ভবপর নহে। নানা বাধাবিলম্বে অতিক্রম করিয়া বাঁচিবার সুগম পথ আবিষ্কার করিতে হইলে কিরূপ দৃঢ়চরিত্র ত্যাগশীল কর্মীর প্রয়োজন তাহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে। দেশের প্রাণ কণ্ঠাগত, এরূপ অবস্থায়, অব্যর্থ ঐষধ প্রয়োগ করিতে হইবে, অনভিজ্ঞতার ফলে বার বার নিষ্ফল প্রচেষ্টায় আমাদের জীবন ক্রমশঃই অবসন্ন হইয়া আসিতেছে, কর্ম্মে উদ্যমবিহীন হইয়া পড়িতেছি, যেমন তেমন করিয়া জীবন অতিবাহন করিতে পারিলেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া মনে হইতেছে, ইহা জীবনের লক্ষণ নহে, যদি বাঁচিতেই হয়, তবে মানুষের মতই বাঁচিব।

ডাক্তার প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের অন্তঃসমস্যাসম্বন্ধে শেষ বক্তৃতা পাঠ করিলাম, কিন্তু কথায় কার্য্যসিদ্ধি হয় না, মানুষের কথঞ্চিৎ চৈতন্যসঞ্চার হয় মাত্র, এইক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে; অধিকন্তু তিনি যে কয়টা উপায় নির্দেশ করিয়াছেন, ঐগুলি কিছু নূতন নহে, সকলেই এরূপ কহিয়া থাকেন, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে অবস্থা অগুরুপ হয়।

সর্বপ্রথমে তিনি যে, শ্রমজাত দ্রব্যগুলি ইংরাজ অথবা মাড়োয়ারী বণিকের হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়া গ্রামবাসীগণের কেহ উহা বাজারে বাহাতে বিক্রয় করিতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতে কহিয়াছেন, ঐ কার্য্যে বর্তমান অবস্থার কতখানি অর্থসামর্থ্যের প্রয়োজন, তাহা তিনি অবগত নহেন। পাটের বীজ রোপণের সময় হইতেই কৃষকদিগকে দানন দিয়া রাখিতে হয়, অর্থ থাকিলে বাঙ্গালী যুবকগণ অনেক ব্যবসায় হস্তক্ষেপ করিতে পারিত, বিনা অর্থে, রেলওয়ে ষ্টেশনে দুই দশ টাকার পান বিড়ি ফেরি করিবার মত ব্যবসা যদি শিক্ষিত বাঙ্গালীগণকে করিতে হয়, তবে যে দরিদ্র আজ ঐ ক্ষুদ্র ব্যবসাতুকূলে নিজের অন্তঃস্থান করিতেছে, তাহার স্থান কোথায়? সেও তো আমাদের দেশবাসী! আমরা ব্যবসা করিয়া খাই, ব্যবসাক্ষেত্রের অনেক মত কথা বলিতে পারি, গ্রামে যে সকল বাতাবি লেবু, পেয়ারা প্রভৃতি তুচ্ছ ফলকর বৃক্ষ, তাহাও কলিকাতার ফলব্যবসায়ীগণের নিকট অগ্রিম মূল্যে বিক্রিত, বাদ্য মৎস্যকর জলাভূমি-

শুলি হাজার হাজার টাকায় বিলি হইয়া থাকে—নিক্তহস্তে ব্যবসাকেজে দাঁড়াইবার কথা কলিকাতার সুরমা হস্তান্তরে বসিয়া বলা শোভা পায়, কৰ্মক্ষেত্র কিন্তু খুবই কঠোর এবং বাঙ্গালীর অন্নসমস্যা বড়ই গুরুতর, সহজে ইহার প্রতিবিধান হইবে না।

এতদসম্বন্ধে আর একটা কথা বলিবার আছে। ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র শুনিলে চমৎকৃত হইবেন, একজন ফলব্যবসায়ী বাংলায় গ্রামগুলি হইতে কল সংগ্রহ করিয়া পশ্চিমভারতে পাঠাইয়া থাকেন, প্রতি মাসে তাঁহাকে নারিকেল দড়ি কিনিতে হয়, নৃত্যাধিক দুইশত টাকার, আর তাহার লহনা পড়িয়া আছে কত হাজার হাজার টাকা। এই ব্যবসাসে যথেষ্ট লাভ আছে বলিয়া, কয়েক কাদি কলা একবার পশ্চিমে চালান দিয়া কিল্লখ নাস্তানাবুদ হইয়াছি, তাহা বলিলে, রেলওয়ে কৰ্মচারীগণের উপর দোষারোপ করা হয়, তজ্জন্ত সৈ কথা নাই বলিলাম।

কথা হইতেছে টাকা চাই। সেইজন্যই সহযোগী হিতবাদীতে যখন দেখিলাম, ধনী ব্যবসায়ীগণের পুত্রগণ উচ্চবিদ্যাশিক্ষার মোহে মজিয়া পিতৃমহগণের ব্যবসাকেজ হইতে সরিয়া ডাক্তার উকিল ব্যারিষ্টার হইবার জন্ত উদ্ভ্রীব, তখনই মধ্যবিত্ত ভদ্রসন্তানগণের অবস্থা যে অতীব শোচনীয় হইবে তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না। এই সকল উচ্চশিক্ষিত ভদ্রসন্তানগণ, অর্থাভাবে না পারিবে ব্যবসা করিতে, না পারিবে কোনও উচ্চবৃত্তির দ্বারা জীবন সুখস্বচ্ছন্দে অতিবাহন করিতে, কাজেই বাংলায় যে সকল ব্যবসা বাণিজ্য আছে, ঐগুলি ভাটিয়া, গুজরাটী, মাড়োয়ারী, ইংরাজ প্রভৃতি ভিন্ন দেশবাসীর হস্তে গিয়া পড়িবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

ডাক্তার বায়ের দ্বিতীয় প্রস্তাব—কলেজের ছেলেরা ৫ মাস বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন, বাকী ৭ মাস বড়বাজার প্রভৃতি বাণিজ্যক্ষেত্রগুলিতে ঘুরিয়া ফিরিয়া ব্যবসা-শিক্ষা করিতে পারেন। কলেজের ছাত্র যাহারা তাঁহারা ইহা সম্ভবপর কি না তাহা বুঝিবেন, তবে একরূপ করিয়া ব্যবসা-শিক্ষা হয় না, একথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি।

তিনি তৃতীয় প্রস্তাবে সভ্য কথা বলিয়াছেন, অর্থাৎ, ব্যবসা শিখিবার জন্ত বড় বড় ব্যবসায়ীগণের নিকট যুবকগণকে বিনা বেতনে কৰ্মশিক্ষার জন্য অবস্থান করিতে হইবে, কিন্তু বাহাদুরের অন্নচিন্তা চমৎকার, তাহাদের এই কথা বলা সাজে কি? কলেজে পড়িতে পড়িতেই বাহাদুর তিনটা

ছেলে পড়াইয়া নিজের গড়া ও সংসার খরচ চালাইতে হয়, তাহারা ব্যবসা শিখিবার জন্ত বিনা বেতনে দুই চারি বৎসর শিক্ষানবীশ হইয়া থাকিতে পারে কৈ? আর ব্যবসা শিখিলেই যে তাহারা ব্যবসার জন্য মূলধন পাইবে, এমন আশাও যে তাহাদের নাই, কাজেই চাকুরী ভিন্ন ইহাদের অন্য গতি নাই।

সত্য কথা বলিতে কি, ব্যবসা করিয়া সংসার চালাইতে হইলে একটা চরিত্রের প্রয়োজন, লক্ষ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া খুব বড় ব্যবসা ফাঁদিয়া কলিকাতা সহরে অফিস খুলিয়া বসিতে সাধ্য যায় অনেকের, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসা করিয়া দুই পয়সা উপার্জন করা যে কি পরিশ্রমসাধ্য তাহা ব্যবসায়ী ভিন্ন অপর বুঝিবে না। ধনী ব্যবসায়ীগণ, তাহাদের সন্তানগণ যাহাতে স্বচ্ছন্দে দুই পয়সা রোজগার করিতে পারে, তাহারা আয়োজন করিতে ব্যস্ত হইয়াছেন; কাজেই ডেপুটী হইতে ডাক্তার উকিল ব্যারিষ্টার, এমন কি পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা দিয়া ব্যাঙ্কের ও সওদাগরী অফিসের কেশিয়ার পর্যন্ত ধনীসন্তানগণের দ্বারাই পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, দুই কুড়ি মশ, তিনকুড়ি, বড় জোর একশত টাকা বেতনের কেরানীগিরিই হইয়াছে অধ্যবিত্ত গৃহস্থগণের উপজীবিকা। ইহাও যখন মিলে না, তখনই তাঁরা ব্যবসা করিবার চেষ্টা, এবং এইরূপ যুবকগণকে ব্যবসা করিতে কিঞ্চিৎ অর্থ দিলেও, উহা এক কিস্তিতে নিঃশেষ হইয়া যাইবে। অতি ক্ষুদ্র ব্যবসা করিতে হইলেও যে শিক্ষার প্রয়োজন, ইহা বুঝাইতে গিয়া, আমরা দুইটি ক্ষুদ্র ব্যবসার ভার দুইজন যুবকের উপর নির্ভর করিয়া প্রায় ১০০০ টাকা নষ্ট করিয়াছি। দেশের ধনশালী যাহারা, তাহাদের দেশসেবা এক স্বকর্ম সংগে হইয়া উঠিয়াছে, বড় বড় যৌথ কারবারের বিজ্ঞাপনের শিরোভাগে ইহাদের নাম দেথিবে, কিন্তু ইহাদের সন্তানগণ, কেহ বিলাতে I.C.S. পড়িতেছে, কেহ বা ব্যারিষ্টারী আবার কেহ বা ডাক্তারী শিখিতেছে; অমচিন্তা মধ্যবিত্ত গৃহস্থসন্তানগণের, সুতরাং তাহাদিগকেই ইহার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে।

প্রথম কথা ব্যবসা-শিক্ষা। এই শিক্ষা যাহারা অর্জন করিবেন, স্বভাবতঃ তাহারা দরিদ্র। শিক্ষাকালে তো অর্থাগম হইবে না, এই অবস্থায় ইহাদের সংসার চলিবে কি প্রকারে?

আমরা যে উপায়ের দ্বারা দেশের এই অনসমস্যার সমাধান প্রচার করি-

তেছি, তাহা কথঞ্চিৎ পরিমানে সুসিদ্ধ করিতে না পারিলে সে সকল কথার উল্লেখ করিব না। তবে একটা কথা এই—দেশের ধর্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতির উন্নতি বিধান করিতে হইলে, এমন একদল লোক চাই, যাহাদের স্বার্থ বলিয়া কোনও জিনিষ নাই, ধর্মপ্রচার যেমন সর্ব-ভাগী সন্ন্যাসীর দ্বারাই সম্ভব, দেশোন্নতিমূলক সকল অঙ্গই ধর্মবিশেষ, সুতরাং এই অর্থনীতির সংস্কার-বিধান করিতে হইলেও, একদল সন্ন্যাসীর প্রয়োজন।

এই সকল সন্ন্যাসী মুক্তি মোক্ষের জন্য সাধনা করিবেন না, ভগবানের ইচ্ছা-পরিচালিত যন্ত্রের মত কার্য্য করিবেন, ভাগবতপ্রীতিই হইবে ইহাদের কর্ম্ম-ইষণা। অনেকেই জীবন-যাত্রার হ্রগম পথটিকে সুগম করিবার জন্য সর্বভাগী হইয়াছেন বটে, কিন্তু অবস্থাবিশেষের পরিবর্তন-হেতু তাঁহাদের এই যে আশ্রয়ভাগ, ইহা সফল হইবে না, আশ্রয়চ্যুতন্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া ভাগবতপ্রীতির রসাস্বাদে জীবনকে নূতন করিয়া গড়িয়া লইতে না পারিলে, অক্লান্ত পরিশ্রমে পৃথিবীর এই কর্কশ যন্ত্রটিকে গড়াইয়া দিতে সমর্থ হইবে না। বাহিরের এই অপ্রিয় কর্ম্ম, ভিতরের শান্তি ও সমভায়, আনন্দের বলিয়াই অমুভূত হইবে, সুতরাং জীবনের সব সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, তুচ্ছ পৃথিবীর অর্থসমস্যা-সমাপানে কে রাজী হইবে? ভারতের যে প্রবল ধর্মসংস্কার, উহা অনায়াসেই ত্যাগী কর্ম্মীকে তুরীয়ার পথেই লইয়া চপিব।

তুরীয় সভায় সবধানি পূর্ণ করিবার আনন্দ যাহাদের আছে, তাঁহাদের তাপোবলেই পার্থিব প্রতিষ্ঠানের যে সকল উপাদান, তাহা সংগৃহীত হইবে। পৃথিবী জীবের বিহারক্ষেত্রে, জীবের মঙ্গলার্থ যাহাদের জীবন উৎসর্গীকৃত, জীবের মধ্যে নারায়ণের অধিষ্ঠান যাহারা প্রত্যক্ষ করিতে চাহেন, এই নারায়ণের ভোগারতির জন্ত যে সিদ্ধ-সম্পদ গুপ্ত আছে, এই সকল সাধককেই তাহা প্রকাশ করিয়া তুলিতে হইবে।

পাশ্চাত্য এই অর্থনীতির আলোচনাকালে প্রথমে ভাবিয়াছিল, Co-operative Credit Society প্রতিষ্ঠিত হইলে, এই সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান হইবে, কিন্তু এক্ষণে এই অর্থের সদ্যবহার করিবার প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য স্পষ্ট বলিতেছে, শুধু Co-operative Credit Society খুলিলেই ইহা সফল হইবে না, পরন্তু Co-operation চাই।

কিন্তু এই Co-operationটা কি দিয়া হইবে? বাহিরের প্রয়োজন

কি মানুষের সঙ্গে সত্য Co-operation আনিয়া দিবে? Co-operation কেমন করিয়া হইতে পারে তাহা এখনও গবেষণামন্দিরে অবরুদ্ধ, আমরা Co-operation ছাড়াইয়া আরও উপরের কথা বলি—চাই মিলন। কর্মীগণের পরস্পরের মধ্যে মিলন ঘটাইতে হইলে, আপন আপন স্বার্থ ও বাসনা পরিত্যাগ করিতে হইবে, পরস্পরকে ভালবাসিতে হইবে, বৃহৎ সমষ্টির স্বার্থটিকে একই কেন্দ্রে টানিয়া আনিতে হইবে, একটা স্বার্থই হইবে তখন জাতিগত জীবন, উপার্জিত অর্থ বা কৃষিজাত দ্রব্য তখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে, উহা সমষ্টিগত বা জাতিগত। কর্মীগণের কর্ম এবং তৎফল তখন কাহারও নহে, সে একটা অনির্দেশ্য দেবতার, অথবা প্রতি আধারে যিনি বিরাজ করেন, তিনিই তাহার সাক্ষী ও ফলভোক্তা এবং সেই সত্তা শুধু ব্যক্তিজীবনে নহেন, তিনিই সমষ্টি-জীবনের কেন্দ্রপতি।

কথাটা তলাইয়া বুঝিতে হইবে। উপর হইতে যে প্রেরণা, তাহা যতক্ষণ না মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে, ততক্ষণ উহার সঠিক চিত্র অঙ্কন বিধেয় নহে, এবং তাহার সকল রেখা যথাযোগ্য নাও হইতে পারে। আমরা উপর হইতে নিম্নে ছুটিয়াছি, উপরের ঐশ্বর্য্য দিয়া নীচের বেদী রচিয়া তুলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, যেমন যেমন রচনা হইবে, তেমন তেমন প্রকাশই বাঞ্ছনীয়, তবে অদূর ভবিষ্যতে যে দেব-জাতির অভ্যুত্থান লক্ষ্য করিতেছি, তাহার মর্ত্য-প্রতিষ্ঠান অটুট করিয়া তুলিবার জন্য উপরের ঐশ্বর্য্যই ভারে ভারে নামাইয়া আনিতে হইবে। তাহার জন্য সম্মাসীন প্রয়োজন—স্বার্থপর সংসারীর দ্বারা তাহা সম্ভব হইবে না।

আমার প্রার্থনা

তোমরা আমার কাজ করিতে বল, কিন্তু কি হইয়া কাজ করিব ? আমার আছে কি ? এই রক্তমাংসের টিপিটাকে নাড়াচাড়া করিলেই কি কাজ করা হইবে ? যিনি কার্য করিবেন, তিনি যে এখনও আমার স্ব-
খানিকে অধিকার করেন নাই—আমার হৃদয় যে রাবণের চিতার মত হ-
হ করিয়া জ্বলিতেছে, তাঁর শীতল করম্পর্শে আমার সর্বাঙ্গ যে এখনও
উৎফুল্ল হইয়া উঠে নাই আমার শক্তি, আমার প্রেম, আমার জ্ঞান-
সকলই যে সীমাবদ্ধ—কুপমণ্ডকের মত অহঙ্কারে ফাটিয়া মরিলাম, এই
দারুণ সঙ্গীর্ণতা হইতে আমার মুক্ত করিতে তাঁর মঙ্গল হস্তখানি আগাইয়া
আসিতেছে কৈ ?

কেবল বুঝিয়াছি—উপর দিক হইতে একটা টান আসিয়াছে—আমার
ভিতরের ইচ্ছা, এই টানে উঠিয়া পড়ি, কিন্তু বাহিরের কোঁক টানাটানি
করিতেছে, ইহাকে সংস্কার বলিতে পার। আর এই সংস্কার কেবল আমার
একলার নহে, কেননা আমি আত্মজীবনের জন্ত কিছু করিতেছি না,
সমষ্টিজীবনের অন্তঃস্বত্ব আমি ভারি হইয়া পড়িতেছি, অন্তরের বলই বড়
বল, আমাদের মধ্যে যে কেহ এই অন্তঃস্বত্বনাশ সিদ্ধি পাইলে আমরা
মুক্তি পাইব।

আমার সংঘম, আমার তপস্যা, আমার সাধন ভজনই যদি আমার
উর্দ্ধে উত্তোলিত করে, তবে সমষ্টিজীবনের এই অন্তঃস্বত্বনাকে গ্রাহ্য করি-
বার প্রয়োজন কি ? অন্তরের মাহুষ যিনি, তাঁর টালের জোরে বাহিরের
সকল বাধন যদি না টুটিয়া যায়, তবে তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া লাভ
কি ? আমার চেষ্টা, আমার ইচ্ছাই যদি আমার একমাত্র অবলম্বন হইত, তাহা
হইলে ভিতরের দেবতাটির চরণে মাথা খুঁড়িয়া মরিব কেন ? তোমরা
বলিতে পার—আমার ইচ্ছা, আমার চেষ্টা, সকলই এই অন্তর-পুরুষের
প্রেরণা, কিন্তু তাহা বুঝিতে পারি কৈ ? অবিকৃত শুদ্ধ আকারে তাঁর
মঙ্গল ইচ্ছাটি আমার জীবনে ছড়াইয়া পড়ে কৈ ? এ যে ঘোর বিকার,
এ যে দারুণ অহঙ্কার ! হে ভগবান, যোলআনা দ্রিবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু

লইবার জন্ম তোমার প্রেমবিগলিত স্বকুমার বাহুদ্রী আমায় জড়াইয়া ধরে কৈ ?

তুমি আছ, এ বিশ্বাস হইয়াছে। এই আধারেও আছ, তাহাও বুঝিতে পারি, কিন্তু তোমার প্রকাশ কৈ ? যাহাকে বুকের কাছে ধরি, সেই যে সাপ হইয়া দংশন করে, সে বিষ তো তাহার নহে, ইহা যে আমারই অন্তরের জ্বালা, আমারই পরশে প্রেমহার কালফণী হইয়া যায়। অন্তরের কোন্ মণিকোটায় আপনাকে গোপন করিয়া রাখিয়াছ, প্রভু, তোমার পরশহীন হইয়া বাহির যে গলিয়া গলিয়া বিধাত্ত হইয়া উঠিল; অন্তরে অন্তরে তোমার অপার্থিব প্রেমাস্বাদ লাভ করিলেও বাহিরের পুতিঃগন্ধে জীবন যে পচিয়া ধসিয়া যায়, একবার জাগ্রত হও, একবার অমৃত-উৎসের দ্বার খুলিয়া দাও, মনে প্রাণে, অঙ্গে প্রত্যঙ্গে, সকল ইন্দ্রিয়ে তোমার অমরস্পর্শ কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠুক, আমি পরিত্র হইয়া যাই, আমি দেবজন্ম লাভ করি। মনের মন্দিরে দেখা দিলেও তো, রক্তমাংসের তুচ্ছ আকর্ষণ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না, মনঃ-পদ্ম বিকশিত হইলেও প্রাণের বিকার ত ঘোচে না, তুমি আবিভূত হও, আমার রক্তে মাংসে, আমার অন্তরে বাহিরে, আমি ভরাট হইয়া যাই তোমারই সত্যায়, আমার অস্তিত্ব তোমারই স্বরূপে পরিণত হউক, 'আমি' মরিয়া, 'তুমি' হইয়া থাকুক, তবেই তো আমাদের উৎসর্গ সফল হইবে।

পৃথিবীর যে হীনবৃত্তি, কত জন্ম জন্ম সে পশুসংস্কারের অধীন হইয়া আসিয়াছি গিয়াছি; মানুষের মন লইয়া, বহুবার বহু সংসার পাতিয়াছি; বহু লোককে ভালবাসিয়া উন্মাদ হইয়াছি, মানুষকে মানুষ-হিসাবে ভালবাসিতে আর সাধ নাই, মানবসংস্কার যতই উচ্চ হউক, পরিমার্জিত হউক, তাহার আরম্ভ আছে, শেষ আছে, কিন্তু তোমায় ভালবাসিতে পারিলে, আমি অমর হইব, উচ্চ হইতে উচ্চতর ভূমিতে আরোহণ করিতে পারিব, সে অনিয়-সাগরে হংসপ্রায় পরমানন্দে সম্ভরণ করিব, আজ উহা স্বপ্ন হইলেও, তুমি জগতের সে মধুর সমীরণ অনুভূত হইতেছে, সে হিরণ্য দৃশ্য চিত্রকলকে চিত্রিত হইতেছে। আমার তুমি উন্মাদ করিয়া দাও, তোমার প্রেমে উন্মাদ হইতে আমার বড় সাধ, ধর্মীর রক্তপ্রবাহ উর্ধ্বপথে পরিচালিত কর, হৃদয়-পদ্ম উর্ধ্বমুখী হইয়া প্রস্ফুট হউক, একটা পাপভীও যেন নীচে ঝুলিয়া না পড়ে, মধ্যাহ্নরোজে পূর্ণফুট স্বর্ধ্যমুখীর

মত আমার জীবন-কুসুম উদ্ধৃখী হইয়া ফুটিয়া উঠুক। ওগো প্রাণারাম ! ইহাই আমার জীবনবেদ, ইহাই আমার ঋক যজুঃ, ইহাই আমার উপনিষদ গীতা, তন্ত্র পুরাণ, সাধন ভজন, স্তোত্র মন্ত্র জপ গায়ত্রী সব—এই পথই আমার ; তোমার টানই আমার জীবনহৃৎ ; ইহাতে আর বিন্দুমাত্র সংশয় নাই—আমি তুমি উঠাইয়া লভ।

আমি তো কিছু করিব না, আজ পর্য্যন্ত তো কিছুই করি নাই; তুমি করাইয়াছ বাহা, তাহা আমি করিয়াছি ভাবিয়াছি ভ্রমে পড়িয়াছি, তোমার মঙ্গল কৰ্ম্ম আমার পরশে অশিব হইয়া গিয়াছে, তোমার দেওয়া আনন্দ অপাত্রে পড়িয়া হলাহলে পরিণত হইয়াছে, আজ আমি আমাকে টুকরা টুকরা করিয়া তোমারই উদ্দেশে যে-হোমানল জ্বলাইয়াছি, তাহাতে আহতি দ্রব, আমাকে নিঃশেষ করিয়া ফেলিব। আমি সে স্থানে বাস করিব না, যে স্থানে তোমার ভুলিয়া আমার মনে করিতে হয় ; আমি সে লোকের ঘর করিব না, যে লোক তোমায় ভুলাইয়া আমার বড় করিয়া তুলে ; আমি সে কৰ্ম্মে হস্তক্ষেপ করিব না, যে কৰ্ম্ম আমাকেই জাগ্রত করিয়া ধরে ; আমি তোমারই আশ্রিত হইয়া থাকিব, সে তুমি আছ বলিয়া ; তোমারই নাম গাহিয়া গাহিয়া বেড়াইব, সে তোমার আনন্দ হইবে বলিয়া ; তোমারই প্রেরণায় ষষ্ঠবৎ পরিচালিত হইব, রন্ধে রন্ধে তোমারই গরিমা প্রকাশ হইবে বলিয়া। তুমি আছ, নিত্যকালের জন্ত আছ, আমিও তাই তোমার জন্তই থাকিব, তোমাকে ছাড়িয়া, তোমাকে ভুলিয়া, একটি নিঃশ্বাসও গ্রহণ করিব না, এমন দেখিয়া পড়শী করিব, বাহারা তোমাকে ভুলিয়া থাকে না, তোমার প্রেমকেই জীবনের কেন্দ্র করিয়া, তোমার প্রীতির জন্ত বাহারা ঘর বাধিয়া আনন্দ করে, তাহাদের সহিত গলা মিলাইয়া দিবারাত্র গান গাহিব। আমি ভুলিয়া যাইব—আমি পুরুষ, আমি নারী, আমি রক্ত আমি মাংস, আমি দশেক্সিয় দেহ মন। পৃথিবীর সঙ্গ হইতে দূরে থাকিব, কেননা তাহারা যে আমার মনে করাইয়া দেয়, যে আমি পুরুষ অথবা প্রকৃতি, তাহাদের আচরণ যে আমার ভেদকেই জাগাইয়া তুলে, ওগো এমন শত্রুপুত্রীতে আমি জার বাস করিব না। তবে কি এ পৃথিবী ছাড়িয়া যাইব ? কোথায় যাইব ? তুমি যেদিন ধরাধাম ত্যাগ করিবে, সেইদিনেই মর্ত্যবাস আমার উঠাইতে হইবে, অত্থা তোমায় বুক করিয় বুগবুগ এই পৃথিবীর বুককেই নাচিয়া নাচিয়া তোমার মহিমা কীৰ্ত্তন করিব।

পৃথিবীর লোক যদি আমার শত্রু হয়, তবে এ দেশে থাকিবার প্রয়োজন কি? তোমার তো আরও অনেক পৃথিবী আছে—যে দেশে রজনী নাই, এমন জ্ঞানোজ্জ্বল অমরধামে আমরা লইয়া চল না। না, এমন কথা আমি বলিব না, তুমি যেখানে আছ সে স্থানই ত পূর্ণ, জ্যোতির্ষ্ম তুমি—তুমি ছাড়া হইলেই যেন আমার মৃত্যু হয়, আমার অস্তিত্বের চিহ্ন যেন না থাকে।

কিন্তু এ পৃথিবীতে এমন নিঃসঙ্গ হইয়া থাকিবার প্রয়োজন কি? নিঃসঙ্গ হইব কেন? তুমি তো সবার মধ্যেই আছ, আমার কাছে তোমার রাগিনী বাজিয়া উঠুক, আমি তো একা নই, ঐ যে সহস্র সহস্র কাছে তোমারই মহিমাগান শ্রুত হইতেছে—আমরা এক নূতন নগর নির্মাণ করিব, তোমার প্রেমের আহ্বানে পৃথিবীর সব লোকই এই নূতন নগরে আসিয়া ঘন বসিবে, সে সোণার স্বর্গরাজ্য পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠার জন্মই যদি আমাদের নাচাইয়া থাক, তবে হে করুণাময়, আমাদের হাতখানি ধরিয়া থাক, পৃথিবীর বুকে যেন কখনও আর আছাড় খাইয়া না পড়িতে হয়। আমরা অমৃতের সন্ধান, তোমারই অমৃতে আমরা দেবু জীবন পূর্ণ হইয়া উঠুক।

গান

ভালবাসি! তোমার ভালবাসি কই!

পলকে পলকে হেরি তোমারে ছাড়িয়া রই।

তোমার আমার মাঝে হৃৎকের রাগিনী বাজে,

ভেদের আকাশটুকু বুচায়ে দিয়েছ কই?

তুমি দেহ, তুমি প্রাণ, তুমি হৃদি, তুমি জ্ঞান,

তোমারই প্রতিমা আমি, তোমাছাড়া আমি নই।

তোমাতে মিশিয়া রব, ভাবাভাবি ভুলে যাব,

এ দেহে-ও দেহে ভেদ, শুধুই যাতনা সই।

আত্ম-নিবেদন

“কেবা শুনাইল গ্রাম নাম?”

কোন শারদ পূর্ণিমার মধুময়ী রজনীর কোলে কোন অপূর্ণ মৃদু হৃদয়ে, গুণে প্রিয়তম, তোমার অমিয়মাণা নামমন্ত্র আমার কাণের ভিতর দিয়া মরমে বিধিয়া গেল।

“নাম পরতাপে বার ঐছন করিল গো”, সত্যই তার অঙ্গের পরশে যে কি হইবে তাহা ভো বলিতে পারি না—ভাবিতে গেলেও সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়, হৃৎপিণ্ডের সমস্ত রক্তশ্রোতঃ তাল পাকাইয়া উত্তাল তরঙ্গভঙ্গে নৃত্য করিয়া উঠে।

কিন্তু সবই তো ঘটিল। নাম শুনিয়া পাগল হইলাম, শত-চাঁদ-নিঙড়ান রূপের ছটায় নয়ন ভরিয়া গেল, স্থললিত দেহবল্লীর মধুর আবেষ্টনে আপন পালরিলাম; কিন্তু তবুও ছেদহীন অজ্ঞপ্রার্থার অমৃতপানে বঞ্চিত হই কেন? কেন মাঝে মাঝে বিরহজ্বালার জলিয়া পুড়িয়া ছাই হই, কেন দমকে দমকে বুকের পাজর ভাঙ্গিয়া অনলধার নির্গত হয়? কেন, প্রিয়তম, তোমার অপার্থিব প্রেমচন্দনে আমার সকল জালা আজিও জুড়াইয়া গেল না, তোমাতে পাইয়াও পাই না কেন?

সে একদিন, যেদিন মরম চিরিয়া তোমার বাণীর ব আঁকুল করিয়া তুলিয়াছিল, যখন তোমার দরশন আগে উন্মাদ হইয়াছিলাম, তোমার ভুবনমোহন রূপের পিপাসায় লজ্জাঘৃণাতর সমস্ত খোঁয়াইয়া উধাও হইয়া ছুটিয়া গিয়াছিলাম—সেদিন মনে হইয়াছিল একবার দর্শনই জীবনের সকল সাধ মিটিয়া যাইবে, শুধু একবার নয়ন ভরিয়া তোমার নিরীকণ করিব, একবার তোমার ভাবধন স্তম্ভ রূপের দিকে চাহিয়া আবিভার জল করিব; তবেই আমার জীবন সার্থক হইবে, আমার তপ্ত মরমজালা জুড়াইবে, আমার অগ্নিময় হৃদয় শিথল হইবে।

চঞ্চল চরণে তোমার পানে ছুটিয়া আসিলাম, নয়নে নয়ন মেলিয়া

চাহিলাম, একবার হইবার, শতবার সহস্রবার তোমায় নির্গিমেষ নেত্রে দর্শন করিলাম, নয়নময় হইয়া তোমার মধুময় রূপসুখা পান করিলাম—
পলকহারি অচঞ্চল আশিষ্ঠারকা দেখিতে দেখিতে গলিয়া গেল, সে অপূর্ব
রূপসন্দর্শনে একেবারে আপনাহারা হইলাম—কিন্তু তৃষ্ণা তো মিটিল না—

“জনম অবধি হাম রূপ নেহারিলু, নয়ন না তিরপিত ভেল !”

চাহিয়া, চাহিয়া, চাহিয়া, শরীর পুলকে ভরিয়া গেল; সর্বদা শিহ-
রিয়া উঠিল, প্রতি রোমকূপ অমৃতময় পরশলালসায় লোলুপ হইয়া বুরিতে
লাগিল—মুহুর্তে তোমার করুণাবিগলিত মেহকোড়ে ঝাঁপাইয়া
পড়িলাম, নিষ্করণ বাহ্যবেষ্টনে তোমায় জড়াইয়া ধরিলাম, তোমার প্রেম-
চল-চল মুখখানি শতচুশনে লাক্ষিত করিলাম। সে অমৃতপরশনে আমার
অঙ্গবলী এলাইয়া গেল, অঙ্গরাগরঞ্জিত নয়নহুটি আলসভরে মুদিয়া আসিল,
দৃঢ়বদ্ধ বাহুলতা শিথিল হইল, আলুলায়িত কেশদাম ভূতলে লুটাইয়া
পড়িল। পুলকোন্নাগে তোমার অসীম রূপসাগরে আছাড়িয়া পড়িতে
গিয়াছিলাম, কিন্তু কুল তো মিলিল না, তোমার অগাধ রূপহিল্লোলের
তল তো খুঁজিয়া পাইলাম না।

সাতারিয়া সাতারিয়া আজ আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি—প্রাণ কঠাগত,
হস্তপদ শ্লথ অবশ, আপনাই গুরুভারে সর্বদা বেদনাময়—ওগো প্রাণেশ,
আজ আকুল হইয়াছি কূলে উঠিবার জন্য। তোমায় পাইয়াও তো
আপনাকে পরিপূর্ণ করিতে পারিলাম না, তোমার দরশনে তৃষ্ণা শুধু
দ্বিগুণতর বাড়িয়া গেল, তোমার স্পর্শে আলা যে আরও জলিয়াই উঠিল—
চক্ষে পড়িল কত দীন আমি, কত অধম আমি, কত ক্ষুদ্র কত অক্ষমতা-
ময়। আজ আমার কাছে আমার অসমর্থতা কি উৎকটরূপে ফুটিয়া
উঠিল, অনন্ত সিন্ধুর মাতৃগর্ভে কি মুষ্টিমেয় সলিল উপহার লইয়া আমি
উপনীত, তোমায় বেড়িয়া বেড়িয়া কি তুচ্ছ নৃত্য অভিনয় করিয়া ফিরি-
য়াছি—বনীভূত ছায়াপুঞ্জে মন আমার বিষময় ধূমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, হৃদয়
আমার আজ কি রুদ্ধরোদনভরা গভীর বিষাদময়।

অত্মসংশয় বড় নিদারুণ! সংশয়গর্ভ বক্ষকঠোর প্রশ্ন নিশ্চয়ভাবে হৃদয়ে
ঝঞ্জিল—পারিব কি? উদয়াচলের ধবল শৃঙ্গ হইতে অরুণরঞ্জিত বিজয়-পতাকা
উড়াইয়া দিতে চাই, স্বর্গের হৃদুভি মর্ত্যে বাজাইতে চাই, তোমায় স্বহস্তচর্চিত
রক্তসিন্ধুর ললাটে মণ্ডিত করিয়া হিরণ্যয় সপ্তাধ-রপ ছুটাইয়া নবীন অভি-

যানে বীর্হিত হইবার জন্য উদ্যত হইয়াছি— কিন্তু আমি কি এ মহাব্রতের অধিকারী হইয়া উঠিলাম? তোমার স্বপ্নানুরূপ দীপ্ত জীবনচিত্রে গড়িয়া জুলিবার কি পরিপূর্ণ সামর্থ্য অর্জন করিলাম? আমার জাগ্রত উল্লাসের সায়ন দিয়া তোমায় পূর্ণ প্রকাশ করিবার জন্য আকুল উন্মাদ হইয়াছি— কিন্তু আমি কি সমর্থ হইব?

এ নির্ভর শূন্য সমস্তার ঘূর্ণিপাকে উৎফিষ্ট করিয়া কি তীব্র মনোজ্ঞদ যন্ত্রণায় আমার অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছ— সমস্ত হৃদয় বান বান করিয়া ছুলিয়া উঠিল— আজ এমন নিষ্করণ পরিহাসচ্ছলে কোন্ কঠোর শিক্ষাদানে উদ্যত হইয়াছ, প্রভু? আমার সর্ব্বশ্ব তো তোমায় চরণমূলেই অকুণ্ঠহৃদয়ে ঢালিয়া আসিয়াছি, তবে কেন, প্রিয়তম, আজ আবার এ দাফন অক্ষমতার অন্তর্ভব জাগাইয়া তুলিলে? আমি কি পারিব? ওগো সকল বলাবলের উৎস, তোমার কটাক্ষপাতে কি চিরদিন পশু গিরি উল্লঙ্ঘন করে নাই, ভাষাহারার কণ্ঠে ভাবের অক্ষয় উৎস বরবরধারে শতসহস্রমুখে বারে নাই? অক্ষম অসমর্থ বলিয়াই তো তোমায় চরণগত হইয়াছি, আমার তুচ্ছ অপদার্থ জানিয়াই তো তোমায় হৃদয়দানে আমার যত্ন করিয়াছ। তুমি তো দুর্ব্বলেরই বল, অধমতারূপ তুমি, বরাভয়ভরা যুগলকরে তুমি তো যুগ যুগ অক্ষমকেই বলদান করিয়াছ— অধম যে অসমর্থ যে, তাহাকে সমর্থ প্রেমের উত্তম অধিকারী করিয়া তুলিয়াছ। তোমায় শতস্ব্যপ্রভ জলন্ত মহিমার আলোকেই আপনাকে চিরযুগ জ্বলাইয়া তুলিয়াছি, তোমারই অপরিমিত কক্ষণায় আমার সকল বিভবগৌরব ফুটাইয়াছি, হে আমার চির আনন্দময় প্রেমের ঠাকুর, আজও তো তোমারই প্রভীক্ষার বসিয়া আছি— সকল সিদ্ধির পূর্ণাধার তুমিই তো ফুটিয়া উঠিবে— প্রাণারাম, আমি কে— তোমাহারা হইয়া আমার একটি নিঃশ্বাসেরও কতটুকু মূল্য সম্ভব? বল, প্রিয়তম, তোমার ছাড়িয়া আমি একেবারে মৃন্ময় হইয়া যাই কি না!

হরষিণীয়া ব্রহ্ম বটে! ওরে আমার অধীর মন, ধৈর্য্যহারা তুমি হয়তো গোড়ার কথা ভলাইয়া বুঝিলে না। রূপের হাটে কর্মের প্রমত্ত উন্মাদনার আপনাকে হারাইয়া ফেলিলে— পরশমণি হাতে পাইয়াও আপনার আড়ধরে তাহার উলঙ্গ স্বরূপ বৃথা ধূমাচ্ছন্ন করিয়া তুলিলে। উন্মত্তের মত স্বহস্তে ক্ষুদ্র প্রদীপ জালিয়া মহাস্বর্য্য-সন্দর্শনে বাহির হইয়াছ, এতটুকু হৃদয়পিঞ্জরে অনন্ত পুরুষকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিবার জন্য ব্যর্থ উদ্যমে বাহ্যহিটি বাড়াইয়া

দিয়াছ—জ্যোতির্গর্ভ দিব্য আশ্রোক তোমার আপনার বিপুল ছায়াপাতে
অলঙ্কিতে স্নান হইয়া গেল। না, আবার ফিরিয়া আইস, আবার স্থির
হইয়া শ্রামের অনাহত বংশীধ্বনি শ্রবণ কর—ঐ আহ্বান, ঐ আকুলকরা
আকর্ষণমন্ত্র যেমন করিয়া ভাসিয়া ভাসিয়া কাণে আসিয়া পৌছিয়াছে,
তেমনি করিয়া বংশীধারীকে আপনি আগাইয়া আসিতে দাঁও, আপনিই
যদি তিনি ধরা দেন, তবেই পরবশ ইচ্ছায় পরমরসসম্পর্শে বশীভূত হইবে,
তবেই তুমি পূর্ণ হইবে, ধন্য হইবে, সমর্থ হইবে, অসীম অরূপ মাধব
অবলীলাক্রমে মদনমোহনরূপে তোমার মধ্যে ফুটিয়া উঠিবেন, —ওগো তবেই
তো সার্থক হইবে এই রূপরসাত্মক লীলাক্ষেত্রে, তোমার দশেক্সিয় দেহ
মন, তবেই তো সফল হইবে তোমায় রসের সাধনা, তোমার ভোগসাধনা—
তোমার অভীষ্ট যদি আপনি আসিয়া তোমায় দরশনে পরশনে পরম চরিতার্থ না
করেন, তবে কোন্ বার্থ সাধনার কুহকমন্ত্রে তাহাকে ধরিতে পারিবে?
কোন্ নিষ্ফল বজ্রবন্ধনে তাহাকে বাধিয়া রাখিবে?

না, আজ আর আমি সাধনার বৃথা আড়ম্বরে জীবন বিড়ম্বনাময়
করিয়া তুলিব না—আজ আর আপনার প্রতিভায় আপন তপোবলে
তোমায় দেখিতে পাইতে, ধরিতে ছুঁইতে মদগর্বে ছুটিয়া যাইব না—
অপরিমেয় তোমার মহিমা, চাহিলেই তোমায় পাওয়া যায়, কিন্তু, আজ
আমার জন্ম আর তোমায় আহ্বান করিব না, আমার ভূজবলে তোমায় নিষ্ফল
ভাবে আকর্ষণ করিয়া ও-কোমল অঙ্গে বেদনাদান করিব না, আজ
আর তোমায় সহস্রলাঞ্ছনা সহিয়া অসমর্থ প্রেমের বোঝা মাথায় করিয়া
অধম ভক্তের দুয়ারে ফিরিতে দিব না—আজ তুমি আপনি আবিভূত
হও আপনারই ইচ্ছাক্রমে; ইচ্ছাময়, তোমার স্বেচ্ছা প্রসূত লীলাক্ষেত্রে তোমার
আপনার অব্যর্থ প্রেরণাটুকুই আমার মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তোল—তোমার
ইচ্ছাটুকুই পূর্ণ করিবার জন্ম আমার সমস্ত তপঃশক্তি নিয়োজিত হউক;
আমার দেহেক্সিয় মনঃ প্রাণ, আমার সমস্তখানি আধারবস্ত্র তোমাতেই
মূর্ত্ত করিয়া তুলিবার অধিকার লাভ করুক—আমি হইয়া যাই তোমারই
স্বরূপ, তোমাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া তোমারই আধারভূত হইয়া তোমারই
সহজ লীলাগ্রহণ্য পরিপূর্ণ রূপে লক্ষ সহস্র রেখায় যুগযুগ নিরবচ্ছিন্ন
প্রকাশ করিব।

সেবা-প্রশ্ন

রুদ্ধ প্রভঞ্নে বাংলার অর্ধেক অংশ উড়িয়া গেল। দেশবাসীর হাহারব নীরব হইবার নহে, অবিরল অশ্রুপ্রবাহে আমাদের বুক যে ভাসিয়া যায়, তবুও তো মনের কালী যুচিয়া গেল না।

আমাদের দেশ যেন একটা বৃহৎ পাগলাগারদ। রিক্তি বিদূরিত করিবার জন্ত প্রকৃতির নির্মম প্রহার বহুশত বৎসর ধরিয়া সহ করিয়া আসিতেছি, কিন্তু আমাদের জ্ঞানোদয় হইল কই? বিকার-ঘোর কাটিল না, দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে—নির্যাতনের মাত্রাও বৃদ্ধি পাইতেছে।

সে দিন দামোদরের বস্ত্রাং বাংলার দুইতিনটা জেলা ভাসিয়া গেল, কত লোক গৃহহীন পথের ভিখারী হইল, আমবাও সে দুর্ভবস্ত্রাং কাহিনী নানা ছাঁদে নানা ভঙ্গিমায় লিখিয়া বলিয়া তিন চারি মাস ধরিয়া হৈ চৈ করিলাম—ধনীর লৌহপেটকা উন্মুক্ত হইল, সেবকদলের রুদ্ধ কণ্ঠোৎসাহ প্রকাশ পাইল, অনেক নিষ্কণ্টক কর্ম্ম মিলিল; তখন যেনে হইয়াছিল, বাড়ে, ভুকম্পে, প্রাকৃতিক যে কোন দুর্ঘটনায় বাংলার আর একটা দিক উড়িয়া পড়িয়া ছারে খারে যাউক, একটানা পরিত্রিতরতে জীবন কাটিবে ভাল, তখন তেমন কিছু ঘটনা উঠিল না, কাজেই একে একে সকলেই ধরে ফিরিল।

একটা কিছু না হইলে আমাদের যে দিন চলে না, বর্ধমানের সেবা-ধর্মের পর বাংলায় বিপ্লবতরঙ্গ নানা রঙ্গে অভিনীত হইল, কিন্তু সে ক্ষুদ্র খেদ্যোত্তের আলোকচিহ্ন যুরোপের বিদ্যাপ্রবাহে নিভিয়া গেল, বাঙালীর জীবন নূতন ঘটনায় হাহাকারে ভরিয়া উঠিল, সেও প্রাকৃতিক বিপণ্য কৈ কি? দেশসেবকের দল দলে দলে কারাবাসী হইল, কংগ্রেসে কনফারেন্সে, ব্যবস্থাপক সভায় নরম গরম বক্তৃতাপ্রলাপ চলিল। তারপর অন্নকষ্টের কথা, পাঞ্জাবের ধোমহর্ষণ কাহিনী, আবার সঙ্গে সঙ্গে এই দেখ, তুমুল বাড়ে আঙ্ক

আবার ভীষণ সর্বনাশ উপস্থিত।

* * *

আমরা জাগিয়াছি, স্মৃতির কণ্ঠ আমাদের চাই। দেশনেতৃগণ এই শোচনীয় দ্রব্যহার প্রতীকারপরায়ণ হইয়াছেন, চতুর্দিকে টাকার বন্ শব্দ, বক্তৃতার কলরব, সেবকবৃন্দের উৎসাহধ্বনি—সাজ সাজ রব। দেশ যার, রক্ষা কর, রক্ষা কর, সেবা! সেবা! এই সকল জাগরণের লক্ষণ নয় ত কি?

* * *

দেশের এই আসন্ন বিপদে ইহার সজাগ হইয়াছেন, যে সকল কমলার বরপুত্র, মুক্তহস্তে ধন বিতরণ করিতেছেন, গ্রামে গ্রামে দেশ-বাসীর হৃৎযন্ত্রদ্বারা শোচনীয় চিত্র দেখিয়া তাহার প্রতীকারপরায়ণ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব, তাহা জানি না। বাংলার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা মহামতি লর্ড রোণাল্ডসে বাহাদুর এ বিষয়ে উদাসীন নহেন, রাজ্য প্রজার মিলিয়া দেশের এই দারুণ হৃৎযন্ত্র অচিরেই বিদূরিত হউক, ইহাই আমাদের একান্ত ইচ্ছা।

* * *

দেশ যে জাগিয়াছে এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু জাতির প্রাণ-শক্তি যেন অন্ধ আবেগে যে দিকে পথ পাইতেছে সেই দিকেই তীব্র-ভঙ্গিমায় ছুটিয়াছে, কোন্ পথটি ধরিয়া চলিলে, দিন দিন ইহা বিস্তৃত ও বেগময় হইয়া এই জাগরণকে সার্থক করিয়া তুলিবে, তাহার পথটি খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেছে না। স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতে আজ পর্যন্ত বাংলার গতিভঙ্গী এইরূপই দেখিয়া আসিতেছি, স্বদেশী কাপড়ের মোট নাথায় করিয়া ফিরি করা হইতে, অর্দ্ধোদয় যোগে, বিপ্লবে, বস্ত্রায় সকলবিধ অন্ত্রাধানে কেবল যে আমাদের প্রাণ হইয়াছে, ইহারই পরিচয়-আমরা দিতে পারিয়াছি, কোন্ রেখায়, কোন্ অনোব উদ্দেশ্যের অভিমুখে খাত কাটিয়া প্রবাহিত হইব, ইহার নির্দেশ আমরা যেন এখনও করিয়া উঠিতে পারি নাই।

* * *

প্রাণ জাগিলে সে নীরব থাকে না। জ্ঞানপ্রকাশের অভাবে, আমরা কেবল দ্রব্যহার ভারী বোঝাটাকে টানিয়া টানিয়া বহিয়া মরিতেছি, এই

যে আমরা বাংলার এই দারুণ হাহাকারময় অবস্থায় একদল লোক উঠিয়া দাঁড়াইয়াছি, ইহার ভিতর উপরের সাড়া বড় বেশী নাই, প্রাণের টানে কাজ মিলিয়াছে, এমন কাজ বছরে দুই তিনবার মিলিয়াছে, মিলিবেও। রামকৃষ্ণ মিশনের মত, ব্রাহ্ম মিশন ও আরও হয়ত অনেক মিশন খাড়া হইয়া উঠিবে, কিন্তু আজ না হয় আকস্মিক বিপদে আমরা বিপর্যস্ত, পরন্তু আমাদের মনে যদি সেবাধর্মটাকেই বড় স্থান দেওয়া হয়, আমাদের ইচ্ছার টানে সেবার অভাব নুটিবে না, উহা কি দেশের পক্ষে মঙ্গলচিহ্ন হইবে?

ভগবানের ইচ্ছাই মানুষের মন দিয়া প্রকাশ হয়। এই ইচ্ছার ভঙ্গীর পরিবর্তন আসে। কিন্তু মানব মন একবার যাহা ধারণ করে, মূলগত পরিবর্তন আসিলেও সহসা তাহা অবধারণ করিতে চাহে না, এই জন্ত এ সংসারে অসংখ্য মতবৈধ দেখা যায়। বাংলার প্রচলিত প্রবল মতের বিরুদ্ধে আমাদের অভিন্নতত্ত্বলি অনেকক্ষেত্রে সংগ্রাম ঘোষণার মতই প্রতীয়মান হয়, কিন্তু আমাদের দর্শন স্পষ্টাক্ষরেই প্রকাশ করিতে চাই। বাংলার বর্তমান বিপদ অপসারিত করিবার জন্ত যে উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে, মনে রাখিতে হইবে ইহার বিরুদ্ধে আমরা কোন মতই প্রকাশ করিতেছি না, বাঙ্গালী মাঝেই এই কার্যে যোগদান করিবে। আমরা নূতন বাংলার ভবিষ্যৎ কর্মের কথাই বলিতেছি।

আমাদের সেবা করিতে হইবে ভগবানের। সেই জন্ত মানবের মধ্যে স্তম্ভ নারায়ণকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে। এক অঞ্জলি চাউল বিতরণ অথবা একখানা খড়ের ঘর বাধিয়া দিবার অনুর্তানই এই নারায়ণকে উদ্ধৃত করিবার স্তম্ভ উপায় নহে। মানুষকে শক্তিমত্তে দীক্ষিত কর, মানুষের আধার মনে জ্ঞানের বাতি জালিয়া দাও, মানুষকে সর্বদা স্তম্ভাও যে সে ঈশ্বর; এই স্তম্ভকোটি বাঙালীর প্রাণে নূতন আশার দীপ জালিয়া তোল। ইহার জন্ত হয়ত অনেক ধনকে নিঃস্ব হইতে হইবে, অনেক সাধকের বক্ষরক্ত নিঃশেষ হইয়া যাইবে, কিন্তু হীনকে হীনতর করিয়া বুকুকে অন্নহীন রাখিয়া, সেবক তুমি অজস্র অর্থব্যয়ে সেবাধর্মে স্বদয়-বৃত্তি চরিতার্থ করিতে থাকিলে, দেশের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

সেবার দেশ জাগিবে না; ব্রহ্মণ্য-শক্তিতে দেশকে উদ্বোধিত করিয়া তোল, বাঙালীর হৃদয় তুরীয় সত্তার পরিপূর্ণ হইয়া উঠুক, অক্ষম বলিয়া পরের করুণায় বাঁচিতে অপমানে তাহার ঘেন মৃত্যু হয়, আপনাকে ভগবানের প্রতীক বলিয়া প্রত্যেক বাঙালী গর্বেমানতশিরে বিশ্বের বুকে বাহাতে, দাঁড়াইতে পারে, তাহার আয়োজন কর।

*

*

*

নবীনের দল, তোমরা প্রচলিত সকল সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া সমবেত ইচ্ছাশক্তির অমোঘ প্রয়োগের দ্বারা, বাংলার তামসিক ধর্ম কথ্য প্রবাহের গতিরোধ করিয়া দাঁড়াও, ধারাবাহিক ইচ্ছার বলে বাঙালীর ঘরে ঘরে কমলার আসন রিস্ত হইবে, বাঙালী ভূপতিত হইলেও নিজের পায়ে ভর দিয়া সে আবার উঠিয়া দাঁড়াইবে, নিজের উপর অগাধ শ্রদ্ধা ও আস্থা রাখিয়া সে নিজের অভাব নিজে মিটাইয়া লইবে। পরের করুণা অবলম্বন করিয়া মর্ত্যপৃষ্ঠে সম্পদে বাস করা অপেক্ষা আত্মমর্যাদা রক্ষা করিবার জন্ত সহস্রবার মৃত্যুও শ্রেয়ঃ; হুঃখ—সে অমর আত্মার মহিমা পুনঃ প্রকাশেরই জন্ত, তাহা দূর করিবার জন্ত দীন হীন কাঙ্গাল মাজাইয়া আত্মঘাতী হইও না, দেশকে আত্মঘাতী হইতে শিখাইও না।

*

*

*

এই শিক্ষা শুধু শিক্ষিত বাঙালীর জন্ত নহে, ঐ গৃহস্থীন অনবজ্ঞের কাঙালকে বল—উঠ, দাঁড়াও, তোমার ভোগ তোমাকেই আহরণ করিতে হইবে, একলা না পার, আইস আমরা বহুজন মিলিয়া একপরিবার-ভুক্ত হই, একজনের সাময়িক অক্ষমতা, সকলের কণ্ঠ ও শক্তিকে কেন্দ্রীকৃত করিয়া শুধরাইয়া তুলি—আত্মজ্ঞানকে উদ্ধৃত করিয়া তুলিবার জন্ত, অসমর্থ তুমি, বহুজনের সহিত সব ঢালিয়া এক হইয়া যাও, একদিন প্রতিজ্ঞনের সিদ্ধি আসিয়া অসংখ্য বাঙালীর জীবনকে অতুলনীয় সম্পদে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবে, ঘরে ঘরে নারায়ণের রূপ দেখিয়া জীবন সার্থক হইবে। মাঠে, স্বয়ং শক্তি তোমাদের কর্ণধার, অগ্রসর হও, মাহুষের কথায় উদ্ভাস্ত হইও না।

ব্রহ্ম-দৃষ্টি

সৎ ও অসৎ উভয় বন্ধন হইতে যে মুক্ত, অসংখ্য বন্ধন মাঝে তার নিরা-
নন্দ নাই, বন্ধন যে সেখানে স্বেচ্ছাধৃত, খেলার ভঙ্গী বিশেষ। যে সৎ হইতে
অসতে, অথবা অসৎ হইতে সতে পৌঁছিতে চায়, সে আপনাকে হারাইয়া
এক বন্ধন হইতে অপর বন্ধন স্বেচ্ছায় গলায় তুলিয়া লয়। হে ভগবান্! কিছু
হইতে আমার বিরত করিও না, সকলের মধ্যে আমার ডুবাইয়া রাখ,
সবখানিই যে তুমি, এই জ্ঞান আমার অপ্রতিহত থাকুক।

জীব ও জগৎ—তাহাকে ছাড়াইয়া যে অজানা অনির্ধ্বচনীয় সত্তা,
তাহাই সৎ, আর এই সৃষ্টি ইহা অসৎ, মায়া, মতিলম—অতএব পারের
নৌকার চড়িলে, এ পার হইতে তোমায় ক্রমশঃ সরিয়া যাইতে হইবে,
যত দূরে যাইবে ততই দেখিবে এপারের সকল দৃশ্য আপসা কুহেলিকাময়,
নেতি নেতি, ইহা নয়, উহা নয়, সত্য ঐ অসতের পরপারে, ঐ দুর্ভেদ্য
আঁধারের প্রান্তভাগে—জীবন-সমুদ্রের উপর দিয়া দ্রুত ক্ষেপণীসকলনে
দলে দলে মানুষ পারে চলিয়াছে, পরানুজ্ঞার জন্ত।

উপনিষদের ঋষি অসতের প্রান্তসীমা অতিক্রম করিয়া বুঝিয়াছিলেন, সৎ
ও অসৎ উভয়ই একই সত্তার দুইটা দিক—পরস্পর অমিশ্র হইলেও অভেদ,
এককে ছাড়িয়া অপরকে পাওয়া যায় না, যুগপৎ সবখানিই ভাগবত বোধে
অম্লভব করিবার সাধনা করিয়াছিলেন।

সেই সাধনভাগই বোগ। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, অজ্ঞানার জ্ঞান ভাগ-
টাই বিখণ্ডিত, এবং বিচিত্র সৃষ্টির অঙ্করাশিকে একত্র করিয়া ঠিক দিবার
জন্ত এই প্রাণীজগৎ, মানুষের মধ্যেই ভগবান্ জ্ঞানার অঙ্কফল নির্ণয় করিতে
চাহিতেছেন। প্রকৃতি জ্যেষ্ঠরূপ, মানুষের মধ্যেই জ্যোতীরূপে ব্রহ্মের অব-
স্থিতি। এই জ্ঞানার শেষ নাই, যতই জানিতেছেন, ততই বিচিত্র সৃষ্টির
আবির্ভাব ঘটতেছে, মানুষ ও সেই অজানা অশেষ পুরুষ পার্থক্য—
কেবল, তিনি জানিতে গিয়া হইয়া বসেন, আর মানুষ হইলেই জানিতে
পারে। তিনি অসংখ্য অঙ্করাশিতে আপনার অসীমতাকে প্রকাশ করিতে-
ছেন, আর মানুষ তার হিসাব রাখিয়া চণিয়াছে। সৃষ্টি এক বিরাট

অন্ধবিশেষ, উপরে অজ্ঞানার খেলা, মধ্যে প্রকৃতির অসংখ্য অঙ্করাশি, নীচে ফলস্বরূপ স্থাবরজঙ্গমময়ী এই পৃথিবী।

মানুষ এই প্রথম তবু জানুক আর নাই জানুক, তার অত্যন্ত এই সনাতন খেলা চলিয়া আসিতেছে, জানিলেই মানুষ ভাগবতস্বরূপ হইতে পারে, এবং এই জ্ঞানার সকল যন্ত্রই মানুষের মধ্যে বিদ্যমান আছে।

অজ্ঞানার ক্রমবিকাশশীল স্বর্গীয় জ্যোতিঃ মানুষের মন দিয়াই তাহার জীবনে প্রতিকলিত হয়, সেইজন্ত মানসশুদ্ধিই যোগের প্রথম কথা, চাড়া-চপড়ের আবিলতায় এই মন অশুদ্ধ থাকিতে তুরীয়ার এই অপূর্ব খেলা মানবজীবনে লীলায়িত হইয়া উঠে না, উপরন্তু মনের সর্কারিতা থাকিলে, এই অশেষকে অতি খণ্ড এবং অপরিণতভাবেই গ্রহণ করে, ভগবান্ লইয়া মানবজাতির মধ্যে যে মতভেদ, তাহা এই অশুদ্ধ মনঃপ্রসূত। সাধক তুমি অধীর হইও না, তাহাকে বাক্য মনের দ্বারা প্রকাশ করিবার তীব্র প্রয়াস করিও না, ভাগবত সম্বন্ধে আলোচনা যদি আত্মশুদ্ধির অনুকূল হয় তবেই এই প্রসঙ্গ শ্রেয়ঃ, অন্যথা একান্তমনে সাধনার পথে অগ্রসর হও, উপরের বিমল আলোকে তোমার সবখানি উদ্ভাসিত হইলে, তর্কে যুক্তিতে ইহা প্রমাণ করিতে হইবে না, যোগফল স্বতঃসিদ্ধ প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

আপনাকে এই অপোরুবেয় তবু হইতে ভিন্ন করিয়া দেখিলেই, আমাদের অনেক কিছু করিবার প্রয়োজন হয়, এবং এই করা একান্তপক্ষে আমাদের উপরই নির্ভর করে। মনই মানুষের প্রধান অবলম্বন, এই মনের সাহায্যে আমরা কতটুকু অগ্রসর হইতে পারি, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখার দরকার, মনকে উর্দ্ধে রাখিয়া চলিতে চাহিলেই মন কিছু উর্দ্ধে উঠিয়া যায় না; বাহ্যিক এইটুকু অমূল্যলবণ করিয়াছেন, তাঁহার সুবিবেচন, সেও কোনও এক অজানা শক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, সেইজন্ত সাধক সর্বোপায়ে স্থির চিত্তে এই অজ্ঞানার বিকাশস্বরূপ আপনাকে ধারণা করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিবেন, বিশ্বাসই একদিন জ্ঞানালোক জালিয়া বুঝাইয়া দিবে, মানুষ ভগবান্কে জানিতে পারে না, ভগবান্ই মানুষের মধ্যে জাগ্রত হইতে চাহিতেছেন, এই বিশ্বাস যত দৃঢ় হইবে, ততই আত্ম-সমর্পণযোগের শক্তি দেখিয়া সাধক সন্তুষ্ট হইবেন।

ভারতের অদ্বৈতবাদ জলদগর্জনে ঘোষণা করিয়াছে, সকলই ব্রহ্ম, বেদের এই বজ্রনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়াও ভারতের সাধকসম্প্রদায় যে জগৎকে মায়া

ধরিয়া উড়াইয়া দেন; সে কেবল ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ অভেদ ভাবে আপনাকে দর্শন করিতে তাঁহার অক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া; জীব যদি ব্রহ্ম চোখে চয়, তবে নিঃসন্দেহে, জীবাধার ছাড়িয়া তাহাকে ব্রহ্মে উপনীত হইতে পারে, আর জীব ও ব্রহ্ম যদি অভেদ হয়, তবে জীবাধারের উপরই ব্রহ্মোদয় প্রতিষ্ঠিত হইবে।

আমরা এই জগতের উপরেই সেই অজানাকে টানিয়া আনিওছি, ইহা যে নূতন কথা এরূপ নহে, ভগবান্‌ নিত্যকাল ধরিয়া ইহাই করিতেছেন।

শব্দস্পর্শময় এই পৃথিবীর সকল গুণই প্রকাশ হইয়াছে সেই গুণাভীত পরম তত্ত্ব হইতে, মানুষও সকল গুণের অধিকারী হইবে যেদিন সে গুণাভীত হইতে পারিবে, ভারতের নির্বীণত্বের মধ্যে যে নিগূঢ় অর্থ ছিল, তাহা যথার্থ অবধারণ করা হয় নাই। নির্বীণ অর্থে শুধু জগদভীত হওয়া নয়, জগৎকে অধিকতর ভাবে পাওয়া। কেননা মানুষ যতই নির্বোধ, শাস্ত ও সমাহিত হইতে পারিবে, ততই জগতের সহিত তাহার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের সন্ধান পাইবে।

ভারতের বুদ্ধশক্তি অসত্তের সীমা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেও, তিনি ফিরিয়াছিলেন, জগতের দুঃখে বিগলিতহৃদয় হইয়া নয়, যিনি চিত্ত-বৃত্তির লয় সাধন করিয়া পরানির্বীণ লাভ করিয়াছিলেন, দুঃখের আঘাত তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, জগতের সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধকেই তিনি সত্যভাবে দর্শন করিয়াছিলেন, পৃথিবীর মধ্যে এত বড় মহামায়া আবিষ্কার করিতে আর কেহ সক্ষম হন নাই। বুদ্ধের যথার্থ শিক্ষা জগৎকে ছাড়িয়া শূন্যে লীন হওয়া নয়, বাহিরের কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, অন্তরে অপরিদীপ্য শান্তি ও সমতা লাভ করিয়া, প্রেম সত্য আনন্দ দিয়া জগৎকে ভরাইয়া তোলা। কিন্তু মানুষ আপনার অক্ষমতাকেই বড় করিয়া, জরামরণশীল পৃথিবী হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করাকেই পরম পুরুষার্থ মনে করিয়াছে।

অদ্বৈত বেদান্ত যে দেশের মূলশক্তি, তাহাকে উপেক্ষা করিয়া, মানুষ আপনাকে ভগবান্‌ হইতে বিচ্ছিন্নবোধে সাধনতৎপর হইলে, অন্ধকার হইতে গভীরতর আধারে যে তাহার পতন হইবে, ইহা এক সত্য।

জগৎ ও ব্রহ্ম যদি অভেদ হয়, তবে ব্যক্তিবিশেষের মুক্তিলাভের অর্থ কি? ব্রহ্ম কোনও কালেই বদ্ধ নহেন, তিনি মুক্ত শাশ্বত অপাপবিদ্ধ:

আর এই বিপুল ব্রহ্মাণ্ডে, একব্যক্তির নির্বাণলাভে, জগতের সুখ দুঃখের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। এ কি সাধকের অক্ষমতার পরিচয় নয়, জগতের দুঃখে, শাস্তি ও আনন্দের অভাবে অতিষ্ঠ হইয়া, জগৎ হইতে পলায়নপর হওয়া? তারপর এই মুমূর্ষু ব্যক্তিই বা কে? নিশ্চয় অথও ব্রহ্ম ও জগৎ হইতে ইনি ভিন্ন জীব। প্রচলিত অদ্বৈতবাদীর নিকট ইহা এক অচিন্ত্য রহস্য! মায়াবাদী বলিবেন, 'এক অজ্ঞের ব্রহ্ম ব্যতীত আর সবই মায়ী, তবে মানুষের নির্বাণলাভ একটা মায়াবাজী, কেননা মানুষ তো মায়াবিশেষ; উহার আবার স্বতন্ত্র সত্য' অস্তিত্ব কি? মায়াময় জগৎ হইতে মায়াময় জীবের মুক্তিলাভই বা কি? এই মায়াবাদীর গ্রহেলিকা হইতে নূতন বাংলা পরিব্রাজ লাভ করুক।

প্রকৃতপক্ষে মানুষও সত্য, ব্রহ্মও সত্য—ব্রহ্ম সত্য বলিয়াই মানুষও সত্য, এই জগৎও সত্য, জীব জগৎ ব্রহ্মেরই বিকাশ। মানুষের মধ্যে এই ব্রহ্মজ্ঞান অবিচ্ছেদ প্রবাহে বহিয়া যাউক, মানুষ আপনাকে ব্রহ্মেরই প্রতীক বলিয়া অনুভব করুক, মানুষ মাটির পুতুল নয়, যে কিছুদিন লোকের কৌতূহল উপাদান করিয়া মাটিতে মিশিয়া যাইবে, মানুষ জন্মিয়াছে অথও পরমায়ু লইয়া, মানুষের এমন একদিন অবস্থা আসিবে, যেদিন সে আপনার মধ্যেই ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিবে, এবং তাহার সাধনা মানুষের গতানুগতিক সাধনার অঙ্কিত রেখাটিকে অবলম্বন করিয়া নয়, সে স্বাধীন ভাবেই আপনার পথ আপনি প্রস্তুত করিয়া লইবে, তাহার জ্ঞান যে অমোঘ বিশ্বাসের প্রয়োজন, তাহা নিজ নিজ অন্তর অন্বেষণ করিয়া দেখিলেই মিলিবে, এক-জনের বিশ্বাস অপরজনের স্বক্ষে চাপাইয়া দিবার প্রয়োজন হইবে না।

সাধকের পত্র

তোমরা হয়ত আমার উপর ভয়ানক চটয়া গিয়াছ, অথবা একেবারে চটয়া না গেলেও বেশ একটু মনঃক্ষুণ্ণ করিয়াছ, কারণ অনেকদিন আমি তোমাদের খোঁজ খবর লই না, তুষিত-চাতকের মত আমার উপদেশ-বাণীর জগ্ন বৃথাই তোমরা অপেক্ষা করিতেছ। অবশ্য প্রত্যুত্তরে আমি বলিতে পারি, কোনকিছুতে চটয়া যাওয়া বা মনঃক্ষুণ্ণ করা সাধকের উচিত নয়, সকল অবস্থায় নির্বিকার নিলিপ্তচিত্ত হওয়াই সাধনার গোড়ার কথা। এ কথা সত্য হইলেও, আমার ছাপাই'র জগ্ন তাহা বলিব না। আমি কি জগ্ন নীরব হইয়াছিলাম, সেটা এমন একটা বড় কিছু নয় যার হিসাব নিকাশ দেওয়া পরম দরকার। তবে এই সম্বন্ধে, উপদেশ-শুনিবার, বিতরণ করিবার বিষয়ে, আমার দুই একটি বক্তব্য আছে, তাহাই তোমাদের কাছে আজ আমার নিবেদন করিবার আছে। ইহাতে আমার মৌনাবলম্বন ব্যাপারটির অর্থ, ইহার মূল্য বা মূল্যহীনতা আনুসঙ্গিক-ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়া যাইবে। আর আমার বিশ্বাস, ইহাতে তোমাদের প্রবর্তকের প্রকৃত কৰ্ম ও উদ্দেশ্যটা, যাহা লইয়া এত গোলমাল চলিতেছে দেখিতেছি, তাহাও একটু খোলাভাবে দেখা যাইবে।

দেখ, প্রচার কার্যটা, উপদেশ ছড়ান জিনিষটা, আমার কাছে তেমন খুব মূল্যবান বলিয়া মনে হয় না। এ কাজ করে যারা, এসব কৰ্ম হয় যাদের উপর (Subject আর Object), তাদের আমার তেমন পাকা লোক বলিয়া মনে হয় না, এমন কি খুব বুদ্ধিমান বলিয়াও স্বীকার করি না। যুগে যুগে সংস্কারের জন্য—অধ্যাত্মসংস্কার হউক, ধর্মসংস্কার হউক, সমাজসংস্কার হউক বা সাহিত্যসংস্কার হউক—সংস্কার বা নূতন গড়নের জন্য যে প্রচারকের আবির্ভাব হইয়াছে, এই জগ্নই কোন সংস্কার আমূল-দৈরস্থায়ী প্রকৃত সংস্কার হইতে পারে নাই। প্রচারের অন্তর্য্যাপ্তে তদন্ত সংস্কার কোনদিন হয় নাই, বাস্তবিক সংস্কার হইতেছে ততটুকু, যতটুকু আছে এই প্রচারের পিছনে একটা গভীরতর, সত্যবস্ত-প্রচার মানুষ্যের বুদ্ধির জগতে একটা আন্দোলন তুলিয়া দেয় বটে অঙ্ক

এ আন্দোলনের যে একটা সফল আছে তাহাও নিশ্চিত, কিন্তু এ আশাত-
বাহীরা পড়ে মানুষের যে অংশ শুধু ভাসা ভাসা, তাহার উপর। মানুষের
অন্তরাত্মাকে জাগাইয়া তুলিতে পারে বাহা, তাহা আর এক ধরনের
বস্তু। এই অন্তরাত্মার উদ্বোধনের সঙ্গে অনুচররূপে চলিতে পারে
প্রচার, কিন্তু প্রচারের নিজের স্বজনক্ষমতা নাই।

আমি বলিতে চাই, আমার কাজ তোমার কাজ উপদেশ দেওয়াও
নয়, উপদেশ শুনাও নয়। প্রত্যেকের কাজ হইতেছে, নিজেকে নিজেকে
ফুটাইয়া তোলা, স্বজন করা। আমার উপলক্ষ আমার সাধনার ফল
তোমাকে জানাইতেছি, এ জন্য নয় যে তুমি তাহার অনুকরণ বা অনু-
সরণ করিবে, আমি পাকা রাস্তা গড়িয়া দিতেছি তোমার যাওয়ার সুবিধার
শ্রমলাঘবের জন্য—কতকটা হইলেও হইতে পারে কিন্তু সেটা মুখ্য কথা
নয়, সেইটার উপরই জোর দেওয়া কখনই স্বাস্থ্যকর নয়। আমি একটা
পথ কাটিয়া চলিয়াছি, সে পথ আমার জন্য, তুমিও তাই দেখিয়া
তোমার জন্য পথ কাটিয়া চল, এই পথ কাটিবার, এই নিজেকে ব্যক্ত
করিবার প্রেরণা, যদি ও যতটুকু আমার প্রয়াস দেখিয়া তোমারও আসে
তবেই ও ততটুকুই—তোমার দিক হইতে আমার উপদেশের বা সাধন-
কথার সার্থকতা।

সাহিত্য জগতে সমালোচক যেমন নিজে কিছু স্বজন করেন না বা
প্রকৃত কিছু গড়িতে পারেন না, সাধনার জগতে উপদেশকও তেমন
কিছু স্বজন করিতে বা গড়িয়া তুলিতে পারেন না। সমালোচক চেষ্টা
করেন পরের সৃষ্টিকে বা নিজের মধ্যে স্রষ্টা সৃষ্টিকে বুঝাইয়া দিতে,
তাহার কল কৌশলের তাহার ধরণ ধারণের একটা ব্যাখ্যা দিতে—কিন্তু প্রকৃত
কবি যখন আবির্ভূত হন তখন দেখা যায় যে তিনি সমালোচকের প্রায়
কোন মানদণ্ডই মানিয়া চলিতেছেন না—নিরঙ্কুশাবয়ঃ; এমন কি
সমালোচক যখন নিজেই কবি তখনও প্রায়শঃই দেখা যায় সমালোচক
হিসাবে তিনি যে সব নিয়ম পদ্ধতি বাঁধিয়া দিয়াছেন, কবি হিসাবে
তাহাই আবার অকুণ্ঠিতচিত্তে অবলীলাক্রমে ভাঙিয়া ফেলিতেছেন।
অধ্যাত্মজগতেও সেই রকম সিদ্ধ হিসাবে (যদি মানিয়া লও আমি সিদ্ধ)
আমি যে সিদ্ধির পূর্ণতর জীবন গড়িয়া তুলিয়াছি আর পরে প্রচারক
হিসাবে আমার সিদ্ধির পহার যে বাট বাঁধিয়া দিতেছি তাহা আমার

নিজের পক্ষেও বোধ হয় বাস্তবে তেমন ঘটে নাই আর তোমার পক্ষে যে ঘটিবে সত্য হইবে তাহার ত কোন সম্ভাবনাই দেখি না। আমি যাহা বলি, আমার সাধনার কথা বড় জোর হইতেছে উদাহরণ, মাত্র, এমনকি exceptional উদাহরণও হইতে পারে। কিন্তু উদাহরণকে বা নিয়মের একটা ব্যাভিচারকে নিয়ম বলিয়া ধরা ও তাহা হবহু মানিয়া চলা বুদ্ধি-মত্তার পরিচয় নয়। আমি আমার জীবন যেমন আমার ভিতরের একটা অদৃশ্য নিয়মের উদাহরণ, তুমিও তেমনি তোমার নিজের ভিতরের অদৃশ্য নিয়মকে চেন জান, তাহারই উদাহরণরূপে তোমাকে তোমার জীবনকে গড়িয়া তোল, তাহা হইলেই আমার উদাহরণ দেখিয়া তোমার উপকার। ব্যর্থ অনুকরণ মঙ্গলকর নয়; অনুকরণের ইচ্ছাটার পিছনে আমি মনে করি আছে একটা তামসিকতা, আলস্তপরায়ণতা।

প্রবর্তকেরও কি এই লক্ষ্য এই উদ্দেশ্য নয়? প্রবর্তককে গালি দেওয়া হয়, প্রবর্তকের ভাব ভাষা বাক্য অর্থ সব হেঁয়ালী, ত্রুটিবোধ। প্রবর্তক ত্রুটিবোধ হেঁয়ালী বলিয়া মনে হয়; কারণ প্রবর্তকের কাছে চাওয়া হয় এমন জিনিষ, প্রবর্তক যাহা দিতে পারিলেও দিতে চায় না। সকলে আশা করে, প্রবর্তকের কাছে পাইবে একটা Royal Road, মানুষ হইবার—বা তোমাদের কথায় দেবতা হইবার জীবন সাধনার একটা কাঁটাছাটা সোজা পরিষ্কার উপায়। নিরামিষ খাইবে, দিবানিদ্রা যাইবে না, বৌদ্ধ ধারণ করিবে অথবা পদ্মাসনে বসিয়া ব্রাহ্মমুহুর্তে আধঘণ্টা রেচক পূরক কুস্তক করিবে কিম্বা লক্ষবার কালী নাম জপ করিবে, এই রকম কিছু বাঁধা নিয়ম। কিন্তু প্রবর্তক ত পদ্ধতির প্রবর্তন করিতে চায় না; প্রবর্তকের নিজের একটা পদ্ধতি থাকিলেও থাকিতে পারে, আর তাহার কথা সে যে বলে নাই এমনও নয়—কিন্তু সেটির উপরই শুধু নজর দেওয়াকে সে ভাল মনে করে না। পদ্ধতির উপর জোর দিয়া আমরা পদ্ধতির গুণকে উদ্দেশ্যকে খাট করিয়া সহজেই ফেলি। সাধনার পাকা সড়কের জন্ত সকলেই লোলুপ; কিন্তু জীবন-সাধনার জগতে সে রকম পাকা সড়ক নাই। পাকা সড়ক নাই বলিয়া কাঁচা রাস্তা বা পায়ের দাগ একেবারে নাই এমন অবস্থা বলা চলে না, কিন্তু সে রাস্তা সে দাগ অনেক বহুল জটিল; এক এক জন এক এক রকম দাগ ফেলিয়া গিয়াছে। সকল দাগের মোট ভঙা একটা আছে, সেটি প্রবর্তক দিতে চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু সেটি লোকের

মনে ধরিবে কেন, সেটি যে ফুল তরল পঙ্কময়—তাহা ইট পাথর দিয়া গড়া নয়। কাজেই প্রবর্তকের কথা হৈয়ালী।

কিন্তু পথ দেখানটা বোধ হয় প্রবর্তকের প্রাণের কথা নয়, পা ফেলিয়া ফেলিয়া নিশ্চিন্তে উঠিয়া যাইবার জন্য প্রবর্তক স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধিতে বসে নাই। প্রবর্তক নিজের মধ্যে একটা সাড়া পাইয়াছে, সেই সাড়া পাইয়া তাহার এই পঙ্কের সঞ্চালন, তাহার এই জ্বলের দোলন, অসীমের কোলে পথ করিয়া ধাবন। আর সকলেই যে ঠিক তাহার দেখাদেখি একই ভাবে একই ভঙ্গিয়ায় ছলিবে উড়িবে চলিবে বা তার চেষ্টা করিবে তাহা নয়—সেই প্রাণের ভিতরের অন্তরাঙ্গার সাড়া পাইলে এ সকল আপনি হইবে আপনি আসিবে—প্রবর্তক যদি সেইটুকু করিতে পারে তবেই তাহার কার্য্য অর্দ্ধেক সমাধা হইল মনে করিব।

জগতের মানবজাতির সমবেত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে অনেকে বিশেষ আশা-বিত্ত নহেন, তাহার কারণ তাঁহারা দেখিয়াছেন মহাপুরুষ সিদ্ধ আসিয়াছেন গিয়াছেন, এমন কি অবতার স্বয়ং ভগবানও আসিয়াছেন গিয়াছেন, পরন্তু মানুষ দুই দিনের চাঞ্চল্যের ক্ষীতির পর পুনর্মূষিক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কেন? কারণ আমি মনে করি, মহাপুরুষের সিদ্ধের অবতারের ভগবানের মধ্যে মানুষ কেবল সেই royal road পাকা সড়ক খুঁজিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছে। ভাগবত দিব্য ভাবকে আমরা ধরিতে চাই নাই, চাহিয়াছি বিধিব্যবস্থাকে অনুসরণ করিতে। বুদ্ধের বুদ্ধত্ব—তাঁহার সেই 'ইহৈব মে শুভাত্ম শরীরং'—সেই অপূর্ণ তেজ অন্তরাঙ্গায় টানিয়া লই নাই, আমরা বিশ্লেষণ করিতে, চিরিয়া চিরিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি তাঁহার অষ্টাঙ্গ-মাধনার বিধান। চৈতন্যের প্রেমোন্মত্ততা আমাদের প্রাণে তেমন সাড়া দেয় নাই, যেমন দিয়াছে সেই প্রেমের বিকার স্বয়ং পুলক মূর্ত্তা কুন্দন। জগৎ মানুষ যে আশানুরূপ অগ্রসর হইতে পারে নাই, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

তাহা নয়, প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেক সাধক আপনার মধ্যে আপনি স্ব-প্রতিষ্ঠা হইবে, আপনাকে আপনি সৃজন করিবে। অনুকরণ বা অনুসরণ নয়, সৃষ্টি করিতে হইবে—ইহাই যেন সকলের প্রত্যেকের আদর্শ হয়। সত্যসিদ্ধির ইহাই একমাত্র মন্ত্র। এ কথাতে এমন বুঝায় না যে প্রত্যেককেই প্রত্যেক হইতে আপনাকে কাটিয়া লইবে, একান্ত ছাড়া ছাড়ি হইয়া

খাণ্ডিকবে, নিজের মধ্যে ভুবিয়া কুপমণ্ডুক হইয়া খাণ্ডিকবে—না, তাহাও নয়। পরস্পরের সহিত সম্মিলিত তোমরা হও, আদান প্রদান তোমাদের হউক কিন্তু প্রত্যেকে তবু নিজেকেই সৃষ্টি কর, নিজেকে সৃষ্টিই কর—“আত্মানং কল্পয়েৎ।” তবুও আসল কথা এই “আত্মানং কল্পয়েৎ”, আর সব অবাস্তব।

পরিশেষে গোড়ার আমার ব্যক্তিগত কথাটা উল্লেখ করিয়া বিদায় হই। আমার বক্তব্য, আমি ঠিক কি বলি তাহার জ্ঞান ব্যগ্র হইবার তোমাদের খুব একটা প্রয়োজন নাই। আমি যদি চুপ করিয়া থাকি, তাহাতেও তোমাদের বিশেষ কিছু আসা যাওয়া উচিত নয়, আর বাস্তবিক আসে যায়ও না। আজ এই সমস্ত যাহা বলিলাম, সে সকলকেও অকাটা উপদেশ বা বেদবাক্যরূপে গ্রহণ করিও না। আমার উপলক্ষি এই যক্ষম, তাহাই ব্যক্ত করিলাম। এই উপলক্ষি শুনিয়া, তুমি দেখ তোমার উপলক্ষি কি—তাহা হইলেই আমার বক্তৃত্তা সার্থক। ইতি—

কংগ্রেস

এ বৎসর পাঞ্জাবে যে যজ্ঞ উপক্রমের তুফল অভিনয় হইয়া গেল, বিখ্যাত ভারতীয় নিখিলম বিধানচক্র পঞ্চনদের বৃকের উপর নিয়া আবর্তিত হইল, তাহাতে মনে হইয়াছিল, পূর্বনির্দিষ্ট জাতীয় সভার অধিবেশন অমৃতসহরে হওয়া এক প্রকার অসম্ভবই হইবে। কিন্তু ভারতের প্রাণশক্তি ক্রমশঃই উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে, প্রচণ্ড আঘাতেও ইহা নির্যাপিত বা প্রশমিত হইবার নয়, তাই পঞ্চনদের জননেত্রগণ আজ কারাগৃহে আবদ্ধ থাকিলেও পঞ্চনদবাসী জাতীয়-সত্তা সম্পাদনে কটি বন্ধন করিয়া দাঁড়াইয়াছেন, স্বাধীন প্রজ্ঞানন্দকে পুরোভাগে স্থাপন করিয়া কর্তব্য পালনে মনোযোগী হইয়াছেন। কর্ম একান্তই বিষহীন নহে, রাজকর্মচারীগণের পুনঃ পুনঃ বাধা বিপত্তিতে অবসাদগ্রস্ত না হইয়া, অত্যর্থনাসমিতির সত্যগণ ধীর ও নির্ভীক চিন্তে শনৈঃ শনৈঃ কর্মসিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছেন। ভগবান্ সহায় হউন, ভারতের জাতীয়যজ্ঞ অমৃতসহরে সূচাকরূপে সম্পন্ন হউক, ইহাই আমাদের ইচ্ছা।

সুরাটের জাতীয় সভায়, ভারতের রাষ্ট্রনেতৃগণের মধ্যে যে ভেদ বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, এই কয় বৎসর ধরিতা তাহারই প্রকট লীলা চলিয়া আসিয়াছে। ধীরপন্থীগণের হস্তেই এই জাতীয় মহাসমিতির পরিচালনের ভার থাকায়, জাতীয় দল জাতীয়যজ্ঞে নগণ্য বলিয়াই উপেক্ষিত হইয়া আসিয়াছে, সহসা দিল্লীর মহাসভায় জাতীয় পক্ষই প্রবল হইয়া উঠে, এবং ধীর ভীক্ষুবুদ্ধিশালী মহাসমিতি মদনমোহনমালব্য মহাশয়ের অধিনায়কত্বে, নরম দল উক্ত সভায় যোগদান না করিলেও, মহাসমিতির গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল, ভারতের নানা প্রদেশ হইতে পূর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক প্রতিনিধি ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন, শিক্ষিত প্রতিনিধিগণ ব্যতীত, ভারতের বহুসংখ্যক কৃষক প্রতিনিধি এই মহাযজ্ঞে উপস্থিত থাকিয়া মহাসভার প্রাণ-শক্তির যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

সুরাটের অধিবেশন পণ্ড হইলে ধীরপন্থীগণ, চরমপন্থী অথবা জাতীয় পক্ষকে দূরে অপসারিত করিয়া এলাহাবাদে কন্ভেন্সনের সৃষ্টি করেন, জাতীয়পক্ষও আপনাদিগকে স্বতন্ত্র রাখিতে অভিলাষী হইয়া নাগপুরে এক অধিবেশনের আয়োজন করিতে সচেষ্ট হন, কিন্তু গবর্নমেন্টের আপত্তি হওয়ায় উহা তখন কার্যে পরিণত হইল না। তারপর জাতীয় পক্ষের উপর দিয়া প্রবল ঝড় বহিয়া গেল, মহাসমিতি তিলক কারাবাসী হইলেন, দেশে বিপ্লববাদের ভীষণ হতাশন জলিয়া উঠিল, জাতীয়পক্ষের অনেকেই রাজশাসনে দণ্ডিত হইলেন, ফলে কয় বৎসর জাতীয় পক্ষ নীরব ছিল। মেঘ চিরদিন আকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে না, ধীরে ধীরে জাতীয় পক্ষ নানা বিপদ-সমুদ্রে অতিক্রম করিয়া আবার কক্ষক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইল, বিদ্রোহী বাসন্তী, মহাসমিতি তিলক, রাষ্ট্রবীর জিন্দা, বাংলার চিত্তরঞ্জন, ব্যোমকেশ প্রভৃতি দেশভক্ত সন্তানগণের প্রচেষ্টায় ভারতের রাষ্ট্রগগনে জাতীয় দলের গৌরব-আলোক প্রদীপ্ত হইল। জাতীয় মহাসমিতিতেও এই পক্ষই প্রবল হইয়া উঠিল, ধীরপন্থীগণ দিল্লীর অধিবেশনে অপর পক্ষকে শক্তিশালী দেখিয়া ভেদকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন, বাংলার কণ্ঠবীর সুরেন্দ্রনাথ, এক নূতন লীগ প্রতিষ্ঠা করিলেন, কিন্তু সমগ্র ভারতের চক্ষে জাতীয়পক্ষ যেমন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত দেদীপ্যমান, ধীরপন্থীগণ তদ্রূপ নহে, সুরেন্দ্রনাথের প্রভাব না থাকিলে, এই লীগের কথা কাহারও স্মরণে থাকিত কিনা সন্দেহ।

পরাদীন জাতির মধ্যে এই ভেদকে, এই অনৈক্যকে আমরা বড়ই ভয় করি। মর্টেণ্ড-চেম্‌ফোর্ড নুতন সংস্কারে হস্ত ধীরপন্থীগণ সমধিক আশা পাইয়া থাকিবেন, কিন্তু সে আশার আলোয় পুলকিত হইয়া, সমগ্র দেশের প্রাণশক্তিকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করি না। ভগবান্কে ধন্যবাদ, নাগপুরে জাতীয় পক্ষের স্বতন্ত্র অধিবেশন যেমন বন্ধ হইয়া এই 'ভেদকে' প্রকট করিয়া তুলিবার পক্ষে বাধা দিয়াছিল, তদ্রূপ ভারতে রাউলাট বিল উপলক্ষ করিয়া, পাজ্যাবের, লোমহর্ষণকারী ঘটনায়, উভয় পক্ষকে একই কেন্দ্রে সন্নিবদ্ধ রাখিয়াছে। ভারতের ষাটিকাবর্তে বাংলার যে শোচনীয় ছরবন্দা ঘটিয়াছে, তাহাতেও উভয় পক্ষকে একত্র কার্য্য করিতে দেখিয়া, আমরা ভগবানের সন্তোষ বোধিয়া আনন্দিত হইয়াছি।

রিফর্ম বিল লইয়া ভারতে উভয় পক্ষের মধ্যে যে মতভেদ পরিদৃষ্ট হইয়াছিল, বিলাতে তাহার লক্ষণ তেমন পরিস্ফুট হয় নাই, কেননা ধীর-পন্থীই হই, আর চরমপন্থীই হই, ভারতের ভাগ্যবিপর্য্যয়ে যে স্বল্প দুঃখের উপস্থিতি হইবে, তাহা তো সমান ভাবেই সকলকে ভোগ করিতে হইবে, তবে ব্যক্তিগত স্বার্থান্ধির আশা বাহারা রাখেন, তাঁহাদিগকে দেশনেতা বলিয়া কেহই স্বীকার করে না, এবং তাঁহাদের কথা আমরা উল্লেখ করিতেও স্থগা বোধ করি।

এই রিফর্ম বিল লইয়া, বিলাতে উভয় পক্ষের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া Indian Daily news বলেন ".....as regards the Reforms the Moderates and the Extremists are not much opposed to each other and they might be practically said to be sailing in the same boat." অর্থাৎ "রিফর্ম বিল লইয়া ধীর-পন্থী ও চরমপন্থীগণের মধ্যে বড় বেশী বিরোধ দেখি না, একরূপ বলা যাইতে পারে যে তাহারা একই নৌকার যাত্রী"।

আমাদের এত কথাই উল্লেখ করিবার প্রয়োজন, এবার অমৃতসহরে যে মহাসভা হইবে, উহার অভির্থনাসমিতির সভ্যগণ, পাজ্যাবের এই দাক্ষণ দুঃসময়ে, সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রানুভূগণ বাহাতে উপস্থিত হইবেন, তাহার জন্য আয়োজন করিয়াছেন। তাঁহাদের এই নিমন্ত্রণ কোন পক্ষই উপেক্ষা করিবেন না, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। অমৃতসহর হইতে যে ভার বাহির হইয়াছে তাহা আমরা এইখানে উল্লেখ করিয়া রাখি।

“The Executive Committee of the Congress Reception Committee on Wednesday resolved in view of the special circumstances of the Punjab to invite all Indian leaders irrespective of party to join the Amritsar Congress invitation to be issued by the Chairman. The Committee also requested the President and the General Secretary of the All-India Congress Committee to move in the matter. Swami Sradhananda has been elected Chairman of the Reception Committee.”

পাঞ্জাব যে অবস্থায় আজ এই জাতীয়-যজ্ঞভার অমৃতসহরে নিষ্কাশ করিবার জন্ত উদ্যোগ করিতেছেন, তাহাতে ভারতের সকল শ্রেণীর দেশ-হিতৈষীই ইহাতে যোগদান না করিলে, জাতীয় জীবনে কলঙ্ক থাকিয়া যাইবে। বাংলার কংগ্রেস কমিটির সভ্যগণ এ বিষয়ে নিশ্চয় উদাসীন থাকিবেন না এবং ধীরপন্থীগণের নেতা, বাংলার মাথার মনি সুরেন্দ্রনাথও অবস্থা বুঝিয়া স্বব্যবস্থা যে করিবেন, এমন আশা আমাদের আছে।

আমরা এক্ষণে চাই। একই রাজার শাসনাধীনে, একদেশে বাস করিয়া, অনর্থক অনৈক্যের সৃষ্টি করিলে, আমাদের দুর্গতির মাত্রার বৃদ্ধি বৈ হ্রাস হইবে না। সুরাটের কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পর, জাতীয় পক্ষের অগ্রতম নেতা, শ্রীযুক্ত অরবিন্দবাবু ধীরপন্থী ও চরমপন্থীর মধ্যে একাই চাহিয়াছিলেন, তিনি বলিয়া গিয়াছেন—“A rapprochement with the moderate party, where-ever possible and the reconstitution of an united Congress.” দিল্লীর কংগ্রেসে উভয় পক্ষের মধ্যে মতবিরোধ ঘটিলেও, ভগবান্ দাক্ষণ অমঙ্গলের ভিতর দিয়া আজ মহামঙ্গলের সূচনা করিয়াছেন, কোন্ হৃদয়বান্ ব্যক্তি পাঞ্জাবনেতৃগণের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করিবেন? আগামী কংগ্রেসে উভয় পক্ষকেই সমবেত হইয়া কার্য করিতে দেখিবার আশা কি দুর্ভাষা? এই মহা-সুযোগে রাষ্ট্রনেতৃগণের মধ্যে মিলন-প্রতিষ্ঠা না হইলে, বুঝিতে হইবে ভারতের ভাগ্যে দুঃখের অবধি নাই। কিন্তু সেরূপ হতাশার চিহ্ন দেখিতেছি না, চতুর্দিকেই মিলনের মঙ্গল-রাগিণী শ্রুত হইতেছে, ভারতের দুর্দশা অপরিমীফ বটে, কিন্তু এই নিদারুণ দুঃখবাহার ভিতরেই ভারত

অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে, মানুষ যেমন জুংখের মধ্যেই আপ-
নাকে জানিতে ও বুঝিতে পারে, ভারতের দুর্ভাগ্য তজ্জপ শাপে বর
হইয়া উঠিতেছে। সেদিন খালিফার দিনে হিন্দু মুসলমানের পুনর্মিলন
দেখিয়া সারা দেশ পুলকিত হইয়াছে, বহুশত বৎসরের দ্বন্দ্ব কলহ নিঃশেষ
করিয়া হিন্দু মুসলমানকে, মুসলমান হিন্দুকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিতেছে,
মানবাত্মার এ মহামিলন সার্থক হইবে।

পাঞ্জাবের রাষ্ট্রশক্তির বল বীণ্য দেখিয়া, আমরা ইহার সাফল্য
কামনায় এত কথা লিখিলাম। এই নিদারুণ আঘাতে পাঞ্জাব যে মুর্খ
হইয়া পড়ে নাই, ইহা কি আশার কথা নহে? ভারতবর্ষ! তোমার
অধ্যাত্মশক্তিকে চির জাগ্রত রাখিও, আঘাতের প্রতিঘাত করিবার
দিন তোমার নয়, অসীম ধৈর্য ও সাহসের সহিত উচ্চপথেই তোমার
চলিতে হইবে, সত্য মন্ত্র সারা ভারতের প্রাণশক্তি পূর্ণ করুক, সহিয়া সহিয়া
জাতি তার আত্ম-সত্তার পরিচয় লাভ করুক, আপনার উপর শ্রদ্ধা ও
বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা হইলে, সে জাতির অসাধ্য কিছু থাকিবে না।

ভারতের চতুর্দিকে যে সকল কর্মপ্রেরণার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা
সার্থক হউক, যিনি যে ক্ষেত্রে আছেন, অশেষ নিষ্ঠাসহকারে
তিনি তাহাতেই নিযুক্ত থাকুন, কাহারও কর্মনিষ্ঠা টুটাইয়া দিবার ছট্‌বন্ধি
কাহারও যেন না হয়। সমগ্র ভারতে অসংখ্য যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠার
প্রচেষ্টা, লোকশিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য, ধর্ম প্রভৃতি সকল প্রেরণাই সার্থক
হউক। ভারতের মহাসভায়, সমগ্র ভারতের শিরায় শিরায় নূতন শক্তি
সঞ্চারিত হইয়া, নানাক্ষেত্রে দেশসেবক যাহাতে কর্মতৎপর হইয়া উঠে, তাহার
আয়োজন করা হউক। জাগরণের সাড়া যে দিক্ হইতে পাওয়া যায়,
দেশসেবক উৎকর্ষ হইয়া তাহা শ্রবণ কর, নিজের অচলায়তনের কক্ষ-
প্রাচীরে চক্ষু কণ্ঠ বুজিয়া বসিয়া থাকিও না—দেশ জাগিতেছে, দেশের
সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া উদাত্তস্বরে গান গাও, ঘরের বাহিরে আসিয়া
উৎসবপতাকা দোলাইয়া নূতনকে আহ্বান কর, ত্রিয়মান হতাশা অথবা
আত্মগরবে চক্কুহীন হইও না।

সমালোচনা

নিবেদিতা বালিকাবিভাগ, বিবেকানন্দ-পুরস্কার-শিক্ষা ও মাতৃমন্দিরের বার্ষিক বিবরণী (১৯১৬—১৯১৮)—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ হইতে প্রকাশিত এই বিবরণ পুস্তিকাখানি পাঠ করিয়া প্রচুর আনন্দলাভ করিলাম। বাঙ্গালী তার হৃদয়ের পূজার ডালি যাহাদের চরণে উৎসর্গ করিতে চিরদিন আনন্দ অনুভব করিবে—তাহাদের পুণ্যস্মৃতির সহিত গ্রন্থোক্ত প্রতিষ্ঠানের ধূলিকণাগুলি বিজড়িত—বাঙ্গালীর ইহা এক আদরণীয় জাতীয় সম্পদ। স্বধীসমাজ ধনীবৃন্দ মুক্তহস্তে এই পুণ্য প্রতিষ্ঠানের সহায়তা করিবেন ইহা আমরা সূর্যাস্তঃকরণে কামনা করি।

নারীজাতি সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ। অর্দ্ধদেহ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইলে শরীরীর কল্যাণ সম্ভাবনা নাই। একটিমাত্র পক্ষ লইয়া বিহঙ্গ অনন্ত আকাশের কোলে উড়িতে অক্ষম—স্বামীজি একথা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছিলেন। বাংলার নারীজাতির জন্ত তাঁহার যে গভীর বেদনা, “নিবেদিতা”রূপে তিনি দেশজননীর চরণে তাহাই নিবেদন করিয়াছিলেন—একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বস্তুতঃ সিটার নিবেদিতা—বিবেকানন্দের এই গভীর মর্মবেদনারই মূর্তিবিগ্রহ। স্বামীজির এই অলোকসামান্য মানসকন্ঠা পতিত জাতির নারীসমাজের জন্ত আমরণ যে অপূর্ণ তপস্যা করিয়া গিয়াছিলেন—তাহার অমৃতময় ফল সবটুকু আশ্বাদন করিবার মত দেশ হয়তো আজও অধিকারী হইয়া উঠে নাই। তবে তাঁহার জ্যোতির্ময় জীবনের প্রত্যেক মুহূর্তটুকু পর্যন্ত ক্ষয় করিয়া, যে নিরবচ্ছিন্ন শুভ চিন্তায় ও ইচ্ছায় অলক্ষিতে দেশের মানসগগন ভরিয়া গিয়াছেন—তাঁহার জীবন্ত নিঃশ্বাসের মত সেগুলি চিরদিন বঙ্গরমণীর কল্যাণ কামনায় বায়ুমণ্ডলে সঞ্চার করিবে—একদিন না একদিন নিবেদিতার অমর তপঃসাধনা সফল হইবে—আজও বাংলার মাতৃজাতি নয়ন মুদিয়া গভীর নিদ্রায় আত্মহারা—কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে তাঁহাদের জাগিতেই হইবে—আর সেই মহনীয় উদ্বোধনের দিন যাহাদের নাম হীরকময় অক্ষরে কোটা কোটা হৃদয়ে মুদ্রিত হইবে—ভগ্নী নিবেদিতা তাঁহাদের অগ্নিতমা।

আর একজন মহীয়সী রমণী কঠোর সাধনার পর এই দেশের নারীজাতির সেবার আত্মবিসর্জন করিয়াছিলেন—তিনি স্বামীজিরই সহিত জনহীন হিমাদ্রি-শিখরে দীর্ঘ তপোমগ্না রহিয়া পরিশেষে একসঙ্গেই দেবাদেশ লাভ করিয়া, লোকহিতায় লোকালয়ে অবতরণ করিয়াছিলেন—স্বামীজির জগৎবিশ্বতঃ কীর্তির পুনরুল্লেখ নিম্প্রয়োজন—মহারাত্রিরমণী মহিমাময়ী তপস্বিনী মাতাজীর নীরব তপস্তার ফল—মহাকালী পাঠশালা আজও বর্তমান। দুর্ভাগ্য জাতির দুর্দৃষ্ট-

ক্রমে মাতাজীর তপঃক্ষেত্র আজ নগণ্য বালিকাবিদ্যালয় মাত্র—প্রাণ অস্তহিত হইয়াছে, শুষ্ক বাহু পিঞ্জরটুকু পড়িয়া তাহার পূর্ব প্রাণের মাত্র সাক্ষ্য দান করিতেছে। তপঃশক্তি মাত্র সঞ্চল করিয়া হিন্দুরমণী-সমাজের অভ্যুত্থানকল্পে দ্বিতীয় উদ্যম করিয়াছিলেন নিবেদিতা; এ উদ্যম কতদূর কৃতকার্য হইবে, তাহা নির্ণয় করিবার সময় হয়তো এখনও আসে নাই—ফলাফল বাহাই হউক, এ বিদ্যালয়ের বর্তমান পরিচালিকা সিষ্টার ক্রিষ্টিনা, আর তাঁহার অল্পগতা তপশ্চারিণী সহ-সেবিকাগণ যে অতুলনীয় নিষ্ঠা, ত্যাগ, উৎসাহ চালিয়া শ্রুত সাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাহার সমুচিত প্রশংসা করিবার ভাষা আমাদের নাই—নিন্দা প্রশংসার উর্দ্ধে থাকিয়া তাঁহারা অজীবন এইরূপ সমভাবেই এই অপূর্ব ব্রত পালন করুন, ইহাই আমাদের অন্তরের প্রার্থনা।

কার্যবিবরণ সত্যসত্যই যুগপৎ বিস্ময় ও শ্রদ্ধা উৎপাদন করে। “শত শতের অধিক সংখ্যক বালিকাজীবন বিদ্যালোকে উদ্ধাসিত হইয়াছে, তিন শত রমণী এই মন্দিরে প্রকৃত শিক্ষালাভে ধন্যা হইয়াছেন, দুই শত দরিদ্রা কুল-কামিনী শিল্পাদি কার্য সহায়ে জীবিকার্জনের গোরবে প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছেন”—অষ্টাদশবর্ষ মাত্র নীরব অনাড়ম্বর উদ্যমের এই প্রশংসনীয় পরিচয় বাস্তবিকই আমাদের জাতীয় জীবনের পক্ষে গৌরবজনক। বস্তুতঃ, আমাদের শ্রদ্ধা ও পুলক দিগন্তের হইল, যখন পড়িলাম এই গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ মহোদ্যমে কুমারী স্ত্রীরা বস্ত্র প্রমুখা কয়েকজন সর্বত্যাগিনী সন্ন্যাসিনী সম্পূর্ণভাবে নিজস্বক্কে আদ্যোপান্ত সকল কার্যভার বহন করিয়া আসিয়াছেন—‘বেলুড় মঠের ট্রাষ্টিগণ এই কার্যের সহায়তায় কেবলমাত্র বাড়ীভাড়া যোগাড় করিয়া দিতেছেন। শুধু বিদ্যাদান ও হিন্দুভাবে চরিত্রগঠন নয়, ইহার আর্থিক গুরুভারও প্রায় সমুদয়ই পরিচালিকাগণ নানা উপায়ে উপার্জন পূর্বক আপনারাই বহন করিতেছেন। মাতৃমন্দির সম্বন্ধে আমাদের গোটাছুই কথা বলিবার আছে। সিষ্টার নিবেদিতা ও ক্রিষ্টিনার অপূর্ব আদর্শানুপ্রাণিত কতকগুলি ছাত্রী প্রাণে প্রাণে হিন্দুরমণীগণের সেবার পূর্ণ জীবননিয়োগের আকুল আস্থান অল্পভব করিয়া পারিবারিক সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে এই নারী-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—এইরূপেই এই মাতৃমন্দিরের উৎপত্তি। এ পর্যন্ত নানা প্রতিকূল অবস্থার সহিত কঠোর সংগ্রাম করিয়াও তাঁহারা এমনভাবে ঐ কার্য পরিচালন করিয়া আসিয়াছেন, যে অল্পকালের মধ্যেই উহার স্তন্য চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া সাধারণকে উহার প্রতি সশ্রদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। বাঙ্গালীজাতির ইতিহাসে এ এক অদৃষ্টপূর্ব ঘটনা। স্বামীজির শুদ্ধ চিত্তপটে হিন্দুরমণীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিরূপ চিত্র সংগোপিত ছিল জানি না—এ সম্বন্ধে সমস্ত সমস্যা নিকপণের ভার রমণীগণের উপরই গ্রাস্ত রাখিবার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন, শুধু বৈদিকরমণী-দিগের গ্রায় পুরুষের মত সমভাবে উচ্চশিক্ষা প্রদান করিয়াই নিরস্ত হওয়া উচিত—এইরূপই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল বলিয়া মনে হয়। মাতৃমন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী-গণ স্বয়ং রমণী, বেলুড় মঠের শ্রদ্ধেয় কর্তৃপক্ষগণও এক্ষেত্রে তাঁহাদেরই উপর সমস্ত

আত্মজীবন ও অধিকার নিরূপণের ভার সংস্থাপ্ত করিয়া স্বামীজির উক্তির মধ্যাদা রক্ষা করিয়া ভালই করিয়াছেন সন্দেহ নাই—কিন্তু ভগবতীর অংশস্বরূপিনী আমাদের মাতৃজাতি যদি এইরূপ যন্ত্রবদ্ধ জীবনাদর্শ নির্বাচন করিয়া লইয়া, তাহাই দেশের পুরোভাগে ধারণ করা শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহা যে দেশের পক্ষে অশেষ কল্যাণকর হইবে না—একথা আমাদের দুঃখের সহিতই জ্ঞাপন করিতে হইতেছে। আমাদের আশঙ্কা অমূলক নয়—উচ্চত্রে জীবন উৎসর্গ করিবার মহদাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে জাগিয়া উঠিলেই যদি পারিবারিক স্নেহবন্ধন ছিড়িয়া স্বৈচ্ছাসেবিকাবেশে মঠে আশ্রমে আবাস স্থাপন করা অপরিহার্য হইয়া উঠে, অন্ততঃ হিন্দুরমণীর সম্মুখে যদি এইরূপ জীবনাদর্শই সমাজের শ্রেষ্ঠ নারীরত্নগণের দৃষ্টান্তে প্রতিষ্ঠালাভ করে, তবে তাহার ফলে এই প্রাচীন সমাজের বৃকে এমন একটা গতিশ্রোতঃ আনয়ন করা হইবে, যাহা পরিণামে পাশ্চাত্য সমাজরূপের একটা উচ্চতর ও শুদ্ধতর হিন্দুসংস্করণ মাত্র গড়িয়া তুলিবে। নারীসমস্যার কোনও সমাধানই পাশ্চাত্য সভ্যতা করিতে পারে নাই, ভারতবর্ষকেই এই জটিল সমস্যার স্বমীমাংসা যদি কখনও করিতে হয়, তবে তাহার জন্ম তাহাকে আপন নিগূঢ় দৈবপ্রতিভারই উদ্বোধন করিতে হইবে; নতুবা এই ধনিষ্ঠ সংবর্ষের যুগে তাহা সহজেই প্রতীচ্যের ছায়াচ্ছন্ন হইবার আশঙ্কা স্পষ্টচর। আমরা দেখিতে পাই, স্বয়ং স্বামীজির কঠোর বৈরাগ্যদীপ্ত মানসপটেও যেন একটা নারী-মঠের অক্ষুট আভাস রহিয়াই গিয়াছিল—কে জানে, ইহার জন্ম কে অধিকতর দায়ী—সেই প্রাচীন বৃদ্ধযুগের মহাভিক্ষুণী গোপাদেবীর গৈরিকবসনাবৃত্তা ভিক্ষুণীসংঘ, না, খৃষ্টীয়জগতের St. Augustine প্রভৃতির ধর্মপ্রচারিকামণ্ডলীগুলি? নারীশিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের অনেক কথা আমরা অন্তরে ব্যক্ত করিয়াছি ও করিব, এক্ষেত্রে আমরা কেবল এইটুকুই নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, যে নূতন ও উজ্জলতর গৌরবসম্পন্ন ভবিষ্য ভারতের বৃকে, যে তপস্বিনী মহীয়সী নারীকুল জন্মগ্রহণ করিবেন, তাঁহারা নীতা সাবিত্রী দময়ন্তী লোপামুদ্রার মতই সংসারের রন্ধে রন্ধে জ্যোতির্ময়ী প্রতিভার দীপ জালিয়া শত শত যুগের অন্ধকারকুণ্ডলিকা বিদূরিত করিবেন, তাঁহারা মাতা, ভগ্নী, কন্যা, পত্নীরূপে পারিবারিক সহস্র নিবিড় সম্বন্ধে জড়িত হইয়াই হিন্দুর পবিত্র গৃহাশ্রম, বিদ্যায়, সেবায়, ত্যাগ ও সংযমের পুণ্য প্রভায় নিত্য উৎসবময় করিয়া রাখিবেন—মাতৃরূপিণী নারীজাতির স্নেহময় করণশব্দ যদি কর্মশ্রান্ত সন্তানকুলের ললাটের স্বেদধারা মুছাইবার পরিবর্তে কঠোর অর্থ উপার্জনেই নিয়োজিত হয়, মধুর রূপ রসে হৃদয় সঞ্জীবিত না করিয়া যদি তাঁহারা আপনাই কর্মক্ষেত্রে মল্লবেশে অবতীর্ণ হইবার জন্ম আকুল হইয়া উঠেন—তবে তাহা ভারতসন্তানগণের দুর্ভাগ্যই বলিতে হইবে। হিন্দুসমাজে ব্রহ্মসাম্বাদিকা সম্মানসিনীকুলেরও স্থান আছে—কিন্তু স্রেসব কথা আলোচনা করিবার এখানে স্থানাভাব।

অবলম্বের নুতি

যে কাহিনী বিশ্বস্তির গহ্বরে আত্মগোপন করিতেছে, তাহাকে টানিয়া টানিয়া লোকলোচনের গোচরীভূত করিবার উদ্যম প্রচেষ্টা কেন করিতেছি? যে কথা মানুষ আর শুনিতে চাহে না, দেশনেতৃগণের কর্ণে যে বাণী আর তেমন বেদনার রাগিণী বলিয়া শ্রুত হয় না, সুখস্বাচ্ছন্দ্যময় ভবিষ্যতের আশাচিত্রে বিমোহিত বাংলাদেশকে এ দুঃখের সঙ্গীতে অতিষ্ঠ করিয়া তুলি কেন? কেন রাজশক্তির অপ্রিয় প্রসঙ্গ বার বার উত্থাপন করিয়া তাঁহাদের কোপদৃষ্টে পতিত হই? কেন—সে কথা কেমন করিয়া বুঝাইব? এ বকের গুঞ্জীভূত বেদনার গাথা সমব্যথী ভিন্ন অপরে বুঝিবে কি?

আমরা রাজনীতিক বন্দীগণের কথাই বলিতেছি। স্বদেশপ্রেমের অমর-প্রেরণায় উরুদ্ধ হইয়া, তাহারা যে তত্ত্বে পরিচালিত হইয়াছিলেন, তাহা ভুল হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের দেশহিতৈষণা মিথ্যা নহে। জননী স্বপ্ন-ভূমির সহিত বাহার পরিচয় নাই, স্বদেশের প্রতি বাহার মমতা নাই, শ্রদ্ধা নাই, ভক্তি নাই, স্বজাতির অথবা রাজশক্তির সত্য মঙ্গল তাহার দ্বারা কোন কালেই সংসারিত হইবার নহে। আজ বাহার পুরাতন কর্ম-প্রবাহে ভাসিয়া অবরুদ্ধ জীবনে, আন্দামানে, কারাগারে, বাংলার গ্রামে গ্রামে হতাশ নয়নে মৃত্যির প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন, তাঁহাদের কথা ভাবিবার লোক কি বাংলাদেশে কেহ নাই?

কেহ কি স্পর্ধা করিয়া বলিতে পারেন না, যে বাংলার নূতন কর্মক্ষেত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, বাঙ্গালীর মানসিক ডাবের অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটয়াছে, ভাঙ্গালী দেশসেবার উৎকৃষ্ট পন্থা আবিষ্কার করিয়াছে; ভবিষ্যতে কোনও নবীন দেশসেবক, রাজসিক উত্তেজনার উদ্ভাস হইয়া, পৃষ্ঠাচ্যোতায় পৈশাচিক এনাকিজমে যোগদান করিয়া অনাচার আনয়নে উদ্যোগী হইবে না—এই আগামী শান্তিউৎসবে বাংলার সকল রাজনীতিক বন্দীকেই নুতি দেওয়া হউক?

কথাটা উড়ট নহে। সম্প্রতি “কেশরী” পত্রিকায় প্রকাশ, বোম্বাই প্রদেশে এক আবেদনপত্র স্বাক্ষর হইতেছে—বোম্বাইয়ের রাজনীতিক বন্দীগণকে মুক্তি দিবার জন্ত। দুর্ভাগ্য বন্দীগণের প্রতি দেশনেতৃগণের এই সহানুভূতি প্রশংসার্হ, কিন্তু বোম্বাই প্রদেশের অপেক্ষা বাংলা দেশে এইরূপ প্রচেষ্টা হওয়ার প্রয়োজনীয়তা যে অধিকতর বাঞ্ছনীয়, একথা কি আবার বলিতে হইবে?

অনেকেই মনে করেন, বঙ্গীয় গবর্ণমেন্ট ক্রমশঃই রাজনীতিক বন্দীগণকে মুক্তি দিতেছেন, সংবাদ না পাইলেও বহুসংখ্যক অবরুদ্ধ যুবক মুক্তি পাইয়াছে; কথাটা একেবারে মিথ্যা না হইলেও যেরূপভাবে মুক্তির বিধান করা হইতেছে, তাহা রাজশক্তি ও মুক্তিপ্রার্থী উভয়ের পক্ষেই অসুবিধাজনক।

আমরা প্রথম হইতে স্বীকার করিয়া আসিতেছি, যে বাংলার বিপ্লববাদ অতি প্রবলমুর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। যাহারা যথাবিধি রাজবিচারে দণ্ডিত, তাঁহাদিগকে অপরাধী বলিয়াই মানিয়া লইতে হইবে; কিন্তু অন্তরীণ বিধানে যাহারা অবরুদ্ধ হইয়াছেন, চন্দ্রভারকর বিচক্রকট কমিটিতে ইহার দোষী বলিয়াই সাব্যস্ত হইলেও, প্রকাণ্ডে বিচার না হওয়ার, দেশবাসী কমিটির মন্তব্য অনাস্ত বলিয়া গ্রহণ করে নাই, এরূপ ক্ষেত্রে সকল বন্দীই যে অপরাধী এরূপ ধারণা যুক্তিযুক্ত নহে। আমরা দেখিতে পাই, অন্তরীণ সেই সব যুবকই মুক্তি পাইতেছে, যাহারা নিজেদের দোষ স্বীকার করিতেছে, অবশ্য রাজশক্তির কৃপালাভ করিতে হইলে অপরাধী ব্যক্তির আত্মদোষ প্রকাশ করাই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু এমন লোকও তো থাকিতে পারেন, যাহারা প্রকৃত কোন অপরাধই করেন নাই? রাজকর্তৃপক্ষগণের মতে এরূপ কাহাকেও ধৃত করা হয় নাই, অতএব ইহার বিরুদ্ধে কোনরূপ মত প্রকাশ রাজশক্তির অবমাননা হইতে পারে, সুতরাং ইহা হইতে বিরত হওয়াই শ্রেয়ঃ। কিন্তু রাজকর্তৃপক্ষগণের জীদেব জন্ত, যে অসুবিধাটুকু ঘটতেছে, তাহা সবিস্তার প্রকাশ না করিলে, দেশের প্রতি ও রাজশক্তির প্রতি কর্তব্যের ক্রটি করা হয়।

বাঙালীর মন নানা কারণে শক্তিহীন। যে মানসিক বল থাকিলে, সত্যের মহিমা জ্ঞাপন করা সম্ভব হইয়া উঠে, অধিকাংশ বাঙালীরই সেরূপ মানসিক বলের অভাব। দুই চারি বৎসর জীবনস্রোতঃ অবরুদ্ধ

থাকিল, অনেক যুবকই মনমরা হইয়া গিয়াছে এবং মুক্তির জন্য গোঁজামিল দিয়া সভ্যের অপলাপ ঘটাইয়া মুক্তি লাভও করিতেছে। প্রকৃষ্ট চরিত্র-বলের অভাব থাকিলেও এই সকল যুবক মুক্তি পাইয়া স্বাধীনভাবে জীবিকার্জন ও দেশসেবা করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবে, এইজন্য ইহাতেও আমাদের বিশেষ আপত্তি নাই। কিন্তু সকলেই যে এরূপ করিবে, এরূপও তো না হইতে পারে। অনেক নিরপরাধ যুবক হয়ত ঘটনাচক্রে রাজশক্তির সংশয়-আবর্তে বিপন্ন হইয়া দণ্ডভোগ করিতেছেন, তাঁহারা আত্মসম্মান ও অসাধারণ মানসিক বলপ্রযুক্ত, যেমন তেমন করিয়া মুক্তি পাওয়ার অপেক্ষা আজীবন অবরুদ্ধ থাকারও শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিতে পারেন। এরূপ অবস্থায় যুবকদিগের সত্যপ্রিয়তার জন্যই যদি তাঁহাদের মুক্তি অসম্ভবপর্যন্ত হয়, তাহা হইলে বড়ই পরিতাপের বিষয় হইবে।

বাংলায় যেরূপ ভীষণ বিপ্লবতরঙ্গাবর্তন দেখা দিয়াছিল, তাহাতে অনেকেই নানা কারণে গভর্ণমেন্টের চক্ষে সংশয়ভাজন হইয়াছিলেন—এই সকল কারণ বাহিরের দিক হইতে গুরুতর দেখাইলেও অবস্থানুসারে ভুক্তভোগীর পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিকই হইয়াছিল, হয়তো স্বীকার করিবার মত ইহাদের কোনও অপরাধ না থাকিতে পারে, কিন্তু চরিত্রবল অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ইহারা ধৈর্য্যসহকারে কারারুদ্ধ সহিতে প্রস্তুত আছেন, এরূপক্ষে গভর্ণমেন্টের দিক হইতে সুবিচার প্রাপ্তির আশা কি আমরা করিতে পারি না ?

দৃঢ় উচ্চ চরিত্রবল অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, সদাশয় ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের শাসনে অনর্থক কেহ দণ্ডভোগ করে, ইহা নিতান্তই অশোভন ও অস্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হয়। কেননা ইংরাজরাজ অবিবেচক ও হৃদয়হীন নহেন, “morals” ভাঙ্গিয়া মানুষকে পরিজ্ঞান দেওয়া তাহাকে একপ্রকার জীবনমৃত করিয়া রাখা, বাংলার চিরশান্তি রক্ষার উপায় যুবকদিগের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া নহে, বরং চরিত্রবান্ যুবকগণের জীবন-পিকাশকে সফল করিয়া তুলিবার প্রকৃষ্ট উপায়বিধান করিয়া দেওয়া। রাজকর্তৃপক্ষগণ এ বিষয়ে একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে আমরা কৃতার্থ হইব।

দেশনেতৃগণের নিকট আমাদের প্রার্থনা, বোম্বাইবাসীর মত বাংলা দেশেও সকল রাজনীতিক বন্দী বাহাতে মুক্তি পায়, তাহার বিপুল আয়োজন করা হউক। একথা খুবই সত্য, যে, বর্তমান রাষ্ট্রক্ষেত্রে যে

সকল জটিল কর্ম উৎস্থিত হইয়াছে, তাহার সমাধানে নেতৃগণ যৎপরোনাস্তি ব্যস্ত আছেন, কিন্তু ইহাও তো একটি গুরুতর সমস্যা। শান্তি উৎসবের আর অধিক বিলম্ব নাই, ইহার প্রতীকার করিতে হইলে, আর কাল-বিলম্ব না করাই যুক্তিযুক্ত। তারপর দেশের যুবকগণের প্রতিও আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। সংবাদ সত্য কি মিথ্যা, তাহা আমরা জানি না, তবে মিথ্যা হইলেই ভাল। “পত্রিকা” প্রকাশ, ময়মনসিংহে গীলা বোম্ব নামক জনৈক গয়েন্দাপুলিশের গুপ্তচর অন্তরীণগুক্ত জনৈক যুবকের দ্বারা নিহত হইয়াছে। গীলা বোম্বের মৃত্যু অশ্রু কারণেও ঘটিতে পারে, ইহা একটা অসম্মানের কথা, কেননা উক্ত গুপ্তচর নিরুদ্দেশ হইবার পূর্বে অন্তরীণগুক্ত শ্রীমান্ শ্রামানন্দ সেনগুপ্তের সহিত তাহাকে ভ্রমণ করিতে দেখা গিয়াছিল। আমাদের বিশ্বাস, এই নরহত্যার অশ্রু কোন কারণ আছে, কেননা শ্রীমান্ শ্রামানন্দের নিকট হইতে তাহার বক্তব্য শুনিয়া পুলিশ নিরস্ত হইয়াছে। কিন্তু ভবিষ্যতে যদি এরূপ হয়, তাহা হইলে জাতীয় চরিত্রে বড়ই কলঙ্কিত হইবে।

“প্রবর্তকের” পাঠকসংখ্যা যুবকগণের মধ্যেই অধিক। আমরা আমূল চরিত্রগঠনের ত্রুত লইয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছি। একজন “প্রবর্তকের” হিতাকাঙ্ক্ষী সন্ন্যাসী পাঠক লিখিয়াছেন, “তোমাদের প্রেমের সাধনা যুবকদল গ্রহণ করিতে তত ইচ্ছুক নয়, তাহারা চাহে একটা হিপ-হিপ জ্বরের ভাব।” ইহার স্ববখানি সত্য নহে—তাহা আমরা জানি। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যুবকগণের মধ্যেই প্রেমের রাজ্য বিস্তার লাভ করিতেছে, তবে মনে হয়, অনেক অপরিণতবয়স্ক যুবক এখনও পুরাতন বিপ্লববাদেরই পক্ষপাতী এবং তাহাদিগকেই আমরা বলি—এই বিপ্লববাদ তো পরাধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্ত, পরাধীন জাতির যতই জ্ঞান প্রকাশ হয়, ততই তাহারা মুক্তির জন্ত লালায়িত হইয়া পড়ে, ইহাও সত্য সিদ্ধান্ত। কিন্তু কোন্ পথটী ইহার জন্ত প্রেরণ ও মঙ্গলজনক, তাহাই গভীর চিন্তাসাপেক্ষ। দেশে যে সকল কর্ম, রাজনীতিক, চর্চা, শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি অল্পষ্ঠাননিচয় সৃষ্ট হইতেছে, ইহার সবই তো জাতিকে মাহুষ করিয়া তুলিবার জন্ত। উদার ইংরাজ গভর্নমেন্টও তো বলিতেছেন, মাহুষ হইলেই তোমরা স্বাধীনতা পাইবে, এই সকলই তো প্রত্যাশিত।

রাষ্ট্রীয় মুক্তির জন্ত উদ্ভাবিত এই সকল পন্থা সযত্নেই আমরা দেশকে সাবধান হইতে বলি, কেননা উহাই ভারতের সবথানি নয়, আত্মমুক্তির সাধনাই এক্ষণে আমাদের করিতে হইবে, রাজনৈতিক মুক্তির জন্ত অরাজকতার রক্তলীলা ভারতের চরিত্রে স্থান নাও পাইতে পারে।

এই আত্মমুক্তির জন্য, আইস সর্বপ্রথমে আমাদের অন্তরতম পুরুষকে জাগ্রত করিয়া তুলি, তাঁহার ইচ্ছাকে প্রকট করিয়া তাঁহারই অঙ্গুলিসঙ্কেতে কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হই, এ পথও যে বিঘ্নসঙ্কুল এ কথা না বলিলেও চলে, তবে এই ধর্মসাধনার পথে বাধাস্বরূপ বাহাই উপস্থিত হউক, তাহাকে আঘাত করিয়া দূর করিবার বিধি স্মৃষ্ট নহে, আমাদের অসীমতার মধ্যে তাহার অকল্যাণকারী ইচ্ছা বিলীনও হইয়া যাইতে পারে। বিদেশকে স্থান না দিয়া অগাধ প্রেমে হৃদয় পূর্ণ করিয়া, একনিষ্ঠ সাধকের মত আইস কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হই।

এই সাধনার ক্ষেত্রে, সর্বপ্রথমেই আমরা আপনাকে জানিবার ও পাইবার তপস্যা করিব। আপনাকে যে পরিমাণে পাইব ও জানিব সেই পরিমাণে আমরা ভাগবতভাবে বিভোর হইতে পারিব, এবং এইরূপে পূর্ণ দেবচরিত্রলাভের উপযোগী হইয়া উঠিব।

দ্বিতীয়—এইরূপ দেবচরিত্র ব্যাট্ট লইয়া এক বিরাট সমষ্টির সৃষ্টি করিব। এই অসংখ্য ব্যাট্ট, একই কেন্দ্রচক্রের বজ্রসঙ্কেতে, একটি আত্মার মজ্জা অথচ বহুভাবে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে বিচিত্র কর্মে রত থাকিবেন।

তৃতীয়—এই দেবচরিত্রের পূণ্যপ্রভার ভারতে নবসৃষ্টির অভ্যুদয় ঘটাইয়া তুলিব, ও বিশ্বের বুকে, যে জমাট আধার পুঞ্জীভূত থাকিয়া, জগতে বিষম দ্বন্দ্ব ও অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা এই পবিত্র স্বর্গীয় আলোকে অপসারিত করিয়া স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিব।

ভারতের তপস্যা ইহারই জন্য। যিনি আমাদের জীবনগুলিকে আশার পুলকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছেন, যিনি উত্তেজনার পরিবর্তে বিছাৎ উৎসাহে আমাদের প্রাণে আগুন জালিয়া দিয়াছেন, আইস কোটা শির নমিত করিয়া তাঁহার চরণে প্রণত হই। কার্ধ্য দেবতার, মানুষের সহিত মানুষের দ্বন্দ্ব অহঙ্কারেরই পরিচয়।

“ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিঃ নিবেদ্য।”

জ্ঞান-যন্ত

আমার ইচ্ছায় কিছুই হয় না; সমস্তই ভগবানের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে—এই দৃষ্টিটুকু ফুটিয়া উঠিলেই আত্মসমর্পণযোগের আরম্ভ হয়। এই ভাগ-বতময় হওয়াই আমাদের সাধনা—আমার সমস্ত জীবনের ভার তাঁহারই, আমার ধর্ম কর্ম সাধন ভজন সমস্ত কিছুর জন্তই আমি আর একবিন্দু দায়ী নহি, দায়ী ভগবান্ স্বয়ং—যেদিন যে মুহূর্তে এই জ্যোতিঃলেখা মানুষের বুদ্ধিপটখানি আলোকিত করিয়া তুলিবে, সেই মুহূর্ত হইতেই নতুন জীবনের সূত্রপাত—আমাদের সাধনা বল, তপস্যা বল, ধর্ম যোগ যাহাই বল—আমাদের সবটুকুই এই একটি নিগূঢ় জীবনমন্ত্রের মধ্যে নিহিত—আর সব যাহা কিছু, সে তো শুধু বৃথা আড়ম্বর মাত্র—সাধনার জন্ত আবার নানা সমারোহের প্রয়োজন কি?—“আমার জীবন তোমার তরে, এই কথাটি মনে রাখা।”

এই যে ধর্ম, যাহা এত সহজ, এত সরল, এত সুখসাধ্য, তাহাকে আমরা সাধনার আড়ম্বরে কত জটিল হুর্গম করিয়া তুলিয়াছি—ধর্ম যেন হিন্দুজীবনের হইয়া উঠিয়াছে একটা বিপুল বোঝার মত—তাহার দুর্ব্বল ভায়ে পৃষ্ঠ নমিত, লগাট কুণ্ঠিত, সমস্ত চেতনা আড়ষ্টতাময়; ভজন অমু-ষ্ঠান পূজার্কনার, কত বিচিত্র সমারোহ—উপচারের স্তূপে প্রাপের নৈবেদ্য হারাইয়া গেল—অস্তরাঙ্কার হাহাকার জুড়াইল না—হায়! কাদা ঘাঁটাই সার-হইল, জালে মাছ উঠিল কই?

তবুও বাঙ্গালীহিন্দুর জীবনে ধর্মের আয়োজন কত প্রচুর। বাঙ্গালীর দীর্ঘ বৎসর অর্দ্ধেকখানি শক্তির আরাধনায় অতিক্রান্ত হয়, শারদীয়া দশভূজা মহাহুগাঁ হইতে আরম্ভ করিয়া কালী, জগদ্ধাত্রী, সরস্বতী, বাসন্তী, অন্নপূর্ণা পর্য্যন্ত যেন একটা একটানা শক্তিপূজার প্রবাহ তাহার জাতীর জীবনের উপর দিয়া বহিয়া যায়—ইহারই মধ্যে বৎসর ঘুরিয়া আসিতে না আসিতে ফাল্গুনের ফল্গু-উৎসব—অম্বরাগের রক্তকুসুমেরে তনু মন প্রাণ রঞ্জিত করিয়া সারি

সারি প্রেমোৎসবের মধ্য দিয়া রথযাত্রা, পরিণেবে জন্মাষ্টমী পর্য্যন্ত বাঙ্গালী প্রেমের অনুশীলন করে—সারা বর্ষের প্রাপ্ত হইতে প্রাপ্ত পর্য্যন্ত শক্তি আর প্রেমের হিলোলে তাহার সমস্ত জীবনখানি ঘেন ভাসিয়া ভাসিয়াই চলিয়াছে—ওরে আমার সোণার বাংলা,—তবু তোর সপ্তকোটি সন্তানকে আজও এমন দুর্বল হীন স্বার্থপুতিগন্ধময় দুর্বল জীবনভার বহিয়া মরিতে হয় কেন?

আমার এই সাধের বাঙ্গালীজাতির সবই আছে—এমন গভীর অতুলনীয় হৃদয়, এমন তীক্ষ্ণ-প্রতিভাময় অন্তঃশীলা বজ্রদূত সঙ্কল্পশক্তি—এ অনুপম প্রীতি ও অন্তর্নিহিত শুভেচ্ছার তুলনা জগন্ময় তো কোথাও মিলিল না—কিন্তু কি নাই, বার জন্ম বাঙ্গালীর এই সব অপূর্ব দৈবসম্পদ দীপ্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতে পারিতেছে না—কোন অনুপলব্ধ রসায়নের স্পর্শে এই হৃদয় ও প্রতিভা জ্যোতির্ময় সহস্রদলে পূর্ণ প্রস্ফুট হইয়া উঠিবে?

ঠাকুর রামকৃষ্ণের আশীর্ব্বাদে জ্ঞানমূর্ত্তি স্বামীজির কণ্ঠে যেদিন বজ্রকণ্ঠে বেদান্তের মহাবীজধ্বনি বাজিয়া উঠিল—সেই দিনই বাংলার চমক ভাঙ্গিল, তাহার সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ-প্রবাহ শিহরিল, তাহার জ্ঞানময় সুপ্ত অন্তঃ-পুরুষ পুলকে নৃত্য করিয়া উঠিল। 'বাংলার' শক্তি ছিল, বাংলায় প্রেমও ছিল—ছিল না শতস্র্ঘ্যসমপ্রভ জ্ঞানের জ্বালামালা—তাহারই অভাবে শক্তি পঙ্গু, প্রেম মলিনতাময়—বাঙ্গালীর শক্তিপ্রেমের সাধনা জ্ঞানের অভাবে ম্লান-হীনপ্রভ, পূর্ণাবয়ব হইয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই।

বিবেকানন্দ সেই জ্ঞানসূর্য্য প্রকাশ করিবার জন্ত প্রথম অভিযান করিলেন—বাংলার ইতিহাসে তাই স্বামীজির স্থান অস্বিতীয় অনন্ততুলনীয়। জাতীয় ধর্মসাধনা হিসাবে উত্তরপশ্চিম ভারতে জ্ঞানের অপ্রতুল নাই, সেখানে অভাব হইতে পারে প্রেমের, দক্ষিণভারতে প্রেম ভক্তি সুপ্রচুর হইলেও সেখানে প্রয়োজন হইতে পারে শক্তির, কিন্তু শক্তি প্রেমের সাধনার সিদ্ধ বাঙ্গালীজাতির সাধন-যজ্ঞ পরিপূর্ণ করিবার জন্ত আবশ্যক শুধু জ্ঞানের বিমল আলোক—বেদান্তের মধ্যাহ্নসূর্য্যের মত আলোজ্বল দ্রুতি-প্রভায় একবার আপামরসাধারণ বাঙ্গালীর জীবন বলসিত হউক—পূর্ণ দিব্য জাতির দীপ্ত জীবন্তচিত্র এইখানেই সর্বপ্রথমে আবিস্কৃত হইবে।

বাংলার কুটীরে কুটীরে জ্ঞানের আলো জ্বালাইতে হইবে—অপূর্ণ জ্যোতিঃপুষ্পে সারা দেশ ভরিয়া দিতে হইবে—বেদান্ত-মন্ত্রের সত্য অনুভব এই দীর্ঘ সাধননিষ্ঠ জাতির অন্তরে অন্তরে পূর্ণ প্রকাশ করিয়া তুলিতে হইবে। ইহাই আজ বাঙ্গালীর জাতীয় সাধনা। ইহারই স্বচ্ছ আয়োজন এক্ষণে করিতে হইবে।

সাধনার পর্যায় আছে। একদিন শক্তিসাধনার পর্যায় আসিয়াছিল—বাঙ্গালী তন্ত্র প্রচার করিয়াছিল, চতুষ্টী মহাতন্ত্রের ব্যবস্থাপিত সাধন-কাণ্ডে এই জাতি সর্বাস্তুরূপে কটবন্ধনপূর্বক লাগিয়াছিল, অনন্তরূপিনী শক্তিরাগীর অধ্যাত্মপূজায় বাঙ্গালী সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল—সে সিদ্ধি লুপ্ত হইবার নহে, আজ উপরের জড়ত্ব দেখিয়া হতাশ্বাস হইও না—মহাদেবীর বরাভয় খড়গখর্পর চতুষ্টী শক্তি পূর্ণাবয়বেই জাতির অন্তরে লুকায়িত আছে—প্রয়োজন বহিয়া না সে সিদ্ধৈশ্বর্য লৌহপেটকার আটকাইয়া রাখিয়াছেন, আরার প্রয়োজন হইলেই রুদ্ধ ভাণ্ডার মুক্ত করিয়া দিবেন—মহামাতার সিদ্ধতিলক এই জাতির ললাটে অঙ্কিত আছে—বিশ্বাস কর, মাতৃপ্রয়োজনমত ধূমাবরণ সরিয়া গিয়া তাহার পূর্ণপ্রভা একদিন ফলসিয়া উঠিবেই।

আর একদিন আহ্বান আসিয়াছিল প্রেমের—নারদের মাঠে তাহার প্রথম অক্ষুট স্বাক্ষর যখন প্রথম বাজিয়া উঠিয়াছিল, সেদিন কাহারও তাহাতে লক্ষ্য পড়ে নাই, কিন্তু অনাহত মুরলীরব ক্রমেই ক্ষুট হইতে ক্ষুট হইয়া বাঙ্গালীর কাণে ভাসিয়া আসিতে লাগিল, ক্রমে আরও নিকট, আরও গভীর, আরও নিবিড়ঘন ভাবময় হইয়া, পরিশেষে ক্রমাৎ মুক্তপ্রেম নদীয়ার চাঁদ আবির্ভূত হইলেন—প্রেমের স্রোতে ডুবিবার ভয় আঁকুল কণ্ঠে প্রাণের ডাক আসিল—বাঙ্গালী একেবারে আপনহারা হইয়া সে আহ্বানে সায় দিল, পিরীতি সাগরে বাঙ্গালী আকণ্ঠ মজিল,—শান্তিপূর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়—শুধু নদীয়া কেন, এই সাগরধৌতচরণ সাগর বাঙ্গলার বিশাল নবদীপ সেই প্রেমসমুদ্রে শতাব্দীর ধরিয়া মনের সাধে সন্তরণ করিল।

আজি আবার নূতন আহ্বান আসিয়াছে—শুধু শক্তি নয়, অক্ষশক্তির
 বোড়শোপচারে পূজা করিয়া যুগযুগান্তর পূর্বেই তো আমরা সে সিদ্ধি উপা-
 র্জন করিয়াছি—সিদ্ধের সাধনা মোহজাত, কাল অপচয় মাত্র—শুধু প্রেম
 নয়—পিরীতি-মাগরে সিনান করিয়া আমরা তো বছদিবস প্রেমের
 ভুবনে কাটাইয়া আসিলাম, ধসিয়া ধসিয়া আমাদের হৃদয় নির্মল হইয়াছে—
 জগৎ তুলিয়া লিসংসার তুলিয়া ভক্তি প্রীতির পঞ্চরস তত্ত্ব আনন্দভরে
 আস্থাদান করিলাম—প্রেমের অভিষেকে হৃদয় আমাদের এখনও এক যুহুতেই
 মধুময় হইয়া যায়—এ'ও আমাদের জন্মজন্মান্তর অপূর্ব হৃদয়সম্পদ—পিরীতির
 নগরীনির্মাণ আমরা স্বপ্নলোকে ইতিপূর্বেই করিয়া রাখিয়াছি—তাই অস্ত্রের
 কাছে বাহাই হটক, বাজালীর নিকটে প্রেমসম্রাজ্যের দিব্যস্বপ্ন একেবারেই
 নূতন নয়, সে স্বপ্নপূরী বাজালীর হৃদয়ক্ষেত্রে সমস্তই প্রস্তুত—এইবার
 কেবল বিতাৎবর্তিকা জালিয়া এই স্বপ্নপূরী আমাদের প্রত্যক্ষদেহনার
 সমীপেও আলোকোজ্জ্বল করিয়া ধরিতে হইবে।

এক্ষণে চাই জ্ঞানস্বর্ষের পূর্ণোদয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণ জ্ঞানগুরু বিবেকা-
 ননের ভিতর যদিও জাতিকে এই বেদান্তমন্ড্রে দীক্ষাদান করিয়া গিয়াছেন।
 এক্ষণে তাহারই বিধিবদ্ধ সাধনে জাতির পূর্ণাভিষেক প্রয়োজন। মাহু-
 বের ভিতরে যে জ্যোতির্ময় পূর্ণপুরুষ আত্মগোপন পূর্বক আজ অজ্ঞান
 ও বন্ধনের বিকৃত খেলার নিরত, তাহার জাগরণ চাই। যে আজ
 অবিদ্যার মায়াশৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত তাহার শৃঙ্খলমোচন করিতে হইবে—
 চাই দেবজাতির মুক্তি, চাই সিদ্ধি, কিন্তু সর্বাগ্রে আমাদের শুদ্ধ হইতে
 হইবে। আত্মশুদ্ধির উপরেই সমস্ত মুক্তি সিদ্ধি নির্ভর করিতেছে—
 জ্ঞানের জলোজ্জ্বল অগ্নিকুণ্ড জালিয়াই জাতিগত সমস্ত অশুদ্ধতা তন্নীভূত
 করিতে সমর্থ হইবে।

যুক্তি ভর্কের ধূলিপটলে অন্ধচক্ষু হইয়া অধ্যাত্মজগৎকে অবিদ্যাস
 করিয়া কোনই ফলোদয় নাই। এই পতিতজাতির পুনরুত্থান শুধু
 অধ্যাত্মবলের সাহায্যেই সম্ভব। ব্রহ্মবলই আমাদের বল—ভগবানই আমা-
 দের জীবনের কর্ণধার। যে বেদান্ত শুধুই শুদ্ধ শাস্ত্র, যে যন্ত্র শুধুই নীরগ
 অক্ষর, তাহাতে অন্তর্দৃষ্টির উদ্বোধন ঘটিবে না। শাস্ত্র, যন্ত্র, বেদ—সমস্তই

মানুষের আত্মায় নিহিত—ভাগবত স্পর্শে কুহেলিকাচ্ছন্ন পুরুষ প্রবুদ্ধ হইবেন। ভগবানকে পুরোভাগে স্থাপন করিয়াই আমরা আমাদের জাতির জীবন গঠন করিব, শুধু ধ্যান ধারণার ভাবের উপাসনায় নহে, আমাদের কণায় কর্ণে, আমাদের ইচ্ছায় চিন্তায়, এমনকি শ্বাসেপ্রশ্বাসে 'আহারে' বিহারে পর্যন্ত ভগবানকেই নিরবচ্ছিন্ন ধারে অনুসরণ করিয়া চলিব—দল নয় সম্প্রদায় নয়, ভগবদ্রিষ্ট, ভগবৎসর্কষ, ভগবৎপূর্ণ করিয়াই আমরা জনে জনে-আত্মজীবন একেবারে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিব। আজ যে সম্পূর্ণ অভিনব নবজাতির দৃষ্টির জন্ম আমরা উদ্বুদ্ধ হইয়াছি—তাহার প্রত্যেক ব্যক্তিই পর্যন্ত যতক্ষণ না ভাবময় মন্ত্রময় ভাগবত অনুভব-ময় হইয়া উঠিতেছেন—ততক্ষণ জাতির এ বিরাট জ্ঞানযজ্ঞ পরিপূর্ণ হইবে না।

আদর্শ

মানুষের ধৃতিশক্তি-বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সত্যদৃষ্টি প্রসারিত হইতে থাকে। মানুষ হির করিয়াছিল সূর্য্য পৃথিবীকে পরিভ্রমণ করে, কিন্তু মিথ্যা মানুষের ধর্ম্য নহে, সে একদিন আবিষ্কার করিয়া বসিল 'ইহার বিপরীত', এইরূপে সত্যই প্রতিষ্ঠালাভ করিল।

পদার্থনিচয় একেবারেই অচেতন নহে, বিজ্ঞানদৃষ্টিতে ইহার মধ্যেও প্রাণের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, প্রাকৃতিক আবর্তনে জড়ও আগ্রত প্রাণ-বস্ত হইয়া উঠে, একথা আজ আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

জড় হইতে যে জীবের উৎপত্তি, তাহার কতখানি উন্নত বিকাশ যে মানবমূর্ত্তি, তাহা তুলনাহীন। মানুষ পাইয়াছে মনোময় দেবতাকে, মানুষের ক্ষমতায় আসন পাতিয়া বসিয়াছেন যে ঈশ্বর, তিনি এক্ষেত্রে কেবল আত্ম-প্রয়োজন সিদ্ধ হইলেই পরিতুষ্ট নহেন, ভক্তাক্রমে আধার রক্ষা করিয়া পাইতে চাহেন জগতের নিগূঢ় সত্যটাকে, তাই, মানুষের জীবনেই দেখিতে পাই অস্তহীন অতৃপ্তি, সূখ, বিলাস, ভোগ, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা, বিজ্ঞান, পাণ্ডিত্য, লাস, যশঃ, গৌরব কিছুই চিরদিন মানুষকে ভুলাইয়া রাখে না—সব ঠেলিয়া, সব পদদলিত করিয়া, মানুষ ছুটিয়াছে, উধাও হইয়া পাইয়াছে উর্দ্ধে,

অন্তরীক্ষে—অজানাকে জানিতে, অজ্ঞেরকে অবধারণ করিতে।

মানুষের এই যে তুরীরের দিকে তীব্র আকর্ষণ, অনন্তের দিকে তার তীব্র গতি, ইহা কখনই সফল হইবে না, যদি মানুষকে কোন এক অদৃশ্যশক্তি এইদিকে পরিচালিত করিয়া না থাকে।

প্রেরণা যদি সত্য না হয়, তান যদি কোন নির্দিষ্ট কেন্দ্রের প্রতি না হয়—সব-খানিই খেয়াল বা স্বপ্ন হইলে, মানুষের জীবন যে একেবারেই ব্যর্থ এ কথা সহজেই অনুমেয়।

জগতের স্রুত হুঃখ, জীবন মৃত্যু, হর্ষ বিষাদ সবই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে শুধু স্রুত, শুধু জীবন, শুধু আনন্দ পাইবার ইচ্ছা করিলে, এ পৃথিবীতে অবস্থান করা চলে না, এ পৃথিবী ছাড়া হইতে হইলে জীবনও ছাড়িতে হয়, ভারতের একদল সাধক আনন্দপথের যাত্রী হইয়া এই নির্বাকের পথেই যাত্রা করিয়াছেন, তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আজও কত সহস্র কত লক্ষ লোক এই পথেই ছুটিতেছেন।

যুরোপের ইহবাদমূলক বিজ্ঞানালোকে, ভারতের এই তুরীয়দৃষ্টি কথ-কিং পরিমাণে হাস পাইরাছে, ইহবাদী বলেন, জগৎ অমিশ্র স্রুতঃখময়, তবে বিজ্ঞানবলে ইহার যথেষ্ট প্রতীকার করা যাইতে পারে, রোগের উপশম ঘটাইয়া স্রুত থাকিবে, রোগ থাকুক, পুনরাক্রমণ করিতে না পারে এমন ব্যবস্থা করিব। মৃত্যু থাকিবে, তবে অধিকদিন বাঁচিবার আয়োজন করা হউক ইত্যাদি, এবং বিজ্ঞান ইহাতে যে কৃতকার্য না হইয়াছে এরূপও নহে।

মানুষ আজ বড় ধাঁধায় পড়িয়াছে, নির্বাকের পথ আবিষ্কার করিয়া সে বসিয়াছিল, চক্ষু কণ্ঠ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরোধ করিলেই পার্থিব স্রুতঃখাদি দন্দ হইতে পরিভ্রাণ পাওয়া যাইবে, এবং ইহা করিতে গিয়া একেবারেই আত্মবিলোপ করিয়া বসিল, উদ্দেশ্য যখন দৃষ্টবিরহিত হওয়া তখন নির্বাকই জীবের চরম আদর্শ স্থির হওয়া বিচিত্র নহে। মেহাৎ বেদবিশ্বাসহীন মানুষ, হাসিয়া বলিবেন, ইহার জন্ম এত চেষ্টাচরিত্র কেন, দড়ি কলসির-সাহায্যেও তো ইহার নিরাকরণ হইতে পারিত, আত্মা অবিনাশী—হিন্দুর এ সনাতন বিশ্বাসের ভিত্তি দর্শনাদি সাহায্যে প্রমাণ করা যাইতে পারে, সে সকল প্রসঙ্গ উত্থাপনের স্থান বর্তমান প্রবন্ধে নাই।

আমরা সকলবিধ সংস্কারবিহীন হইলেই মুক্তি অবশ্যস্বার্থী। এই পৃথিবী জীবের সাধনক্ষেত্র, ভগবানের ছায়াবাজী, এই গ্রাহলিকা হইতে মুক্তির পথ হিন্দুশাস্ত্রে বিশদভাবে বর্ণিত আছে, সে সকল কথার উল্লেখ-প্রয়োজনও এক্ষেত্রে নাই, আমরা বলিতে চাই, মানুষ যাহাই করুক না কেন, মিথ্যাদৃষ্টি তাহাকে যতদূরেই ছুটাইয়া লইয়া চলুক, সত্যরজ্জু দীর্ঘ আছে, একদিন তাহাকে সেই কেন্দ্রেই টানিয়া আনিবে।

ইহবাদী প্রত্যক্ষ দর্শনাদি সাহায্যে, তাঁহাদের পথই সত্য বলিয়া যেমন জ্ঞার করিতে পারেন, তুরীয়ের দৃষ্টি লইয়া, অতীন্দ্রিয় দর্শনাদির সাহায্যে ভারতের মায়াবাদীরাও, তাঁহাদের পথকেও সেইরূপই সত্য বলিয়া নির্দেশ করিতে-কুণ্ঠিত-হইবেন কেন?

কথা হইতেছে, এই জীবন আর ঐ তুরীয়, ইহার মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধানের কি কোনই পন্থা নাই? ভারতের ঋষি ইহাতে যে অকৃতব্যর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কথার ভঙ্গীতে ও ভাবপ্রকাশে এরূপ আমরা বুঝি না; আমরা উপলব্ধি করিয়াছি, কৃতযুগে ভারতবর্ষই মর্ত্যের সহিত ত্রিদিবের সংযোগ সাধন করিয়া ভাগবতানন্দে তাঁর সৃষ্টির সত্য মহিমা উদাত্ত স্বরে গাহিয়া গিয়াছিলেন। আমরা কোন নূতন পথের কথাই বলিতেছি না, ভারতের অতি পুরাতন, শব্দর, বুদ্ধের, পৌরাণিক যুগেরও বহুপূর্বে যে সত্যমহিমায় ভারতের ললাট উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাই, সংস্কার-মুক্ত মহাপুরুষের হৃদয়ে জাগ্রিত হইয়া নূতন বাণীব্যবহৃত করিতেছে, ভারত-বর্ষ নূতনকে অবধারিতরূপে বরণ করিয়া লইবে এবং সমগ্র জগতে একচ্ছত্রাধারাজ্য গড়িয়া তুলিবে।

আমরা অনর্থক অচঞ্চল শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণাদির সাহায্যে ইহার প্রতিষ্ঠা চাহি না; বাহ্য চাহিতেছি, উহা হইয়া না উঠিলে, কোন সিদ্ধান্তই অপ্রাপ্ত বলিয়া স্বীকৃত হইবে না, কিন্তু সত্যপ্রকাশ সম্ভব করিয়া তুলিতে হইলে ভারতে অসংখ্য সাধককে ইহার জগ্ন অসাধারণ ধৈর্য্য ও সাহস লইয়া দাঁড়াইতে হইবে।

আকাশে উড়িবার জগ্ন, উত্তরমেরু আবিষ্কারের জগ্ন কত লোক জীবন পণ করে, ভারতেও মুক্তি মোক্ষের জগ্ন অসংখ্য লোক এক প্রকার আত্মহত্যাও করিয়া থাকে, আর এই জীবনের উপরেই ভগবানের প্রতিষ্ঠার জগ্ন সর্বস্বত্যাগী সাধক যে পাওয়া যাইবে না, এরূপ নহে; এতদ্ব্যতীত,

সত্যপ্রেরণা কোন কালেই নিষ্ফল নহে, আমাদের প্রেরণা মিথ্যা হইলে, মিথ্যার ভারে মরিব, তাহাও তো সত্যকে উজ্জ্বলতর করিয়া প্রকাশ করিবার জন্ত, কিন্তু জীবনই সত্য, অথবা তুরীয় সত্যই সত্য আর সব মায়া—ইহা নহে, সব সত্য, এই সত্যসামঞ্জস্য আনয়নের জন্ত আমাদের আগরণ ব্যর্থ হইবার নহে।

জীবন ভগবানকেই প্রকাশ করিবার জন্ত। সচ্চিদানন্দ-সাগরের চতুর্দিকে গভীর মেঘমালা নিরীক্ষণ করিয়া, ভারতের ঋষি, উহারও সত্য নিরূপণ করিতে, তপোবলে হ্রতক্রম্য মহাসমুদ্র অতিক্রম করিয়াছিলেন, সে অসীম, তুরীয়, বাহ্য এখনও বিশ্বে অপ্রকাশ, তাহা অনির্দেশ্যম্ অনির্বচনীয়ম্ হইলেও, ঋষি স্মিতবদনে ফিরিয়া গাহিয়াছিলেন, “সর্বং খলিদং ব্রহ্ম” বাহ্য আছে, বাহ্য নাই, সবই ব্রহ্ম; ব্রহ্ম ভিন্ন কিছু নাই, আমি তুমি, কীট পতঙ্গ সমস্তই ব্রহ্মময়। মৃত্যু অমরজীবনের পরিচ্ছদ পরিবর্তন—স্বথ দুঃখ, মঙ্গল অমঙ্গল, বন্ধন মুক্তি, এই সকল সচ্চিদানন্দের তরঙ্গহিলোল; উঠা নামা প্রেমের তুফানে—উঠার দিক্‌টাই স্বথ, নামার দিক্‌টাই দুঃখ, এইরূপ হর্ষ বিবাদ সমস্তই একই আনন্দের উন্মিমালা।

মানবজীবনে এই মহনীয় অনুভূতি চিরজাগ্রত থাকিলেই, ভগবানের অসীম ভাবের কেন্দ্র হওয়া তাহার পক্ষে আর অসম্ভব নহে। জীবন হইতে নিবৃত্ত হওয়া ভগবানের ইচ্ছা নহে, জীবনকে কেন্দ্র করিয়া অসীম লীলাপ্রকাশেই তাঁর আনন্দ। কিন্তু এরূপ না হওয়ার কারণ কি? সকলই যখন সচ্চিদানন্দের রূপ, তখন দ্বন্দ্বময় জীবনের মূলস্থত্র কি?

অহঙ্কার! এই অহঙ্কারই আবার মানুষকে এই অপার্থিব পরমানন্দে অধিকারী করিয়া তুলিতেছে। অহঙ্কার ব্রহ্মজ্ঞানের খণ্ডতা, যতক্ষণ মানুষ পূর্ণরূপে পরাংপর পুরুষের সমগ্র ভাবটীকে (totality) অবধারণ করিতে অসমর্থ, ততক্ষণ অহঙ্কার নানা পথে নানা ভাবে নানা খেলায়, জয়ে পরাজয়ে, স্বথে দুঃখে, হর্ষে বিষাদে, পীড়ায় স্বাস্থ্যে অনুভূতির সূক্ষ্মযজ্ঞগুলিকে ফুটাইয়া তুলিতেছেন। একটা বানর যদি ধারণা করিতে পারে, যে তাহাকেও মানুষের মত অর্ণবধান নির্মাণ করিয়া কালাপানি পার হইতে হইবে, এ্যারোপ্লেনে আকাশে উড়িতে হইবে, ট্যাঙ্ক লইয়া সমরক্ষেত্রে দৌড়াইতে হইবে, তবে সে কি ইহা সম্ভব করিতে চেষ্টা করিবে? ইহা স্বপ্ন বলিয়াই উড়াইয়া দিবে। আজ মানুষেরও এই স্বপ্ন তাহার পক্ষে

অসম্ভবই হইবে, যদি সে বিশ্বাস করিতে না পারে, যে বিশ্বন্যস্তার ইচ্ছাই হইতেছে, তাঁর অসীম বিচ্ছিন্ন সৃষ্টিধারা মানুষের জীবনেই সমষ্টি-গত-কল্পিতে হইবে।

ইহারই জন্ত আত্মসমর্পণযোগ্য সমগ্র জগতের প্রশস্ত সেবাদনা, ভগবান্‌ই এক্ষেত্রে সাধক, সিদ্ধি তাঁহারই। দীক্ষালাভ মাত্রই যে অহং দূর হইবে এরূপ নহে, তবে যোগের নিয়মই হইতেছে, জীবনের চরম বিকাশটিকে ঘন সন্নিবেশে ক্ষিপ্ততার করিয়া তুলিবে। আত্মসমর্পণ ফাঁকি নহে, ভোগ-লালসা চরিতার্থতার স্রবিধা নহে, স্বাসে প্রাধাসে ভগবান্‌কে অপিয়া যাইবার অবস্থা ভগবান্‌ই আনয়ন করেন বলিয়া আত্মসমর্পণযোগী কোন কৃচ্ছ্রতাই অল্পভব করেন না, চেষ্টাই মানুষের গতিকে কষ্টক্লিষ্ট করিয়া তোলে। ভাগবতপ্রেরণায় মানুষ চলে বটে কিন্তু সে চলা মায়ের কোলে চড়িয়া চলা, সমষ্টিসাধনার জন্ত এই উৎসর্গমন্ত্র মানব-কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিবেই, এ আমি দিব্যকর্ণে শুনিতেছি।

পাগালের চিঠি

ভায়া! তোমাদের খবর শুনে চিন্তিত হলাম। ভগবানের এ কেমন বিচার কে জানে? আনন্দের হাটে এমন নিরানন্দের বাতাস কেন? বাই হোক ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হবেই। তার জন্ত আর ভেবে কি করবো? তোমাদের ভিতর দিয়ে, তিনি যে-খেলা খেলাচ্ছেন, অবহিতে তা খেলে যাও। সকল ঘটনাই ভগবানের স্পর্শ, নানা দিক দিয়ে এই অনুভূতিই তোমাদের মধ্যে জাগ্রত হোক।

জীবন মৃত্যু দুই তুলা কথা। জীবনের দিকেই তোমাদের অধিক ঝোক, তাই মরণের দৃশ্য ভয়ঙ্কর বলেই মনে হয়। ভগবান্‌ কোন উদ্দেশ্যে কোন কার্য সংঘটন করেন, তাও মানুষের বুদ্ধিতে সব সময়ে অবধারণ হয় না, সোজা কথায়, মনকে এমন দৃঢ় এবং শক্ত করবে, যেন সকল অবস্থাই আনন্দের বলে উপলব্ধি হয়।

বার বছরের প্রফুল্ল পদ্মফুলটা, তোমাদের অগাধ স্নেহ-সিঞ্চনে, তাজা

না হয়ে, দিন দিন শুধিয়ে যেতে লাগলো, নৈরাশ্রে হৃদয় ভরে' যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়, আর কোন্ অভিধানে সোণার কমল মলিন হবে, তার কারণ অব্যবহারণের প্রচেষ্টাও স্বাভাবিক, কিন্তু ভায়া, মহামায়ার খেলা খেলে যাওয়াই ভাল, বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই, যার কর্ম তিনি করছেন, এবং সে কর্মও চিরদিন চলতে থাকবে—তুমি, আমি, সে—হাজার বার যাওয়া আসা করলেও, তাঁর খেলা একদিনও বন্ধ থাকবে না।

আমাদের ভিতরটা বাহিরের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে গেছে, যেন আমরা একান্তই বাহিরের অধীন। বাহিরের গোলেমালে ভিতরটাও যে গুলেগোলে—ভরে' যায়, তা আমি হাজার বার স্বীকার করি। কিন্তু সত্য অবস্থা তো একদম নয়, বাহিরটা যে ভিতরেরই প্রকাশ, ধীর চিত্তে এ তথ্য কেবল জানা নয়, পাওয়া চাই, এবং তার জন্য তপস্যা করতে হবে।

এই তপস্যার অনেক ধারা থাকলেও, তোমরা উৎসর্গ-যজ্ঞে আত্মাহুতি দেওয়াই প্রাপ্ত পস্থা বলে প্রচার করেছ। এবং এই সাধনা সংসারে বসেই করবে এমন সঙ্কল্পও জানিয়েছ। কাজেই সংসারের সকল বিষয়ই তোমাদের যে অতিষ্ঠ করে' তুলবে, ইহা তো বিচিত্র নয়।

বসে' বসে' দেখ, যা তোমরা করবে না বল, তাই তোমাদের করতে হয়। দেশ বিদেশে ছুটোছুটি করে', সেবাধর্মের চাপরাশ বকে মেরে না বেড়ালেও, তোমার চারপাশে, আত্মীয়স্বজন প্রতিবাসীগণের কতখানি সেবার ভার তোমার উপর। দেখ সংসারের ভেতর ঔষধ পথ্য শুক্রবার অভাবে—তোমারই জননী, ভ্রাতা, সহোদর বা বন্ধুবান্ধব কিরূপ কষ্টভোগ করে, তাদের ছেড়ে তোমরা যদি হেথা হোথা ঘুরে বেড়াও, অথবা সাধন-ভজনের জন্য কোন মঠে কিম্বা হিমালয়ের চূড়ায় গিয়ে রাসা বাঁধ, তবে রোগে শোকে পাপে জর্জরিত সংসার আর কতদিন টিকবে। শ্রেষ্ঠ সাধকদের সন্ন্যাসীর মতই সমাজ-শরীরের রক্তে রক্তে বসবাস করতে হবে। এ বড় কঠোর সাধনা। কত উৎকৃষ্ট প্রাণ এই সংসারচাপে বিদলিত চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে, কিম্বা তবুও তোমাদের অটুট সঙ্কল্প যেন শ্লথ না হয়, যদি ঐশ্বর্য থাকে, সাহস থাকে, অসাধারণ সহিষ্ণুতা থাকে, তবে তোমাদের দ্বারাই, কালে বাঙ্গালীর ভাঙ্গা হাটে টাদের মেলা বসবে, হাহা-কার ঘুচে গিয়ে আনন্দ-উচ্ছ্বাস ফুটে উঠবে।

বলি ভায়া! সন্ন্যাসী তো সবাই হয়—তোমাদের মত নাথার ঘাস

পায়ে ফেলে, উপায় উপার্জন করে', সংসারে মায়ার ফাঁসি গলায় না তুলে কয়টা সন্ন্যাসী দেখতে পাও, কয়জন সন্ন্যাসী দেশের জন্ত, মরা জাতির জন্ত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে' উপার্জিত সকল সম্পদ দেশজননীর চরণতলে উৎসর্গ করে? নিজের জীবন স্বচ্ছন্দ ও স্বাধীন না করতে পারলে জীবনের সিদ্ধি খুঁজে পাওয়া যাবে না, মৃতপ্রায় সমাজের ঘাড়ে নিজের জীবন চাপিয়ে চললে, তার সেবাই কি, ধর্মই কি, আর উৎসর্গই বা কি?

তোমাদের সাধনা সার্থক হোক। আজ এই নতুন সাধনার পথে এই যে নিষ্ঠাতন ভোগ করতে হচ্ছে, সিদ্ধি এলে এ সবই অল্পমূল্য বোধে উপেক্ষিত হবে।

সংসারের হাটে বসে' হাজার হাজার টাকা নাড়াচাড়া করবে, আর মাঠাকুরাণীর শত অল্পরোধে টুকটুকে বোটা ঘরে আনবে না, বলবে আমি সন্ন্যাসী, নিজের সকল সিদ্ধিই ভগবৎ-কার্যে উৎসর্গ করেছে, এ কথাটা একেবারেই নতুন নয় কি? সমাজ-জীবনে এ অত্যাচার সহিবে কেন? তাই পিতামাতার অভিশাপ, বন্ধুবান্ধবগণের পরিহাস, প্রাচীন সমাজের হিতোপদেশ, হেসে উড়িয়ে দিতেই হবে।

কেউ কেউ আমার জিজ্ঞাসা করেছে, ছেলেদের বিয়ে না করবার কারণ কি? আমি তাদের বলি, আচ্ছা ছেলে যদি গেরুয়া পরে' বেলুড় মাঠে গিয়ে বসতো, তা'হলে হয়তো এ প্রশ্ন তুমি করতে না। মনে করনা ছেলেগুলো সন্ন্যাসী, ভগবান্ পাবার জন্ত চক্ষু মুদে থাকার এদের দরকার নেই, তাই বৃথা সময় নষ্ট না করে' মাঠে লাঙ্গল দেয়, কাপড়ের পুঁটলি ফিরি করে' বেচে, দেশবিদেশ থেকে পণ্য আমদানি করে' অর্থ উপার্জন করে, একটা কিছু করা চাই তো—কথাটা তারা বোঝে না কেন বল দেখি?

বিয়ের কথা নিয়ে তোমাদের অনেক চিঠিই আমার কাছে এসেছে; এই তুচ্ছ কথাটার উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তবে এই সোজা কথা বলা আপত্তি নেই, যারা বিয়ে করবেন, তারা যেন ইঁ বোজাবার প্রতিকারটা আগে করেন। বো এসে ইঁ করবে তো, আর একটা ইঁ নয়, বছর বছর ইঁয়ের মাত্রা বাড়বে বৈ কমবে না, হৃদয়ের অভাবে বালির জল আঁহারে এই অধম জাতটাকে অধিকতর অপদার্থ করার চেয়ে, দিনকতক না হয় বংশবৃদ্ধির কলটা বন্ধই থাকুলো, যাদের

সামর্থ্য আছে, তারাই বিয়ে করবে, আর সখের বিয়ে হাজারটা হোক না, দু'বছর দশ বছর পরে যারা খুক খুক করে' কাশবে আর জাহান্নামে যাবে তাদের সঙ্গে আমার কিসের সম্বন্ধ, আমি নতুন জাতিটার সঙ্গে কথা কইতে চাই, ভগবানকেই জীবনের সর্বস্ব বলে' জানবার বা পাবার মতো মনের, তেজ যাদের আছে, তারা যে আজ নিঃসঙ্গ, তারা যে শব্দর বুদ্ধের মত, আর এই জাত সাতকোটি রাজাজীর মধ্যে সাতপো পাওয়া যায় কি না সম্বন্ধ—সন্মাসী চাই, কিন্তু ঐ গেকর্যা আর বৈরাগোর মারা তাকে শীত্র ছাড়তে হবে, এই টুইল সার্ট, আর মোটা কাপড় পরে', সমাজ-পরীয়ে এই নতুন জাতটাকে সমাজের অশেষ নির্যাতন সহ করে' এবার থাকতে হবে, ভাঙ্গা, কথটা খুলেই বললুম, এক্ষণে তোমাদের বিচারে যা হয় তা করো।

কাজটা বড় সোজা নয়। এখন তো মা বাপের তাড়া বাচ্ছ, পুলিশের তাড়াও বড় বেশী খেতে হবে না, কেননা অস্পষ্টতার পুটুলি বগলে থাকলেই ও-পাপ ঘাড়ে চাপে, তা'না হ'লে সাধ্য কি? সমাজের নির্যাতন এমন বাড়বে, যে যাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় এই অসাধারণ ভাগ স্বীকার করবে, তারাই পিপাসায় তোমার বুকের ছাতি ফেটে গেলেও একফোটা জল দেবে না, তোমার মরণ-কামনাই, তাদের ধর্ম হবে। এমন কখন শুনেছ, পেটের ছেলে ভগবচ্চরণে আত্মোৎসর্গ করেছে বলে', তার মা এমন ছেলের মৃত্যু কামনা করে? সংসারে এমন বাপ মা খুব কমই আছে, দেবতার জন্ম যারা হাসিমুখে পুত্র উৎসর্গ করতে পারে। আমি নতুন যুগের সন্মাসীদের সেইখানেই তিল তিল করে' জলে মরতে বলি, যেখানে স্বার্থ আছে, পাপ আছে, এই সব ক্ষেত্র থেকে সাধক সরে' এলে, সমাজকলুষ, চিরকাল পুঞ্জীভূত হয়ে থাকবে, অবসর পেলে, বহু আয়াসসিদ্ধ পবিত্র ধর্মক্ষেত্রটিকে ছেয়ে ফেলবে; আমাদের সব গ্রাস করে' ফেলতে হবে, সমাজ-পরীরের যত পাপ, সে তো সব ভগবানেরই রক্তরূপ, মঙ্গল সৃষ্টির পদ্ধতি অগ্নিনার মধ্যে তার সকল প্রভাব আকর্ষণ করে' আপনাকে এই তীব্র হতাশনে আচ্ছাদিত স্বরূপ অর্পণ করা। যদি বল থাকে, বিশ্বাস থাকে, আপনাকে অমৃতের বরপুত্র বলে' ধারণা থাকে, এই আশুনের ভেতর দিয়েই আমাদের বঙ্গ-দৃষ্ট হয়ে' ফিরে আসতে হবে।

অনেক কথাই বলবার ছিল, মাথা ঘোঁরাপু হয়ে আসছে, তোমাদের

সংবাদ পেলে আবার কিছু লেখবার চেষ্টা করবো, আজ এই পর্য্যন্ত।
 ওরে পাগলা, এইবার তোর একতারাতে ঝঙ্কার দে! তোর ব্রহ্মতন্ত্রী
 ঝন্ ঝন্ করে' বেজে উঠুক, সমগ্র ভারতবর্ষ এই ব্রহ্মতন্ত্রে ঝঙ্কার দিক,
 সুরের মাত্রা যতই উর্দ্ধে উঠবে, যতই উদারা মৃদারা তারা ভেদ করে'
 বাজতে থাকবে, চৌষট্টি হাজার তার তখন আপন আপন বোল বলতে
 আরম্ভ করবে। মূল তারে ঝঙ্কার দিলে যদি হাজার হাজার তার বেজে
 উঠে, তবে হাজার হাজার তারে বা দিয়ে নাকাল হবো কেন? বাজা
 পাগলা, বাজা, ঐ ব্রহ্মতার বাজা, বাজাতে বাজাতে পাগল হয়ে যা,
 সুরে ভরপুর হয়ে যা, সব জ্ঞান হারিয়ে ঐ তারের সুরে মিলে যা,
 সুরের মূর্ছনায় ঐ দেখ আর সব তার কেঁপে উঠছে, আরও জোরে
 বাজা, ঐ দেখ সব বাজতে আরম্ভ করেছে, বাজা, বাজা, ব্রহ্মতার বাজা,
 বাঙ্গালীকে ঐ একতারার সন্ধান দে, যদি ভারত জাগে ঐ একতারার
 সুরে সুরে জাগবে, ঐ একতারার তালে তালে নাচবে, বাজা পাগলা
 তোর একতারা পুরো দমে। কালী—কালী—কালী, ঝন্ ঝন্ ঝন্, ব্রহ্ম
 ব্রহ্ম ব্রহ্ম, ঝন্ ঝন্ ঝন্, ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

আত্ম-সাধনা

জাতি ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছে আজ নয়। কৃতযুগ ছিল, একথা যদি
 স্বীকার করিয়া লইতে হয়, তবে ঐ যুগাবসানের কাল হইতে আজ
 পর্য্যন্ত পতনেরই যুগ। জাতির অধোগতি আরম্ভ হইলে, স্বভাবতঃই আত্ম-
 রক্ষার চেষ্টা প্রবল হয়, প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে করিতে সংরক্ষণ-
 শক্তি বৃদ্ধি পায়। কৃতযুগের অপার্থিব ঐশ্বর্য্য কালরশে অপহৃত হইলেও,
 ভারতবর্ষ বাচিয়া থাকিবার অনন্ত শক্তি আহরণ করিয়াছে, বিপরীত বিব-
 র্ত্তনক্রমে জাতির বিশেষত্ব অটুট রাখিবার যে সাধনা, ভারত তা হাজার
 হাজার বৎসর করিয়া সিদ্ধকাম হইয়াছে, এ জাতি মরিবার নয়।

আত্মরক্ষার যুগে যে পদ্ধতি যে বিধি অনুসরণ করিয়া চলা হয়, আত্ম-
 প্রসারণের সময়ে উহা একেবারেই পরিভ্রাণ্য। কিন্তু বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া

যে মস্তকের সাধন করা হইয়াছে, তাহা একদিনে পরিহার করা অসম্ভব। ভারতের অস্থি মজ্জায় সংরক্ষণনীতি এমন নিবিড়ভাবে জড়াইয়া আছে, যে তাহার একটা বন্ধন মুক্ত করিতে অগ্রসর হইলে, ভারত-প্রকৃতির অমোঘ শক্তি বিরোধী হইয়া দাঁড়াইবে, এবং ভারতকে মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ করিতে হইলে ভারতেরই পুরাতন শক্তির সহিত তুমুল সংগ্রাম করিতে হইবে।

পুরাতনের সহিত নূতনের সংগ্রাম ঘোষণা অনেকদিন হইল আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, চতুর্দিকে খণ্ডযুদ্ধও যে না চলিয়াছে এমন নহে, কিন্তু পুরাতনের বিরুদ্ধে নূতনের এই অভিযান সত্যদৃষ্টিপ্রসূত কিনা এবং প্রাচীন রীতি পদ্ধতির সমূহ পরিবর্তনের সময় আসিয়াছে কিনা, এইগুলি বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিয়া দেখার প্রয়োজন আছে।

মানুষ কি মরিতে চাহে? কিন্তু রোগাণুকীটে বান্ধকো শরীর জীর্ণ হইয়া পড়িলে, মরণই স্বাভাবিক। মানুষের আসক্তিই, ইচ্ছাক্রমে পুরাতন আধারে অবস্থান করিতে চাহে, কিন্তু সে ইচ্ছা সত্য নহে, মানুষের ইচ্ছা বাসনা প্রভৃতির পরপারে, যে মানুষ নিত্যকাল খেলিয়া আসিতেছেন, তাহার ইচ্ছাই চিরদিন জয়লাভ করে।

এই প্রাচীন জাতি আত্মরক্ষার জন্ত যে-সব উপকরণ আহরণ করিয়াছে, তাহার কতগুলি এখনও প্রয়োজনে লাগিতে পারে, কতগুলিই বা গলিত শবের মত পরিহার করিতে হইবে, সে বিষয়ে তাহার সভ্যজ্ঞান যে আছে, এমন বলিয়া বোধ হয় না। এবং ইহা না থাকাই স্বাভাবিক। কেননা বাঁচিবার জন্ত যাহা প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহাও অজানা জগৎ হইতেই মানুষের জীবনে সৃষ্টিক্রমে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, এবং আজও অমৃতফলাভের জন্ত যাহা অর্জন বর্জন করিতে হইবে, তাহার জ্ঞানও মানুষের মধ্যে সেই জগৎ হইতেই মিলিবে, মায়াপরিচ্ছিন্ন সাধক ভগবানের ইষণা অবধারণ করিতে সমর্থ নয় বলিয়া, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাঙনিম্পত্তি করে না, সাধারণমানুষ সংগ্রামপরিয়ায়ণ হয়, ইহারও প্রয়োজন নূতনকে শক্তিসমধিত করিয়া তোলা। অন্যায়সলভ্য সামগ্রীতে মানুষের আস্থা থাকে না, এবং এরূপ সহজলব্ধ সংগ্রামবিরতি সাধককে অপদার্থ ও হীনবীৰ্য্য করিয়া দেয়।

পুরাতনের সহিত সংগ্রাম নানা পদ্ধতিতে চলিতে পারে, প্রকৃতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ইহা অনুষ্ঠিত হয়। পানাহারে আত্মা কলুষিত হয় না, এই ভাবটিকে জয়ী করিয়া তুলিতে, পরলোকগত রাজনারায়ণ প্রভৃতি

রাক্ষপথে দাঁড়াইয়া গোমাংস চর্ষণ করিয়াছিলেন, আবার স্বামীজি উহা এত সহজ এবং স্বাভাবিক ভাবে নিষ্পন্ন করিলেন, যে পুরাতনের হৃদয়ে কোনই আতঙ্কের সঞ্চার হইল না।

ভারতে জাগরণের যুগ আসিয়াছে, কিম্বা আসে নাই, তর্কে ইহা বুঝাইবার নহে, নবীনের দল যদি বুঝিয়া থাকেন, ভারতের পূর্ব গগনে সোণার মুকুট-মাণায় পরিয়া নব-স্বর্গ উদয়োন্মুখ, তবে ধীরে ধীরে পুরাতনের ক্ষেত্র হইতে অনাবশ্যক সংস্কারভূপকে অপসারিত করিতে হইবে, নবীনের ইহা যদি সত্যদৃষ্টি হয়, তবে প্রকৃতিই ইহা করাইয়া লইবেন।

রজনী প্রভাত হয়, এক কালে সবাই জাগিয়া উঠে না। অলস জড়তাগ্রস্ত চক্ষু মুদিয়া রজনী আছে বলিলে, প্রত্যক্ষীভূত প্রভাতকে কে অস্বীকার করিবে? অন্ধকারকে অপসারিত করিবার জন্ত বহুবিধ আলোক-সৃষ্টির প্রয়োজন হয়, রবিকিরণ উদ্ভাসিত হইলে ঐ গুলির অনাবশ্যতা বুঝিতে বাকী থাকে না, তখন সেগুলি নিক্রান্ত করাই যুক্তিসঙ্গত। উদাহরণটি যেমন সহজ এবং স্পষ্ট, জাতিকে বাঁচিবার জন্ত যে সব ভাব ও কর্মের উৎপত্তি হইয়াছিল, আজ উহার প্রয়োজন নাই বলিয়া, ঐ গুলির অপসারণ তত সহজসাধ্য নহে। গোকুলের ইন্দ্রপূজা উঠাইতে গিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেও বিরোধ সহ্য করিতে হইয়াছিল।

পতনযুগে জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠান ভাঙ্গিয়া যায়, কাজেই তাহাকে দাঁড়াইবার জন্ত অনেক কিছু সংগ্রহ করিতে হয়, ইহার উপর বাহিরের আঘাত আসিতে থাকিলে, আপনাকে বাঁচাইবার জন্ত, আপনার বলিতে যাহা কিছু সবগুলিকেই প্রদ্বার চক্ষে দেখিতে হয়, সে তুলসীমঞ্চ হইতে কালীর বিশ্বনাথ পর্যন্ত, আর পুরাণ, তন্ত্র হইতে স্বর্গনরক কাহিনী, মনসার ভাসান পর্যন্ত জাতির জীবন বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হয়, এইগুলিই যে দীর্ঘ অমারজনীর জাগরণমন্ত্র, এইগুলির সাহায্যেই তো আমরা বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছি, আজ জাগরণ যুগে, আঘাত দিয়া ইহাদের অমর্যাদা করিতে থাকিলে, কোন হিন্দুই নীরব থাকিবে না, নবীনের সত্যদৃষ্টিও এইখানে আঁধারলিপ্ত হইয়া পড়িবে।

জাতি যাহা লইয়া বাঁচিয়াছে তাহা পরম পবিত্র চিরপূজ্য। জাতির সঞ্জীবনীমন্ত্রে অনাহু্য করিতে নাই, আমরা ভারতের তেত্রিশ কোটি দেবতার চরণে নিত্য নাতা নত করি, অশ্বখ, বট, তুলসী, মনসা প্রভৃতি

বৃক্ষের পূজা করি, আর বেদান্তের দেশে পৌত্তলিকতাকেও প্রশ্রয় দিই, কালীঘাটে, ভারকেশ্বরে, বৈদ্যনাথে সহস্র সহস্র হিন্দু ষোড়শোপচারে পূজা দিয়া থাকে, এ সকলেরই প্রয়োজন ছিল, আজও যে নাই এমন কথা কে বলিবে ?

তবে মানুষ যখন আপনাকে জানিতে ও পাইতে চায়, আর ঐ সকল বিশ্বাসের বোঝায়, আপনার অস্তিত্ব খুঁজিয়া পায় না, তখন আত্মদর্শনের বিরোধী ভাববিশ্বাসগুলিকে সম্বন্ধে দূরে রাখিতে হয়, ভগবানকে আপনার মধ্যে জাগ্রিত ও প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানিলে ও পাইলে, সর্বভূতে তাঁহার অবস্থিতি যেমন নিঃসন্দেহে জানা যায়, সহস্র বন্ধনে তাঁহাকে বাঁধিয়া, হিন্দু রক্ষা করিবার জন্ত অনন্তকোটি দেবতার সৃষ্টি তেমন সাধনার অনুকূল বলিয়া বোধ হয় না। মানুষ বিপদে পড়িলে সে যখন দৌড়ায়, ভগবানের আশীর্বাদ আশে, হাজার মাইল পার হইয়া বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে, তখন তাঁহাকে বলিয়া দিতে দোষ কি—ওগো, যাহাকে চাও, সে তোমার অন্তরের মণিকোটির আছেন, এত নিকটে তাঁহাকে পাইতে না শিখিলে, দূরে ছুটিলে, তিনি আরও দূরতরই হইয়া যাইবেন।

যখন হিন্দুর আত্মবিশ্বাস লোপ পাইয়াছিল, কেবল বিশ্বাসের মূল রক্ষা করিবার জন্ত, এই সকল রচনা সার্থক হইয়াছিল, এবং জাতির জীবনরক্ষার জন্ত, ভারতের দুর্ভাগ্য হইতে বৃক্ষলতা, নদী জলাশয়, দেবদেবী সে বিশ্বাসের স্থান অধিকার করিয়াছিল; ইহা ঠিক সত্য যে, এক্রপ না হইলে, ভারতের স্বাভাবিক রক্ষা পাইত না, কিন্তু আজ জাতির আত্মবিশ্বাস জন্মিয়াছে, বিশ্বাস জ্ঞানের প্রসূতি, জ্ঞানবলে ভারতে নতুন সাধনমার্গ রচিত হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। আবার জলদম্বে আত্মবিশ্বাসের প্রণবমন্ত্র ভারতের গগন পবন মুখরিত করিয়া নিনাদিত হউক, আবার ভারতবর্ষ, অন্তরে অন্তরে অপৌরুষেয় বেদের সত্যবাণী উপলব্ধি করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করুক।

বিশ্বাস যদি জ্ঞানপ্রকাশ না করে, তবে বৃদ্ধিতে হইবে, সপ্ণাবিশেষ মতই আমরা বিশ্বাসের সাধনা করিতেছি। এই বিশ্বাসের মূলে জাতির আন্তরিকতা নাই। সংস্কার যেন জোর করিয়া মানুষকে ছুটাছুটি করাইতেছে, মানুষ যেন ভুতাবিষ্ট।

আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য, অন্তঃসাধনাকে উপেক্ষা করিয়া, নানা অলৌ-

কিকভাবে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়া, আত্মপুরুষের অবমাননা করিতেছি, আপনার অন্তরস্থিত সত্যকে উদ্ধুদ্ধ করিয়া না তুলিলে, জাতির ভিত্তি যে উপাড়িয়া পড়িবে, সে জ্ঞান আজও আমাদের হইল না, বিশেষতঃ বাংলা-দেশে ধর্মসাধনা হইয়াছে ভোজবাজী বিশেষ, আর তীর্থ পর্যটন বায়ু-পরিবর্তন অথবা Recreation. এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে, আপনাকে না জানিয়া আপনার জীবন্ত সত্যকে উপলব্ধি না করিয়া, কে কবে ভগবৎ-লাভে সমর্থ হইয়াছে?

অতঃপর নবীনের সাধনা—আত্মাকে পাওয়া ও জানা। ভগবানের অস্তিত্ব, তীর্থে, মূর্তিতে, বৃক্ষে, লতায় বিশ্বাস করিয়াছি, এই বিশ্বাসকেই যুরাইয়া ধরিতে হইবে আপনার প্রতি, ডুবিয়া বাইতে হইবে অন্তরের গভীরতম স্তরে, যেখান হইতে উৎসৃত হইতেছে অনন্ত অমৃতধারা, যাহা সঞ্জীবিত রাখিয়াছে যুগযুগান্তর এই ভারতবর্ষকে। অধোমুখী জাতি—আত্মসাধনায় অন্নপোষণী—তাই তাহাকে ভক্তি বিশ্বাস অটুট রাখিতে বাহিরের সহায়তা লইতে হইয়াছিল; কিছুকে আঘাত করিয়া নহে, আইস আমরা ফিরিয়া যাই অন্তরের মণিকোটায়, ভগবানকে চাই, তাঁহাকে জীবন দিয়া না পাইলে, আমাদের জীবনে প্রয়োজন কি?

সমালোচনা

স্বাভাবিক শব্দ বা মন্ত্র—অধ্যাপক ক্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক বিবৃত—মূল্য ১০ মাত্র। এই মনোরম নিবন্ধপুস্তকখানি পড়িয়া পূর্বযুগের পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির অপূর্ব হিন্দু ধর্মতত্ত্বব্যাখ্যানের কথা মনে পড়িয়া যায়। আধ্যাত্মবিগণ অধ্যাত্মদৃষ্টি ও সাধনা সহযোগে যে সকল সত্য উপনীত হইয়াছিলেন, অক্ষাটীন যুগের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ বিপরীত পদ্ধতিক্রমে স্থূল হইতে উর্দ্ধে যাত্রা করিয়া সেই সকল মহাসত্যকে বৈজ্ঞানিক প্রমাণসিদ্ধ করিয়া দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করিতেছেন। ভবিষ্যৎ বিশ্বমানব যে পূর্ণজ্ঞান-সম্বয়ের অধিকারী হইতে চলিয়াছে, নবযুগের সামগ্র্যসাধক দার্শনিকগণের এই নূতন তত্ত্বচিন্তাসমূহ তাহায়ই পূর্বাভাস। আলোচ্য পুস্তকখানির মূল

মাননীয় বিচারপতি উদ্ভরফ সাহেবের একটা ইংরাজি বক্তৃতা—উদ্ভরফ সাহেবের সারগর্ভ তাত্ত্বিকগবেষণাগুলি ইতিপূর্বেই বিদ্বৎসমাজের বিশ্ময় উৎপাদন করিয়াছে ও তত্ত্বশাস্ত্রের মত রহস্যচ্ছন্ন বহুকালের অবজ্ঞাত বিষয়েও শিক্ষিত জগতের নূতন নয়ন উন্মিলন করিতে সমর্থ হইয়াছে; ইহার অল্প হিন্দুসমাজ সাহেবের নিকট চিরঞ্জলী রহিবে সন্দেহ নাই। প্রমথবাবুও এই সকল গূঢ় গবেষণাপূর্ণ তত্ত্বালোচনা অতি মধুর প্রাঞ্জল উপন্যাসের মত সরস ভাষায় সাধারণ পাঠকের গোচরীভূত করিয়া, বাঙ্গালী হিন্দুসমাজের ধন্বাদার, ইহা বলাই বাহুল্য। ভাষ্যকর্তার ব্যাখ্যানপদ্ধতি চমৎকার, বাংলাসাহিত্যে এক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের তত্ত্বব্যাখ্যা ছাড়া এরূপ মনোমুগ্ধকর দার্শনিক গবেষণা অল্পই পাঠ করিয়াছি। যে অনাহত পরমজ্ঞান এই সৃষ্টিসংসারকে বিধৃত করিয়া রাখিয়াছে—তাহাই অপৌরুষেয় বেদ—সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণের নির্মল বুদ্ধিপটে এই অক্ষর ব্রহ্মবিদ্যা দিয়াছেন আত্মপ্রকাশ করিয়া যে ধীরোদান্ত ঋদ্ধার তুলিয়াছিল, সে অপূর্ব বেদগানের মর্মাভাস আজ মানুষের গুরু অবনমিত যুক্তিবুদ্ধির কাছে তর্ক প্রমাণসহ প্রতিপন্ন করিতে হইতেছে—ইহাই বিচিত্র। হয়ত এ বোর সংশয়পূর্ণ যুগেরও সার্থকতা আছে—ইহারই মধ্য দিয়া হয়তো প্রাচীন আৰ্য্য প্রতিবোধ অলোজ্জল দিব্যজ্ঞানে পরিণত হইতে চলিয়াছে। তাহাই হউক—ভারতের গণ্ডীবদ্ধ বৈদিকযুগ বৃহত্তর ও পূর্ণতর হইয়া উভয় ভূমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়াই পুনরাবিভূত হউক—প্রলয়পয়োধিজল হইতে যিনি যুগে যুগে বেদ উদ্ধার করিয়াছেন, তাঁহার পুণ্য সিংহাসে ভাবী নবঋষিগণের হৃদয়ে নব বেদমন্ত্রের স্ফূরণ হউক।

জাতীয়শিক্ষার অধিকার—অধ্যাপক শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত কর্তৃক পঠিত—জ্ঞানপ্রচার সমিতি প্রকাশিত এখানি দ্বিতীয় পুস্তিকা। আমাদের শিক্ষা আমাদেরই করিতে হইবে—এ অধিকার আমাদেরই অধিকার—ইহাই জাতীয়শিক্ষার অধিকার, লেখক সূচিন্তাপূর্ণ নানা কথায় ও সুললিত ভাষায় এই তত্ত্বটাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। শিক্ষাক্ষেত্রের সহিত সাক্ষাৎ সংঘর্ষ নিবন্ধন এ দেশের শিক্ষাসমস্যা সম্বন্ধীয় বহু নিত্যপ্রত্যক্ষ অভাব অভিযোগ স্পষ্টরূপে চক্ষের সম্মুখে রাখিয়াই লেখক কথাগুলি আলোচনা করিতে পারিয়াছেন। দ্রুইদিক হইতে তিনি সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টাবান—প্রথম, সাধারণভাবে আবশ্যকীয় বিবিধ জ্ঞানের অধিকার—শিক্ষিত

ভক্তসমাজের পক্ষে যাহা নিতান্ত প্রয়োজন। দ্বিতীয়—আধুনিকযুগের জীবন-সংগ্রামের উপযুক্ত বৃত্তি সংস্থানের যোগ্যতা অর্জন। প্রথম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁহার মতে টোলের অনাড়ম্বর সহজ ধরণটি ধরিতে পারিলেই সবচেয়ে ভাল হয়। তবে আধুনিক এই টোলগুলি হইবে বড় বড় পুস্তকালয় আর অল্পে সমৃদ্ধ সরল অনাড়ম্বর জীবনে অভ্যস্ত পণ্ডিতদের লইয়া। তাঁহার চিন্তার মধ্যে সেই প্রাচীন আচার্য্য ও আশ্রমের সুন্দর পরিকল্পনাটিই ছায়াপাত করিতেছে—বর্তমানযুগের আড়ম্বরবহুলতার মধ্যে এ আদর্শচিত্র কতদূর সফল হইবে, তাহা চিন্তনীয়—বোলপুরব্রহ্মচর্যাশ্রমের কবিকেও আধুনিক জীবনশ্রোতের সহিত সংগ্রামে পরাজয় স্বীকার করিবার উপক্রম করিতে হইয়াছে। হয়ত সাধারণ জ্ঞানশিক্ষা, যাহাকে ভারতবর্ষ অপরাবিদ্যা কহিয়া আসিয়াছে, তাহার জন্য অপরা পদ্ধতিকেই আপন অঙ্গীভূত করিয়া লইতে হইবে। তবে ভারতের ব্রহ্মবিদ্যা সাধন ও প্রচারের দৃষ্ট, যে, তাহাকে বিস্তৃতভাবে সেই সরল অধ্যাত্ম ভাবকে কেন্দ্রসমূহেরই নবায়োজন করিতে হইবে—ইহা নিঃসন্দেহ। অধ্যাপকের ব্যবসায়িক শিক্ষাসম্বন্ধীয় কথাগুলি তেমন স্পষ্ট ও বস্তুতন্ত্র হয় নাই—দেশের মনীষীবৃন্দের মধ্যে অর্থসমস্যার 'হুচিন্তা' প্রবল হইয়াছে, কিন্তু সূষ্ঠ পথনির্দেশ হইয়া উঠিতেছে না। কালীপ্রসন্ন বাবুর শেষ কথাটি বড়ই গুরুতর—“অর্থ ও কাম সাধনের শিক্ষাই জাতীয়শিক্ষা নহে—চতুর্দিকের সাধনেই মানুষের পূর্ণসিদ্ধি হয়—আপাততঃ উচ্চশিক্ষায় প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের প্রাধান্য দান মাত্র আমরা করিতে পারি—ইহার বেশী করিবে ভারাই, যারা এই শিক্ষায় মানুষ হইয়া উঠিবে।”—হায়, স্বথঃস্বপ্ন, এমন মানুষ এই উপায়ে হইবে কি?

মনোমোহন—শ্রীনিশিকান্ত সেন ও শ্রীলবজঙ্গ পাল দ্বারা লিখিত—
ত্রিপুরা আনন্দ আশ্রম হইতে প্রকাশিত—মূল্য ১ টাকা। একখানি সাধু-জীবনী—তাঁহার ভক্ত লিখিত। বাংলার অজ্ঞজনতাসুলভ অন্ধ মহাপুরুষ-ভক্তির নিদর্শনপূর্ণ, বহু অলৌকিক তথ্যের জালজগ্মালসমাকীর্ণ হইলেও, গ্রন্থোদ্ধৃত সঙ্গীতগুলি গভীর, প্রাঞ্জল ও মধুর—রচয়িতার অধ্যাত্মদৃষ্টির পরিচায়ক। যাহাই হউক, পুস্তকোদ্দিষ্ট মনোমোহন স্বামী একজন পল্লীপুঞ্জিত ধর্মসাধক সন্দেহ নাই—তাঁহার সত্য অনুভূতিগুলি সাধনার বহু ইঙ্গিতপূর্ণ, ভারতের যাহারা mass, নিরক্ষর জনসাধারণ, তাহারাও কিরূপ গূঢ় ধর্ম-তত্ত্বসমূহ লইয়া অন্ততঃ নাড়াচাড়া করিয়া থাকে, তাহারই একটা উদাহরণ পুস্তকখানির মধ্যে পাইলাম। ইহাও আশা ও আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই।

গান (দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস)—শ্রীবিহারীলাল সরকার প্রণীত, ১০ নং রামচাঁদ নন্দীর লেন, কলিকাতা হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ১০ আনা। গ্রন্থখানি আগমনী, বিজয়া, শ্রীশ্রীলক্ষ্মী এবং শ্রীশ্রীশ্যাম—এই চারিভাগে বিভক্ত। সঙ্গীতগুলি ভক্তের সরল হৃদয়োচ্ছ্বাস—প্রবীণগণের ভাল লাগিবে।

হাটার কমিশন

রাজনীতিক চর্চা ‘প্রবর্তকের’ অধিকারবহিত। রাজবিদ্ বা রাজকর্ষ-পক্ষপাতি কার্যাদি সম্বন্ধে বিকল্প আলোচনা আমরা করিব না, নিরপেক্ষ-ভাবে কতখানি আমরা সহিতেছি ও আরও কতখানি সহিতে হইবে, ভবিষ্য লইয়াই আমাদের কথা। কেননা ভারতের কার্য কলহ করা নয়, ভবিতব্যের লিখন মানিয়া চলা, তাহার জ্ঞত কতটা প্রস্তুত হইলাম দেখিতে হইবে বৈ কি ?

সহিব কেন বলিলে চলিবে না। সহিষ্ণুতা লাভের সাধনায়ুগে হঠ-কারিতা অনর্থই সৃষ্টি করিবে। মাথার উপর যত ভারি চাপ পড়িবে, মাটির দিকে ততই আমাদের দৃষ্টি অধিক পড়িবে, এই নতদৃষ্টি অবনতির লক্ষণ নয়, উন্নতমুখী হইবার সত্য সাধনা, ভারত ঘে অন্তরদেবতাকে চাহিয়াছে, তাহাকে লাভ করিবার ইহাই যে সূচনা।

পাঞ্জাব রাজদ্রোহী হইয়াছে—এই সংবাদ যখন কানে আসিয়া পৌছিল, ভারতের এই অধ্যাত্মসাধনার যুগে, পক্ষনদের উষ্ণ মস্তিষ্কের পরিচয়ে যথার্থই আমরা স্তম্ভিত হইয়াছিলাম, তারপর নিরস্ত ভারতপ্রজার রক্তে যখন জালিওয়ানাবাগ রঞ্জিত হইল, হরকিশন লাল, রামভূজ দত্তচৌধুরী, সত্যপাল, কিচলু প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ যখন কারাগারে বন্দী হইলেন, তখন রাপার অপূর্ণ রুহসাময় বলিয়াই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম, আজ হাটার কমিশন তদন্তে সত্য বিবরণ পাঠ করিয়া আমরা হতবস্ত হইলাম।

ডেপুটি কমিশনের আরভিং সাহেবের একেহারে জানিতে পারি, নই এপ্রিল পূর্ণাঙ্ক অমৃতসহরের অবস্থা খুবই আশাপ্রদ ছিল, জনবাহিনী “জৈত

save the King” চিহ্নিত পতাকা হস্তে নগর ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে-
ছিল, ১১ই এপ্রিলে এমনই ঘটনার পরিবর্তন ঘটিল, যে সামরিক নীতি
অবলম্বন অনিবার্য হইয়া উঠিল, ১৫ই এপ্রিল হইতে নগর রক্ষার ভার
জেনারল ডায়ার সাহেবের হস্তে অর্পণ করিয়া, সিভিল শাসন বিভাগ
নিরস্ত রহিলেন। তাহার ফল যে কি ভীষণ হইয়াছে হাণ্টার কমিশনে
ডায়ার সাহেব প্রদত্ত দীর্ঘ বিবরণের শেষাংশ পাঠ করিলে তাহা অনায়াসেই
বুঝা যায়।

GENERAL DYER'S STATEMENT CONTINUED

In reply to further questions put by Mr. Ran-
ken, Genl. Dyer said that he himself directed fire
where crowd was the densest. That was because he
wanted to punish them for having assembled at all.
With regard to flogging, he said although it had prac-
tically disappeared from the Indian army yet he pre-
ferred it, for it was a speedy punishment. No discri-
mination was made in favour of respectable persons.
He admitted, a respectable person might easily vio-
late one of the many proclamations that he issued
every day.

In reply to Sir Setalvad's questions, witness said,
when he took over charge of the affairs, he did not do
so under orders of his superior authority. He did not
know what authority the civil authorities had in hand-
ing over the administration to him. But he believed
there was a civil law. He had no discussion with the
Deputy Commr. about restoring peace and order with
the aid of military. In his opinion that time had
come. The situation was very serious and the whole
administration was handed to him rightly and prop-
erly. When he heard of the meeting he at once made up
his mind that he could delay no longer but fire imme-
diately to save the military situation. He said he

could not take the two armoured cars with machine guns as the passage was narrow but if he could, he would open fire straight from the machine guns. He did not like to treat them with gloves on, but give them a lesson. His idea was not only to strike terror into the hearts of the immediate crowd but make an impression throughout the Punjab. He wanted to reduce the number of the rebels to reduce the morale of the enemy, to prevent further mutiny and save the necessity of firing again and shedding blood again. It was a merciful act on his part although a horrible act and people ought to be thankful to him for it. He thought he was doing a jolly good thing to them. To render aid was not his job. There were the hospitals for those who wanted to go. The Lieut. Governor approved of his action.

“INDIA IS THE PLACE OF SALAAM.”

With regard to salaaming British officers, he said every Indian ought to know to salaam his superior. India is the place of salaam. Indians know and ought to know to salaam. It might be that some men who did not salaam and also showed impertinence got 10 days imprisonment and some others who were arrested were by accident sent through the crawling street and the Sergeant made them crawl. After the 19th they voluntarily crawled. He admitted having written in his report that after the 13th, Amritsar was the pattern of law and order. Yet martial law was continued, for he thought there would be no harm in it and moreover it was being very justly administered. The witness practically admitted that martial law was continued longer than it was necessary.

In answer to Pandit Jagatnarain the witness said, he did not know what had been done in Belgium and could not say if his orders had a family likeness to what was done in Belgium. The witness admittedly had no tangible proof for holding that there was organised conspiracy, but said he drew inference from simultaneous cutting of the telegraph wire and railway and the murder of Europeans, that there was. He said if the number of the killed was 500, the number of wounded would be 1500 or more. It was quite possible that one bullet would kill two or three persons. He however heard that on the 13th night, dead bodies had been mutilated. To Mr Sultan Ahmed the witness said, it might have been a coincidence that disorders broke out simultaneously at the different places but it looked like an organised rebellion.

জালিয়ানাবাগে যে সকল নরনারী হত হইয়াছে, শুনা যায়, তাহার মধ্যে সাত মাসের একটি শিশু বিনষ্ট হইয়াছে, যাহা ঘটয়াছে, তাহার প্রতিবিধান নাই, উৎসন্নপ্রায় জাতির অশ্রুপাতে বাধা ঘটবে না।

সমগ্র পৃথিবী আজ অদৃষ্টচক্রে বিপর্যস্ত, ভারতবর্ষ তো পৃথিবী ছাড়া নয়, কাজেই তাহার ভাগ্যেও অশেষ ক্লেশ অনিবার্য হইয়া উঠিল, কিন্তু আমাদের ললাটে দুঃখের যে মনীচিত্র পরিষ্কৃত হইল, তাহা বৃষ্টি অপর কোন দেশেই সম্ভব নয়, একেবারেই অস্বাভাবিক।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর হইতে, শাসকজাতির মনে প্রজার উপর অবিশ্বাস জন্মিয়াছে, সে অবিশ্বাসের অপর কোন কারণ নাই, ভারতবাসী ইংরাজাধীনে, ইংরাজ জাতির মতই শাসনাধিকার প্রার্থনা করিতেছে, রাজা ক্ষত্রিয় হউক ব্রাহ্মণ হউক, মুসলমান হউক, ইংরাজ হউক তাহাতে তো কিছু আসিয়া যায় না, বৈষম্যবোধই বিদ্বেষকে জাগাইয়া তোলে, ঐ বৈষম্য ভেদ অপসারিত করিতে পারিলে যথার্থ শান্তি প্রতিষ্ঠা হইতে পারে।

কিন্তু পাঞ্জাবের বিবরণে শাসকজাতির মনোভাব যেরূপ আকারে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা সত্য হইলে আশঙ্ক্য কথা বটে, “হাট্টার কমিশনের”

মন্তব্য প্রকাশনা হওয়া পর্যন্ত এতদসম্বন্ধে আমরা কোন অভিমতই প্রকাশ করিব না।

এই দুঃখের দিনে নহাওয়া গান্ধী, ক্ষমাবীর মালব্য, দেশপ্রেমিক চিত্ত-রঞ্জনর মত সাহসী নেতা পাইয়া আমরা আশাবিহীন হইয়াছি। ভারতপ্রজা রাজদ্রোহী না হইলেও তাহার ভীষণ নহে, কারণ ভারতবর্ষ তো পশুবল চাহে না, সেইজন্য ডায়ার সাহেব যে ভয় দেখাইয়া, পঞ্চনদকে শুদ্ধিত করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি যে কতটা কৃতকার্য হইয়াছেন তাহা ভবিষ্যৎ কথা, কেননা পশুবল আঘাতে উপশম হয়, পরন্তু তপঃশক্তি আঘাতেই ক্ষুরিয়া উঠে, এক্ষেত্রে তাহাই যে হয় নাই, এ কথা কে বলিতে পারে? ভারতে নহাওয়া গান্ধী প্রমুখ নূতন নেতৃশক্তির আবির্ভাব দেখিয়া আমরা উৎফুল্ল হইয়াছি।

হাণ্টার কমিশন লাহোরে স্থানান্তরিত হইলে, মহামতি মালব্য মহাশয় লাহোরের নেতৃবৃন্দের মুক্তি প্রার্থনা করেন, অবশ্য এই মুক্তি কমিশনের কার্য যতদিন চলিবে ততদিনের জন্ত—কিন্তু পাজাব গবর্ণমেন্ট তাহাতে অসম্মতি জানাইয়াছেন। এই কারণে কংগ্রেস সভ্য-কমিটি এই কমিশনে যোগ দিতে অসম্মত হইয়াছেন। যেক্ষেত্রে সুবিধার পরিবর্তে অসুবিধা ঘটিবার অধিক সম্ভাবনা, সেরূপ ক্ষেত্র হইতে দূরে থাকাই শ্রেয়ঃ বলিয়া বোধ হয়; মাননীয় মালব্য, গান্ধী, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ যাহা করিবেন, তাহার উপর কথা কহিবার প্রয়োজন নাই। তাহার অত্যয় বৃদ্ধি-মাছেন, এরূপ বলা স্পর্ধার কথা।

হাণ্টার কমিশনে আমরা অনেক কথাই জানিতে পারিলাম। ইহাও বড় কম লাভের কথা নয়। বাংলার দুঃখভোগ যতই গোপন করিয়া রাখি, পঞ্চনদের রাজদণ্ড কিন্তু উলঙ্গ কুপাণের মতই নিরস্ত্র প্রজার বুকে বড় বেদনাই সৃষ্টি করিয়াছে—রাজভক্ত প্রজার শোকাবেগের অজস্র অশ্রু নয়ন-বহিয়া বক্ষস্থল প্লাবিত করিতেছে—হায় পঞ্চনদ, ত্যায়পরায়ণ ইংরাজ-রাজ হস্তে এরূপ শাস্তিবিধান আরব্য উপায়াসের মতই বিস্ময়জনক, পড়িতে পড়িতে অশ্রুবেগ উখলিয়া উঠে, হৃদকম্প উপস্থিত হয়।

প্রায় দুইশত বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া, এই নূতন যুগে, নিরস্ত্র ভারতপ্রজাকে শাসনে রাখিতে গিয়া, ইংরাজরাজকে এরূপ শাসনযন্ত্র আবিষ্কৃত করিতে হইল, যে ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত

হাহাকারে ভরিয়া গেল, এ কি বিধাতার কঠোর বিক্রম নহে? জগন্মাসী মহাসমরাস্ত্রে শাস্তি-উৎসবের অমুঠানে ভারতবাসীর উদাসীনতা প্রকাশ হুংখেরই অভিব্যক্তি, রাজভক্তিকে ক্ষুর করা কোনও দেশনায়কেরই উদ্দেশ্য নহে, পাজ্ঞাবের ক্ষিপ্ত রুষ্ঠ জনবাহিনী মিস্ সারউডের প্রতি অত্যাচারের প্রচেষ্টা করায় দেশের ললাটে কলঙ্কের লেখাই প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, খ্রীষ্টান ধর্মমন্দির, ব্যাঙ্ক, রেল-অফিস প্রভৃতিতে অগ্নিসংযোগে সুবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় না, নিরপরাধ ইংরাজগণের প্রতি পৈশাচিক আচরণ অতীব গহিত হইয়াছে—কিন্তু এই অত্যাচারীর দলই তো পজ্ঞাবের সবধানি নয়, মিস্ সারউডের জীবনরক্ষাও ত পজ্ঞাববাসীর আমুক্যল্যেই সম্ভবপর হইয়াছে, মুষ্টিমেয় লুণ্ঠনকারীর অপরাধে সকল নগরবাসীকেই যে রাজদ্রোহী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। পাজ্ঞাবের রাজভক্তির কথা স্বয়ং ছোটলাট মাইকেল ওডারারই এককালে শতমুখে প্রচার করিয়াছিলেন, এতদ্ব্যতীত ভারতবাসীর রাজভক্তির পরিচয় দিবার জন্য কাহারও দ্বারস্থ হইতে হইবে কেন? যে ভারতবর্ষ স্বেচ্ছায় নিজের রক্তপাত করিয়া ইংরাজরাজের স্বর্ণ-সিংহাসন দৃঢ় প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছিল, যে ভারতবর্ষ ইংরাজপ্রজাকে রাজদ্রোহী দেখিলে, রাজকর্ণে সে সংবাদ প্রদান করিয়া আগুনাকে কৃতার্থ বোধ করে, যুরোপের মহাসংগ্রামে যে ভারতবর্ষ রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া লক্ষ লক্ষ নরবলি দিয়া আসিল, সঞ্চিত সম্পদ হই হস্তে রাজকরে উঠাইয়া দিল, কোন মহাপরাধে আজ রাজদত্ত কঠোর প্রায়শ্চিত্তে সেই ভারতবর্ষ মর্দ্যাহত—কে ইহার উত্তর দিবে?

আমরা হর্ভাগ্য—বিধাতা আমাদের প্রতিকূলে, ইহাই আমাদের বড় সাধনা। কিন্তু যখন প্রায়শ্চিত্ত বড় কঠোর বলিয়া অনুভূত হয়, তাহার সঠিক কারণ নির্দেশে যখন অক্ষম হই, শাসকজাতির নিকটেই তখন কর-জোড়ে ইহার প্রতিবেদন কামনা করি, সকল ক্ষেত্রে সাধ অপূর্ণ থাকিলেও আর তো উপায় নাই, হে ইংরাজ! আমাদের কাতর নিবেদন কতদিনে তোমাদের কর্ণগোচর হইবে?

“বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা?” মানুষ তো মানুষের কাতর প্রার্থনার কর্ণপাত করে না, মানুষের উপরে যে মানুষ, রাজার উপরে যে রাজা, সে পরাংপর পুরুষের উদ্দেশ্যে যত্নকরে কোটা কণ্ঠে প্রার্থনা কর, পূর্ব হইলেও হইতে পারে, কিন্তু মনে রাখিও, পৃথিবীর এই হুংখ-

ভোগের মূল কারণ রাজদণ্ড নহে, উহা উপলক্ষ, রাজবিদ্বেষ স্বাভাবিক বটে, কিন্তু স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া আমাদের আজ প্রেমের রাজ্যে উপনীত হইতে হইবে, আজিকার ভোগ সহিষ্ণুতাকেই অটল করিয়া দিবে, সাহসকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবে, ভাগবত বিশ্বাসকে দৃঢ় করিয়া রাখিবে।

নূতন জাতি যেন ঘটনা দেখিয়াই আত্মহারা না হয়েন, এই কথাই বিশেষভাবে জানাইবার জন্যই বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা, অন্ধতমসচ্ছন্ন কলিযুগের অন্তকাল উপস্থিত, আকাশের কোলে তপশক্তির অরুণরাগ রেখাকারে দেখা দিয়াছে, ভোরের আধ আঁধার আধ আলোর অন্তরালে সারি দিয়া কৃতযুগের সাধকের দৃষ্টি ঐ গগনতলে দৃঢ়নিবদ্ধ, ভারতের কাননপ্রান্তর, পর্বত-নির্ঝর, গ্রাম পল্লী সে সোণার কিরণে এখনও উদ্ভাসিত ও সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে নাই, কর্ণে মানবজাতির অতিষ্ঠ হাহাকার বিকট রবেই বাজিয়া উঠিতেছে, কিন্তু চিন্তা দৃঢ় কর, পদভর মৃত্তিকা হইতে যেন এক অঙ্গুলিও উঠিয়া না পড়ে, স্থির ধীর হইয়া অপেক্ষা কর—ঐ কনক রেখা সারা আকাশ প্রাবিত করিয়া অন্ধকারের কুক্ষি হইতে নূতন পৃথিবী প্রকাশ করিবে, সেই নূতন রশ্মিপাতে নূতন নয়ন উন্মীলিত হইবে, পথ তখন আর অস্পষ্ট কুহেলিকাবৃত থাকিবে না, উহা হইবে স্পষ্ট স্ফুট, তখন তালে তালে-নূতন জাতি চলিবে দৈবশক্তিসম্বিত হইয়া বিজয় অভিযানে, হৃদয় ভরিয়া উঠিবে প্রেমে করুণায়, বিদ্বেষ তখন আঁধারে শিশিয়া যাইবে, আজিকার দর্শন তপোভঙ্গের চাতুরী মাত্র, সাধকের সঙ্কল্প বিদগ্ধিত করিবার পরীক্ষা। মনে রাখিও—

“দোষ কার নয়গো শ্রামা,

আগি স্বখাত-সলিলে ডুবে মরি।”

অনন্ত যাত্রা

মাটিতে লগ্নী ঠুকিয়া ঠুকিয়া, যে-তরলীখানি তীর ধরিয়া ছুটিয়াছে, তাহার আরোহীর মুখে কত দেশ দেশান্তরের কাহিনী, বীরত্বের ইতিহাস, ভিন্ন ভিন্ন মানব জাতির বিচিত্র আচার আচরণের কথা—সে দেখিয়া চলিয়াছে পৃথিবীর কত আশ্চর্য্য দর্শন, প্রকৃতির লীলা মাধুরী—কোথাও দীর্ঘ গগনব্যাপী গিরিমালা, ভীম দর্শন নায়েগ্রা প্রপাত, অন্তহীন মরুকাঙ্গার, বন উপবন, গ্রাম পল্লী, নগর মহানগর, তীরে তীরে ধনী রম্য নিকেতন, দরিদ্রের পর্ণ কুটীর—শুনিয়া চলিয়াছে শিশুকণ্ঠের কলোচ্ছ্বাস, যুবতীর সঙ্গীত আলাপ, মানব জাতির সুখ দুঃখের কতই কথোপকথন—সৌন্দর্য্যের ইয়ত্তা নাই, স্তবকে স্তবকে ফুলের রাশি, শস্যক্ষেত্রে মরকত মনের তরঙ্গহিলোল, নব কিশলয়দল পরিশোভিত বিস্তৃত বনভূমি—বিরাম নাই বিশ্রাম নাই, নয়ন শ্রবণ অবিরাম ভরিয়া আছে পৃথিবীর রূপে গানে, অন্তহীন সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে ভরপুর হইয়া নাবিক তীর ধরিয়া তরলী বহিতেছে, ক্রান্তি অবসাদ নাই, সন্ধ্যায় আধার বনাইয়া আসে, নিবিড় অন্ধকারে-তীরভূমি ডুবিয়া যায়, সে জমাট মসীচিত্রে খদ্যোতের ঝিকমিক, কুটীরে কুটীরে প্রদীপের চুম্বিক, সহরের বিদ্যুৎপ্রভা নয়ন বলসিয়া দেয়, সেও এক চমৎকার দৃশ্য, আবার আকাশ আলো করিয়া, স্বর্ণকিরণে পারের ছবি উজ্জ্বল হইয়া উঠে, গিরিশীর্ষে হিরণ্যমুকুট বলম্বল করে, জলশ্রোতে রোপ্যশ্রোতঃ বহিয়া যায়, শস্যক্ষেত্রে আগুন জলিয়া উঠে, বিশ্বব্যবিকারিত নেত্রে নাবিক প্রকৃতির নব নব লীলারঙ্গে বিভোর হইয়া তীর ধরিয়া ছুটিয়াছে, সৃষ্টির অন্ত নাই, গতিও অবিশ্রান্ত ।

*

*

*

কত যুগযুগান্তরের পর নাবিকের চক্ষু মুদিয়া আসিল—হাতের লগ্নী হাতেই রহিল—রূপের ছবি মনে পরশ করিল। এতদিন ধরিয়া বাহা করিয়াছে, দেখিয়াছে, শুনিয়াছে, সব সব যেন রেখায় রেখায় ভিতরে তার আঁকা হইয়া গিয়াছে, সে দর্শনেও পুলকে সর্কশরীর শিহরিয়া উঠিল। তরী ছুটিয়াছে, বাতাসের ঝায়ে তরঙ্গের বুক ভাঙ্গিয়া উঠা

জীৱ ছাড়িয়া দৰিয়াৰ মাথোঁ আশিয়া পড়িল। নাৰিক চাহিয়া দেখিল, জীৱেৰ ছবি ছোট হইয়া গিয়াছে, অস্পষ্ট বোধ হইতেছে—লগী ধৰিয়া দেখিল, মাটি আৰু ছোঁয়া যায় না, অথৈ জল, মুক্ত সমীৰণ বহিরাছে হু হু কৰিয়া, জলধিবক্ষে ঢেউয়ে ঢেউয়ে লুকোচুৰি খেলা কৰিতেছে। ঐ পাৰ দেখা যায় বটে, কিন্তু বাপসা, কত কথা কৰ্ণগোচৰ হয়, কিন্তু সে কলৱব, অৰ্থ আৰু বুঝা যায় না, ক্ৰমে নৌকা দূৰে বহুদূৰে গিয়া পড়িল; নাৰিক দীৰ্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া দেখিল, সে অকূলে ভাসিয়াছে, এপাৰ ওপাৰ কোন পাৰ আৰু দৃষ্টিগোচৰ হয় না।

উপরে নীল, নীচে নীল, নাৰিকেৰ জীৱন পৰ্য্যন্ত নীলিয়ায় ভৰিয়া গেল। কত কথা মনে পড়িল। ওপাৰেৰ চিত্ৰগুলি মনে মনে গুছাইতে লাগিল। তৰণী ছুটিয়াছে, মহাসিন্ধুৰ বক্ষে পুলকস্পন্দনে নাচিতে নাচিতে, জীৱন-তৰীৰ কি অপাৰ্থিব আনন্দ! নাৰিক গান ধৰিল। মুক্ত আকাশেৰ কোলে, মুক্ত জলধিবক্ষে, সে গান স্বৰে ভালে গমকে গমকে জমিয়া উঠিল, জীৱন যেন স্বৰময় হইয়া উঠিল—আকাশ, বাতাস, সমুদ্ৰ, তৰী, নাৰিক, সে স্বৰে এক হইয়া গেল, এক জমাট আনন্দ! বিষয় বহু হইলেও, গানের মুৰ্ছনায় সব যেন একটা চৈতন্তে জাগ্ৰত হইয়া উঠিল, স্বৰসংযোগে বিচিত্ৰ একাকারে পৰিণত হইল। গান ধামিয়াছে, সমীৰণ শুক, জলোচ্ছ্বাসেৰ শব্দ নাই, এই মহা শুকতাত মাথোঁ নাৰিক তন্ময় সমাধিময়।

কোটা স্বৰ্ধ্যাকৰে দশদিক বগসিয়া উঠিল। জ্যোতিঃস্পৰ্শে নাৰিক শিহৰিয়া উঠিল, দশ ইল্লিৰ দশ দিকেৰ বাতায়ন খুলিয়া দিল, অন্তৰ বাহিৰ আলোকে ভৰিয়া গেল। নাৰিক দেখিল, সে এক অলৌকিক দৰ্শন, এপাৰ ওপাৰ হুই দিকই দেখা যাইতেছে, এপাৰেৰ সকল ছবি ওপাৰেৰই ছায়া, ওপাৰ যেন আলোকে চিত্ৰে প্ৰতিফলিত, চকিতে পাৰেৰ আলো জ্বলিয়া গেল, নাৰিক দেখিল, সে অকূলেই ভাসিয়া চলিয়াছে।

ছবিৰ পাৰে নাৰিকেৰ আৰু ফিৰিতে সাধ নাই। যে দিক হইতে ছবি ফুটিয়া উঠে, চিত্ৰকৰ তুলি ধৰিয়া যে পাৰে ছবি আঁকিতেছেন, আৰে

আলোর সাহায্যে নতুন দৃশ্যে ওপার রঙে রঙে ভরাইয়া তুলিতেছেন, নাবিক সেই দিকেই ছুটিয়া চলিল, কিন্তু এই অসীমের শেষ কোথা, ওগো চিত্রকর! তুমি আর কতদূরে, তোমার কোলে বসিয়া, এপারের ফলন দেখিব—আমায় পার করিয়া দাও।

* * *

এই অসীম বাত্ম আজও শেব হইল না। মাঝে মাঝে ওপারের আলো জ্বলিয়া উঠে, কেন উঠে, কেনন করিয়া উঠে, তাহার নিরাকরণ কে করিবে? নাবিক আজও ভাসিয়া চলিয়াছে, যদি সে ওপারে পৌছিতে পারে, তবে এই অনন্ত বারিধির বক্ষে সেতু বাধিয়া দিবে, ওপারের আলো ভারে ভারে বহিয়া এপার আরও অধিকতর মহিমামণ্ডিত ও জ্যোতির্ময় করিয়া তুলিবে—এপারের তপস্যা ওপারকে কি নিকটতর করিয়া আনিবে না, অসীমের যাত্রী এই সঙ্কল্পই করিয়াছে।

এক

মাটির দিকেই যখন মানুষের অধিক টান এবং মাটির স্বভাবই যখন মানুষকে টানিয়া রাখা, তখন এই টানের মাঝেই আপনাকে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে হইবে, আত্মস্থ হইতে না পারিলে, মাটিতে মিশিয়া যাওয়াই মানুষের পরিণাম হইতে পারে।

বাহারী সংসারে থাকিয়া জাতির জন্ত, ভগবানের জন্ত জীবন উৎসর্গের সঙ্কল্প করিয়াছেন, এই টানের সঙ্গে নিয়ত সংগ্রামই হইয়া উঠে তাঁহাদের প্রধান কর্ম, কাজেই জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ, যাহা দিয়া সংসারটিকে নিখুৎ করিয়া গড়িয়া তুলিবে, তাহা প্রকাশের অবসর ঘটে না।

এ কথা অবশ্যই স্মরণ রাখা চাই, বর্তমান মানবজাতির মধ্যে স্বর্গীয় প্রেম ও আনন্দকে বহিয়া আনিতে হইলে, মানবপ্রকৃতির আমূল পরিবর্তন ঘটাইতে হইবে, অধুনা যে প্রকৃতি লইয়া আমরা ঘর করি, ইহা ভাগবত গুণপ্রকাশের অল্পকূল নহে, কিন্তু এই দেবচরিত্র গড়িয়া তোলাও বড় সহজ কর্ম নহে, যিনি এই কাজের ভার লইয়া অবতীর্ণ হইবেন, মাটিকে

জয় করিরাই তাঁহাকে এই কৰ্মে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে, মাতার চান হইতে আপনাকে উৰ্দ্ধে রাখিতে না পারিলে এত বড় বিরাট কৰ্মসাধন তাঁহার পক্ষে কোন মতেই সম্ভব হইবে না।

বাংলাদেশে শত বৎসর ধরিয়া মানুষ হইবারই সাধনা চলিয়াছে। ঠাকুরের তিরোভাবের পর হইতে, নূতন আশায়, নূতন স্বপ্নে বাঙ্গালীজাতি উদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, স্বামীজির সিংহ-গর্জনে বাঙ্গালীর প্রাণশক্তি আরও উত্তেজিত, আরও বিদ্যাপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, বাঙ্গালী শুধু মানুষ হইতে চাহে না, বাঙ্গালী হইতে চাহে দেবতা; আত্মসাধনার যুগে, এই কথাটা এমন জোর দিয়া বলিবার অবস্থা না ঘটিলেও, জাতিগত সাধনার যুগে আমরা উচ্চকণ্ঠে হাকিয়া বলিয়াছি “দেবায় জন্মেন”।

তপঃসিদ্ধ-ব্রাহ্মকর ক্রৌঞ্চমিথুনের শোচনীয় কলকণ্ঠে বিগলিতহৃদয় হইয়া উচ্চারণ করিয়াছিলেন চতুস্পদী ছন্দ, সে স্বর আবৃত্তি তাপসের কণ্ঠবিনির্গত হইলেও ভারতীয় প্রেরণাবলেই উচ্চারিত হইয়াছিল, সেই সিদ্ধ ভাষায় সপ্তকাণ্ড রামায়ণ রচনা সার্থক হইল, আজ আমরা সংসার-সমুদ্রে ক্ষুদ্র কীটের মতই বিচরণশীল বটে, কিন্তু আমাদের বজ্রদূত কণ্ঠে যে অগ্নিবর্ণ মহামন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছে, তাহা সফল করিবার বল তিনিই দিবেন, যিনি আমাদের অন্তরে থাকিয়া আমাদের দীক্ষা দিয়াছেন, তাঁহারই অমৃতশীতল আশীষধারায় অভিষিক্ত হইয়া আমরা পূর্ণসিদ্ধি লাভ করিব, এমন স্পর্ধা দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে।

বাঙ্গালীজাতির মধ্যে বুদ্ধত্বের সিদ্ধিলাভ করিয়া, দৃঢ়পদে দাঁড়াইতে চাহেন যাহারা, তাঁহাদের সাধনার বিষ ও সহায়গুলিকে ধীরে ধীরে বুঝিয়া উঠিতে হইবে। অন্তরায়গুলিকে অতিক্রম ও সহায়গুলিকে অবলম্বন করিয়া জাতির মেরুদণ্ড গড়িয়া তুলিবার জন্ত একদল সাধককে কৰ্মক্ষেত্রে আগাইয়া আসা চাই।

অসাধারণ চরিত্রলাভের জন্ত বৌদ্ধযুগ হইতে, বৈরাগ্যকেই বড় মহায় বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে, ভাব একজন ব্যক্তিকেই আশ্রয় করিয়া অবতীর্ণ হয় না, কোন এক ব্যক্তির মধ্যে উহা প্রকট হইয়া উঠিতে পারে, কিন্তু সমগ্র জাতির জীবনেই অন্তঃশীল ফলপ্রবাহের মত উহা অবস্থিত থাকে। বৌদ্ধযুগের পর হইতে জাতির জীবনেই উহা সংক্রামিত হইয়াছে, মানুষের কৰ্মফল একার নহে, সমষ্টিকেই অধিকার করিয়া ভোগ করে,

কর্মস্থলে হাজার হাজার বৎসর আমাদের জড়াইয়া রাখিয়াছে। এই কর্ম-
বন্ধন হইতে জাতিকে মুক্ত করিবার জন্য ব্যষ্টির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিলেও
ইহাও জাতিগত ব্যাপকতা লাভ করিবে, অতীতের ফলকে অতিক্রম করিয়া
এই নবভাবের সাহায্যেই সংসারে থাকিয়াই আমরা দেবচরিত্রের অধিকারী
হইব।

কিছুকে ধরিয়া আমরা চলি না, কিছু আমাদের ধরিয়া চালাইতেছে।
যখনই মাটির টান হইতে পরিত্রাণ পাইতে চাই, তখনই অতীতের কর্মফল
আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে, অতীতের সিদ্ধশক্তিই আমা-
দিগকে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করে, আমরা যে সাধনানুষ্ঠান করি, উহাও পৌরা-
ণিক যুগের প্রভাব, পরন্তু আমরাই আমাদের ঈশ্বর, আমাদের ইচ্ছামাত্র
পূর্বসংকীর্ণ সহায়তা লাভ করিয়া আদর্শের পথে অগ্রসর হই, এই ইচ্ছার
ধার্মাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিলে ইহার অমোঘ শক্তির পরিচয় পাওয়া
যায়, সাধনার অন্তর্ধান নিচয়ও সঙ্কল্পকে স্রবণ রাখিবার উপায় মাত্র, কিন্তু উহার
ব্যতিক্রম ঘটিলে, সাধক অন্তর্ধানের গুরুভারে চাপা পড়িয়া যায়।

অপ্রতিহত ইচ্ছাশক্তিই যদি আমাদের উর্দ্ধগতির পরম সহায়, তবে
অন্তরায় কি? সেই কথা বলিবার প্রয়াস করিব—বৈরাগ্য তপস্যানুষ্ঠান,
আসন প্রাণায়াম, জপ ধ্যান প্রভৃতিই যেমন ভগবান্ পাইবার সিদ্ধসহায়
নহে, প্রকৃষ্ট সহায়ের গৌন কারণ মাত্র, সেইরূপ ধন রত্ন রমণী নাম
যশঃ প্রভৃতি প্রকৃত বিষয় নহে, বিশ্বের উপলক্ষ বিশেষ।

বিষয় হইতেছে আত্মবিশুদ্ধি। আমরা ভগবান্ হইতে ভিন্ন জানে তাঁহার
উপাসনা করি। কর্ম আমাদের নহে, ফলও আমরা ভোগ করিব না,
ভগবান্কে পাওয়া সাধনার উপরেও নির্ভর করে না, আর বিশ্বেও উহা
প্রতিহত হয় না। জীবন ধর্ম করিয়া মানুষকে ব্যর্থমনোরথ হইতে
দেখা গিয়াছে, মহাপাপে চির জীবন লিপ্ত থাকিয়া সহসা একদিন ভগবদ্-
স্পর্শে দেবত্বলাভের ইতিহাসও হিন্দুশাস্ত্রে বিরল নহে।

বিষয় আমাদের মূল ধারণায়। ভগবান্ হইতে ভিন্ন বোধ থাকায়,
এভাবে ব্যক্তিগত মুক্তিই ছিল জীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু ভগবান্ অচ্ছেদ্য,
সৃষ্টির মধ্যে তাঁহার ফাঁক নাই, একটা সূত্রে আকর্ষণ করিলে উর্ণনাভ-
জাল যেমন নড়িয়া উঠে, জগৎ জীবনের মধ্যে একটা মানুষ বুদ্ধ লাভ
করিলে, বিশ্ব মানবজাতির মধ্যে নতুন ভাব অবতরণকারী। ফল থাকিতে

আরম্ভ করিয়া উহা বৃত্ত্যচ্যুত না হইলে, আগা গোড়া পাকিয়া যায়, মানবজাতির মধ্যেও পরমাণুবিশেষ স্থানে রঙ ধরিলে, সবথানিই একদিন রাঙা হইয়া যাইবে। এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইলেও, ফলে ইহার অত্রথা হয় না, জাতির চিন্তা আজ যে শ্রোতে চলিতে থাকিবে, এ শ্রোত কত পুরুষ চলিবে তাহার ইয়ত্তা নাই, মানুষ ইহাকেই কর্মফল বলে, এই কর্মফল হইতে মুক্ত হইতে হইলে জাতিকেই যে যুগপৎ মুক্ত করিতে হইবে, এই ধারণার দৃঢ়প্রতিষ্ঠা না হইলে পূর্ণযোগ অদম্ভব এবং পূর্ণসিদ্ধিও সুদূরপর্যন্ত।

ভারতের চিন্তাশ্রোত ফিরিতে আরম্ভ করিয়াছে, দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে যে ভাব একটা দেহীর মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, ভারতের পর্কে পর্কে তাহার মনোহর কলিকা দেখা দিয়াছে, মানুষের প্রচেষ্টার ভাবের পরিবর্তন ঘটে না, দেবতার ইচ্ছাই মূর্ত হইয়া উঠে, তখনই এক একটা জাতির মধ্যে সেই ভাবের লীলা চলিতে থাকে, ভাবপ্রবাহের শক্তি অনুসারে ইহার বিস্তার ও স্থায়িত্ব পরিলক্ষিত হয়। দেবমানব ত্রিষ্টের মহিমা অর্ধ জগতে বিস্তৃত হইয়াছিল, মহম্মদের ধর্মশ্রোত পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছিল, মহাত্মাগী বুদ্ধের প্রভাবে সমগ্র এসিয়া ও যুরোপের অনেকাংশ উদ্ভুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। ঠাকুরের ভাব-প্রবাহ কোথায় গিয়া মোড় ফিরিবে, তাহার ঠিক কি? কতদিন ইহার ভাবের জ্যোতিঃ মানবজীবনকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে, তাহা কে বলিতে পারে?

সমুদ্রতরঙ্গের মত কর্মশ্রোত ছুটিয়া চলে, তাহার কোলে আর একটা, তাহারও পিছনে এমন কত তরঙ্গ স্তবকে স্তবকে ছুটিয়াছে, ইহার ইয়ত্তা নাই, বিরামও নাই, কর্মহুত্র মূলে যখন ছিন্ন হইয়া যায় তখনই প্রগম-উপস্থিত হয়, ইহাও আবার নূতন কর্মহুত্রের সূচনামাত্র, লীলাবিকাশের অন্ত নাই, বিশ্রাম নাই, বরং পূর্বাশ্রিত্য পনের কর্মহুত্র অধিকতর ভাবে ভাগবত মহিমা প্রকাশের উপযোগী হয়।

এই ভাবতরঙ্গ মাথায় বহিয়া ছুটিয়াছে কে? মানুষ?—উন্মাদ হইয়াছে, তপঃসিদ্ধ আধার না হইলে, মন্দাকিনী স্বর্গচ্যুত হইয়া বারিবর্ষণে ধরণী-তল শীতল ও পবিত্র করে না, আজ এই দেবজাতি সংগঠনের সঙ্কল্প জাগিয়াছে যাহাদের মনে, এই অতুল স্বপ্নে আত্মহারা উন্মাদ হইয়াছেন

যাহারা, তাঁহারা কি আজ জয়ী হইয়াছেন, সমষ্টির ভোগরাগ আত্মজীবনে উপলব্ধি করিয়া আত্মারাম হইতে পারিয়াছেন? মহামায়ার বিজয়সিন্দুর তাঁহাদের ললাটে কি ধক্ ধক্ করিয়া জলিয়া উঠিয়াছে? এই নবযুগের আগমনবার্তা ঘোষণা করিয়া দেবজাতির স্বপ্নে সমগ্র জাতিটাকে উন্মাদ করিয়াছে। বিন্দুবার স্পর্শে যাহাদের, তাঁহাদের এই প্রশ্নই বার বার জিজ্ঞাসা করি।

ঠাকুরের বজ্রকঠোর কঠোর অমর বার্তা আকাশের কোলে আজিও জলদগর্জনে ধ্বনিত হইতেছে। দেবজাতির বিজয়পতাকা উড়াইয়া যাহারা পথে বাহির হইয়াছেন, যাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ এখনই অসংখ্য নরনারী সারি দিয়া চলিবে, তাঁহাদের হৃদয় হইতে কামিনী কাঞ্চনের উন্মাদনী আসক্তি অপসৃত হইয়াছে তো, ভাগবত আনন্দের অজস্র অমৃত ধারায় তাঁহাদের সবথানি শীতল হইয়াছে তো, কোন কামনা বাসনায় তাঁহাদের হৃদয় আর যদি বিচলিত না হয়, তবে হে নবযুগের সাধক, উচ্চকণ্ঠে তোমাদের জয় ঘোষণা করি, বিচিত্র সংস্কারবিজড়িত গলিত শবের সঙ্গে তোমাদের হস্তস্থিত অমৃত বারি হইতে বিন্দুবারি সিঞ্জন কর, ভারতের প্রাণশক্তি ভগবদ্ভাবে, পূর্ণ হইয়া জগতে নূতন সৃষ্টির ভিত্তি রচনা করুক।

মনে রাখিও নবযুগের অগ্রদূত, বিন্ন তোমাদের সংসার নহে, কামিনী কাঞ্চন নহে, তোমাদের অমর প্রেরণা যদি সত্য হয়, তবে উহার মধ্য হইতেই তোমাদের বিশিষ্টতা প্রমাণিত হইবে—ভারতের সব উপকরণ সাধকের পূর্ণ সিদ্ধির অভাবেই ব্যর্থ হইয়াছে, যদি ভাগবতইচ্ছায় তোমার সবথানি পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, তোমার অসীম শক্তিবলে শুধু ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র জগৎ তোমায় অনুসরণ করিবে, অমর পথের পথপ্রদর্শক যিনি তিনি বুদ্ধ ভিন্ন অপরে কে হইবেন?

ভারতের ভাগ্যসূত্র

ভারতবর্ষের অধঃপতনের কারণ অন্বেষণ করিতে গিয়া শিক্ষিত বাঙ্গালী বিচিত্র মতবাদের অবতারণা করিতেছেন। কি কারণে কোটী কোটী নরনারী দীন কালালের বেশে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়, রোগে অনাহারে লক্ষ লক্ষ লোক প্রতিবৎসর কালগ্রাসে পতিত হয়, শ্রী বীর্ধ্য প্রতিভা হারাইয়া ঘৃণ্য অপদার্থ জীবন ভার বহিয়া বাঁচিয়া থাকে, এক নিঃশ্বাসে তাহার উত্তর দেওয়া সম্ভব নহে। আজ যাহারা শক্তিসম্পদশালী জাতি, তাহাদের গুণাবলী অনুকরণ করিলেই যে আমাদের সৌভাগ্যোদয় হইবে, এমন মন্তব্য যুক্তিযুক্ত নহে, কেন না একদেশের আচার ব্যবহার ধর্মকর্ম শিক্ষা দীক্ষা অপর দেশের উপযোগী হইবে কি না সন্দেহ, হয়ত অনুকরণের ফলে গতপ্রায় জীবন অচিরেই নিঃশেষ হইতে পারে। বাংলার নবযুগের পুরোহিত কর্মবীর বিবেকানন্দ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, ধর্মই জাতির লুপ্ত জ্ঞান, নষ্ট বীর্ধ্য ঐশ্বর্য্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবে, কিন্তু সেই ধর্মব্যাপ্যও এক প্রকারের নহে, ধর্মের ঐশ্বর্য্য স্বরূপনিরূপণও সহজ কথা নয়, সিদ্ধ কর্মে মূর্ত্ত হইয়া না উঠা পর্য্যন্ত ধর্মের মন্ত্রশক্তি জাতির জীবনগঠনের উপর কি অপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, তাহাও প্রতিপন্ন করা দুর্লভ।

মানুষের জীবনবিকাশে তাহার অন্তঃশক্তির হাত কতখানি, সে কথা অনেক সময়েই ভুলিয়া যাই। বাহিরের শক্তিবাহু মনের উপর কার্য্যকর বিস্তার করে, ঐতিহাসিক কার্য্য কারণ পরম্পরায় মনের অভিব্যক্তির দ্বারা অনেকখানি নিয়মিত হয়, রাষ্ট্র, সমাজ, কর্মক্ষেত্রে অসংখ্য শক্তির ঘাত প্রতিঘাত ঘটনাতরঙ্গের গতি নির্ণয় করিয়া দেয়—এ সকল আধুনিক বিজ্ঞানসিদ্ধ কথা। প্রাকৃতিকবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের সঙ্গে বর্ত্তমান ইউরোপের মনোবিজ্ঞানকেও নূতন ছাঁচে ঢালাই করিয়া দিয়াছে, জাতির উত্থান পতনের মূলে তাহারা যে সকল শক্তির হস্ত দর্শন করিয়াছেন, তাহার সব গুলিই এই বহিঃপ্রভাবমূলক। Personal equation এর মত জাতির নিজস্ব এক একটা genius আছে, যাহা এমনই স্বল্প, যে তাহার ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা বিভ্রমামাত্র,—এই দুজের তত্ত্বটির একটা স্থান ইউরোপের

চিন্তার মধ্যে থাকিলেও, তাহা গোণ প্রভাব মাত্র, মুখ্যতঃ রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক, ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক কারণ সমূহই জাতীয় ভাগ্যবিবর্তনের নিয়ামক। ইউরোপের দর্শন সত্য কি না, তাহা এককথায় বিচার করিবার বস্তু নহে, তবে তাহার প্রচারিত তথ্যগুলি যে সকল প্রমাণ প্রয়োগের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠা, সেই সমস্ত ইউরোপেরই নিষ্ক-প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজন্মক; প্রতীচ্যের ভূগোল ইতিহাসের যদি কিছু বিশিষ্টধারা থাকে, তবে সেই বৈশিষ্ট্যের ছাপ তাহার চিন্তাপ্রবাহকেও যে অল্প বিস্তার অনুরঞ্জিত না করিয়াছে তাহা নয়, সেই বিশিষ্ট মানস দৃষ্টি দিয়া সে যে-সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইয়াছে, তাহা তাহারই স্বভাবমূলভ হইলেও, সকলের পক্ষে একান্ত সত্য নাও হইতে পারে। বাহ্য প্রতীচ্যের ধাতুসিদ্ধ, তাহা প্রাচ্যের প্রকৃতিবিরুদ্ধ হওয়া অসম্ভব নয়।

বাহিরের প্রভাব হইতে পূর্ণরূপে মুক্ত মন পৃথিবীর পৃষ্ঠে সহজদৃশ্য বস্তু নয়। তবে মানুষ মাঝেই কি এক অজানা প্রেরণার ঠেলা অনুভব করে, বাহ্য তাহাকে মাটি হইতে শিকড় তুলিয়া উপরের দিকে ছুঁড়িয়া দিবার জন্য ক্রমাগত ধাক্কা মারে, সেই ধাক্কা পৃথিবীর সকল জাতির প্রাণেই বর্তমান, সকলেরই জাতীয় জীবনভঙ্গী তাহার আকর্ষণে কমবেশী নিয়ন্ত্রিত। এই উপরের টান যার মত বেশী, তার সভ্যতাও তদনুরূপ উচ্চতর স্তরের, সভ্যতা সাধনার ক্ষেত্রে জাতিতে জাতিতে যে তারতম্য তাহার কারণ এইখানে, সমস্ত মানবজাতি বর্ধরতার আচ্ছাদন ঝাড়িয়া উর্দ্ধমুখে ছুটিয়াছে, তবে কাহারও দৃষ্টি অল্প মাত্রায়, কাহারও বা অধিক পরিমাণে মাটির ছায়া অতিক্রম করিতে পারিয়াছে। যে জাতির চিত্ত মাটির বহিঃপ্রভাব হইতে অধিকতর মুক্ত, সভ্যতার মানদণ্ডে তাহারই দৃষ্টি উচ্চতর বলিয়া গণ্য করা যুক্তিযুক্ত।

ইউরোপের দর্শন জাতীয় ভাগ্যালিপি পড়িয়াছে বহিদৃষ্টি দিয়া—তাই সে গবেষণায় কল্পনার স্থান গোণ, প্রধানতঃ প্রত্যক্ষ প্রমাণসংগ্রহ, আর লজিকের কাটা ছাটা যুক্তিযুক্তের মধ্য দিয়া তথ্যকে ঘাটাই করিয়া সিদ্ধান্ত স্পর্শ করাই তাহার সত্য নির্ধারণের বাধা পদ্ধতি। ইউরোপের যুক্তিপথ প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে যোজনা করিয়াই জ্ঞান সংকলন করিতে সচেষ্ট, বস্তুতঃ এইরূপ অনুমিত সিদ্ধান্তগুলি সম্ভবপর সত্য মাত্র, সম্ভারনা মৌলিক সত্যকে কতক প্রকাশ করে, কতক ছায়ায় মত কুহেলিকায় রূপ রাখে, এই অবগুহিত

দৃষ্টির সাহায্যে নিঃসন্দেহ সত্যে উপনীত হওয়া হ্রস্ব, এমন কি অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

পাশ্চাত্য আপনার বিচারপদ্ধতির সঙ্গীণ সীমা যে আদৌ উপলব্ধি করে নাই, এমনও নয়—ইউরোপের আধুনিকতম নূতন দর্শন—Bergson প্রভৃতি চিন্তানেতৃগণ একটা নূতন জ্ঞানযন্ত্রের অবধারণা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন—Intuitionএর সাহায্যে জ্ঞানোপলব্ধি আজ অগ্রণী প্রতীচ্য মনীষীবর্গের সমীপেও একেবারে উড়াইয়া দিবার জিনিষ নয়—তবে সেখানে এখনও চিন্তাজগতের এই সব নবীন আবিষ্কার ঘূরার মত অস্পষ্ট, কুহেলিকাচ্ছন্ন পদ্যার অন্তরাল হইতে সত্যজ্যোতির অরুণরাগ এখনও ভোরের আধার কাটাইয়া পূর্ণপ্রকাশ হইতে বিলম্ব আছে। ইঞ্জির ও যুক্তিবুদ্ধির উপর অতিমাত্রায় নির্ভরতাই তার প্রধান পরিপন্থী। দোষ ইউরোপের স্বভাবধর্মের—Intuition ও করণার যন্ত্র প্রভেদ বদয়ঙ্গম করা এখনও তাহার পক্ষে সুদূরবর্তী।

পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোক যখন এদেশে আসিয়া পড়িল, তাহার ঝাঁঝাল তীব্র ছটার প্রথম আমাদের মন সত্যই মুচ্ছািত হইয়া পড়িয়াছিল, উদ্ভাস্ত মস্তিষ্কে জাতি আপনার প্রতিভার আস্থাহীন হইয়া, সেই আলোকরশ্মি বুদ্ধির মধ্যে টানিয়া লইবার জন্ত বন্ধপারিকর হইল, ব্যগ্র আগ্রহে পাশ্চাত্যশিক্ষা কণ্ঠস্থ করিয়া যে ধারকরা মনীষী অর্জন করিলাম, তাহা এতই কৃত্রিমতাপূর্ণ, যে তাহার দ্বারা জীবন নির্বাহও অচলপ্রায় হইয়া উঠিল। প্রকৃতি নিরস্তা নহেম, বিগুণিত শক্তিপ্রবাহে সেই উদরস্থ আমদানী অন্ন পরিপাক করিবার জন্ত তীব্র প্রচেষ্টা চলিল, পুষ্কায় বৎসরের আহৃত শিক্ষা হজম করিবার চেষ্টায়, যদি গত চতুর্দশ বর্ষের সাধনা যথেষ্ট না হইয়া থাকে, তাহা একান্ত বিশ্বয়জনক নহে। তবে ভারত-প্রকৃতি আপনাকে না ফিরিয়া পাওয়া পর্য্যন্ত তাহার অন্তরাশ্রয় মুক্তি নাই, একথা ঐক্য সত্য।

ভারতের বর্তমান অধোগতির কারণ নিরূপণ উপলক্ষে বাঙ্গালী ষষ্ঠখানি গভীর চিন্তা ও মনীষার নিয়োগ করিয়াছে, এমন অগ্রান্ত প্রদেয়বাসী করে নাই, ইহা বাঙ্গালীর গৌরবের কথা। বাঙ্গালী হইতেই ভারত-মননের হস্তান্তরের সূত্রপাত, একথা ঐতিহাসিক সত্য। এই ক্ষণমানের লজাই তাহার স্বদেশচিন্তাকে গভীরতর করিয়া তুলিবার পক্ষে উত্তেজক কারণ

হইলেও হইতে পারে, কিন্তু ইহার একটা অন্তরের কারণও আমরা নির্দেশ করিতে পারি। পাশ্চাত্য শিক্ষার সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্রাহ্ম-স্মি ও যুক্তিবাদী-হইয়াছিল, তবে তাহা হজম করিবার জন্ম কিছু দীর্ঘতর অবসর ও প্রকৃতিদত্ত সুস্কৃতির মনীষাশক্তির আবহুকুল্যে তাহার অন্তর্নিহিত স্বভাববর্ণ্য একটু অগ্রেই বিকশিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালী-জাতিকে অবলম্বন করিয়া প্রকৃতিদেবী দ্রুত বিবর্তনক্রমে একটা নূতন সভ্যতা ও সাধনার বিকাশ দ্বিপ্রভর সম্পন্ন করিয়া তুলিতেছেন—ইহা মনঃকলিত কথা নহে। ইহা শুধু বাংলার হাওয়া মাটির গুণ নয়, এখানে অন্তঃসত্তার প্রেরণা একটু বিচিত্র ও অভিনবরূপে লীলাশীল। বাংলাদেশে একটা নূতন প্রতিভাশালী জাতির অভ্যুদয়, তাহার চিন্তার, দর্শনের, রাষ্ট্রে, ধর্মে বিশেষ স্পষ্টরূপে তাহার সাহিত্যে নানাকারে তাহার আগমনী-সঙ্গীত ফুটাইয়া তুলিতেছে—ইহা প্রত্যক্ষ কথা। অন্তরের কাছে অশ্রুট কুহেলিকাবৃত হইলেও, বাঙ্গালীর নিজের মগ্নচেতনায় এ ইষণা স্পষ্ট অনুভবের বস্তু।

বিশেষ, একটা সিদ্ধ সাহিত্যের পূর্করাগিণী খুব স্পষ্টরূপেই কর্ণকুহরে বাজিতে আরম্ভ করিয়াছে—ইতিহাস: তার ছই একটা রাগেরখা চূর্ণ সুবর্ণের মত ইতিমধ্যেই বলমূল্য করিতে দেখা যাইতেছে, বাঙ্গালীর এই নূতন দৃষ্টি, নূতন আলো নূতন স্বপ্নের স্বর্ণচিত্র আজ যতই কল্পনামণ্ডিত বলিয়া প্রতীয়মান হউক, ইহা একটা উদয়োন্মুখ নবপ্রতিভার অরুণরাগ, এ একটা সিদ্ধ বাণী, সিদ্ধমন্ত্র, সিদ্ধরাগিণীর আকড়াই দেওয়া—কাব্য ও কল্পনার রঙ্গীন মসলা দিয়াই তরুণজাতি পূর্কসাধনা আরম্ভ করিলেও, ইহার পরিণতি উদার, মুক্ত, স্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল।

যুক্তি ইতিহাস তর্কশাস্ত্র সহজবুদ্ধি—এ সবই জ্ঞানের উৎকৃষ্ট উপকরণ: সন্দেহ নাই, বাহ্য কারণনিরূপণে এ সকল প্রচুর পরিমাণেই সার্থক, কিন্তু সত্য ও মৌলিক কারণ বাহিরে স্থলে তো ভাসেই না, পরন্তু যে স্বপ্ন ছায়াময় সম্ভাবনার লোকে, অসুমান দর্শন বিচরণ করে, সেখানেও তাহার সন্ধান অসম্ভব। কারণ যাহা তাহা, স্থলেও নয় স্বপ্নেও নয়, কারণ অন্তরের অন্তরে—জাতির জীবন মরণের চারীকাটিটি সেইখানেই নিহিত, দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে সেই-টিকে উদ্ধৃত করিয়া আনিতে হইবে। সেইজন্মই আমরা শুধু ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক বা সহজ বাহ্যদৃষ্টি দিয়াই ভারতের জীবন অধ্যয়ন সম্পূর্ণ মনে করি না, ভারতের উত্থান পতনের মূল সত্য নির্ণয় করিতে হইলে অধ্যাত্মদৃষ্টি

দিয়া অন্তরাআর নূতন আলোকে তাহা পুনঃ পাঠ করিতে হইবে—এই নূতন দর্শনের কথাই আমরা নানাচ্ছলে দেশের সমীপে উপস্থাপিত করিতে চাহিতেছি—ইহার অভাবে ভারতের সাধনা একেবারে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যাইবে, ইহা আমরা জোর করিয়াই বলিব।

আমরা অধঃপতিত হইলাম কেন? এক্ষণে আমরা ছিলাম না, শ্রুতির যুগে, বেদান্তের যুগে, পুরাণের যুগে—পরিশেষে, বৌদ্ধ, তান্ত্রিক, মুসলমান যুগ পর্য্যন্ত একটা একটানা ক্রমবর্তন অববোহণ দেখিতে পাই—আমরা যেন উপর হইতে ক্রমাগত সিঁড়ি বাহিয়া নীচেই নামিয়া আসিয়াছি—হিমালয়ের তুঙ্গ শৃঙ্গ যেন ক্রমেই ঢলিয়া পড়িয়াছে—নিম্ন হইতে নিম্নতর। ইহার কারণ কি? একটা পূর্ণগৌরবময় মহনীয় স্বর্ণযুগ ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া এ কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে, কেন ভাঙ্গিল, কেনই বা ভাঙ্গার প্রবাহ হঠাৎ আজ এই নবীন যুগে শুভিত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, এ সব কথাই কে মীমাংসা করিবে? বিজ্ঞান পারে না—বিজ্ঞান বলে উপর হইতে অবতরণ কই, মানবজাতি তো নীচে হইতে উপরেই উঠিয়া চলিয়াছে। যুক্তি পারে না—যুক্তি বলিবে, কার্য্যকারণ শৃঙ্খলার শেষ অনুরীয়কটুকু দেখিতে পাইতেছি, বড় জোর তার পূর্ব্ব, নয় তারও পূর্ব্ববর্তী অনুরীয়কটুকু ধরিতে পারি, তার বেশী আমার সাধ্যাতীত, সে শৃঙ্খলার ভাষাত্তর অধঃপতনস্থল সত্যই দুঃখিণী। সমাজতত্ত্ব বলিবে—কারণ, জাতির জীবনীশক্তির হ্রাস, একটা মহাকর্ষশীল তরুণজাতি আজ বয়ঃপ্রভাবে ক্লান্ত শ্রান্ত হতব্রাহ্ম হইয়া পারের যাত্রী হইয়া চলিয়াছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলিবে, শুধু তাহাই নয়, জলবায়ুর অবস্থাপ্রবর্ত্তে প্রাচুর্য্যপুষ্ট হীনবীৰ্য্য জাতি ধনগৌরবলুপ্ত নব নব তেজস্বী সৰল জাতিকে আশ্রয় করিয়া তাহারই হস্তে বারম্বার পরাভূত হইয়াছে, এ নবজাগ্রত রাষ্ট্রশক্তির কাছে হীনবল অলস জাতিরই পরাজয়, রাষ্ট্রক্ষেত্রে শক্তির সঙ্গে শক্তির বিগ্রহে যে বীৰ্য্যে, চরিত্রে, প্রতিভায়, সর্ব্বাপেক্ষা বাহুবলে পশুবলে বলবন্তর, তাহারই গলে জয়মালা পড়িবে, তাহা আর এমন বিচিত্র কি? দার্শনিক বলিবেন এ সব সত্য হইলেও, অবাস্তব; মূল গোড়ার কথা হইতেছে, জাতি তাহার ভাবপ্রেরণা হারাইয়া ফেলিয়াছে, বুদ্ধ শব্দের গৈরিক-পতাকা উড়াইয়া যে জাতি শুধু ব্রহ্ম সত্য জগৎ বিখ্যা জপিতে তন্দ্রালস মুদিত নেত্রে যুগ যুগ-কর্ম্মবিমুখ বৈরাগ্যেরই পূজা দিয়া আসিয়াছে, তাহার অনিবার্য্য অধোগতি কে প্রতিরোধ করিবে—জাতি

আপনারই নিজস্ব জড়তার মস্তে আপনার মৃত্যুর পথ স্থপরিষ্কৃত করিয়াছে ; আপনি না মরিতে চাহিলে, সংসারে কে কাহাকে মারিতে পারে—আত্মাই তো সত্য, এ জগৎ তাহারই রচিত কল্পনা, বাহিরের কারণ বড় জোর এই অন্তর্দৌর্য্যেরই বাহ্য উপলক্ষ মাত্র। আর সহজ বুদ্ধি তাহার অনাড়ম্বর সরল বাংলাভাষায় দেখাইয়া দিবে, আমরা দুর্ব্বলশরীর বৃহৎমস্তিষ্ক ভাবকতাপ্রিয় বাঙ্গালীজাতি—কর্ম্মকঠোর জীবন আদর্শে পশ্চাৎপদ, বর্তমানের কর্ম্মবিফলতার লজ্জা নিবারণের জন্তই কল্পনাযোগে অতীতের উপর দোষারোপ করিতে উৎসুক, পরন্তু সত্য দুর্ব্বলতা আমাদের বর্তমান জীবনপদ্ধতির পর্কে পর্কে বিজড়িত—যদি বাঁচিতে চাও ইহাদিগকে একে একে ধর, আর নির্ম্মমভাবে নিরসন কর।

যত মত, তত পথ—বিচিত্র পথে শিক্ষিত বাঙ্গালী জাতীয় হুর্ভাগোর হেতু নির্ণয় করিতে চাহিয়াছে, চাহিতেছে—অসংখ্য মতামতের কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা বিচার বিশ্লেষণ করা দুঃসহ। একটি মূল সত্য এই সমস্ত বিভিন্ন সিদ্ধান্তে বহু খণ্ডে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, ইহাতে সন্দেহ নাই ; একই বনস্পতির শাখাপত্রব পুষ্পফল স্পর্শ করিয়া সেইখানেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ভাবিতেছি, সবটুকু সত্য এই, আর সব গোণ। বুদ্ধিচক্রে ইহার পূর্ণরীমাংসা অসম্ভব। বুদ্ধি বড় জোর এই সব নানা মূনির নানা মতের একত্র সংযোগ সমাবেশ করিতে পারিবে, সামঞ্জস্য বুদ্ধির ধাতুতে তুলিত।

সামঞ্জস্যের জন্ত অগ্র করণ, অগ্র যন্ত্র। তাহাই ত শুদ্ধদৃষ্টি, অন্তর্বিজ্ঞান। জাতিকে এই তপঃশুদ্ধ অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হইতে হইবে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে সূর্যের উদয়াস্তের মত দিব্যরজনীর আবর্তন। এসিয়ার গৌরবের যুগে ইউরোপ অন্ধকারাচ্ছন্ন, ইউরোপের অভ্যুদয়যুগে এসিয়া ভূপতিত ইউরোপের পদানত। উভয় ভূমণ্ডল যেন একে অল্পকে পূর্ণ করিবার জন্তই চক্রাকারে আলোক অন্ধকার পৃষ্ঠে বহন করিয়া ইতিহাসকে আলোছায়ায় চিত্রবিচিত্র করিয়া আসিয়াছে। ইউরোপ যখন খৃষ্টের বৈরাগ্যমস্ত্রে ইহলোকের প্রতি উদাসীন, এসিয়া তখন জ্ঞানে গৌরবে প্রভাবে মহিমায় সমুজ্জ্বল। চীন, জাপান, ভারতবর্ষ বুদ্ধবাণী যেখানেই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, সেইখানেই মানুষ্যের মূল প্রতিভাশক্তি ইহবিমুখ ও পরজীবনের জন্ত অন্নবিস্তর উদগ্রীব হইয়া উঠিয়াছিল, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এশিয়ার ক্রমবেশী

সকল জাতিরই অন্তরায়। অধিকতর শান্তিপ্ৰিয়, ধর্মপ্রাণ, তপস্বী, ইহাও অস্বীকার্য্য সত্য। সেই এশিয়া আজ বিজ্ঞানবলদৃপ্ত প্রমত্ত ইউরোপের নিকট হতপ্রভ ম্লান।

ইহা সত্য, প্রাচ্যের যখন অমারজনী, আমরা তখন জগৎকে উপেক্ষা করিয়াছিলাম; বুদ্ধ যখন নির্বাণ প্রচার করিতেছেন, শঙ্কর যখন মায়াদের বিজয়-বৈজয়ন্তী আসমুদ্র ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, তখনও আমাদের কর্মগৌরব নিশ্চিন্ত হয় নাই, গতিবেগ রুদ্ধ হইতে বিলম্ব ছিল, কিন্তু প্রাণের ধাক্কা দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল, বুদ্ধের মানবসেবা, শঙ্করের ব্যবহারিক লোকধর্ম সেই অন্ধবেগের রেখ মাত্র—কিন্তু বেগ ক্রমেই ক্ষীণতর হইতেছিল—নির্বাণোন্মুখ দীপশিখা মাঝে মাঝে হেথায় হোথায় বাংলায় মহারাষ্ট্রে পঞ্চনদে ধর্ম ও রাষ্ট্রজাগরণসমূহে জলিয়া উঠিলেও, অন্ধকারের ঘনচ্ছায়া ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া আসিতেছিল, একটা সমষ্টিগত মহাজাতি সম্মিলিত সঙ্কল্পে জগৎকে অস্বীকার করিবার জন্ত সমস্বরে হাঁকিয়া উঠিল, সে সঙ্কল্প কে রুদ্ধ করিবে, দিন দিন তাহা সিদ্ধ হইয়াই চলিল, মাহুঘের রিরাট অস্বীকারে জগৎ তাহার কাছে ক্রমশঃ ম্লান হইয়াই পড়িল। আজ যখন একদিকে দুই মুঠা অন্নে ভুট্ট বৈরাগীর উদাস কণ্ঠ ‘কি ছার আর কেন মায়ী কাঞ্চন কায়ী তু হবে না’ খজনার বোলের তালে তালে গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে মহাপ্রস্থানের রাগিণী আলাপ করিয়া ফিরিতেছে, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার হৃদয়ে ক্ষণভঙ্গুর সংসারের নখর বন্ধনকে ছিন্ন করিবার প্রেরণাটাকেই বলবতী করিয়া তুলিতেছে, তখন অপরদিকে সেই উপেক্ষিত সংসার-রোগ, শোক, দুর্ভিক্ষ, পরাধীনতা সহস্র প্রকার মায়ার ছায়াবাজী সাজাইয়া জীবনকে অতিষ্ঠ করিবার জন্ত বদ্ধপরিকর, প্রকৃতির ভীষণ অকুটবদ্ধ প্রতিশোধে জাতির দেহ মন নষ্ট, লুপ্ত, নিশ্চিহ্নপ্রায় হইয়াই উঠিয়াছে—ধর্মের জন্ত, বৈরাগ্যের জন্ত, জগৎত্যাগমূলক মায়াবাদের জন্তই আমরা জগৎ হইতে বঞ্চিত, এ কথাও কি প্রাণে প্রাণে অস্বীকার করিবার উপায় আছে?

চীন জাপান ঋগুহৃদয়ে অন্ধ ইচ্ছাভরে বৈরাগ্য মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল—

ভারতবর্ষ-যাহা মাথায় তুলিয়া লইয়াছিল, তাহা পূর্ণভাবে সম্পূর্ণ হৃদয়ের সমস্ত ধ্যানি অকপট শক্তি ঢালিয়াই। ইউরোপের বীরজাতিসমূহ জগৎকে স্বীকার করিয়া জগতের যে দান বরস্বরূপ লাভ করিল, তাহার মন্ত্রপ্রভাবে দেখিয়া আজ প্রাচ্য চমৎকৃত, নূতন শক্তির হিল্লোলে এশিয়া চঞ্চল, জাপান ক্ষিপ্ৰ

ছাড়িয়া উঠিল, চীন নড়িতেছে, ভারতবর্ষ আলোকের প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে তপস্যামগ্ন। সন্ন্যাসের উদাস সঙ্গীত আজ তাই ভারতের কর্ণে এমন বেসুরা বাজিতেছে— তথাকথিত প্রেমের, বৈরাগ্যের, সন্ন্যাসের খোলসের উপর আজ জাগ্রত ভারত সেইজন্ত একযোগেই খড়্গাহত।

তাহা হইলে, আমাদের পতনের কারণ কি? বাহিরের পরিবেষ্টনী আমাদের প্রতিকূল, রাষ্ট্র-সন্নিবেশের ভিতরে আমাদের স্থান নাই, চারিদিকেই বাধা, আমাদের প্রতিভার জীবনের সম্প্রসারণের স্থানাভাব। অভিমতের মত আমরা অদৃষ্টচক্রে বিপর্যস্ত, বিরুদ্ধ ব্যাধে সন্নিবদ্ধ, সে ব্যাধিছোঁদের মত জানি না। ইহা বাহ্যদৃষ্টির কথা, সহজবুদ্ধির কথা, স্থূলচক্রে বাহ্য প্রত্যক্ষ করিতেছি, ইহা সেই সুপরিচিত অভিজ্ঞতারই সূচি। ইহা জড়দৃষ্টি মাত্র, ইহা অধ্যাত্মবাদের কথাও নহে, দার্শনিকের কথাও নয়। জড়দৃষ্টি, জড়বুদ্ধি ছাড়া মানুষের হৃদয়ের দর্শনযন্ত্রও বর্জমান। এই জটিল অবস্থাতক্রে আমরা পড়িলাম কেন,—বিস্তানও দিন দিন যতই উচ্চ ও গভীরতরে প্রবেশ করিতেছে ততই বাহির ছাড়িয়া বস্তুর অন্তরেই ঘটনার, কার্যের, পরিবর্তনের কারণ নির্দেশে যত্নপর হইয়া উঠিতেছে, কেন এই হুগ্রহ আমাদের ঘটিল, জগৎ কেন আমাদের ভাগ্যোন্নতির এত প্রতিকূল, বিরুদ্ধ বহিঃপ্রভাব এই যে আমাদের উপর এতখানি মায়াবিস্তার করিয়া জাতিকে আষ্টেপিটে বাধিয়া পঙ্কু করিয়া ফেলিল, ইহার ভিতরে কি আমাদের এতটুকু হস্তপাত নাই, আমাদের অদৃষ্টলিপি কি সম্পূর্ণভাবেই আমাদের আত্ম-বিরুদ্ধ। অন্তরাত্মার নিভৃত সম্মতিপত্র না পাইলে প্রকৃতি এরূপ অবস্থা সৃষ্টি করিতে পারিতেন কি? হিন্দু দর্শন ইহা অস্বীকার করে, হিন্দুর হৃদয়দৃষ্টি দেখাইয়া দেয়, প্রকৃতি পুরুষের অমুজ্জাভিন্ন একপদও অগ্রসর হন না, ভারতপুরুষের অনুমতি অনুবায়ীই ভারতের ঐতিহাসিক বিবর্তন ঘটয়াছে—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—এক একটা বিরাট জাতির কম শক্তিপূর্ণ আদেশমন্ত্র?

রজনী আজ প্রভাত হইয়াছে, জাপানী রূপাণ এসিয়ার ললাটে নব উষার রক্তসিক্ত পরাইয়া দিয়াছে, ভারতের অন্তলোকে আজ যে জাগরণের তপস্যা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, তাহা মধ্যাহ্ন মার্গভোর গুরিমা প্রাচ্যকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবার জন্ত। আজ নবীন বাংলার নতুন জাতি, প্রথমে তোমরাই নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখ, স্থূল প্রত্যক্ষের পশ্চাতে হৃদয় দর্শনেরও নিগূঢ়ে, গভীরে তুরীয়ে অবগাহন করিয়া স্পষ্ট সমুজ্জ্বল অনুভব কর—

এই যে পতনের উল্লাসে প্রকৃতি তরতর বেগে নিয়ে অধিরোহণ করিয়াছিলেন, মহাশক্তির সেই উল্লাসতরঙ্গই আজ আবার উর্দ্ধমুখে ধাবমান, উঠা নামা মলীলানুতোই বিশ্বমঞ্চ দোলাচল, তুরীয়ার স্বর্ণকপাট রুদ্ধ করিয়া পুরাৎ-পুরুষ যখন নিবিড় স্রুশ্চিধোরে ডুবিয়াছিলেন, তখনই ভারতের দীপ্ত জ্ঞান-স্বর্গ্য অন্তচূড়ায় অধিরূঢ়, তখনই দেশের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা-অন্তঃসন্নিবিষ্ট অন্ত-জগতের রহস্যো নিমগ্ন, তখন বাহিরের উপর, জগতের উপর, জীবনের উপর স্বভাবতঃই নিরুৎসাহ এলাইয়া আসিয়াছিল; বহিঃশক্তির তাড়নার মূলে যেমন অন্তরের বৈরাগ্যজাত উদাসীন সম্মতি (passive will) —তেমনি এই উদাসীনতার মূলেও, ভগবানের নিজার উল্লাস, বিশ্রাসের ধ্বংসে স্তব্ধ আনন্দই ছিল।

মানুষের, জাতির মনের উপর যে আদেশ আসিয়া পড়ে, জীবনে তাহারই ছায়া পড়িয়া থাকে, তাহাই বহিজীবনের ঘটনা। বাহ্যদৃষ্টি দিয়া এই ছায়াটুকুই প্রত্যক্ষ করি। মনও যন্ত্র মাত্র। মনে যেসব ইচ্ছা, ভাব, মন্ত্র, সঙ্কল্প ক্রীড়া করে, তাহাও এক গভীরতর অনন্ত সমুদ্রের বীচিবিক্ষোভ —স্বন্দৃষ্টি ফেলিয়া এই উর্দ্ধমালা বুদ্ধি, ভাবনা কল্পনার আলোকে তাহারই নানা সম্ভাবনীয়তাপূর্ণ প্রতিক্রিয়া বুদ্ধিপটে তুলিয়া লই, সেই অতল অনন্ত কারণ-সাগর, অপ্রকৃতম্ সলিলম্, ভগবানের অনির্কচনীয় ইচ্ছা ও উল্লাস, বাহ্য জগতের সর্ব ঘটনা, সর্বকাৰ্য্য, সর্বপরিবর্তনের উৎসকেন্দ্র, মূল কারণ, তাহা উপলব্ধি করিতে হইলে তপঃশুদ্ধ অধ্যাত্মসাধনারই প্রয়োজন।

সমালোচনা

সত্যধর্ম—শ্রীগুরুনাথ সেন গুপ্ত কবিরত্ন কর্তৃক প্রকাশিত। প্রথম ভক্তি একাগ্রতা গুরুত্ব প্রভৃতি আলোচনাপূর্ণ কতিপয় ধর্মপ্রবন্ধ। প্রকাশক একটা ‘নব উদ্ধারের পথ’ পাপপূর্ণ জগতের পরিব্রাণের জন্ত প্রকাশ করিবার দারুণ স্পর্ধা করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার ‘আত্মাকর্ষণ রূপ উৎকৃষ্ট উপায়দ্বারা পারলৌকিক মহাত্মাদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত’—সত্যধর্ম। আর তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস, এই ধর্ম প্রচলিত খৃষ্টান, মহম্মদীয়, বৌদ্ধ ও বেদান্ত ধর্ম, এমন কি অধুনাতন নিরাকারবাদী ব্রাহ্ম, থিরজাফিষ্ট, আমেরিকাদিতে প্রচলিত সাধারণ আত্মাকর্ষণ বা স্পিরিচুয়ালিষ্ট ধর্ম, (আশ্চর্য্য এই শেষোক্তগুলিও লেখকের ভাব্য ধর্ম শব্দবাচ্য) এই সমুদয় হইতেই বিভিন্ন, সত্য ও উৎকৃষ্টতম। আর পাছে, এই অতিস্পর্ধা অন্ধ-গোড়ামীর মতই প্রতিভাত হয়, তাই একস্থলে ব্রাহ্মধর্ম সমালোচনা প্রসঙ্গে এইরূপ একটা কথাও বলিয়া

রাখিয়াছেন—“স্বাবলম্বিত ধর্মই একমাত্র অত্যাংকুষ্ঠ পথ বলিয়া জ্ঞান না থাকিলে সেই ধর্মের অবলম্বনে সাধন করিবে কিরূপে ? ... ধর্মরাজ্যে অচল অটল বিশ্বাস আবশ্যক”—কথাগুলি সত্য, ও ভেজঃপূর্ণ—কিন্তু ঠাকুরের সেই উদার বাণীটুকুও এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন—যত মত, তত পথ, ইষ্টনিষ্ঠার দোহাই দিয়া যেন সঙ্কীর্ণ ‘মতুয়ার বুদ্ধিকেই’ পরিপোষণ না করি। লেখক গুরুস্বীকার প্রসঙ্গে, ব্রাহ্মধর্মকে একটি গুরুতর আক্রমণ করিয়াছেন—“গুরু অস্বীকার করায় ও গুরুর অভাবে উপযুক্ত উপদেশ না পাওয়ায়, ব্রাহ্মধর্ম প্রচলন অবধি অদ্য পর্য্যন্ত কোনও ব্রাহ্ম পরমপিতার দর্শনলাভে সমর্থ হন নাই—” কথাটা যদি সত্য হয়, তবে তাহা বড়ই মারাত্মক অভিযোগ। লেখকের দ্রুতসাহসিক লেখনী এইরূপ সূক্ষ্ম বিষয়ে আরও একটু সংযত উদারতার পরিচয় দিলে সুখী হইতাম। সাধকের ব্যাকুল সত্যপিপাসা যেখানে, সমস্ত ধর্মজগৎ সেইখানে—তা সে হিন্দু, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম যে পহার পহীই যিনি হউন না কেন—নির্মল ধর্মপিপাসার অধিকারী যদি কেই হইয়া থাকেন, তবে তিনি সেই পথেই সত্যলাভ করিয়াছেন। এ স্থলে শুদ্ধ ভগবদ-তত্ত্বাই একমাত্র সত্য মানদণ্ড, নতুবা কোন পথে কোন বিধিবদ্ধ দীক্ষাপ্রণালী, গুরুবাদ প্রভৃতি আছে কিনা, তাহা হইতেই সেই পথের সত্য মিথ্যা যাচাই করিতে হইবে, ইহা একান্তই স্থূলদৃষ্টির কথা। অবশ্য মনে রাখিতে হইবে, আমরা কোনও ধর্মবিশেষের পক্ষ হইতেই এই সকল কথার উল্লেখ করিতেছি না, ধর্মপ্রচারকের মুখে আমরা একটু উদার সত্যসঙ্গীত শুনিবার আকাঙ্ক্ষা করি বলিয়াই এতকথা বলিতে বাধ্য হইলাম। “সত্যধর্ম” প্রচারক গুণবাদী, তাঁহার দর্শনে জগৎ গুণময়, ব্রহ্ম গুণময়, সাধনা গুণের অনুশীলন। গ্রন্থখানির ছত্রে ছত্রে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব, গূঢ় দৃষ্টি ও উৎকৃষ্ট ধর্ম-অভিজ্ঞতারও স্থানে স্থানে পরিচয় পাইয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। ভাষা অতি সুখপাঠ্য, বিষয়গুলিও সুনির্বাচিত এবং সুন্দর ও গভীর অন্ততত্ত্বের আলোচনার পূর্ব। হুই একস্থলে অতি স্পষ্টাঙ্গ অতুগ্র প্রকাশ এবং পারলৌকিক মহাআর উপর অতিনির্ভরতা, এইগুলির ছায়াপাতেই গ্রন্থখানি একটু বিশ্বাদ হইয়া পড়িয়াছে। তবে বাংলার অতি স্থূল লোকধর্মের পার্শ্বে লেখকের সূক্ষ্ম গুণধর্মতত্ত্ব একটু স্থখপ্রলেপের মত সাঙ্ঘনা দান করে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। সূক্ষ্মজগৎও চরমজগৎ নয়, পারলৌকিক মহাজনের উপরে অতিভক্তি, গুটিকাসিন্ধি প্রভৃতি জটিল ঐশ্বর্যের পশ্চাদ্ধাবন, এই সকলেরও পরম সার্থকতা কি ? এসব আবর্জনা হইতে মুক্ত হইয়া বাঙ্গালী শুদ্ধ অধ্যাত্মদৃষ্টি, অধ্যাত্মশক্তির অধিকারী হইয়া উঠুক, ইহাই আমাদের অন্তরের ইচ্ছা। ধর্ম জটিল নয়, দুর্গম নয়, সরল, নির্মল, উদার, বিধাতার আলোক বাতাসের মত স্থূলভ, স্বাস প্রবাসের মত সহজ স্বাভাবিক—এই মুক্ত ভাবের ভাবুক হইয়া তরুণজাতি কবে বাংলার বায়ুমণ্ডল ভাগবতপূর্ণ করিয়া তুলিবে ?

প্রাপ্তি স্বীকার—

তোমরা আর আমরা—শ্রীশ্রীতীক্ষ্ণনাথ ঠাকুর প্রণীত—একটা রাজনৈতিক চিত্রাচম্ব্য ছয় আনা মাত্র।

শাসন সংস্কার

রাজনীতিক কোন উদ্দেশ্য সাধন মানসে আমরা এই সকলের আলোচনা করি না, শিক্ষিত বাঙ্গালীর মস্তিষ্কে আধুনিক চিন্তারাজির বিশদ বিশ্লেষণ করিয়া, জাতিকে নূতন পথ প্রদর্শন করাই আমাদের লক্ষ্য, ঘটনার উল্লেখ না করিয়া তদ্বিশ্রান্তগত মূল সত্তোর নির্দেশ সম্ভবপর নহে, সুতরাং মাঝে মাঝে রাজনীতির কথা কহিতে হয়, পরন্তু এই সকল আন্দোলনের পথেই দেশ যে উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিতে পারিবে, এমন বিশ্বাস আমাদের নাই।

অধুনা সারা ভারতবর্ষে অপর অনেক বিষয়ের আন্দোলন চলিলেও, রিফর্ম লইয়া বিশেষ আলোচনা আন্দোলন চলিতেছে। ঘটেগু-চেমসফোর্ড সাহেবের নূতন শাসননীতির কি ভাবে প্রবর্তন হইবে তাহার স্পষ্ট বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, পার্লামেন্টে কমন্স সভায় রিফর্ম বিলের তৃতীয় সংস্করণ এবং লর্ড সভায় দ্বিতীয় সংস্করণ গৃহীত হইয়াছে, সম্প্রতি এ সংবাদও ভারতে আসিয়া পৌছিয়াছে, দেশের ধীরপন্থীগণ এই শাসনপদ্ধতির পক্ষ অবলম্বন করিয়া বণেন; যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাই এক্ষণে যথেষ্ট, ইহার পর আরও অধিক পাওয়া যাইবে, আইস সকলে মিলিয়া সমুদ্রচিন্তে ইহার সম্ভাবহার করি; যাহাদিগকে চরমপন্থী বলা যায় তাঁহাদের মধ্যে দুই একজন ধীরপন্থীগণের পক্ষাভ্রম করিয়াছেন, মহামতি ভিগক বলেন—যদিও নূতন শাসনপদ্ধতি আশাহরূপ হয় নাই, কিন্তু উহা গ্রহণ করা না করার কথা এখানে উঠিতেই পারে না, ভারতের গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের মুখ চাহিয়া যাহারা দাতা, তাহার দানের খাতা খুলেন নাই, অতএব যাহা পাইয়াছি তাহার সবটুকু সুবিধা গ্রহণ করিয়াই আরও অধিক পাইবার জন্য অবিশ্রান্ত আন্দোলন চালাইতে হইবে; অবশিষ্ট অধিকাংশের মতে উহা একেবারেই দিবাসপ্রের ধর্ত মূল্যহীন মিথামাত্র; এই নবযুগে ভারতের ভাগ্যে এই মার্কাল ফল কোনও বুদ্ধিমান লোকের মনোহরণ করিতে পারিবে না।

এই রিফর্ম সম্বন্ধে আমাদের কোন বিশেষ সম্ভ্রামত নাই, তবে সাধা-

রূপের চক্ষে ইহা আশাশ্রিত হয় নাই, এই নূতন শাসনতন্ত্রে ইংরাজপ্রজার বিশেষ কিছু অধিকার বৃদ্ধি হইয়াছে, এরূপ মনে হয় না, কয়েকটা উচ্চ পদ সৃষ্ট হইয়াছে মাত্র, শাসন বিভাগের কোন সারগর্ভ অংশেই দেশীয়-পক্ষকে স্বাধীনতা দেওয়া হয় নাই, নির্বাচিত সভাগণকে যদি গবর্নমেন্টেরই বৃত্তিগুষ্ঠ মন্ত্রীদ্বয়ের অধীনে থাকিয়া কার্য্য করিতে হয়, তবে সেখানে গলা-বাজী ব্যতীত আর অধিক কি আশা করা যাইতে পারে? আমাদের ফরাসী ভারতে যে জেনারল্ কাউন্সিল আছে, উহাতে গবর্নমেন্টের কোন কর্ম-চারীই হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না, বৎসরান্তে যে সভাধিবেশন হয়, উহাতে নির্বাচিত সভাগণই, আপনাদের সভাপতি নিয়োগ করিয়া, দেশের বজেট নিরূপণ করেন, এই জেনারল্ সভা হইতে যে বজেট নির্দ্ধারিত হয়, তাহাই ফরাসীভারতে চলিয়া থাকে। ফরাসীভারতের জনবৃন্দ অপেক্ষা ইংরাজাধীন ভারতবর্ষের প্রজাবর্গ অধিকতর শিক্ষিত, সেক্ষেত্রে ভারতসভায়, অন্ততঃ প্রাদেশিক সভাগুলিতে নির্বাচিত সভ্যবৃন্দ যদি সভাপতি নির্বাচন করিয়া রাজকীয় যে কোনও বিভাগ পরিচালন করিবার অধিকার পাইতেন, তাহা হইলে, ইহাকে স্বায়ত্তশাসন লাভের প্রথম অঙ্ক বলিয়া স্বীকার করিবার উপায় থাকিত, নূতন শাসনপ্রণালী একটু ব্যাপক ও বিচিত্র হইয়াছে বটে, কিন্তু সেখায় প্রজাবৃন্দের বিশেষ কিছু স্বতন্ত্র অধিকার একে-বারেই নাই, তবে পূর্বাশ্রয় ইহা যে কিছু সুবিধার হইয়াছে ইহা অব-শ্যরিত, যখন কিছুই নাই, তখন কানা মামাও ভাল; অতএব ভারতবাসী ইহা পাইয়া, আবার পাইবার প্রচেষ্টা করা মন্দ পরামর্শ নহে।

যাউক এই সকল কথা, আমরা যে নূতন জাতির কথা উল্লেখ করিয়া আসিতেছি, তাঁহাদের সহিত বাহিরের এই দান প্রতিদানের কোনই সম্পর্ক নাই, রাজবিধি মানিয়া, আমাদেরকে নিজের ঘর সামলাইয়া চলিতে হইবে, পরলোকগত উপাধ্যায় মহাশয়ের ভাষায় আমাদের আপন “কোর্টের” অন্তর্গত থাকিয়াই হুটু অটল জ্ঞানপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে; ঘরের মধ্যে আপনাকে এমন ভাবে সুপ্রতিষ্ঠা করিয়া তুলিতে হইবে, যেন আমরা পরমুখাপেক্ষী না হই, আমাদের সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা, আচার বিচার সকলের মধ্যেই ভারতীয় ভাবকে পুনর্জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে, পরস্পরের মধ্যে আকাটা ঐক্য, যথার্থ মিলন-স্টাইল একজাতি একপ্রাণ হইয়া, আমাদের সংসারকে মূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে, এই কর্মের জন্যই বাহিরের তরঙ্গগুলি আমাদের

যতটুকু অভিজ্ঞতা দিয়া যাইতেছে, তাহা আহরণ করিয়া আমাদের নূতন
স্বষ্টিকে শনৈঃ শনৈঃ বৃহৎ করিয়া তুলিতে হইবে। এই রিফর্ম লইয়া
সে দিন সহযোগী Bengalee এক অদ্ভুত কথা উল্লেখ করিয়াছেন— তাহা
এই “Liberty cannot be granted by acts of Parliament. Liberty is the crowning fruit of national worth and
endeavour. It does not come from above, it grows from within. Let us therefore not talk of liberty,
but come down to the lower plane etc.”

অর্থাৎ প্যার্লিমেণ্টের আইন কানুন দ্বারা কেহই মুক্তি দান করিতে পারে
না, মুক্তি জাতির চরিত্র ও সাধনারই সর্বোৎকৃষ্ট ফল; মুক্তি বাহির হইতে
আসে না, অন্তরেই উহার জন্ম; অতএব মুক্তির কথা আমাদের মুখে
আনা উচিত নহে, আইস আরও নীচের স্তরে নামিয়া... ইত্যাদি।

কথা হইতেছে, ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক বলিতেছেন, মুক্তি
যখন অন্তরের সামগ্রী—এবং উহা পাইতে হইলে অনেক কিছু করিতে হয়,
তখন আইস আমরা আরও নীচে দাঁড়াইয়া কথা কহি, সে কথা—রাজ-
শক্তির নিকট হইতে আবেদন ও বৈধ আন্দোলন করিয়া বাহা পোড়িয়া
যায়, তাহাই আমাদের যথেষ্ট।

কথাটা সমীচিন বটে! কাজের মূল্য দিয়া মুক্তি করায়ত্ত করিবার সামর্থ্য
দেশের নাই, আপনার চরিত্রের উপর নেতৃবৃন্দ আস্থাশূন্য, অন্তঃসাধনার নামে
হিন্দুস্তান আজ আতঙ্কে নমন মুদ্রিত করেন, বর্তমান শিক্ষা যে আমা-
দিগকে কতদূর অসার ও অপদার্থ করিয়া তুলিয়াছে, কথাটা তাহারই
একটা অসত্যক পরিচয়। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় যে সকল উজ্জ্বল আদর্শে
উন্মাদ, তাহা নিহক অন্তরের প্রেরণাপ্রসূত নহে, বৈদেশিক দৃষ্টান্তে
মুক্তির যে আদর্শচিত্র আমরা ধারণাগত করিয়া লইয়াছি, তাহা ভারতের
প্রকৃতির অমুকুল নয়, প্রকৃতিবিরুদ্ধ আদর্শের জন্ম ভিতর হইতে সম্পূর্ণ
সাড়া পাওয়া অসম্ভব, নেতৃবৃন্দের আশা যে এত কুণ্ঠাপূর্ণ, চিন্তার পরিধি
এমন সঙ্কীর্ণ গোপীবদ্ধ, তাহার কারণ অন্তরের স্বভাববিরুদ্ধ কঠোর গুরুভার
মনোমুগ্ধতা, তপস্যার অভাবে ভিতরের ত্রুটি দিন দিন ক্ষুদ্র হইয়া পড়িতে
ছেন।

উজ্জ্বল তপস্যার—গান্ধী, মালব্য, চিত্তরঞ্জন, কিন্না প্রভৃতি নূতন তত্ত্বের

নেতৃত্ব ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে এক নবীন রাগিণী তুলিয়াছেন, যে মৃতের
পরা অমৃতময় করিয়া ইহারা চলিয়াছেন, তাহা দেশের প্রাণে একটা আশার
হিলোল প্রবাহিত করিয়াছে, বেদনা-বিধুর জাতির বুকে ইহাদের সেবা,
নিষ্ঠা, স্বার্থভ্যাগ স্বর্গের অমৃতধারা বরিষণ করুক, ইহাদের কন্ঠে দেশের
গভীর মর্গবেদনার উপশম না ঘটিলেও, তাহাদের করুণ নিবেদন বিধাতার
সিংহাসনতল স্পর্শ করিবে, ইহাই আশা করিতে পারি।

আত্মশাসন: অন্তঃসাধনারই অমৃতফল। সে অন্তঃসাধনা বাহিরের সহিত
আঘাতে ও সংগ্রামে নয়, প্রতিকূল অবস্থাচক্রকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া কত প্রতি-
হত করিবে, ভিতর পরিপক্ব না হওয়া পর্য্যন্ত বীরচিত্তে প্রতীক্ষা করিতে
হইবে, অন্তর মুকুলিত হইলে বাহিরের জগৎ ভাবনা নাই, বনকুঞ্জে বসন্তের
বহা আসিলে গুহকর্তৃক হইতে যেমন আপনা আপনি জীর্ণ পত্র বরিয়া নব
পত্রপুঞ্জে তরু পরিশোভিত হইয়া উঠে, অকালে একটা একটা করিয়া গুহ
পত্র ছেদন করিয়া বৃক্ষকে নিষ্কত্র করিয়া কোনই ফলোদয় নাই, তেমনি
ভিতর হইতে মুক্তিমন্ত্র যখন বহুত হইবে, তখন বাহিরের সমস্ত বিষয়,
সমস্ত বন্ধন নিমেষে অন্তর্হিত হইবে, বন্ধন ভো বাহিরে নয়, বন্ধন ভিতরে,
বাহিরে যাহা দর্শন করি তাহা সেই অন্তর্বন্ধনেরই প্রতিচ্ছবি।

এই অন্তরের ব্যাধিই প্রথমে নিশ্চল করিতে হইবে, স্বায়ত্ত শাসনের
গভীর মূল এইখানেই নিভিতে খুঁজিয়া বাহির কর, দেখ কেন মানুষ
হুর্দ্বল, দুঃখী, হীনচরিত্র, কেন সে পরাধীন পরমুখাপেক্ষী, কেন জাতি অধম
আত্মপ্রতিষ্ঠাশূন্য। দেশকে এই ভিতরের পাপ ও কলুষ হইতে মুক্ত হইবার
পথ দেখাও, তাহার স্থান আধারপূর্ণ হৃদয়ে জানের আলো জালিয়া দাও, নিরাশকে
আশার মন্ত্র শুনাও, হীনকে শক্তিসাধনার রহস্য শিখাইয়া দাও। অন্তঃ-
সাধনা শিকায় তুলিয়া রাখিবার জিনিষ নয়, ভারতকে আজই এই মুহূর্ত্তেই অন্তঃ-
সাধনার দীক্ষিত হইতে হইবে, উপরের সমুজ্জল আলো তরঙ্গে তরঙ্গে নামাইয়া
আনিতে হইবে, ভিতর হইতেই আপনাকে পূর্ণ মহিমায় ছড়াইয়া বাহিরে
প্রকাশ করিয়া তুলিতে হইবে।

আঘাতের প্রত্যাহাত জাতির সনাতন পথ নয়, সত্যের জগৎ, কল্যাণের
জগৎ, মহানের জগৎ আপনাকে ক্রমবিস্তৃত করিয়া চলাই ভারতের স্বভাব-
ধর্ম, ভিতরে যেমন যেমন ব্রহ্মের বিকাশ ঘটবে, আত্মপ্রকাশের অন্তরায়-
শুলিও তেমনি তেমনি অপসৃত হইবে, ভারতবর্ষের অন্তরে এই ইচ্ছাই

স্বপ্ত রহিয়াছে, এই ইচ্ছাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলাই মুক্তির একমাত্র পথ, এই পথে চলিবার উপযোগী শক্তি ভারতের নিজের প্রকৃতির ভিতরেই পূর্ণমাত্রায় অবস্থিত। ভারতের আত্মশাসন সেই ব্রহ্মগুণশক্তির জাগরণের উপরেই নির্ভর করিতেছে।

বাংলার নতুন দল আজ এই মুক্তির বাণীই শ্রবণ করিয়াছে, ব্রহ্মগুণ-শক্তির উদ্বীপনার জন্ত স্থির শুদ্ধচিত্তে অপূর্ব তপস্যা আরম্ভ করিয়াছে, অন্তরে সেই স্বরাজ সে প্রতিষ্ঠা করিয়া তুলিবে, আপনার মহিমায় যাহার জন্ম, আপনার মহিমায় যাহার স্থিতি, আপনার মহিমা-সমুদ্রেই যাহা ভাসমান; চল, নবীন, চল, এই স্বরাজ্যের অমৃতরসে যতদিন না সমস্ত জীবনখানি কূলে কূলে ভরাইয়া তুলিতে পার, ততদিন তোমার শাস্তি নাই, স্বস্তি নাই—অবিচ্ছেদ সাধনা, নিরবচ্ছিন্ন তপস্যা, অবকাশহীন অবিশ্রান্ত তপঃ-প্রয়োগ করিয়া চল, বাহিরের রীচিবিক্ষোভে আজ উদ্ভাস্ত হইও না, আকাশে ঘনঘটা দেখিয়া বিভ্রান্ত হইও না, মরুমরীচিকার মনোলোভা রূপে মুগ্ধ হইয়া দেবতার আসন লোভে কলুবিত করিয়া তুলিও না, আবার, রুদ্র প্রভঞ্জন উত্তাল তালে নৃত্য করুক, অন্ধকারে দশদিক সমাচ্ছন্ন হউক, কিন্তু তপঃরত তরুণজাতি তুমি এক মুহূর্তের জন্ত তপোভঙ্গ করিও না, এইসব প্রাণোত্তর আগ্রসিবে যাইবে, আলোয়ার আলো জ্বলিবে নিভিবে, দূরাগত স্বপ্ন-পূরী হইতে কত কুহকিনী সঙ্গীতলহরী কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া চিত্ত দোলাচল করিয়া তুলিবে, তুমি অসীম ধৃতিশক্তি লইয়া হৃদয়-মন্দিরে নীরবে-প্রতীক্ষা কর, দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গের পঞ্চপ্রদীপ জালিয়া, অবিচলচিত্তে তাঁহারই জন্ত পূজার নৈবেদ্য সংগ্রহ কর, ঐ নবউষার প্রথম সিন্দূরবাগ সর্বাগ্রে তোমারই উন্নত ললাট চুষন করিবে, আত্মমুকুলপরিণোভিত নতন সৃষ্টির তোরণস্থার তোমারই প্রথম প্রবেশে-পুণ্যপ্রভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

বৃহত্তের পূজা

বৃহৎকে জীবনের মধ্যে বিকশিত করে' তোলবার জন্যই সাধনা। বৃহত্তের প্রকাশ মানুষের সর্কার মনে পদে পদে প্রতিহত হয়ে যাচ্ছে, থণ্ডকে প্রকাশ করে' তুলেই আমরা পরিতৃপ্ত হই, যতটুকু ব্যক্ত হয়ে উঠলো, তার পিছনে যে অসীম অব্যক্ত ধর্মতমে আকাশের অতল রহস্যপূর্ণ নীলিমার মত তলে তলে ছেয়ে রইলো, তার সন্ধান রাখতে একেবারেই চাই না। একেই বলে মায়া, অসীম অনন্ত ব্রহ্ম ক্ষুদ্র প্রকাশের মধ্যে আপনাকে থণ্ড পরিচ্ছিন্ন করে' দেখে তাতেই নিমগ্ন রয়েছেন। বৃহৎ অপরি- সীম সত্তা একটুকু স্থানের কালের অবস্থাচক্রের মধ্যে পড়ে' আপনাকে সীমাবদ্ধ করে' ফেলেছেন—যার পরিণাম নাই, স্বেচ্ছাধর্মিশ্রিত নানা কার্যকারণের বিচিত্র রংমসলার মুহূর্তে মুহূর্তে তিনি আপনাকে পরিবর্তন- নীল মনে করছেন। এই মায়া, আবার এইটাই যখন জ্ঞানোন্মাদিত চৈতন্ত- পূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন একেই বলি লীলা—লীলাময় রসের ঠাকুর অসংখ্য রসের ফাদ পেতে আপনাকে অসংখ্যরূপে ধরা দিয়েছেন, আর আপনার সঙ্গে অনন্ত রকমের সম্বন্ধ স্বজন করে' অপরূপ খেলার প্রমত্ত হয়েছেন। সাধনা, কেবল এই মায়াপ্রবাহটিকে জ্ঞানের দীপ্ত জ্যোতিঃপ্রভায় সমুজ্জ্বল করে' লীলার পুলকলহরী জীবনময় ঢলিয়ে দেবার জন্য।

কথা হচ্ছে তৃপ্তি চাই, আনন্দ চাই, নতুবা তপস্যা কঠোর কষ্ট সাধনা মাত্র হয়ে দাঁড়াবে, বৃহৎকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে আনন্দ মিলবে কেমন করে? জীবনে সুখ দুঃখের তরঙ্গহিলোল হবেই, সংসারে আপন বিপদ বজ্রাঘাত মনকে ক্ষণে ক্ষণে ক্ষুব্ধ করে তুলবেই, কিন্তু আপনাকে সবার ভিতরে যদি স্থির অবিচল পরিপূর্ণ আনন্দে ভরপুর করে' রাখতে না পারি, তবে সে ব্যর্থ সাধনায় কি ফল? এই অটুট আত্ম- প্রতিষ্ঠার একমাত্র মন্ত্র আপনাকে বৃহত্তের চরণে নমিত করা, ক্ষুদ্র আনন্দটিকে পূর্ণরূপে জলাঞ্জলি দেওয়া ছাড়া জীবনে সত্যকে বৃহৎকে উদ্ধৃত্ত করবার দ্বিতীয় উপায় নেই। অহংকারই বৃহত্তের পূজার একমাত্র

অন্তরায়, স্বতন্ত্র ভাবে জগতের মাঝে আপনাকে ফলে ফলে বিকশিত করবার প্রচেষ্টাই বিশ্বজনীন অসীম আনন্দপ্রবাহ থেকে আমাদের পদে পদে বিচ্ছিন্ন করে' ফেলেছে। ব্যক্তিত্বই আমাদের প্রাকৃত জীবনের মেরুদণ্ড, ইউরোপ এই ব্যক্তিত্বকে চূর্ণ করবার কথা শুনলেই আতঙ্কে শিউরে ওঠে, তা'হলে আর অবশিষ্ট কি থাকবে, মানুষের এই মূল মেরুদণ্ডটি যদি ভেঙ্গে গেল তা'হলে আর তার বাঁচবার সার্থকতা কি? হিন্দুর তপস্যা, দর্শন, অন্তর্বিজ্ঞান, সব এই আপাতদৃষ্ট ব্যক্তিত্বটির উচ্ছেদ করে' তুরীয়কে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যই সর্বস্ব নিয়োগ করতে বলেছে।

এইখানেই মস্ত প্রভেদ। হিন্দু আপনাকে এই চরম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার দুঃসাহস করেছে—এই 'আমি আমি' বলে' যে ব্যক্তিকে আমরা কর্মে চিন্তায় নির্দেশ করে' থাকি, সেই ব্যক্তির মধ্যে সত্য সত্য অস্তিত্ব হচ্চেন কে? মানুষ কার জন্ত চিন্তা করে, কাজ করে, কার জন্ত তার কঠোর জীবনসংগ্রাম, এই ভোগ ও কর্মের অঞ্জলিভরা অর্ঘ্য দিনে দিনে সে কার চরণে অর্পণ করবার জন্ত নিরন্তর পরিশ্রম করছে? মানুষ যেই হোক, সে একজন, তাহাকে আপনার স্বার্থ কড়ায় গণ্ডায় বন্ধে চলতে হবে, নতুবা বিরুদ্ধ জগৎ তার বিপুল শক্তিবাহু নিয়ে এখনই তার উপরে হুড়মুড় করে' চেপে বসবে, চক্ষের পলকে তাকে ছন্নছাড়া করে' ফেলবে, ইউরোপের এইটাই জীবনের গোড়ার কথা। ব্যক্তি আসলে যেই হোক, সে কথা নিয়ে মাথা বাঁমাবার বিশেষ প্রয়োজন নেই, জীবনে দরকার তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, তার ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে তার জ্ঞান রস কর্মবৃত্তিগুলিও প্রস্ফুটিত করে' তুলতে হবে, সেই প্রশ্ন মনের সামঞ্জস্যময় স্ফুর্তি ও পরিণতিই মানুষের লক্ষ্য। এই কাজ একলা সসিদ্ধ হয় না, তাই দল বাঁধবার প্রয়োজন, মানুষের সমাজবৃত্তি তাকে দল, সম্প্রদায়, মণ্ডলী, রাষ্ট্র, নেশন প্রভৃতি গড়ে' তুলতে প্রবৃত্ত করেছে, কিন্তু এ সকলের আসল উদ্দেশ্য সমষ্টিবদ্ধ ভাবে মানুষের সেই মনুষ্যত্বটিকেই পরিপূর্ণ করে' তোলা—একা যখন তাহা অসম্ভব, তখন বহুজনের, অধিকাংশের অর্থ স্বাচ্ছন্দ্য বিকাশ স্ফুর্তির সম্মিলিতভাবে যতখানি আয়োজন করতে পারা যায়, ততই মঙ্গল—বড় বড় জাতীয়, এমন কি আন্তর্জাতীয় সমষ্টি-জীবন প্রকৃতপক্ষে সেই মৌলিক ব্যক্তিগত স্বার্থেরই বিচিত্র সম্প্রসারণ মাত্র।

ভারতবর্ষ অল্প চক্ষে এই একই জিনিষ দেখতে চেয়েছে। বাটতে হবে, খেলতে হবে, জ্ঞানের কন্ঠের প্রেমের বিকাশ করতে হবে, কিন্তু মূলকে অন্তরালে রেখে কিছুই করতে প্রস্তুত নই, যে আমি এই সব করবো, যে আমাকে নিয়ে আশ্রয় ঘর করতে হবে, আচ্ছা, আগে তার সঙ্গে একটা আলাপ পরিচয়ের বন্দোবস্ত করা যাক, সর্বপ্রথমে সর্ব প্রাধান্যঃ এইটাই আসল প্রয়োজন—ভারতবর্ষ এই কথাটাই খুব জোর করে বলতে ও ধরতে চেয়েছে, শুধু কথায় নয়, যুগের পর যুগ, অসংখ্য বংশ-পরম্পরা ধরে' এই জিনিষটাকেই অনুভব করার জন্য প্রাণপাত সাধনা করে' এসেছে, তার সেই জন্মজন্মব্যাপী অবিচ্ছেদ্য তপস্যা যে সমস্তই ব্যর্থ হয়েছে, এ একেবারেই অসম্ভব। ভারতের গোড়ার কথা হচ্ছে, আগে তুরীয়, তুরীয়ার মধ্যে অবগাহন করে' আপনাকে নিঃশেষ করে' দিয়ে, তবেই মানুষ তার ব্যক্তিত্বকে পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে, নচেৎ ক্ষুদ্র খণ্ড গণ্ডীবদ্ধ এই সঙ্কীর্ণ শরীর প্রাণ মনের মধ্যে কতটুকু ভোগ, কতটুকু নার্কত্যা সম্ভব? জগতের মধ্যে এই একটা অদ্ভুত জাতি, এক অপূর্ণ ভাবের চরণমূলে আপনার সর্বস্ব উৎসর্গ করে' দিতে এক তিল পশ্চাৎ-পদ হয় নাই, অবাঙমনসোগোচরম্ অনির্দেশ্য রহস্যের মধ্যে সম্ভরণ করতে একটুকু ইতস্ততঃ করে নাই, এই একটি দেশ, যে অনন্তের কল্পনা করেছে, অসীমের স্বপ্ন দেখেছে, রূপের হাটে এসেও অপরূপের হৃদয়নীর আকর্ষণ কিছুতেই জলাঞ্জলি দিতে আজও পেরে উঠলো না।

খণ্ড বৃহৎ নয়, ব্যক্তি আপনার মধ্যে পূর্ণ হয়েও পূর্ণ নয়, এই মর্মে থেকে ভারতের ধর্মসাধনার আরম্ভ। বাইরে চেয়ে সে দেখলে একটা অসীম জগৎ, ভিতরে মুখ ফিরিয়ে লক্ষ্য করলে আর একটা দুজ্জ্বল প্রাহেলিকা-পূর্ণ জগৎ সেখানে নিভতে অপেক্ষা করছে। এই উভয়ের যোগসূত্র কোথায়, বৈদিক ঋষি আপনার ভিতরে তাহারই আবিষ্কার করতে প্রবৃত্ত হলেন। বেদ এই সামঞ্জস্যের গান। বেদের মধ্যে হিন্দুর যে জীবনমর্ভাভ গমকে মুচ্ছনায় বিচিত্র তালে লয়ে সপ্তসুরে বদ্ধ হরে উঠেছিল, তার শেষ তান লয় সেদিন পর্য্যন্ত বুদ্ধের পবিত্র কণ্ঠে অপরূপছন্দে বেজেছিল, নির্বাপনের সিংহদ্বার হতে প্রত্যাবর্তন করে' অমিতাভ বুদ্ধ আপনার অপূর্ণ জীবনে

সেই উত্তম রহস্যই সবচেয়ে সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করে' গিয়েছেন, আপনাকে আপনার মাঝে পরিপূর্ণ ভাবে পেয়েও জগন্ময় পুনরায় পাবার জন্য তাঁকে আবার ফিরে আসতে হ'ল। বিচিত্র এই, বুদ্ধের মধ্যে যে ব্যক্তিত্ব জগতে আপনাকে ফুটিয়ে তুলেছিল, সেই যখন আপনাকে চূর্ণ বিচূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে' অনির্বচনীয় মহাশূন্যে সম্পূর্ণরূপে নির্বাপিত করে' দিল, তখনই তাঁর সেই পরাংপর বুদ্ধভাব শতসূর্যের মত জ্বলে উঠলো, যার আলোর প্রভাৱ পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ আগুও উদ্ভাসিত। বুদ্ধের মত জ্ঞানের প্রেমের শক্তির অপূর্ণ লীলা আর কোন্ পুরুষ বিশ্বমঞ্চে প্রদর্শন করতে পেরেছেন, কিন্তু তাঁর মত অপৌরুষেয় তুরীয় অল্পভূতিও আর কার ভিতরে এমন উজ্জলরাগে উদ্ভূত হয়েছিল?

*

ভারতের বুদ্ধশক্তি আজও তপোময়। শক্তি মানুষ চাই, যাদের তাঁর পুণ্য পদাঙ্ক অনুসরণ করে' বুদ্ধত্ব লাভ করতে হবে। বুদ্ধভাবের-অধিকারী না হ'লে, ভারতের জীবনে যে সত্য ঋতম্ বৃহৎ হিমালয়ের মত অপর ধৈর্য্য ল'য়ে প্রতীক্ষা করছে, তার প্রকাশ হবে না। আজ একজন বুদ্ধ, একজন শঙ্কর, একজন বিবেকানন্দের রুদ্রবিষাণ জগতের জন্য যথেষ্ট নয়। অসংখ্য কোটি জীবের মধ্যে একজনও তপসিদ্ধ হ'লে পৃথিবীর মুক্তি হবে অবধারিত। কিন্তু এই একজনের মুক্তি বহুগুণিত হয়েই ধীরে ধীরে বিশ্বমুক্তি সত্য করে' তুলবে। একটি অগ্নিকণা যেমন আপনাকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে সমস্ত সংসারে প্রলয়কাণ্ড হুটি করতে পারে, তেমনি একজনের আত্মমুক্তির তপস্যা দেখতে দেখতে সমস্ত মানুষকে তপসাস্কর করে' ফেলবে। এই নতন যুগে, যখন মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ বাহিরের জীবনেও এমন ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, যে একদেশের নতন ব্যাধিও দেখতে দেখতে আসমুদ্র ধরণী সংক্রামিত করে' ফেলে, এক জাতির নতন জ্ঞান, নতন ভাব চক্ষের পলকে গিরিসমুদ্র উল্লঙ্ঘন করে' দেশদেশান্তরের সকল জাতির মানসক্ষেত্র ছেয়ে দেয়, তখন জগতের সব চেয়ে শক্তিশালী যে মহাত্মা, তার আত্মান মানুষ কয়দিন উপেক্ষা করতে পারবে? আজ তাই জ্ঞানের একতারাটির একটা যে পরম হয়, সেই-টিতেই যিনি একনিষ্ঠ মনে অপূর্ণ রক্তার তুলেছেন, তাঁর উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞলিপিতে এস আমরা প্রণত- হই, সেই এক-মূল-সাগরীর

অনাহত মুর্ছনায় আপন আপন মহত্ব তন্ত্রের স্বর মিলাইয়া লই, একটি মন্ত্রচ্ছন্দ, একটি রাগিণী, একটিই স্বরের বজায় নূতন বাংলা সন্তরণ করুক। নূতন সৃষ্টির বিকাশের জন্ত মহাবুদ্ধ যেদিন সমাধিমন্দির থেকে প্রত্যাগমন করবেন, সেদিন জগতের কোনও কুটিল অমঙ্গল শক্তি তাঁর একটা কেশ কলুষিত করতে পারবে না।

সিদ্ধ-মন্ত

বাংলাদেশে ধর্মের বজা বহিয়াছে। সে ধর্ম পারলৌকিক। ইহজগতে তাহার যেটুকু প্রকাশ, তাহা কর্মক্ষয়ের জন্ত, অথবা ধর্মসাধনার রূপমাত্র। মানুষ চাহে মুক্তি পাইতে। সে মুক্তি জগৎ হইতে মুক্তি, জীবন হইতে মুক্তি। কিন্তু আমরা যে আত্মসমর্পণযোগের কথা প্রচার করি, উহা এই ধর্মের একেবারেই বিপরীত। কেননা, আমরা চাহি জীবন, আমরা চাহি জগৎ।

প্রচলিত ধর্মসাধনায়, সাধক চাহে স্থলকে স্বপ্নে মিলাইয়া নির্বাণ লাভ করিতে, শরীরজ্ঞান প্রাণে, প্রাণ চিত্তে, চিত্ত মনে, মন বিজ্ঞানে, বিজ্ঞান তুরীয়সত্তায় আত্মগোপন করিলেই সমাধি লাভ হয়; এই সমাধি যত স্থায়ী এবং নির্বিকল্প হইবে, নির্বাণের পথ ততই পরিষ্কার হইয়া উঠিবে, ত্রিমার্গযোগ, হঠ এমন কি তান্ত্রিক সাধনাও, নানা অবস্থার ভিতর দিয়া আপনার সত্যকে লয়েই লইয়া চলে, সাধকজীবনের যাহা কিছু প্রকাশ, তাহা এই পথ চলার মধ্যেই, তবে ভাগবত বিভূতি লাভ করিয়া এই পথের মাঝেই অনেক রহস্য, সাধকের ভাবাতিশয্যে অনেক আবেগময় অনৈসর্গিক লীলাখেলা পরিদৃষ্ট হয়, ঐ সকলের বিশেষ কোন মূল্য নাই, উহা দীর্ঘকাল স্থায়ীও নহে, মূল উদ্দেশ্য মুক্তি মোক নির্বাণ।

আত্মসমর্পণযোগী বিপরীতমুখী। সে চাহে যাহা আছে, তাহাকে আরও স্পষ্ট করিয়া তুলিতে, আরও সত্য করিয়া ধরিতে, সে চাহে না স্থলকে ভাঙিতে, পরন্তু আরও নব নব রসে, ভাবে, ঐশ্বর্যে তাহাকে পরিপূর্ণ করিতে। তাই সর্বোপরে সে স্বীকার করিয়া লয়, পরাংপর পুরুষ তাহার মধ্যেই আছেন, এবং তাঁহার অবাধ ইচ্ছা জীবনে ছড়াইয়া পড়ুক, ধর্ম

অধর্ম, পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখ, ভোগ ত্যাগ, সকল ভরসাই সমানভাবে খেলিয়া যাউক, এই সকলের ভলে আছে অমৃত ধারা, উপরের আবিল-প্রবাহ ছুটিয়া গেলে জীবন একদিন আনন্দময় সত্য ও শান্তিপূর্ণ হইয়া উঠিবেই, তাই এই অধ্যাত্মযোগীর প্রথমেই চাই অসাধারণ বৈধা, আর অটুট বিশ্বাস।

বিশ্বাস, যে, সে ঈশ্বর। আপন মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন এই যে জগৎ, এক্ষণে তাহারই ভিতর দিয়া আত্মজ্ঞান আহরণ করিতে চাহেন। সাধক তো আমি নহি, ঈশ্বরই সাধক, তাই আত্মসমর্পণ-যোগীর প্রথম মন্ত্র “অহং ব্রহ্ম”।

এই সুষ্প্র মায়াপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মকে জাগাইবার জন্তই যোগাবলম্বন করিতে হইয়াছে, জাগিবে না তো জীব, জাগিবেন ব্রহ্ম। ব্রহ্মেরই বহিরাবরণকে জীব উপাধি দেওয়া হইয়াছে, অন্তরতম পুরুষ জাগিলে, বাহির তো জাগিবেই, আপনার মস্ত্রে আপনি উদ্বুদ্ধ হইয়া যখন নিত্য স্মরণ রাখিতে পারি “অহং ব্রহ্ম”, তখনই আমার দীক্ষা, এই ব্রহ্মজ্ঞানে যিনি যতক্ষণ অবস্থান করিতে পারেন, তত পরিমাণেই তিনি সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইবেন।

শুরু চাই, কিন্তু সে শুরু আপনি ভিন্ন অপরে কে হইবে? আমার অবস্থা আমি যেমন পর্যবেক্ষণ করিতে পারিব, এবং আমার জীবনতরীকে আমি যেমন চালাইয়া লইব, আমার জীবনের সন্ধান আমি যেমন জানিব, বাহিরের লোকে তেমন পারিবে কেন, উদ্দেশ্য এক হইলেও পথ ভিন্ন, অপরের পথে চলিয়া সিদ্ধির বিলম্ব ঘটাইব কেন? আমিই যেমন “আমার ঈশ্বর, অবস্থান্তরক্রমে আমিই শুরু, আমিই আমার কর্ণধার, যদি জাগিয়া থাকেন আমার অন্তঃপুরুষ, তবে তো জীবনতরী ছুটিবে, নতুবা পরের ধাক্কা আমি কি চলিতে পারি?

হে ব্রহ্মযোগিন্! তোমার বন্ধন, ছিড়িয়া ফেল। সংসারমোহ হইতে পরিত্রাণ না পাইলে, ব্রহ্মসাধনা যেমন স্বপ্নের মত মিথ্যা অলীক, তদ্রূপ ধর্মের সম্মোহন হইতেও মুক্ত হও, বর্ণযোজনা করিয়া অক্ষর মন্ত্র মানুষের মুখ হইতে গ্রহণ করিয়ো না—স্বাধীন তুমি, ঈশ্বর তুমি, মানুষের বন্ধনে আপনাকে আবদ্ধ করিও না, যিনি আত্মজ্ঞানী, যিনি বুদ্ধ, তিনি শুরু নহেন, তিনি জাগাইয়া দেন জীবের অন্তরস্থিত সুষ্প্র ব্রহ্মশক্তিকে, অন্তরপুরুষ-আপনার বীজমন্ত্র তুরীয় জগৎ হইতে আবিষ্কার করিয়া লইবেন,

আমার মন্ত্রশক্তি আমাকেই আয়ত্ত করিতে হইবে, আমার কুণ্ডলিনী শক্তি আমাকেই জাগাইয়া তুলিতে হইবে, খণ্ড সঙ্ঘীর্ণ ধর্মের গম্বীতে ঋষিপুত্র তুমি বিজ্ঞান হইও না, আপনার গভীরতম প্রাণে দৃষ্টি সন্নিবেশ কর, দেখ জলন্ত স্বর্ণবর্ণ জ্যোতির্ময় অক্ষরে, নিবিড় তমিস্রাসমুদ্রে তোমার মহামন্ত্র ভাসিয়া বেড়াইতেছে, উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারণ কর—আমিই ব্রহ্ম, আমিই ব্রহ্ম, আমি আর কিছু নয়।

আপনাতে ব্রাহ্মস্থিতি জানিয়া, যদি তোমার অহং উপস্থিত হয়, তাকে একেবারে বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখ “সর্বং খন্দিৎ ব্রহ্ম” কেবল তুমি ব্রহ্ম নও, জগৎ ব্রহ্মময়, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতা, গিরিনদী, গম্বুপক্ষী, মানব দানব, যক্ষ রক্ষ, জানা অজানা পরিপূর্ণ ব্রহ্মে, তুমি আদি, ইহারই মাঝে যে বায়ুপূর্ণ স্থানটুকু তাহাও ব্রহ্মময় নয়, জগৎ অথও ব্রহ্মময়।

আত্মমন্ত্রে দীক্ষার পর সাধনার যুগ। চাই ধৃতিশক্তি। আমার এই বিজ্ঞানকে দৃঢ় ও স্থায়ী করিতে হইলে আমার সবখানি দিয়া ইহাকে ধারণ করিতে হইবে। বুদ্ধির, মনের, চিত্তের, প্রাণের, স্থূল শরীরের এমন অবস্থা আনয়ন করিতে হইবে, যেন এই সকল ব্রহ্মজ্ঞানের অবিচ্ছেদ প্রবাহ সমানভাবে বহন করিতে পারে—বুদ্ধির কল্পনা, মনের সংশয়, চিত্তের চাক্ষু্য, প্রাণের বাসনা, শরীরের দৌর্বল্য টুটাইয়া, এইগুলিকে শক্তিময় করিয়া তুলিতে হইবে। শক্তিসাধনার সিদ্ধি লাভ না করিলে, ব্রহ্মজ্ঞান অসম্ভব। আকাশের কোলে চপলার কণস্থায়ী দীপ্তিপ্রকাশের মত, মন্ত্রশক্তি ব্রহ্ম মাত্র জ্যোতিঃ প্রদর্শন করিয়া বিলুপ্ত হইবে, যদি সঙ্গে সঙ্গে শক্তিসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে না পারি।

অরামরণশীল জগতের বুকে যে ক্ষুদ্র জীব, আপনাতে ব্রহ্মের অবস্থান স্বীকার করিবার স্পর্ধা রাখে, তাহার সাহস অসাধারণ, এই সাহসকে ক্ষুণ্ণ করিও না, উৎসাহানল জালিয়া, আত্মস্থিত কুণ্ডলিনীশক্তিকে জাগাইয়া তোলা, বাহির হইতে তোমার কোন ভরসাই নাই, সমস্তই আপনার ভিতরস্থ আছে, অন্বেষণ কর, আত্মদর্শনে উদ্বুদ্ধ হও, দেখিবে ব্রহ্মশক্তি মহাকাশী মূর্তিতে আধারস্থিত সকল অক্ষমতা দূর করিয়া, সবখানি নুতনশক্তিতে ভরাইয়া তুলিবার জন্য তাখিয়া তাখিয়া নৃত্য করিতেছেন, ওঁ কালী, ওঁ কালী বলিয়া আইস আমরাও উন্মাদ হইয়া যাই, কালীর তাণ্ডব নর্ত্তনে ভীম-পদক্ষেপে, আধারের রক্ষে রক্ষে যে সকল পাপ নির্বিবাদে রান্না করিতে-

ছিল, তাহা বিচলিত চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে, বুদ্ধি ধারণ করিবার শক্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইবে, মনের বল অসাধারণ হইবে, চিত্তের ক্ষুর্ত্তি বিকাশলাভ করিবে, প্রাণের তেজ অপরাহ্নেয় হইয়া উঠিবে, শরীর মত্ত-মাতঙ্গের বল ধরিবে, তপঃ তপঃ তপঃ, হে সাধক, উপমা অলৌকিক কিছু নহে, নিত্য প্রত্যক্ষের বিষয়, শক্তিসাধনায় মহাত্মনিক জগৎকে সনাতন পথেই প্রবর্তিত করিতে চাহে, জগৎজোড়া অখণ্ড ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠান কোন মতেই অসম্ভব হইবে না, সমস্তই নির্ভর করে সাধকের বিশ্বাস, আগ্রহ ও উৎসাহের উপর, দলে দলে নবীন সাধক তপঃরত হউন, জলদগর্জনে এই আদেশই অন্তরপুরুষের মুখ হইতে নির্গত হইতেছে।

প্রয়োজন নাই অহুষ্ঠানে। বিশ্বাসকে অটুট রাখ। নিত্য স্মরণ কর, তুমি ঈশ্বর, এবং ঐশ্বরিক শক্তিকে আধার দিয়া প্রকাশ করিয়া তুলিবার জ্ঞাত শক্তির সাধনা কর। স্বীকার কর, কালী তোমার শুদ্ধিবিধান করিতেছেন যাহাতে তোমার আধারের প্রতি পর্ব ভাগবতবিকাশকে পরিপূর্ণরূপে মূর্ত্ত করিয়া ধরিতে পারে, তুমি দৃষ্টমাত্র, ধৈর্য্যসহকারে কেবল দেখিয়া যাও জীবন লইয়া যাহা কিছু বটে, অশুদ্ধতার গুরুভারে নিষ্পেষিত হইলেও মনে রাখিও উহা বহিষ্কৃত হইয়া যাইবার লক্ষণ মাত্র, আবার শুদ্ধি ও শক্তির মহনীয় বিকাশ লক্ষ্য করিলেও আত্মদর্শন ক্ষুণ্ণ করিও না, কে জানে ইহার পশ্চাতে আবার পাপের ক্রয়মুক্তি সমুদিত হইবে কি না, নির্বিকার চিত্তে-পাপপুণ্য, ভালমন্দ, মশ অপমশ, সকল প্রকারের অবস্থা ও ঘটনা অবধারণ কর, বিলম্বে হতাশাস হইও না, জানিও তুমি অমর, অনন্ত কাল তোমার সম্মুখে, যে অসীম শক্তি ও আনন্দের অধিকারী হইতে চাহিয়াছ তাহা অল্পকালসাপেক্ষ নহে, ভারতের পুরাতন সাধনপদ্ধতি জীবনকে ব্রহ্মে লয় করিতে চাহিয়াছিল, কয়জন সাধক তাহাতে সফলকাম হইয়াছেন? যাহারা এইপথে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছেন তাহাদের জীবনের কতখানি ইহার জ্ঞাত ব্যয়িত হইয়াছে, তাহার সন্ধান রাখ কি? আর তোমরা চাহিয়াছ ভগবানকে জীবনে মূর্ত্ত করিয়া ধরিতে, ইহার জ্ঞাত কত সময় কত সহিষ্ণুতা কত তপঃশক্তি ব্যয়িত হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই, সেইজন্ত এই অধ্যাত্মযোগীর চাই ধৈর্য্য, সাহস ও বিশ্বাস, সে কথা লক্ষ্যবান উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি।

চাই জ্ঞান, শক্তি প্রেম। আমি ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কিছু নহি, ইহার

অপেক্ষা পরাজ্ঞান আর কি হইতে পারে? আমি মরি না, আমি জরা ভোগ করি না, আমি শোকে দুঃখে অপমানে ক্ষুব্ধ হই না, কেননা আমি আনন্দময়, সকল অবস্থাই আনন্দের রূপান্তর মাত্র, ইহাই তো চরম আদর্শ, ব্রহ্মস্বরূপ না হইলে এরূপ অবস্থা আসিবে না, কুচ্ছ সাধনে কয়টা অবস্থা সমতার চক্ষে দেখিবে, অনন্ত ব্রহ্মের অনন্ত অবস্থা, সকল অবস্থায় অটুট রহিব, অবিচল রহিব, তাহার জন্ত এই ব্রহ্মজ্ঞানকেই সত্য করিয়া তুলিতে হইবে।

এই জ্ঞান লাভ করিবে সেই, যে শক্তিমান। সে শক্তি এই ব্রহ্মশক্তি-তেই আত্মনিয়োগ করিলে, তবেই সম্ভবপর। ব্রহ্মশক্তি ভিন্ন দ্বিতীয় শক্তি আর নাই, শক্তিকে ঋণ করিয়া সাধনা করিলে অনন্তশক্তি কেমন করিয়া লাভ হইবে? আমার সবখানি এই মহাশক্তির হস্তেই সমর্পণ করিলাম এবং ইহার পর আমি কেবল স্মরণ রাখিয়া চলিব কালীশক্তিই আমার সমস্ত লইয়া চালনা করিতেছেন, আমি কালীময় হইয়া যাইব, আমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব-জ্ঞান আর রাখিব না, আমি মাতৃপ্রেমে বিভোর হইয়া থাকিব, মাতৃনামে ভরপুর হইয়া যাইব, মাতৃশক্তির হস্তে আমার সকল কার্য নির্ভর করিতেছে, এই জ্ঞানকে মুহূর্তের জন্যও দূরে রাখিব না।

ব্রহ্ম-সাগরে যে নিমগ্ন সে মহাপ্রেমেই আত্মহার। দর্শনে, শ্রবণে, স্পর্শে ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছু মানস-মন্দিরে তো যাইতে পারে না। যে জাহ্নবীতরঙ্গে ভাসিতেছে, তাহাকে ধরিয়া ধরিয়া গদ্যাজলই নাচিয়া ছুটিয়াছে, যাহা করি, যাহা বলি, যাহা ভোজন করি, সকলই সেই ভগবান্, ওগো এ প্রেম কি আর রাখিবার স্থান আছে? আমার প্রতিবর্ণ ব্রহ্মময়, আমার প্রতি পদক্ষেপটী ব্রহ্মশক্তিচালিত, আমার প্রতি অন্তর্য্যাক্ষটী ভগবান্, চর্য্য ভগবান্, ভোজন ভগবান্, তখন কি উদাত্তস্বরে কণ্ঠে ধনিয়া উঠে না—ওঁ নমঃ ভগবতে বাহুদেবায় ।”

সানজস্য থাকিবে তো? এমন পাগল হইলে সৃষ্টির বিচিত্রতা রহিবে কেমন করিয়া? সেইজন্যই তো মাহুঘের স্বতন্ত্র বিকাশকেও সত্য বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে, স্বতন্ত্র মত ও পথকেও প্রেমঃ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, ভগবানের ইচ্ছাকেই ঘটে ঘটে বিচিত্র ভাবে পুরোভাগে ধরিয়া পথ চলিতে হইবে। ইচ্ছা তো আমার তোমার নহে, ভগবানের, তাঁর ইচ্ছায় আমি যদি কবি হই, তুমি যদি দার্শনিক হও, সে যদি যোদ্ধা হয়, তবু মিলন ঘটবে, মিলন তো কর্ম্মবিকাশে

নহে, সেই অন্তরতম ইষণায়। ভাষা এখানে নীরব, লেখনী অচল, সে দিব্য যুগের স্মৃচনাসঙ্গীত জানাইবার বিফল প্রচেষ্টা মাত্র, সাধক অন্তরের মণিকোটীর স্তিমিত নেত্র লেখকের মর্মকথা বুঝিয়া তোমার স্থললিত বাহুবল্লরীর আবেষ্টনে আমায় কি ধস্ত করিবে না, মিলনের অমোঘ শক্তিতে ধরায় নূতন সৃষ্টি সার্থক করিয়া তুলিবে না, কে জানে আমার কথা বোধযোগ্য কি না।

ভ্রমণ-চিত্র

আজ সোণার বাজার পূর্বভাগে আসিয়া পড়িয়াছি। হিরণ্যদ্যুতি-মলসিত এ কোন্ জননী আমার নয়নসম্মুখে মূর্ত হইয়া উঠিল! আকাশ-জোড়া বর্ষার ছিন্নমেঘ বিদীর্ণ করিয়া অরুণ-জ্যোতির একি পুলকস্পর্শ—কত মধুর, কত নিবিড়! পূর্ববঙ্গ, তোমায় প্রণাম করি—বক্ষে তোমার কর্ণহার পদ্মা ও-সেবনা—শিরে কাননকুন্তল গিরিরাজি,—ধূস্রটীর জটা ঘন দেবতার ধ্যানে সুযোগ্য পাইয়া অরণ্যে পরিণত। মেঘরবারিমেখলা তোমার চরণ-সৈকতে জলধি একি একটীর পর আর একটী করিয়া অগ্রসর উর্ধ্ব শুল্ল গুপ্তের মত উৎসর্গ করিতেছে। তোমার অঙ্কস্থিত সবল স্তন্য হৃষ্টপুষ্ট কর্মকুশল সন্তানগণের হৃদয়স্পর্শে আজ আমি আনন্দপ্লুত, আমি ধস্ত। বাংলার পূর্বে, মা তুমি কি অথও বঙ্গের উজ্জল ভবিষ্য আদর্শ, না তুমি আমাদের পূর্বে, অতীতে আমরা যাহা ছিলাম? নারদ-বীণা-বিনিমিত প্রাণমাতান অমর গান তোমার হৃদয়ের নিভৃত মণিকোটীর-রঞ্জে রঞ্জে কি বাজিয়া উঠিতেছে না? মাহুঘের অসীম ভাবনা তোমার সন্তানের অন্তরে আজও কি আত্মগোপন করিয়া থাকিবে? তুমি কি পূর্বদেশে অবস্থিত হইয়া বাজালা পূর্বে যাহা ছিল তাহার নিদর্শনরূপে আজও বিরাজ করিতে চাও, নূতনের অটুট জ্যোতির্গর্ভ বিভূতির দিকে একবার চাহিয়া দেখিবে না, দেবতা আজ আপন বিরাটরূপের প্রকাশ করিতে ভিখারী সাজিয়া মাহুঘের দ্বারে উপস্থিত—এইটাই কেমন কেমন; তবে বিফল সে ফিরিবে না,—মাহুঘ তাহাকে কেমন করিয়া প্রত্যাখাত করিবে, তুমি কি তাহার প্রত্যুদগমন করিয়া আনিতে যাইবে না? না তুমি আজও তোমার কয়ালমুষ্টি

পরিত্যাগ কর নাই। বহুতর কীর্তি, জনপদ, তীর্থক্ষেত্র তোমার কীর্তিনামীর গর্ভে অবলুপ্ত। তোমার জীবনকাল এখনও অজস্র বারিধারার স্রাব কত সহস্র বৎসর দ্রুত নারগ্রাপ্রপাতে পড়িলেও সমাপ্ত হইবে না, যা আজ তোমার সৃষ্টি করিবার দিন আসিয়াছে, আমি সেই বার্তা লইয়া আসিয়াছি। বাঙ্গালার পশ্চিমে গঙ্গা সূর্য্য ভাঙতের জীবন আহরণ করিয়া ভাগীরথীরূপে তাহা বঙ্গজননীর চরণে ঢালিয়া দিয়া ছল ছল কল কল গতিপ্রবাহে ছুটিয়া চলিয়াছে—একটি অব্যক্ত ধর্ম্মির মূর্ছনা অরূপ অশ্রুত গানের মত কানে ভাসিয়া আসিতেছে—পূর্বে যা তোমার পদ্মার সঙ্গে তেমনি তোমার সকল সম্বানের জীবন ওতপ্রোতভাবে মিশাইয়া রহিয়াছে—পদ্মা চকিত-চঞ্চলহরী তুলিয়া তবু তবু খবু খবু শব্দভঙ্গিমায় নাচিয়া চলিয়াছে। সম্বানকে আশীর্বাদ কর মা—দৈবী করুণা অজস্রধারায় ধরিয়া পড়ুক তাহার মন্তকের উপর।

হীনকর বিলাসসখল বিকট সভ্যতা, বুদ্ধিমজ্জি যার পরিচালক সারথী, এখনও তাহা তোমার অন্তর অধিকার করিতে পারে নাই, এখনও তোমার ঘাটের পথ পল্লীবধুর চরণস্পর্শে পবিত্র; এখনও তোমার শ্রামলক্ষেত্রে ছেলেরা নৃত্য করে, হরি বলে; তাহাদের কলকণ্ঠে দিগন্ত মুখরিত হয়, এখনও সভ্য সারথ্য গ্রাম্যতা তোমায় পরিত্যাগ করে নাই। তুমি চিরসংঘমপরারণা, শাস্ত্র তোমার নিকট জীবনধর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে—তুমি প্রাকৃতের উপাসিকা। কিন্তু এই কথাটি মনে রাখিও, যে, জীবন হইতে উদ্ধৃত শাস্ত্রের উপরেই ধর্ম্মের সূচভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। মা, তোমার প্রাণ কোথায়? তোমার পুণ্য মৃতিকাস্পর্শে কেন অন্তরে দেবতার সেই চিরবৈদিক প্রহ্ন জাগিয়া উঠিল, 'মা তুমি কেন'—কি লীলা করিতে ধরিত্রীর বুকে মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিয়াছ? তোমার তেজ আছে, কিন্তু তাহাকে আমি প্রাণ বলি না, তোমার অন্তর কই—চিন্ময়ী ইচ্ছার জাগ্রত দ্যোতনা—কই? তোমার চিন্তা আছে, কিন্তু আত্মোপলব্ধি কই—তুমি বিহ্বলী, কিন্তু আত্মজ্ঞান কই? তোমার আশা তাই আকাশের মত পরিধি বিস্তৃত করিয়াও শুধু একটা উদাসদৃষ্টি নিক্ষেপ করে। আত্মজ্ঞান বিহনে তুমি নূতনের জন্ম দিতে পারিবে না, জগতের রাসপথে বিজয়রথে অভিবান করিবে কেমন করিয়া? মা তুমি জাগ্রত অন্তরের মণিকোটা হইতে যোগশক্তি দিয়া তোমার জীবনধারাত্তি প্রজিয়া বাহির কর—তোমার সম্বানের হস্তে ব্রহ্মতারের অমৃতবাহার প্রস

গগনের কোলে কোলে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠুক, আর আমি তোমার পদতলে মাথা লুটাইয়া পড়ি—উঠিয়া নৃত্য করি, আবার লুটাই, আবার নৃত্য করি।

প্রথম আসিলান টাঁদপুরে। তখন যেন মনে হইল বালারুণের কনক-কিরণে-আকাশ রঙ্গিন হইয়া উঠিতেছে, পদ্মার জলোচ্ছ্বাস সফেন উশ্বিচ্ছটা-সস্তাড়িত নবাকর্ণকরম্পর্শে দৃষ্ট হইয়া বিদ্যুচ্চকিত হীরকবৎ বৃক্ বৃক্ ঝল-সিত—নাচিতেছে, ভাসিতেছে, হুলিতেছে। একদিকে পদ্মা অত্ৰদিকে ডাকা-তিয়া, মধ্যে বেত্র, সুপারি, বংশনির্গিত টিনের আচ্ছাদনাবৃত বর্দ্ধায়মান গ্রাম, পার্টের শুঁড়ার ধুয়া শীতের কুয়াসার মত গ্রামখানির উপর নামিয়া আসিয়াছে—কাজেই গৃহাবদ্ধ হইয়া থাকিতে বাধ্য হইলাম। জনৈক ভদ্রলোকের গৃহে আলাপ কালে জিজ্ঞাসা করিলাম—মহাশয় আপনারা “প্রবর্তক” পড়েন, আপনাদের কেমন লাগে?

ক। বড় পুরাতন, সেই ভদ্র মস্ত পুরাণ। এখনও up-to-date thoughts ধরিতে পারে নাই।

খ। মহাশয় ও প্রেমের ধর্ম দিয়া আর স্বর্গে গিয়া যাত্ৰা হওয়া বাহিবে না।

আমি। মহাশয়, এই ধর্মই কি দেশকে হীন করিয়াছে, মানুষকে খর্ব করিয়াছে?

খ। তা বই কি! ধর্মের দোহাই দিয়া অলসভাবে বসিয়া রহিলাম, পেটের বিশেষ আলা ধরিলে একমুঠা চাল ভিক্ষা করিয়া উদর পূর্ণ করি লাম—ইহাতে দেশের কি উন্নতি হইবে, মৃত্যুর পথ পরিষ্কার করিয়া দিবে।

আমি।—অর্থাৎ আপনি বলিতেছেন ধর্ম আশাদের পতনের কারণ, আর সেই ধর্ম ভগবানের দেওয়া জগতের প্রতি উপেক্ষা—প্রকৃতির ক্রোড়ে আমাদের জীবনের অনন্ত বিকাশ না ঘটাইয়া হীনতর ত্যাগের আদর্শে অলসতা ডাকিয়া আনা।

খ। একরকম তাই—কিন্তু ত্যাগ ত করি না—গৃহিণী একবার নর্থ লাড়া দিলেই সব দিব্যস্বর্গ হাওয়ার মিশিয়া যায়—তারপর আবার আছে দীত, আছে ক্ষুধা, একদিকে অব্যর্থ প্রকৃতির টান অত্ৰদিকে ঐ ধর্মের টান, এই ছটানে পড়িয়া আমরা অধম সন্ন্যাসী ও অধম গৃহীতে পরিণত হইয়াছি।

আমি। বাস্তবিকই ধর্ম জাতীয় উত্থান পতনের কারণ। ইহাকে আমরা National Certitude বলি। এই National Certitude সত্য না হইলেও হইতে পারে, কিন্তু ইহা ইতিহাসে নতুন সাম্রাজ্য গঠন, নতুন সভ্যতা সৃজন ও ধ্বংস করিতে অধিতীয়। মহম্মদীয়দিগের অস্ত্রবলে ধর্ম-প্রচার হইতে আর্মস সাম্রাটের Supermankind অভূত হইলেও পৃথিবী ওলট পালট করিতে অক্ষম হয় নাই। কিন্তু এই যুগধর্ম, এই ভাবই যদি আমাদের অধঃপতনের কারণ হয়, তবে কোথায় ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে? ওই অন্তরে, না, তাহার প্রকাশ এই অবাস্তব দেহে?

খ। অন্তরেই ঔষধ দিতে হইবে।

আমি। ঐ ঔষধ কিরূপ এখন দেখা যাক। ভাব ছিল, জগৎ মিথ্যা জীবন স্বপ্ন, তাহা হইতে অলসতা, হীনতা ও অধঃপতন, কিন্তু যদি কোন ক্রমে এরূপ একটি ভাব সন্মুখদিকে ফুটিয়া উঠে, যাহার জন্ত মানুষ গুণে—জীবন সত্য, জগৎ সত্য, কর্মই জীবন, আনন্দ জীবনের সার্বকতা, তাহা হইলে কি ওই দোষ দূরীভূত হয় না?

খ। হাঁ, তাহা হইতে পারে, কিন্তু এরূপ জাতীয় বিশ্বাসেও বিপদ আছে।

আমি। অর্থাৎ সাধারণে ত্যাগমস্ত্রের মত, ভোগধর্মের দোহাই দিয়া বাহ্য পাশ্চাত্যে হইতেছে তাহাই করিয়া যাইবে। উত্তর মতের ভিতরটীর দিকে কেহ দৃষ্টি রাখিবে না।

খ। ব্যাপারটা তাই।

আমি। তাহা হইলে মানুষকে আত্মোপলব্ধি করার দিকে আগাইয়া দিতে পারে, এরূপ ধর্মই কি সকল সময়ে, বিশেষতঃ আমাদের দেশে এই সময়ে আবশ্যিক নয়? Socialist স্থলে গিয়াছিলেন, তাহার সেখানে ছেলেদের শিখায় Self-estimation করিতে, আপনাকে যাচাই করিয়া চিনিতে। ইহা আত্মোপলব্ধির পথের পূর্বরাগ।

ভোজনের ডাক আসিল, আমরাও উঠিয়া পড়িলাম। ভোজন করিতে করিতে কথা আসিল।

খ। — কিন্তু এ আত্মোপলব্ধি কয়জন করিবে?

আমি। সকলের পক্ষেই ইহা সম্ভব, তবে বার করিবার সেই করিতে পারিবে।

খ। তবে এ প্রচারের প্রয়োজন কি?

আমি। কিছুই না—আবার আছেও। মহত্ব লোকের কর্ণে এই বাণী
অনবদ্য সুরে ধ্বনিত হইলে একজন শুনিতে পাইবে। এই একজনকে
টানিবার জন্ত এত আয়োজন।

নিকটস্থ গ্রামে ভ্রমণ করিলাম। ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর, ক্ষুদ্র পথ, ক্ষুদ্র লোক-
সংখ্যা লইয়া গ্রামখানি প্রকৃতির নিভৃত প্রান্তে যেন অভিনব এক ক্ষুদ্র
জগতের সৃষ্টি করিয়াছে। এখানে মানুষের আড়ম্বরশূন্য আচরণে, হৃদয়
ঢালিয়া পরস্পরে প্রাণে প্রাণে মেশায়েশিতে ক্ষুদ্রত্বের মধ্যে কিছু মহত্ব
স্পষ্ট লক্ষিত হয়। এ দেশের ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী দূর হইতে দেখিলে মনে
হয় একটা রক্ততৃজ্ব রেখাবৎ পড়িয়া রহিয়াছে। একদিন একটা Interneeer
সহিত সাক্ষাৎ হইল। লোকটা বেশ সরল, জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাশয় আপ-
নারা নাকি অনেক কাজ করিয়াছেন, কিসের অভাবে সকল কর্মে ব্যর্থ হইয়াছেন,
আর আজিকার কাজই বা কি?

In। মানুষ নাই; মানুষের অভাবেই সকল ব্যর্থতা। আজ সেই
মানুষ তৈয়ারী করিতে হইবে, ইহাই আজিকার কাজ।

আমি। মানুষ তৈয়ারী করিতে হইবে, না মানুষ তৈয়ারী হইতেছে
ভগবানের হাতে, তাহা দেখিতে হইবে—আমি তাই দেখিতেছি।

In। হাঁ, ভগবান করিতেছেন—আর অহঙ্কারের ক্ষুদ্র লীলায় ভুলিব
না।

আর একটি গ্রামে গেলাম, সহৃদয় যুবকদল সম্মুখে ডাকিয়া লইল।
তাই দিন পরে ফিরিলাম। পথে একটি বন্ধু বলিলেন—আপনার নিকট
“প্রবর্তকের” আদর্শ সম্বন্ধে কিছু শুনিব আশা ছিল, কিন্তু হুর্ভাগ্যক্রমে আপ-
নার নীরবতাভঙ্গ হইল না।

আমি। ভাই, কি বলিব? বলিয়াই বা হইবে, কি? চাই মানবের
আত্মোপলব্ধি, আত্মার জাগরণ, তাহা প্রচার দ্বারা সম্ভবে না। এমন একটি
অধ্যাত্ম প্রক্রিয়া আছে যাহা দিয়া এই অন্তরকে উদ্বুদ্ধ করা যায়—তাহাই
করিতেছি। প্রচার মানবের বুদ্ধি স্পর্শ করে, কিন্তু বুদ্ধি ত জীবনের
নিরস্তা নয়। জীবনের জীবন, তাহার অন্তরতম প্রেরণা, যাহার তলে
লুকাইয়া আছে, সেই স্বপ্ন আবেগটা, সেই গূঢ়তম আনন্দস্পর্শ,
সেই সচ্চিদানন্দের ঢেউ, যাহা লইয়া প্রথম পৃথিবীতে ক্রিতি

অপ্ ভেদ করিয়া খাতদ্বা লইয়া নড়িয়া উঠিয়াছিলাম, সেই ঢেউ, সেই গুঁটতম স্রবটিকেই ধরিতে হইবে, তাহাকেই জীবনে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে—কে সে যোগী বাহার ভিতর এই প্রেরণা জাগিয়া উঠিয়াছে, কে সে আত্মচিন্তানিরত মহাকবি বাহার দিব্য দৃষ্টিতে স্বপ্নরাজ্যের মত নূতন ভারত গড়িয়া উঠিবে, বাহার অনুভূতিতে ভগবানের বিরাট যজ্ঞ সাধন করিতে অগ্রদূত দেবজাতির সন্ধান মিলিবে—কে সে দেবসাধক, যে এই বিরাট দেবতার নিকট আপনার জীবন পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিবে? কাহার ভিতর আমার এই নবসুধরূপ আগতপ্রায়, তাহাকেই আহ্বষণ করিতেছি দেশে-বিদেশে, তাহারই অপেক্ষায় বসিয়া আছি আপন অন্তরে—কে সে দেবতা বাহার সহিত যুক্ত হইয়া মহাশক্তিসম্বন্ধ গড়িয়া তুলিব—বাহার সহিত মিলিলে আমার খুঁজিয়া পাইব?

পুরাতন চিঠি

তুমি আবার একটু হতাশ হয়ে পড়েছ, শীঘ্র শীঘ্র তোমার কাজের দিক থেকে Response না এলে এরূপ বোধ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নহে, তবে মনে রেখো আমরা কেবল ভগবানের ইচ্ছাপ্রসূত কার্যের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ইচ্ছাসম্মত কার্যগুলিকে মিলিয়ে নেবার উদ্যোগ করছি মাত্র, কোথাও পিছিয়ে পড়ছি, কোথাও বা আগিয়ে যাচ্ছি, আবার কোথাও বা সঙ্গে সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, এতে ক্ষুব্ধ হবার কোন কারণ নেই, মনে রেখো ভগবান্ যা করবেন, তা আমাদের অহংকারের চোখ দিয়ে দেখলে সময় সময় অসদৃশ ব'লেই মনে ধারণা হবে বটে, কিন্তু সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের পথেই তিনি সমস্ত জগৎবাসীকে পরিচালিত করছেন, এই ভাব প্রতি কার্যে মনে রাখতে পারলে, সমস্ত আনুভূতিক অধিক বিলম্ব হবে না।

এখন কথা হচ্ছে, ভাল করে বোধ করতে হবে আমরা কারা? আমরা কি প্রকৃতই আমাদের বুদ্ধিগত কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে জীবন্ত করে তোলাবার জন্য লালায়িত, না ভগবান্ আমাদের মধ্যে থেকে—তঁার কোন মহৎ কর্মসাধনে আমাদের এনেছেন, জগতের অতীত গতিবেগ যতই কেন আমাদের বাধা দিক না, আমরা আরও উত্তমের সহিত সে বেগকে পর্য্যুদন্ত করে তঁার উদ্দেশ্যের পথেই অগ্রসর হবে—এমন একটা গর্ব, এমন একটা সাহস, এমন একটা ধারণা মনের মধ্যে দৃঢ় করে তোলা চাই, মনে করতে হবে—আমি ভগবানের হাতের যন্ত্র, আমি ভগবানের কোন মহৎ কার্যের জন্য অমূকের বংশে অমূকের বাড়ীতে বাস করছি—কিন্তু আসল উদ্দেশ্য, ভগবানের ইচ্ছায় পরিচালিত হব। কণাটা সম্যক উপলব্ধি করাই সাধনসাপেক্ষ, প্রকৃতই যদি তুমি দেবকার্যে জন্মগ্রহণ করে থাক, তবে এই সাধন automatically হবে—এ আমি স্পষ্ট করে বলতে পারি।

যাক, তুমি অনেক Philosophy শুনেছ, আমি তোমায় অধিক কি দেখাব, কথায় বা চিঠির ভাষায় কিছু হয় না, এ সকল সাময়িক উপ-

করণ, আমার মনে হয় তোমার আর সব ভাব খ'সে গিয়ে কেবল একটা বাসনাই আগ্রত হ'য়ে উঠ'বে, সেটাকে আর বাসনা বলা যায় না, সেটা লিপ্সা। বাসনায় কিছু ক'রতে নেই, খুব মহৎ উদ্দেশ্যও যদি বাসনাগত হয়, তবে রাগদেব অবশ্যস্বাবী এবং এগুলি সমতার অন্তরায়, তোমার সেদিনকার চিঠির কথা তোমার মাকে ব'লেছি—তিনি তোমায় আশীর্বাদ করেছেন, তাঁরও যে এখন সাধন-অবস্থা—তবে আশা করি—তোমার মা শীঘ্র মুক্ত হ'য়ে উঠ'বেন।

তুমি না ব'ললে — সম্বন্ধে আমি নূতন কিছু আর ক'রবো না, তার দোষ হয়েছে, একথা আমি প্রমাণ করে' দিতে পারবো। যদি উৎকট অহঙ্কারের দাস হয়ে থাকে, তবেই সেটাকে অস্বীকার করে' অতি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠাকে বরণ ক'রে নেবে এবং ভগবানের যদি ইহাই অভিপ্রায় হয়, তবে আমাদের হাহাকার করা কেন? আমাদের চলতে হবে—অনির্দিষ্টের পথে—সেই দূর দূর বহুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্যের পথে—আমাদের যে মহাকালী পেছন থেকে ঠেলা দিচ্ছেন, অন্ততঃ আমি যে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না—দাঁড়ালেই হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে যাব, এ গতি কেউ রোধ ক'রতে পারবে না, আমি তোমায় অনেক মত পথ চলতে বলি না, একটা অস্পষ্ট সংশয়ের মধ্যে মানুষ এই দুর্গম পথে ক'দিন দাঁড়িয়ে থাকতে পারে? আমি সবায়ের হাতে বাতি জেলে দিতে চাই—সে আলোকে আমার পথও অধিক আলোকিত হ'য়ে উঠ'বে—একটা রোসনাই করে' আমাদের এগোতে হবে, ওরে মানুষ, বুঝে দেখ—তুই কি—তোর ভিতর আজ কি শক্তির বিকাশ কেবল তো'র অহং'এর লৌহ কপাটে ঠিকরে বিকৃত ভাবে ছড়িয়ে প'ড়ে যাচ্ছে—আমি বলি এস—আমার জ্ঞানে তোমার জ্ঞানে মেশামিশি করে' একটা ভাগবতমণ্ডলী গ'ড়ে তুলি—যেখানে থাকবে শুধু কুষ্ঠাশুভ্র প্রেম, আর আকাশের মত উদার হৃদয়, আমি জানি না আজ তোমায় কত কথা লিখে ফেল'লুম—তুমি শুধু চেয়েছিলে কোন নূতন খপর থাকে ত দিতে, তাহার উত্তর, কিছু নাই।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

(যজুর্বেদ—শান্তিপ্রকরণ)

যন্মে ছিত্রধক্ষুবো হৃদয়স্য মনসো বাতিত্বম্ বৃহস্পতির্মে তদধাতু ।

শন্নো ভবতু ভুবনস্য যম্পতিঃ ॥

আমার চৃষ্টির মধ্যে আমার হৃদয়ে আমার মনে যেখানে যে ফাঁক আছে, যেখানে যাহা ছিড়িয়া গিয়াছে, আমার অন্তরাঙ্গার মহাবাক্ সে সমস্তই যেন ভরিয়া জুড়িয়া দেন ।

সৃষ্টির বিনি কর্তা তাঁহার শান্তিতে সকল আমাদের সমান হউক ।

ইন্দ্র বিশ্বস্য রাজতি ।

শন্নো অন্ত দ্বিপদে চতুপদে ॥

ইন্দ্রের প্রতিভায় বিশ্ব আলোকিত, ইন্দ্রই সকলের রাজা ।

তাঁহার শান্তি প্রতিষ্ঠিত হউক জাগ্রতে ও স্বপ্নে, স্মৃতি ও তুরীয়ে—
আমাদের দেহে প্রাণে, আমাদের মনে অন্তরাঙ্গায়—আমাদের পার্শ্ব জীবনে, আমাদের অধ্যাত্ম প্রতিষ্ঠানে ।

শন্নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শন্নো ভবত্বর্য়মা ।

শন্ন ইন্দ্র বৃহস্পতিঃ শন্নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ ॥

শান্তিতে আমাদের সম্মিলন, শান্তিতে আমাদের অসীম প্রতিষ্ঠা, শান্তিতে আমাদের ক্ষাত্রবীর্ঘ্য ।

শান্তিতে আমাদের প্রজ্ঞা ও প্রজ্ঞার বাহ্য প্রকাশ, শান্তির মধ্যে প্রসারিত আমাদের বিপুলবিসারী মহাবিক্রম ।

শন্নো বাতঃ পবতাং শন্নন্তপতু সূর্য্যঃ ।

শন্নো কনিক্রদৎ দেবঃ পর্জন্তো হভিবর্ষতু ॥

প্রাণের বেগ আমাদের বহিয়া আনিবে শান্তিকে, জ্ঞানের শিখা আলিয়া দিবে শান্তিকে, আনন্দের ধারা তীব্র গর্জনে বর্ষণ করিবে শান্তিকে ।

অহানি শন্তবন্ত নঃ শং রাজ্ঞী প্রতিধীয়তাম্ ।

শন্ন ইন্দ্রাণী ভবতাম্বেভিঃ শন্ন ইন্দ্রাবরুণা রাতহব্য ।

শন্ন ইন্দ্রাপুংশা রাজসাতৌ ইন্দ্রাসোনা সুবিঅন্ন শং যোঃ ॥

জ্ঞানের দিন সব আনিবে আমাদের শান্তি, অজ্ঞানের রাত্রী আনিবে শান্তি। হে মনের চিন্ময় শক্তি, হে প্রাণের তপোময় শক্তি, শান্তিকে, তোমরা রক্ষা করিয়া ধ্বংস করিয়া চল। হে ইন্দ্র, হে বরুণ শান্তির জন্ত তোমাদের উদ্দেশ্যে আমাদের সকল দান। হে ইন্দ্র, হে পৃথ্বী আনন্দ সম্পত্তি জয় করিতে আমরা চলিয়াছি, শান্তি হইয়া তাই আমাদের মধ্যে উদ্ভিত হও; হে ইন্দ্র, হে সোম শান্তি হইয়া শক্তি হইয়া উদ্ভিত হও, আমরা যে অসীমের পথিক।

শরো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে।

শং যোরভিষবন্ত ॥

আমাদের প্রেরণা সকল সম্মুখে চলুক, তাই দেবতার শক্তিরাজি শান্তির মধ্যে ছুটিয়া যেন উঠে; জীবনের ধারা সব শান্তির মধ্যে প্রবাহিত হউক, আমরা যে উহা পান করিব।

শান্তি শক্তি—শান্তির মধ্যে বিধৃত শক্তিধারা সম্মুখে যেন ছুটিয়া চলে।

দ্যৌঃ শান্তিরন্তরীক্ষং শান্তিঃ পৃথিবী শান্তিরাপঃ শান্তিরোধয়ঃ শান্তিঃ।

বনস্পত্যঃ শান্তি বিশ্বদেবাঃ শান্তি ব্রহ্ম শান্তিঃ সর্ব শান্তিঃ শান্তিরেব

শান্তিঃ সা মা শান্তিরেধি ॥

উপরে অন্তরাশ্রায় শান্তি, মধ্যে অন্তঃকরণে শান্তি, বাহিরে শরীরে শান্তি, আনন্দ-অমৃতে শান্তি, স্বাস্থ্যে শান্তি, স্বখে ভোগে শান্তি, সকল প্রবৃত্তিতে শান্তি, নিবৃত্তিতে শান্তি, সমস্তে শান্তি, শান্তিতেও শান্তি।

সেই শান্তি আমাতে আসুক।

দূতে দৃংহ না মিত্রশ্চ মা চক্ষুষা সর্কানি ভূতানি সমীক্ষন্তাম্।

মিত্রসাহায্যক্ষুষা সর্কানি ভূতানি সমীক্ষে মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষামহে ॥

দীর্ঘ হইয়া গিয়াছে-যাহা তাহা আমার সংযুক্ত করিয়া দাও। মিলনের সাধের দৃষ্টি দিয়া সকল জিনিষ দেখ তোমরা, মিলনের সাধের দৃষ্টি দিয়া আমিও যেন দেখি সকল জিনিষ, মিলনের সাধের দৃষ্টি দিয়া আমরাই যেন দেখি সকল জিনিষ।

ও শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মুক্তি-সংবাদ

আজ মনে পড়ে শতীন্দ্রের আত্মহত্যার কথা, জ্যোতিষচন্দ্রের শোচনীয় মৃত্তিক-বিকৃতির কাহিনী, তারপর কত যুবক উচ্চাকাঙ্ক্ষায় উদ্ভূত হইয়া স্বদেশের কল্যাণকামনায় রাজবিধির কঠোর শাসনে যে নিৰ্য্যাতিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। ইংরাজ শাসনের নিদারুণ যন্ত্রে, কেবল বাংলা নয়, ভারতের সর্বত্রই হাহাকার উঠিয়াছে, পঞ্চনদের লোমহর্ষণ ঘটনা বিংশ শতাব্দীর এই উন্নতিযুগে, ইংরাজরাজ্যধীনে যে ঘটতে পারে, জগতের কোন সভ্যজাতিই ইহা বিশ্বাস করিতে পারে না, প্রজাবৎসল ইংরাজ নিরস্ত্র প্রজার উপর যে নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছেন, তাহা ক্রুরহৃদয় জঙ্গলীর পক্ষেও বুঝি অসম্ভব! যাহা ঘটয়াছে, তাহার জন্ত আর শোচনা করি না, কেননা এই সকল অপ্রিয় কথার বার বার উল্লেখ আমাদের বিশেষ ইষ্টের সম্ভাবনা নাই।

ভারতবাসী মুক্তি চাহে। সে মুক্তি অন্তরের। পাশ্চাত্য শিকার ইহার বিকৃত রূপের প্রকাশ হইয়াছিল, তাহার জন্ত যে প্রায়শ্চিত্ত, তপস্বী ভারতের পক্ষে উহা অতি কঠোর না হইলেও, শাসক জাতির ইহাতে যথেষ্ট মর্যাদাহানি হইয়াছে; নিউইয়র্ক সহরে আন্তর্জাতিক সম্মিলনীতে, লাল লাজপত রায় ইংরেজের বর্তমান শাসনপদ্ধতির বিষময় ফলের কথা বর্ণনা করিয়াছিলেন, পাক্সাবের দীভৎস ঘটনা শ্রবণে, শ্রোতৃবর্গ যুগপৎ স্তম্ভিত ও বিশ্বয়ান্বিত হইয়াছিলেন, ইংলণ্ডবাসীও জেনারল ডায়ার সাহেবের নিষ্ঠুর আচরণে ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হইয়াছেন; পঞ্চনদের বৃকের রক্ত ইংরাজ শাসনের ছরপনেন্ন কলঙ্ক, এ কলঙ্ক যেমন করিয়াই হউক মুছিয়া ফেলিতে হইবে, এমন কথা চতুর্দিক্ হইতেই পরিশ্রুত হইতেছে।

ঠিক এমনই সময়ে, যখন ভারতের জাতীয় মহাসভায় পাঞ্জাবের হৃদয়-বিদারক স্বাধীনতা কাহিনীর কথা বিনাইয়া বিনাইয়া দেশনেতৃবর্গ অশ্রু বিসর্জন করিতে সমবেত হইতেছিলেন, মহামতি ভারতসম্রাট পঞ্চম জর্জের সাম্রাজ্য-বাণী ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘোষিত হইল। শাসনসংস্কারের কথাগুলি ভারতবাসীর হৃদয় আকর্ষণ করিত না, রাজনীতিক কথার ফাঁকি আর আমরা শুনিতে চাহি না, কিন্তু সম্রাটের এই কথাগুলি আমাদের হৃদয় শীতল করিয়াছে—

“It is my earnest desire at this time, that so far as possible, any trace of bitterness between my people and those who are responsible for my Government should be obliterated. Let those who in their eagerness for political progress have broken the law in the past, respect it in future. Let it become possible for those who are charged with the maintenance of peaceful and orderly Government forget extravagances they have had to curb. A new era is opening. Let it begin with a common determination among my people and my officers to work together for a common purpose. I therefore direct my viceroy to exercise in my name and on my behalf my Royal clemency to political offenders in the fullest measure which in his judgment is compatible with public safety. I desire him to extend it on this condition to persons, who for offences against the state or under any special or emergency legislation are suffering from imprisonment or restrictions upon their liberty. I trust that this leniency will be justified by the future conduct of those whom it benefits and that all my subjects will so demean themselves as to render it unnecessary to enforce the laws for such offences hereafter.”

অর্থাৎ, “আমার একান্ত ইচ্ছা, যে, এই সময়ে যতদূর সম্ভব আমার প্রজাপুঞ্জ এবং আমার গবর্ণমেন্টের দায়িত্বভার ষাঁহাদের স্বন্ধে, তাঁহাদের

পরাম্পরের মধ্যে সকলবিধ বিদ্বেষভাবের চিহ্ন পর্যাপ্ত মুছিয়া যাউক। অতীতে যাহারা রাজনৈতিক উন্নতিসাধনের আগ্রহাতিশয্যে আইনভঙ্গ করিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহারা ভবিষ্যতের জন্ত আইনের মর্যাদা রক্ষা করুন। রাজ্যের শান্তি ও সুশৃঙ্খলা বিধানের জন্ত যাহারা ভারপ্রাপ্ত, তাঁহাদিগকে যে সকল উৎপাত উপদ্রব সংঘত করিতে হইয়াছিল, সে সমস্ত বাহাতে তাঁহারা বিন্মত হইতে পারেন, তাহা সম্ভব হউক। একটা নূতন যুগের সূচনা হইতেছে। আমার প্রজাবৃন্দ এবং আমার কর্মচারীগণ একই উদ্দেশ্যে একযোগে কার্য্য করিবার একই সঙ্কল্পে উদ্ভূক্ত হইয়া এই নবযুগ আরম্ভ করুন। এই উদ্দেশ্যে আমি আমারি প্রতিনিধি বড়লাট বাহাদুরকে এই আদেশ দিতেছি, যে, তিনি আমার নামে, আমারই প্রতিনিধিত্বরূপে, তাঁহার বিবেচনামত সর্বসাধারণের নিরুদ্দিগতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমার রাজকরণা রাজনৈতিক অপরাধীগণের উপর পরিপূর্ণ মাত্রায় প্রয়োগ করুন। আমার ইচ্ছা, তিনি এইটুকু লক্ষ্য রাখিয়া, যে সকল ব্যক্তি রাজশক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ প্রযুক্ত কিম্বা কোনরূপ স্বাধীনতার সঞ্চোচকলো সাময়িক আইনের প্রভাবে কারাদণ্ড কিম্বা কোন বিশেষ অথবা সাময়িক কষ্টভোগ করিতেছেন, তাঁহাদিগের উপরেও এই করণা বিস্তৃত করিবেন। আমার বিশ্বাস, যাহারা এই করণালাভে উপকৃত হইবেন, তাঁহারা এবং আমার সমস্ত প্রজাবর্গ, বাহাতে অতঃপর এই সকল অপরাধের জন্ত তদ্রূপ বিধান প্রয়োগ নিশ্চয়োজন হয় সেইরূপ আচরণ করিলেই, আমার এই অনুগ্রহ সার্থক হইবে।”

রাজশক্তির এই অনুগ্রহটুকুর জন্ত “প্রবর্তক” শচীন্দ্রের আত্মহত্যার পর হইতে ধারাবাহিক লেখনী চালনা করিয়া আসিতেছে এবং বাঙ্গালীর অনিন্দ্য চরিত্রের উপর কালপ্রভাবে যে মূর্খলোপ হইয়াছিল, তাহা মুছিয়া সুন্দর সভ্য রূপটি ফুটাইয়া তুলিবার জন্ত জন্মাবধি প্রচেষ্টা করিয়াছে; আজ তাহা সফল হইবার দিন, অতঃপর আমরা সকল রাজনৈতিক অপরাধীরই মুক্তির আশা নিঃসংশয়ে করিতে পারি।

সম্রাটমহোদয়ের ঘোষণাবাণীর মধ্যে আমরা আশার আলো যথেষ্টই পাইয়াছি, চন্দ্রকলঙ্কের মত এই কয়টা কথা আমাদের প্রাণে এখনও অঙ্ককারের সৃষ্টি করিতেছে, তিনি রাজকরণা বিতরণে কুণ্ঠাহীন হইয়াও বলিয়াছেন—
“.....My Royal clemency to political offenders in the

fullest measure which in his (Viceroy's) judgment is compatible with public safety.” খুব সম্ভব এই কথাই মধ্যে এমন কথা কিছু নাই, যাহাতে সকল বন্দী মুক্তি না পাইতে পারে, তবে রাজনীতির কুট মন্ত্রণায় আমরা একাধিক বার বড় আশা পাইয়া আবার নিরাশ হইয়াছি, সেই জন্তু কথার মারপ্যাচে আতঙ্কের সঞ্চার হয়, তবে আমাদের বিশ্বাস, সমগ্র ভারতবাসীর হৃদয় অধিকার করিবার এমন-স্বযোগ বৃথা যাইবে না, বড়লাট বাহাদুর ও প্রাদেশিক শাসনকর্তৃগণ, বর্তমান ভারতের অবস্থা দেখিয়া, যোগ্য ব্যবস্থাই করিবেন; ফল না দেখিলে এতদসমক্ষে অধিক কথা এক্ষেত্রে নিশ্চয়োজনা।

অন্তরীণপ্রসঙ্গ লইয়া আমরা অনেক কথাই উল্লেখ করিয়াছি, ভবিষ্যতে বিপ্লববাদের পুনরাবির্ভাবে দেশে অশান্তি উপদ্রবের সৃষ্টি যাহাতে না হয়, তাহার জন্তু আমরা অনেক কথাই বলিয়াছি, এবং ভবিষ্যতেও ইহার জন্তু আমরা নিশ্চেষ্ট থাকিব না। দেশের চিন্তা ও কর্মস্রোত সত্য ও শ্রেয়ের পথ ধরিয়া দিন দিন সমুচ্চের পথে যাহাতে পরিচালিত হয়, তাহার আয়োজনই করিয়া চলিয়াছি, এক্ষেত্রে সকল রাজনৈতিক বন্দীকেই মুক্তি দিতে ভারত-গবর্ণমেন্ট যেন ইতঃস্ততঃ না করেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা, কেননা শাসন-নীতি যেমন ভাবেই প্রবর্তিত হউক না, রাজনৈতিক কঠোর শাসনে নির্যাতিত বন্দীগণের মুক্তি হইলে ভারতে নতুন যুগের সত্য সত্যই সূত্রপাত হইবে, এবং অসংখ্য প্রজার মন হইতে রাজবিদ্বেষ অপসারিত হইয়া স্বার্থ রাজভক্তির উৎস খুলিয়া যাইবে এরূপ আশা করা যায়।

এক্ষণে আমরা দেখিতেছি, ভারতসম্রাটের আদেশ অনুসারে ও ভারত-গবর্ণমেন্টের সুবিবেচনার ফলে, ভারতের সকল রাজনৈতিক বন্দীই মুক্তি পাইবেন। আন্দামানে অবরুদ্ধ স্বদেশবাসীর মর্যাদাসিক কাহিনীর কথা স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে, সেদিন “ভাই পরমানন্দের” মশ্বম্পর্শী পত্রখানি পড়িয়া অশ্রুবেগ সঞ্চার করিতে পারি নাই। প্রেমের অগ্নিপরীক্ষা আজ অবসান-প্রায়, অচিরেই আবার আমরা কর্মবীর বারীন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ, শচীন্দ্র সান্যাল প্রভৃতিকে কর্মক্ষেত্রে নতনভাবে কর্মোদ্যত দেখিব, আবার আমরা ভারতের কারাগার হইতে শত শত স্বদেশসেবককে মুক্ত দেখিয়া নয়ন সার্থক করিতে পারিব, রাজ্যক্ষা আইন ও ১৮১৮ সালের নং ৩ রেগুলেশনে দ্বিহারা অবরুদ্ধ আছেন তাঁহাদিগকেও স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে দেখিব।

এ আনন্দ সত্য সত্যই তুলনাহীন, রাজকর্তৃপক্ষগণের অতীত আচরণ যতই কঠোর হউক, মুক্তির পুলকোচ্ছ্বাসে তাহা মন হইতে অপসারিত হইবেই, ভারতসম্রাট পঞ্চমজর্জের আশাবাগী সফল করিতে আমরা কিছুতেই কুঠাবোধ করিব না, তিনি সত্যই বলিয়াছেন, "Let it begin with a common determination among my people and my officers to work together for a common purpose." হে ভগবান, সম্রাটের মঙ্গল-ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

কিন্তু এই উল্লাসের দিনে, আজ যে-সকল স্বদেশপ্রেমিক রাজবন্ধনে আবদ্ধ না হইয়া, বহুপুত্র মত অরণ্যে পর্বতে কখন অনশনে কখন অর্দ্ধাশনে জীবনরক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদের-মুক্তি বিধানের উপায় হইবে কি? সম্রাট ইহারও উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "Let those who in their eagerness for political progress have broken the law in the past, respect it in future." অতরাং তাঁহাদের মুক্তিও অসম্ভব হইবে না। বাংলাদেশে বাঁহারা রাজনৈতিক অপরাধী তাঁহারা প্রায় সকলেই শিক্ষিত এবং বিচক্ষণ, আমরা বহুবার বলিয়াছি, রাজশক্তি যদি আমাদের উন্নতি-পথ মুক্ত রাখেন, তাহা হইলে রাজবিধি অমাত্য করিবার কোনই কারণ থাকে না। রাজশক্তির অবिवেচনার ফলেই হউক, অথবা দেশপ্রেমের খরতর প্রবাহে পড়িয়া দেশের যুবকগণ কথঞ্চিৎ জ্ঞান-হারা হইয়াছিলেন বলিয়াই হউক, অনেকক্ষেত্রে অনেকে রাজবিধি লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে এইরূপ হইবার আর সম্ভাবনা নাই, কেননা "A respect for the law is a necessary quality for endurance as a nation and it has always been a marked characteristic of the Indian people. We must therefore scrupulously observe the law while taking every advantage both of the protection it gives and the latitude it still leaves for pushing forward our cause and our Propaganda (An Open letter by A. Ghose.)" অতএব রাজনীতিক অপরাধীগণ মুক্তি পাইলে ভবিষ্যতে রাজবিধি লঙ্ঘন না করিয়াই স্বদেশসেবা করিতে পারিবে, আজ এইকথা বুঝিবার অবস্থা আসিয়াছে। এরূপক্ষেত্রে রাজনীতিক অপরাধে দণ্ডিত হইবার ভয়ে বাঁহারা আত্মগোপন

করিয়া আছেন, তাঁহারাও মুক্তি পাইবেন, অন্ততঃ বড়লাট বাহাদুর অতঃপর যে আদেশবাণী প্রচার করিবেন তাহার মধ্যে তাঁহাদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ না থাকিলেও, তাঁহারা অন্তরের বল লইয়া আত্মপ্রকাশ করিতে সঙ্কোচ করিবেন না, নবযুগের মহাশক্তি এই অভয়বাণীই উচ্চারণ করিতেছেন।

যুদ্ধের পর ভারতের অবস্থাপরিবর্তনের কথা “প্রবর্তকের” ছত্রে ছত্রে প্রকাশ করিয়া আসিয়াছি, আজ সে গুপ্ত দিনের আগমন কল্পনামূলক নহে, ইহা দিন দিন সত্য হইয়া উঠিতেছে, বাঙ্গালীর কৰ্ম্মপ্রেরণা বিস্তৃত আকারে প্রকাশ হইবার ইহা গুপ্ত সূচনা মাত্র, সম্মুখে কঠোর কৰ্ম্ম স্তরে স্তরে বিস্তৃত, একটার পর আর একটা, এমন অসংখ্য কৰ্ম্ম দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিতে পারিলে, ভারতের ভাগ্যে দিব্যসুখ্য উদিত হইবে। বাঙ্গালী! আজিকার আনন্দে আত্মহারা হইও না, হৃদয়ের সমতা নষ্ট করিও না, যে যেমন আছি, যেখানে আছি, সকলেই স্ব স্ব স্থানে থাকিয়া আরও প্রচুর তপঃশক্তি অর্জন কর, আনন্দশ্রোতঃ মাথার উপর দিয়া প্রবাহিত হউক, তোমরা অটল থাকিও, উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রতীক্ষায় সমানভাবেই তপোমগ্ন থাকিও, অচিরেই ভারতের কাননপ্রাপ্তির বিদ্যোত করিয়া এক নূতন কৰ্ম্মশ্রোতঃ প্রবাহিত হইবে, সে প্রবল তরঙ্গে তোমরা যেন ভাসিয়া না যাও, সেইদিকে তীব্র দৃষ্টি রাখিও, মনে রাখিও পথের মাঝে মনোরম নৃত্যগীতে গতি বন্ধ করিলে নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছিতে বহুবিলম্ব ঘটবে।

প্রশান্তি

কালচক্রে "প্রবর্তকের" আর একবর্ষ সমাপ্ত হইল। নববর্ষ আগতপ্রায়। পুরাতন স্মৃতিরূপে অতীতের অন্ধকারগর্ভে আত্মগোপন করিতেছে। নূতনের পুলকহিল্লোল দিগন্তকোলে নৃত্য করিতেছে। সম্মুখে অজানা ভবিষ্যৎ। অনন্ত কালস্রোতঃ ধীরকল্লোলে সমানভাবেই ভাসিয়া চলিবে। ক্ষুদ্র মানব-জীবন লইয়া বিশ্বশিল্পীর ক্রীড়াভঙ্গী সমানভাবেই স্ননিপুণহস্তে সম্পন্ন হইবে। নূতন আশায় বুক বাঁধিয়া আজ আবার জীবনযজ্ঞের নূতন পর্যায়ের জগ্ন অভিনব আয়োজন করিতে হইবে। "প্রবর্তকে"র পাঠক পাঠিকা গ্রাহক অনুগ্রাহিকা বর্ষান্তে সকলেরই সমীপে আজ আমরা হৃদয়ের মর্মোপহার লইয়া উপনীত। হে ইন্দ্র, অগ্নি, সোম, হে বরুণ, মিত্র, পুষণ, হে ত্রিভুবন-রক্ষক দিকপালগণ, হে পিতৃগণ, সিদ্ধগণ, হে ঋতুসমূহ, দেব নর যক্ষ রক্ষ-গুরুর্ক কিম্বর যে যেখানে আছ, জগদ্ধিতায় আমাদের এই বজ্রায়োজনকে আশীষপূত কর, সফল কর, সার্থক কর। ইহাকে কল্যাণ হইতে কল্যাণের পথে, উৎসব হইতে উৎসবান্তরে তোমাদের পুণ্য অঞ্চলাশ্রয়ে নির্বিল্পে লইয়া চল, আমাদের ব্রত সুসিদ্ধ কর, আমাদের যজ্ঞ পূর্ণ কর।

* * *

এই বর্ষ হইতে বর্ষান্তরে আমরা একই প্রবলক্ষ্যে স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া চলিয়াছি। সে লক্ষ্য দেবজগৎ—সে আদর্শ সেই দিব্যজীবন, উপনিষদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি-যাহার মহনীয় অনুপ্রেরণায় মাতলিকচ্ছলে উদাত্তকণ্ঠে গাহিতেন—ব্যাশেম দেবহিতং যদাযুঃ। আদর্শ আমাদের স্পষ্ট সমুজ্জ্বল, পথ আমাদের রাজু-সরল, সিদ্ধি আমাদের অবশ্যাস্তাবী, বিজয় আমাদের অবধারিত। আমরা যে দিব্যমানের পথিক, দিব্যধামের যাত্রী। আমাদের এই অভিধান দেবায়, জগদ্ধিতায়, দেবতার জন্ত, জগতের জন্ত—মানব-জাতির-জন্তই আমাদের যোগ, ধরণীর স্বর্ণযুগের জন্যই আমাদের তপস্যা। এই মহাযোগে আমাদের পথে বিঘ্নকণ্টক কে প্রক্ষেপ করিবে, কে আমাদের শত্রু, কি আমাদের বাধা? ভগবানের অমোঘ বিধানে আমরা চলিয়াছি, তাঁহার অব্যর্থ ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য—স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।

জীবনই আমাদের যজ্ঞভূমি, উৎসর্গই আমাদের সাধনা। ইহলোক পরি-
 বর্জন করিয়া আমরা কোথাও গিয়া সিদ্ধি চাহি না, মাটির কংকি-
 ঞ্জলিকেই আমরা তপোদণ্ডের স্পর্শে স্বর্গরেণুতে পরিণত করিয়া লইব। স্নেহ
 হৃৎকের যুগল অশ্ব আনন্দরথে সংযুক্ত করিব। সং অসং সূত্রবদ্ধ করিয়া
 হিরণ্য কণ্ঠহার গড়িব। ভাল মন্দ, পাপপুণ্য, জীবনমৃত্যু, সমস্ত বিচিত্র
 দৃশ্য সাজাইয়া নৃত্য-অভিনয় জমাইয়া তুলিব। এককে বহুবিচিত্ররূপে
 ফুটাইয়া, বহুকে অথও সম্বন্ধে সম্মিলিত করিয়া সংসারনাট্য নিবিড়তর
 রসাস্বাদের উপযোগী করিব। এই লীলানৃত্যে বহুভঙ্গিয়ায় একই নটরাজকে
 ঘিরিয়া ঘিরিয়া জীবন নিত্য উৎসবময় করিয়া রাখিব।

ধৃতি আমাদের প্রতিষ্ঠা, অনুমতি প্রেরণাশক্তি, স্মৃতি আমাদের নিত্য
 সঙ্গ। আমাদের কর্ণধার ভগবান্, ব্রহ্মবিদ্যা তরণী, অনন্ত সমুদ্রে আমরা
 অসীম সাহসে অর্ঘবপোত ভাসাইয়াছি, তরঙ্গের পর তরঙ্গ কাটাইয়া ব্রহ্ম-
 শক্তি কালীই আমাদের অকুল-কূলে লইয়া চলিয়াছেন। আমরা তাই অভ্য-
 জ্ঞানসমর্পণযোগী আমরা, ভগবান্কেই পূর্ণ নির্ভর করিয়াছি, মিত্য অশু-
 ষ্মরণ করি তাঁহারই অভয় ব্রহ্মনির্ঘোষ—

সর্বধর্ম্যান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ

অহং হ্যম্ সর্বপাপেভ্যো যোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।

তাই সহস্র পতনেও আমরা স্থির অবিচল, সহস্র প্রলোভনেও অটুট অটল;
 সহস্র ঝঙ্কা-বিপ্লবের মধ্যেও আমরা তৃতীয় হস্তের অদৃশ্য বরাভয় বিস্মরণ
 হইতে অক্ষম। আমরা ভগবানের দাস, ভগবানের যন্ত্র। ভগবান্ই আমা-
 দের প্রভু, গুরু, সখা, স্বামী, সকলই—ভগবান্ই আমাদের অন্তরাঙ্গার
 পরাংপর আত্মস্বরূপ। তাঁহার সহিত স্বরূপে অভিন্ন হইয়াও, জগৎলীলার
 আমরা তাঁহারই প্রতিভূ। বিশ্বনাট্যে বিভিন্ন ভূমিকায় বিচিত্র সজ্জায়
 আমরা তাঁহারই সহিত অসংখ্য সম্বন্ধে সংযুক্ত হইয়া তাঁহারই সহিত নানা-
 রঙ্গে খেলিয়া চলিয়াছি। এই অপরূপ আনন্দোদ্যানে আমরা সকলেই
 আনন্দময়ের খেলার সাথী। আনন্দই খেলার উৎস, আনন্দই খেলার
 প্রবাহ, আনন্দই আমাদের খেলার চিরন্তন লক্ষ্য। অনন্তরূপে, অসংখ্যভাবে,
 অগণন রসের আনন্দে সমরস অক্ষর আনন্দকে লীলায়িত করিয়া তোলাই

এই আনন্দলীলার উত্তম রহস্য।

উৎসব হইতে উৎসবে, আনন্দ হইতে আনন্দেই আমরা পরিক্রমণ করিব। সত্য হইতে সত্যে আমরা অধিকৃত হইয়া চলিয়াছি, স্বাত হইতে স্বাতে আমরা জীবনস্রোত ঢালিতেছি, বৃহৎ হইতে বৃহতে আমাদের সম্প্রসারণ। জ্ঞানের আলোকে আমাদের সত্যদর্শন, শক্তির ইষণায় আমাদের কর্মসৃজন, প্রেমের হিলোলে আমাদের হৃদয়বিস্তার। ত্রয়ীর আশ্রয়ে অধ্যাত্মযোগ-পথেই আমরা অগ্রসর—উৎসর্গের অভিষেকেই আমাদের জ্ঞান, প্রেম, শক্তি সার্থক, উৎসর্গই আমাদের দীক্ষামন্ত্র। শাস্ত্র উৎসর্গবেদ, দীক্ষাদাতা পরম উৎসর্গসিদ্ধ মহাশুক্র, উৎসর্গের অনুরোধনাই আমাদের অগ্নিময় উৎসাহের দীপক, নিরবচ্ছিন্ন উৎসর্গজ্বোতেই আমাদের সন্ধানি জীবনদারা তরঙ্গায়িতা। আমাদের ক্ষুদ্র ইচ্ছাশক্তির নেপথ্যে যে অহাকালী আত্মগোপন করিয়া আছেন, সেই মহীয়সী মাতৃগতির পুণ্য নিঃশ্বাসের সঙ্গে আমাদের অঙ্গপা মিলাইয়াই আমরা শুদ্ধ যুক্ত পূর্ণ ব্রহ্মরূপে বজ্রদূত আত্মপ্রতিষ্ঠা পাইয়াছি। আজ তাই সত্যেই আমাদের আরতন, ব্রহ্মেই আমাদের প্রতিষ্ঠা, অহং ব্রহ্ম এই মহানন্ত্রই আমাদের সমুজ্জল জয়পত্র। ব্রহ্মমন্ত্রে আমরা উদ্বুদ্ধ, ব্রহ্মমন্ত্রে সত্যদর্শন করিয়াছি, ব্রহ্মমন্ত্রে সত্য জ্ঞান পাইয়াছি, ব্রহ্মমন্ত্রে অন্তরের অন্তরে সত্যময় হইয়াছি, না, সত্যই হইয়াছি।

কালী, কালী, কালী,— কালীই আমাদের আধারের গুহ্যবিধান করিতেছেন, কালীই সাধিকা, কালীই মহাযজ্ঞের পুরোহিত। আমরা হোতামাত্র, আমরা যজমান, আমরা ত্রষ্টারূপ। ত্রষ্টাই আমাদের একমাত্র আত্মবৃত্তি। আত্মজীবন লইয়া, বিশ্বজীবন লইয়া, অদৃশ্য তৃতীয় হস্তে এই মহাশক্তির ক্রীড়াকৌতুক অবিচলস্বরূপে পর্যবেক্ষণ করিয়াই আমরা নিশ্চিন্ত। কালীই হোমকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করিয়াছেন, আহামন্ত্রে ধন জন যৌবন, মন প্রাণ শরীর তাহাতে হবন করিতেছেন, জীবের জীবনযজ্ঞ কালীই উদ্‌ঘাপন করিবেন। আকাশ, রসনা, শ্রোত্র, মন, একত্র সমাহিত করিয়া একটা একটা কালীনাম উচ্চারণ করিব, আর একটা একটা করিয়া কুণ্ডলিত পাপ ভস্মীভূত হইয়া ধরিয়া যাইবে, পুন্নাতন মন বুদ্ধি দীর্ঘ হইয়া ধূল্যম

মুটাইবে, অস্থিমাংস মেদ মজ্জা খণ্ড খণ্ড হইয়া ধসিয়া পড়িবে, নূতন মন, নূতন হৃদয়, নূতন শুক্ল শোণিত লইয়া অগ্নিশুদ্ধ অপাপবিন্ধ নূতন আধার গড়িয়া উঠিবে, এই খণ্ড, ম্যাজ, ক্ষুদ্র, ভগ্নস্বাস্থ্য বাগনজাতির স্থানে নবীন দেব-জাতি দিব্যরূপ লইয়া আবির্ভূত হইবে। কালীমন্তের শক্তিপ্রভাবেই এই অভাবনীয় অবটনলীলা সংঘটিত হইবে। অগ্নিময় বিশ্বাসসম্পন্ন তরুণ আধ্যাত্মিকই মহাদেবীর এই নামমাংসাত্ম্য আত্মজীবনে পূর্ণ প্রতিপন্ন করিয়া তুলিবে।

নমঃ, নমঃ, নমঃ—ওগো প্রবীণ দেবসাদক তোমায় প্রণতি করি, ওগো নবীন দেবসাদক তোমায় প্রণতি করি, ওগো পরিচিত তোমায় প্রণতি করি, ওগো অনাগত ভবিষ্য সাদককুল তোমাদেরও প্রণতি করি, আজ প্রণাম তোমাদের চরণে, আজ প্রণাম তোমাদের হৃদয়ে, প্রণাম তোমাদের স্বরূপে, প্রণাম তোমাদের অরূপে, প্রণাম করি তাঁহাকে যিনি আমার সম্মুখে, প্রণাম করি তাঁহাকে যিনি আমার অন্তরালে, প্রণাম তাঁহাকে যিনি প্রত্যক্ষ, প্রণাম তাঁহাকেও যিনি অলক্ষ্য; আমার বামে দক্ষিণে, আমার উর্দ্ধে তলে, যেখানে যত জীব যত শিব স্মারক, সকলকেই উর্দ্ধকরে স্বতাজলিপুটে দণ্ডবৎ নমস্কার করি, জানা অজানা তোমায় নমস্কার, দেবাসুর তোমায় নমস্কার, শত্রু মিত্র তোমায় নমস্কার, নরনারী তোমায় নমস্কার, তরুণ তরুণী তোমায় নমস্কার, বাল বৃদ্ধ তোমায় নমস্কার, ঘটে পটে, জড়ে জীব, আকাশে অন্তরীক্ষে, জলে স্থলে, ভূলোকে দ্যালোকে, চন্দ্রে সূর্য্যে, অগ্নিতে পরমাণুতে যে অখণ্ড পরাৎপর নারায়ণ সমভাবে স্বপ্রকাশ, সেই বিশ্বব্যাপ্ত ভগবান্ বাহুদেবকে বিবিধপুঙ্কজ ভূয়ঃ ভূয়ঃ প্রণতি জ্ঞাপন করি—

নমঃ পুরাতাদথ পৃষ্ঠতন্তে

নমোহস্ত তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।

নমো নমস্তেহস্ত সহস্রকৃতঃ

পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে॥

উৎসর্গ-রহস্য

উৎসর্গ কোথায় করিতে হইবে, কাহাকে করিতে হইবে, কেমন করিয়া করিতে হইবে, এইরূপ একটা প্রশ্ন চারিদিক হইতেই শুনা বাইতেছে। এই সকল কথার উত্তর দিবার পূর্বে প্রত্যেক সাধককে ধারণা করাইয়া দিতে চাই, যে ঋষিবাক্য যেমন বেদে উপনিষদে ছড়াইয়া থাকিলেও, তাহা কেবল পাঠ করিয়াই মর্ম গ্রহণ সম্ভব হইয়া উঠে না, উহা উপলব্ধির জ্ঞান, সাধনা এবং আত্মসম্বন্ধ সহায়চতুষ্টয়কে অবলম্বন করিতে হয়, তদ্রূপ উৎসর্গমন্ত্রে দীক্ষা লইতে হইলে “প্রবর্তকের” উপদেশই যথেষ্ট নহে, ভাষা পাঠকের হৃদয় আকর্ষণ করে মাত্র, সহায়গুলির অনুসন্ধান ও ঐ সকলের শরণ গ্রহণ প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

ভাষা যতই প্রাঞ্জল-হৃদক, জলন্ত হৃদক, বাণী যতই ক্ষুধার এবং স্পষ্ট হৃদক, এইগুলি সাময়িক উত্তেজনারই উপকরণ, মানুষের মনকেই উদ্বুদ্ধ করিতে পারে, বাংলাদেশে কেশবচন্দ্র হইতে আজিকার দিন পর্যন্ত অনেক মহাত্মার অগ্নিময় উপদেশবাণী আমাদের কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, অনেক মহাপুরুষের প্রাণস্পর্শী সত্যবাক্য মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে উৎকৃষ্ট সাহিত্যরূপে আমাদের ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছে, এই সকলের দ্বারা আমরা যে একেবারেই উপকৃত হই না, এমন বলি না, তবে ইহা অন্তরতম পুরুষকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে না, চঞ্চল চিত্ত এই গুলির সাহায্যে কথঞ্চিৎ শান্ত হয়, অসত্য হইতে সত্যের দিকে কিছু আকৃষ্ট হয়, অধোমুখী চিত্তবৃত্তি উদ্বগতি লাভের জ্ঞান সময় সময় আকুল হইয়া পড়ে, কিন্তু পাজিতে দশ আড়া জলের কথা লেখা থাকিলেও যেমন উহা নিঙড়াইলে এক ফোঁটা জলও বাহির হয় না, এই সকল সাহিত্য অথবা সিদ্ধ মহাত্মাগণের উপদেশবাণীতে এমন শক্তি পাওয়া যায় না, যাহা মানুষকে সত্য সত্যই সমুদ্রের পথে চালাইয়া লয়, মানুষ যেখানে সত্যের আশ্রয় পাইয়াছে, নিশ্চয় জানিও সেখানে শান্ত ও উপদেশের পশ্চাতে কোন অপূর্ণ সম্পদ আছে, যাহা না থাকিলে অপর সকল সহায় নিষ্ফল ও ব্যর্থ হইত।

চক্ষু যেখানে পৌছিতে পারে না, কর্ণ যেখানে শক্তিহীন, বাঁক্য যেখানে মুক, মনও যেখানে শুষ্ক মৌন, সে দেশের কথা কোন্ ইন্দ্রিয়-সাহায্যে উপলব্ধি করিবে? ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্য কিছু, সংবস্তু তাহারও অনেক পশ্চাতে; সে দর্শন, সে প্রকাশ অধিগত করিতে হইলে, চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি স্থূল ইন্দ্রিয়ের পশ্চাতে যে সকল সূক্ষ্ম অল্পভূতিযুক্ত স্তরে স্তরে সজ্জিত আছে, ঐ গুলিকে জানিতে ও পাইতে হইবে।

শব্দগুণই অনন্ত ব্যোমের প্রস্থিতি। এই শব্দের আলোড়নেই স্পর্শের সৃষ্টি, কিন্তু ইহাও যখন স্থূলসৃষ্টির উপযোগী উপকরণ হইয়া উঠিল না, তখনই প্রকৃতির হস্ত আবর্তনে অগ্নিময় রূপের বিকাশ সংঘটিত হইল, তারপর রস, পরিশেষে পার্বত্যভৌতিক পৃথিবীর সৃষ্টি। পৃথিবীর বাহ্য কিছু তাহা অতিক্রম করিতে পারিলেই আমরা সত্যস্বরূপের সন্ধান পাই, সত্যের বিকৃতি লইয়া বিগুঢ় সভ্যসন্ধান বাতুলতা মাত্র।

গুণাবলীর পশ্চাতে যে শুদ্ধা প্রকৃতি, এই অচিন্ত্যপূর্ব মহাশক্তির যিনি অধীশ্বর, তিনিই আনন্দময় সত্তা। এই সত্তার সহিত হয় আমাদের একত্ব লাভ করিতে হইবে, ইহাই লয়ের পথ, অথবা আনন্দময় সত্তাকে জানিয়া এবং পাইয়া, তিনি যেমন নিত্য শাস্ত হইয়াও পরিবর্তনশীল রূপের লীলাপ্রকাশে আপনাকে ছড়াইয়া দিয়াছেন, আমরাও তাঁহাতেই আপনাদের অবস্থিতি নিশ্চয়রূপে জানিয়া যন্ত্রের মত আনন্দোৎসবে যোগদান করিব। এই পথে চলিবার জন্তই উৎসর্গমন্ত্রের দীক্ষা, এই অবস্থানাভই আমাদের যুক্তি, ভুক্তি, সিদ্ধি।

ভিতরের জ্ঞান দিয়াই পরম-জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। বাহিরের রূপ নিথ্যা, ইহা মায়াবাদীর যুক্তি। বাহির অস্থায়ী, কেননা নিত্য আনন্দ পরিপূর্ণরূপে এখনও প্রকাশ হয় নাই, সে অপরিসীম আনন্দকে প্রকাশ করিতে প্রকৃতি যতবার সৃষ্টি রচনা করিতেছেন, ততবার উহা অনন্তদেবের প্রেম ও আনন্দের তুলনায়, অপকৃষ্ট বলিয়াই বোধ হইতেছে, আবার ভাবিয়া গড়িতেছেন, সে অসীম রূপের সত্য চিত্র কোন মতেই সম্ভব হইয়া উঠিতেছে না, কোন কালে যে হইবে এমন আশাও নাই, কিন্তু প্রকৃতির অনন্ত খেলায়, সৃষ্টির আদিও নাই, অন্তও নাই, এই আপাত অনিত্য সৃষ্টির স্রষ্টা অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা অপ্রয়োজন বোধেই মায়াবাদীর চক্ষে এপৃথিবী মূল্যহীন, অলৌক, ইহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া, প্রকৃতির দুর্দমনীয় শক্তিকে

অতিক্রম করিয়া, পরাংপর পুরুষের সন্মানে ছুটিয়াছেন। আমরা কিন্তু বিশ্বসৃষ্টির এরূপ অর্থ গ্রহণ করি না। প্রকৃতির খেলালেই যে পৃথিবীর সৃষ্টি, অথবা পুরুষের অর্থশূন্য ইচ্ছাই যে এমন অসীম ভোজবাজীর সৃষ্টি করিয়াছে, ইহা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। প্রকৃতির উদ্যম তাণ্ডব নৃত্যে যখন পৃথিবীর বুকে নররক্তের নদী বহিয়া যায়, শস্ত্রশ্রামল ধরিত্রী সমুদ্রে পরিণত হয়, সুসজ্জিত কোটীমানবপরিপূর্ণ সুন্দর নগরী যখন মরুভূমে পর্যাবসিত হয়, তখন তাহার কারণনির্দেশ মানুষ্যের বুদ্ধি দিয়া অসম্ভব হইয়া উঠিলেও, কালে তাহার নিগূঢ় উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম হয়, সৃষ্টির গূঢ় অভিসন্ধি আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে। প্রকৃতি ঝড়ের মত বিশ্বের বুকে প্রলয়নৃত্য করিলেও, সে ভীষণ লীলার মধ্যে বিশ্বশিল্পীর কারিকুরি স্পষ্ট হইয়াই উঠে, পার্শ্বভৌতিক জগৎ ক্ষণবিক্ষণসমূহ হইলেও, যতক্ষণ উহা অবস্থিতি করে ততক্ষণ সত্যই তাহার সবখানি ঘিরিয়া রাখে, সত্য দিয়াই উহা প্রতিভাত হয়, সত্যের উপরই উহা প্রতিষ্ঠিত থাকে। আকারগত অদর্শন ঘটিলেও, উহা একেবারে ধ্বংস হয় না, অন্তরের মধ্যে আত্মগোপন করে, অধিকতর সুন্দর ও বৃহৎ হইয়া পুনরাবিস্তারের জন্য। বাহিরের অনুভূতি যেমন সত্যদর্শনে অসমর্থ, সৃষ্টির নিত্য রূপ অবধারণেও উহা ভ্রমপ অক্ষম, অপারগ।

আমরা যে দিন ভগবান্কে আমাদের মধ্যে সত্য করিয়া পাইক, সেই দিনই এই সকল জটিল সমস্তার চূড়ান্ত মীমাংসা হইবে, তাহার পূর্বে এইগুলি অবাস্তব কথা। এইসব তত্ত্ব বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষসাধনে অল্পকাল হইলেও, সাধকের সাধনকালে ইহা একেবারেই পরিত্যজ্য। কেবল মনে রাখিতে হইবে, সৃষ্টিবৈচিত্র্য যতই জটিল হউক, যতই মিথ্যা ও নথর বলিয়া অনুমিত হউক, এক ভাগবত উপাদানে গঠিত বলিয়া তাহা কোন কালে মিথ্যা নহে, অমূলক নহে। সৃষ্টির মধ্যেই তাঁর আনন্দমুক্তি চিরদিন প্রচ্ছন্ন আছে, সৃষ্টির মধ্য হইতেই তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, সাধকের মনে এইরূপ সঙ্কল্পের উদয় হইলে, বুঝিবে, যোগপথ তাহার নিকট উন্মুক্ত হইয়াছে, পৃথিবীতে ভগবান্কে যে চার সেই পায়, জগৎ ছাড়াইয়া ভগবান্কে পাইবার আশা করিলে, কোন কালেই তাহার আশা সফল হয় না, বাহা নাই, তাহা পাইবার সাধ যেমন নিষ্ফল হয়, ভগবান্কে জগদতীত জানিয়া, তাহার অহুসরণ বন্ধানারীর পুঞ্জগাভের

মতই অসম্ভব হইয়া থাকে।

তাঁহাকে পাইতে হইবে চেষ্টা করিয়া নহে, ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে নিয়োধ করিয়া নহে, আসন প্রাণায়াম প্রভৃতি কোনরূপ সাধনপদ্ধতি দিয়া নহে, তাঁহাকে পাইতে হইবে আপনাকে উৎসর্গ করিয়া। আপনার সবখানি যন্ত্রস্বরূপ তাঁর হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে, চেষ্টা ও বাসনা পরিত্যাগ করিতে হইবে—সকলই বুঝা যায়, কিন্তু আমি তো উৎসর্গ করিলাম, আমার উৎসর্গ গৃহীত হইল কি? আমার আত্মসমর্পণের পর হইতে তিনিই যে জীবন লইয়া ক্রীড়ারত, তাহা বুঝা যায় কৈ? অন্তরের অন্তরে অহঙ্কারের বিলয়ভেরীই দিবানিশি শুনিতে পাই, ভগবানের চরণনুপুর রুণু রুণু বাজে কৈ? তাঁর মধুর মুরলী আমার প্রাণ মন আকুল করিয়া তুলে কৈ? আত্মসমর্পণের মধুমাখা কথাগুলি মন ভুলাইয়া দেয়, সহসা সব ছাড়িয়া তাঁরই চরণে মাথা নত করিয়া অপূর্ণ আনন্দ উপভোগ করিতে কাহার না সাধ যায়? কিন্তু হয় কৈ? তখনই তো প্রশ্ন করি, ওগো তোমার যন্ত্র হইতে আমার বড় আশা, বড় সাধ, তুমি আমার তাপিত হৃদয়-খানিতে দিবানিশি বিরাজ করিবে, ইহা আমার বড় আনন্দ—আমার পথ বলিয়া দাও, উপায় করিয়া দাও, কোথায় কেমন করিয়া তোমায় সব দিব? আত্মসমর্পণের মধুরসাগিনী বুঝাইয়া দেয় বটে, কে যেন বংশী-বটে আমার জন্ত অপেক্ষা করিতেছে, কিন্তু চক্ষু আমার অন্ধ, হস্তপদ মায়াডোরে বদ্ধ, তারপর পথ জানা নাই, আকুলকণ্ঠে তখন বলিতে থাকি, জীবন যায়, পথ বলিয়া দাও, জ্ঞানাজনে চোখের আঁধার অপসারিত কর, মায়ার বাঁধন টুটাইয়া দাও, তুষিত চাতকের মত কেবলই করুণ আর্তনাদ করি, এক ফোঁটা শীতল বারি তো আশার পুলকে নাচাইয়া তুলে না?

শাস্ত্র, গুরু, উৎসাহ, কাল—যোগের এই চারি উপকরণ। একটীর সহায়তায় পাইলেই অপর তিনটি উপস্থিত হইবেই। বাঁশী বাজে, সুর ধরিয়া পথে বাহির হইলেই বাদকের সন্ধান মিলে, উন্মাদ হইলে, আকুল হইলে, পক্ষুরও চলচ্ছক্তি ফিরিয়া আসে; আর কাল—উহা তো নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে প্রবাহিত, কথা হইতেছে বাঁশী শুনিয়াছ কি? মরম বিদ্ধ করিয়া মুরলীধ্বনি সুষ্প্ত কুণ্ডলিনী শক্তিকে স্পর্শ করিয়াছে কি? কেবল চিত্ত-চঞ্চল্য উপস্থিত হইলে, যোগশক্তি কোন কালেই মূর্ত হইয়া উঠিবে না,

চাই একটা স্পর্শ, একটা স্পষ্ট অনুভূতি, একটা প্রত্যক্ষ দীক্ষা।

যখন অন্তরাগ্নি জাগিবে, তখন ধীরে ধীরে অধ্যাত্ম যোগক्रीড়া আরম্ভ হইবে, বাহিরের অনুষ্ঠান তখন পঙ্গু হইয়া যাইবে, উহা তখন আর জোর করিয়া ত্যাগ করিতে হইবে না, আপনা আপনি পরিত্যক্ত হইবে। কিন্তু এই যে আত্মচৈতন্য, এই যে বিদ্যাৎসর্শ, ইহা কেমন করিয়া ঘটিয়া উঠিবে, এই কথাই না জিজ্ঞাসা করিতেছ ?

লিখিয়া জানাইব কেমন করিয়া, বাক্যসাহায্যে বোধগম্য করিবে কি প্রকারে, আমি তাই রুদ্ধকণ্ঠ, আমার লেখনী তাই আর চলিতে চাহে না, তাহার জন্ত প্রার্থনা করিতেছি কালীর নিকট, আমাদের ভাবসজ্জকে মূর্ত্ত করিয়া দাও, সাধনমন্দিরের ধূলিকণা স্পর্শ করিয়া সাধকের অন্তর-প্রদেশ নবীন আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠুক, অন্তরের নবিকোটার ঘটে ঘটে যে দিব্যশক্তি বিরাজ করিতেছেন, তাহারই দ্যোতনায় সাধনার প্রথম মন্ত্র উচ্চারিত হউক, মানবের কণ্ঠেই শ্রীকৃষ্ণের অমর বাণী বজ্রত হউক, “সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি, মা শুচঃ, মা শুচঃ,” উৎসর্গের পর ভগবানের দিক্ হইতে স্বীকৃতি না পাইলে আত্মসমর্পণ সার্থক হয় না, কোন কালে হইবে না।

অসীম বারিধিবন্ধ হইতে সহস্র কলস বারি উত্তোলন করিলেও সিদ্ধ-রাণী বিচলিতা হন না, দরিদ্রা হইয়া পড়েন না, বাংলার কোটা কোটা মানবসত্ত্বের মধ্য হইতে, আমরা আজ সহস্র সাধকের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি, এই নূতন পথে, নূতন সৃষ্টির জন্ত। সহস্র সন্তানের আত্মদান যদিও ব্যর্থ হয়, মানবসমাজের ক্ষতিবৃদ্ধি ঘটিবে না, প্রচলিত অসংখ্য ধর্মমন্ত্রদ্বায়ের ধ্বংস আসিবে না, আমরা সীমার প্রাচীর তুলিয়া, জাতির মধ্যে আবার এক ভেদের সৃষ্টি করিতে চাহি না, আমরা অমঙ্গলের কৃষ্ণপতাকা উড়াইয়া মানবসমাজ অশান্তিপূর্ণ করিতে প্রস্তুত নহি, আমরা এক বৃহৎ মণ্ডপে জাতির প্রাণে বিদ্যাৎশক্তি সঞ্চার করিবার যে শিক্ষা ভাহাই অর্জন করিতে চাহি, আমরা আরও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিব, আরও শক্তির সাধনা করিব, আমাদের মধ্যে ভগবানের হস্ত অবিরাম কর্মরত থাকিবে, আমরা বিশ্রাম চাহি না, বিরাম চাহি না, বাহিরের কোনও ঐর্ষ্যই আমাদের অভিভূত করিতে পারিবে না, আমরা চাহি, কেমনটি হইলে পৃথিবীতে সত্যকে জুন্দের করিয়া ফুটন্ত করিয়া প্রকাশ করা যায়, আমরা চাহি সমগ্র মানবজাতি কেমনটী হইলে অসংখ্য ভেদের মধ্যে একের আনন্দ

প্রেমবিগলিত হৃদয়ে পরস্পরের -গলা ধরিয়া আলিঙ্গন করে, আমরা চাহি অন্তরের নিত্য আনন্দের গতিপ্রবাহটিকে বাহিরে প্রবাহিত করিয়া, মর্ত্যধামকে আনন্দে মুখরিত করিয়া তুলিতে, স্বর্গের মন্দাকিনী সহস্রধারায় ধরায় অবতীর্ণ করিতে; মানবজাতির অন্তরে যে দেবতা নিত্য অবস্থিত থাকিয়া প্রকৃতিসহযোগে আপনাকে প্রকাশ করিতে চাহিতেছেন, যোগ-শক্তির সহায়ে, তাঁহারই আশীর্বাদে শীঘ্র শীঘ্র তাহা সিদ্ধ করিয়া প্রকৃতির বিলম্বিত গতিকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিব।

আমরা আজ কোন নূতন ধর্ম প্রচার করিতে আসি নাই, কোন সম্প্রদায় গড়িতে উদ্যত হই নাই, আমরা চাহিয়াছি ভগবানের যন্ত্র হইতে; ভগবানের ইচ্ছাটিকে অচিরে পূর্ণ করিয়া তুলিতে; এই ইচ্ছা জাগাইয়াছেন তিনিই, যিনি আজ সাধকরূপে আমাদের মধ্যে এই অভাবনীয় কর্ম সম্পাদন করিবেন। সুতরাং মানুষের কোন বাসনা, কোন অভিলাষ, কোন উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্ত এই সাধনা অনুকূল নহে; বরং একেবারেই ইহা তাহার বিপরীত। এই সাধনা একদিন জাতিগত হইবে যদি আমরা সিদ্ধিলাভ করিতে পারি, আমাদের সাধনা প্রচারের জন্ত নহে, ইহা সাধনার জন্ত, যাহাদের প্রাণ ভগবানের সঙ্কেতে এই পথে নাচিয়া ছুটিবে, তাঁহাদের সহিত আমাদের পরিচয় হইবে, তাঁহাদের সহিত আমরা যুক্ত হইব, আমাদের মিলনেই এই সাধনার সত্য সহায় সত্য উপায় নির্ধারিত হইবে, মনে রাখিও ইহা ব্যক্তিগত সাধনা নয়, সমষ্টি না হইলে, চক্রশৃঙ্খল না হইলে, এই সাধনার প্রকৃত তথ্য অবগত হওয়া চিরদিনই অসম্ভব থাকিয়া যাইবে।

জাগরণের মন্ত্র

সে দিন গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া দেখিলাম, একদল লোক শব দাহ করিতেছে। তাহাদের মধ্যে নবীন প্রবীণ এবং বৃদ্ধ ছিল। কিন্তু মাথার সাদা কাল চুল ছাড়া, কে বৃদ্ধ কে নবীন আর প্রবীণই বা কে তাহা নির্ণয় করিবার উপায় ছিল না। এমন কদাচার, শীর্ণ, শ্রীবিহীন চেহারা জীবন্ত মানুষের ক্ষেত্রে যে কি অশোভন এবং বীভৎসদর্শন তাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলাম।

আমরা সহরের লোক, ফরসা কাপড়খানি কৌচা করিয়া শুছাইয়া পরি, সর্বাঙ্গ তৈল মর্দিত করি, অপরিণত দেহযন্ত্রিখানি সার্টে কোঁটে সর্বদা ঝিকিয়া রাখি, দৈহিক অবনতি তত লক্ষ্যের মধ্যে আসে না, কিন্তু এই কঁউলঙ্গ গ্রামবাসীদের দেখিয়া আতঙ্কে শরীর শিহরিয়া উঠিল, শতকরা চানবুই জন অশিক্ষিত এইরূপ ভগ্নস্বাস্থ্য অস্থিপঞ্জরের স্তূপ লইয়া আমরা বাঙ্গালীজাতি। কলিকাতার সুরম্য অট্টালিকায় দাঁড়াইয়া শিক্ষাতার প্রস্তাবের আলোচনা করি, জাতিগঠনের পরামর্শ করি, কিন্তু আমরা কোথায়? মানুষ নাই, মাথা ব্যথা কেন? আমরা যে একেবারেই গিয়াছি, যেখানে থাকিলে ভো জাতি হইবে, শিক্ষাবিস্তার হইবে, এ যে সব মরিয়া ভুত হইয়া আছে।

শত বৎসর পূর্বে জৈনক রাজপ্রতিনিধি ইংরাজ তাঁহার দৈনন্দিন লিপিতে বাংলার গঠনাকৃতির চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন; তাহা পাঠে জানা যায়, বাংলা বর্ষিষ্ঠ, দীর্ঘাকৃতি, দৃঢ়পেশী, কিন্তু এই শত বৎসরের মধ্যে এমন কঁউল, এমন খুর্কি, এমন শিথিল শরীর তাহার কেমন করিয়া হইল, ইহার উত্তর কোথায় মিলিবে?

কিছুদিন পূর্বে গুনিলাম, বাংলার খোঁরাক ভাত আর কলাইয়ের দাল, ইহা প্রচুর হইলেই বাঙ্গালী বাঁচিয়া থাকিতে পারে; আমাদের মনে হয়, সভাবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালী এইরূপ স্বব্যবস্থার বন্দোবস্ত করিয়াছে, কিন্তু এই অন্ন আহারও তাহার যে আর জুটে না—একবেলা, আধবেলা, এমন কি একদিন অন্তরও যে উদরপূরণের যোগ্য সামগ্রী মিলে না, আঁঙা মরিয়া আহার একেবারেই গিয়াছে, জীবন আর কেতদিন টিকিবে।

আমরা মধ্যস্থিত গৃহস্থসন্তান, ছুইবেলা আমরা খাইতে পাই, কিন্তু সে আহারও আমাদের যথেষ্ট নহে, কেননা, কেবল বাহা তাহা। দিয়া উদর পূরণ করিলে শরীরবৃদ্ধির উপাদান যে মিলিবে এমন কোন কথা নাই, কলাইয়ের দাল আর ভাত, কিছু না পাইলে ভাল বটে, কিন্তু বাঙ্গালীর যোগ্য আহার ইহা নহে। প্রচুর দুগ্ধ ঘৃত, মৎস্য মাংস, ফল-মূল, তরিতরকারি, ভাত দাল, এই সকলই আমাদের খাদ্য; প্ৰব্য পদার্থ ও মৎস্য মাংসের অনটনে, এবং ফলমূল দুগ্ধল্যা বলিয়া, ভাত ডালকেই প্রধান খাদ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি, তাহাও যখন দুপ্রাপ্য হইয়া উঠিল, তখন বায়ুভক্ষণই, শ্রেষ্ঠ খাদ্য বলিতে হইবে, তারপর হুঃখময় ইহজীবন যতশীঘ্র শেষ হয়, ততই মঙ্গল, এমন কথাও বাঙ্গালীর মুখ হইতে শুনা যাইতেছে।

সত্যই কি বিধাতা বাঙ্গালীজাতিকে পৃথিবীর ভোগ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, অথবা আমরা স্বেচ্ছায় ইহবিমুখ হইয়াছি? ভগবানের, স্বপ্ন বিচারে 'কেহ অনাহারে মরিবে আবার কেহ রাজভোগ উপভোগ করিবে' এমন হইতে পারে না। জাতির অধঃপতন যখন আসে, তখন তাহাদের মধ্যে স্বতঃই এমন ভাবের আবির্ভাব হয়, অধোগতিই বাহার বিকাশ; অবশ্যই জাতিগত এইরূপ অধঃপতনের মূল কারণ, ভাগবত বিধান ভিন্ন অপ কিছু নহে, কিন্তু স্রবিচার বলিয়া ইহাও স্বীকার করা যায়, তখনই, যখন দেখি অধঃপতনের ভিতর দিয়া উত্থানের প্রচুর শক্তি অর্জিত হইতেছে; আজ বাঙ্গালীজাতির দারুণ ছরবস্তার 'ভিতরেই' জাগরণের আভাস পাইয়া আমরা ভগবানের মহিমাই জয়যুক্ত দেখিতে পাই, বাঙ্গালীজাতির অধ্যাত্ম জাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই বাহিরের অপূর্ণ বিকাশ দিন দিন সফল হইয়া উঠিলে বাঙ্গালী মরণের মধ্যেই অমৃতের সন্ধান পাইবে, বাহিরের দৈন্যে অশ্রু উত্থলিয়া উঠে, কিন্তু জাতির এই পঙ্কজ ঘুচাইয়া, তিনি 'যে ইহাকে ভবিষ্যৎ একটা শক্তিশালী জাতি করিয়া তুলিবার জন্তই এরূপ অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছে' এরূপ যখন বুঝি, তখন আশায় ও উৎসাহে হৃদয় ভরিয়া উঠে।

বাংলাদেশ হইতে ইহবিমুখ পারলৌকিক ধর্ম বিদূরিতপ্রায়। ত্য্য বৈরাগ্যের গৈরিক বসনের মর্যাদা বাংলার আর তত নাই বলিলেই চলে বাংলার অন-সমস্তা হুঃখের, কিন্তু এই শোচনীয় ছরবস্তার ফলে জাতি জীবনমন্ত্র পরিবর্তিত হইয়াছে, মন্ত্রই মানুষকে উর্দ্ধে উত্তোলিত করে, আবার মন্ত্রই ক্ষমতার অধঃপতন আনিয়া দেয়।

আমরা জীবনের মন্ত্র পাইরাছি। তাহার কলে বাঙ্গালী বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে, যে তাহাদের বাঁচিতে হইবে, এই জীবনমন্ত্রই ঘরে ঘরে প্রচার হইয়া চাই। অতীত ধর্মের মোহ এখনও বাঙ্গালীজাতিকে ঘিরিয়া ধরিয়া আছে; শ্রীগৌরাঙ্গকে যেমন হাততালি দিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল, শ্রীরামকৃষ্ণকেও বাঙ্গালীজাতি হৈ হৈ করিয়া উড়াইয়া দিতে চায়, আবার নবযুগের ক্রমশঃ বাঙ্গালীর পাল্লায় পড়িয়া না পরকালের দেবতা হইয়া দাঁড়াইয়া, বিষয়ে নবযুগের সাধকগণকে সাবধান হইতে হইবে। ধর্মচিন্তা হইতে মানুষের বুদ্ধি নিরস্ত হউক, মানুষ চিন্তা করিতে শিখুক। কেমন করিয়া আমরা আত্মরক্ষা করিবে, জীবনের প্রতিষ্ঠানক্ষেত্রটি কেমন করিলে অটুট থাকিবে, উন্নত হইতে অমৃতধারা ধারণের উপযোগী হইবার জন্ত তাহাকে ক'রিতে হইবে? ধর্মকে চিন্তা করিয়া আগন্ত করিতে হইবে না, ধর্ম-সামাদিগকে নিত্য ধরিয়া আছে, কেবল সামর্থ্যের অভাবে উহার যোগ্য ব্যবহার করিতে আমরা সমর্থ হইতেছি না।

শরীর নশ্বর, কিন্তু মানবসত্তা চিরস্থায়ী। দেহপরিবর্তনে অন্ত-আর উন্নতি অবনতি ভ্রাস বুদ্ধি হয় না। আজিকার চিন্তা কতশত সের মানবজাতির উপর দিয়া বহিয়া ছুটিবে তাহার স্থিরতা নাই, এবং আজ আমাদের মধ্যে এমন ভাব জাগাইয়া তুলিতে হইবে, যাহা রোজাতির উন্নতির সহায়তা করে। আমরা অক্ষম দুর্বল, দুই মুঠা উলেই আমাদের দিন, কাটিয়া বাইবে, এরূপ উজ্জ্বলতা মন হইতে ছিয়া ফেল, আমরা শক্তিশালী হইব, আমরা বীর হইব, আমরা বন্ধু-বান্ধব যাবতীয় ঐর্ষ্যা উপভোগ করিব, আমরা সামর্থ্যবান হইব; এইরূপে বাঙ্গালীজাতির প্রাণে প্রাণে প্রবেশ করাইয়া দাও, বাঙ্গালীর আর তেমন মন্ত্র প্রদান করিও না, যে মন্ত্র পৃথিবীর প্রতি তার হা আনয়ন করে, যে মন্ত্রে চক্ষু মুদিয়া আসে, ইন্দ্রিয়বৃত্তি ক্ষুণ্ণ হয়; যাকে জীবনের মন্ত্রে উদ্ধৃত কর, তাহাকে বেড়িয়া ঘিরিয়া যে বিপুল-দ, অজস্র প্রেম, অজস্র শক্তি নাচিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, জীবন তাহা আগন্ত করিতে শিক্ষা দাও। মানুষ ভগবানের বিগ্রহ, রূপে তার জীবন পরিপূর্ণ, ইহজগতেই আনন্দোৎসব তাহাকে দেখাইয়া দি, মানুষ জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাবান হউক, পৃথিবীকে, পৃথিবীর লোককে গানিতে শিক্ষা করুক।

পর্যায়ীন বলিয়া যে দুঃখ তাহা তো আছেই, কিন্তু ঐ একম কারণেই যে আজ আমরা কৃষিকীটের মত মাটিতে পড়িয়া হামাগুণ দিতেছি এরূপ মনে করিও না, আমাদের অন্তঃপুরুষ নিদ্রিত স্তম্ভ, তাঁহা জাগাইয়া তুলিতে পারিলেই, আমাদের পরম অবস্থা ফিরিয়া আসিবে। বাল্লীজাতির মধ্যে, অসংখ্য সাধককে প্রাণপণে এই নূতন মন্ত্র প্রচা-
করিতে হইবে, সহস্রাধিক সন্ন্যাসী নূতন ভাবে কার্যক্ষেত্রে আগুয়-
হইবে, কথায় ভাবে কার্যে দেখাইয়া দিতে হইবে, ভগবান্ নিত্য প্রত্যক্ষ
আনন্দ জীবনের মধ্যেই সহজপ্রাপ্য। অর্থ অনর্থ নহে, শস্যক্ষেত্র মা-
মরীচিকা নহে, মানবের প্রেম মোহ নহে, সুংসার বন্ধনের কারণ নহে,
সকলই ভগবানের ঐশ্বর্যবিকাশ, তিনিই ভোগ, আবার তিনিই ভোক্তারূপে
প্রতি জীবের মধ্যে 'অবস্থান' করিয়া লীলারত। আজ যে-সকল
সাধক স্বর্গের এই সজীবনীমুখা অর্দ্ধমৃত জাতির জীবনে ছড়াইয়া দিবার
জন্ত অন্তরপ্রেরণা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ই জাতির আদর্শ নহেন
তাঁহাদের মত চরিত্রগঠনের অমূল্যকরণ মারাত্মক হইবে, তাঁহারা আসিয়াছে
জাগাইবার জন্ত, জাগিবেন যাহারা তাঁহাদের আর জাগাইবার কার্যে প্রয়োজ-
নাও লাগিতে পারে, জাগিবার পর, যথানির্দেশ তাহাই করিয়া যাই-
হইবে, স্বামীজী জাগরণমন্ত্র প্রচারোদ্দেশ্যে যে আচরণ অবলম্বন করি-
য়াছিলেন, জাগিবার অবস্থা পাইলাম কি না, তাহা অনুধাবন করা দুঃ-
সাধ্য, স্বপ্নঘোরে গৈরিকবাস পরিধান করিয়া নিদ্রাসজ্জিত কে
স্বামীজীর উক্তিগুলি আবৃত্তিকরাই পরিবর্তনযুগের কার্য হইয়া উঠিল
প্রাণের আসক্তি ঘুচাইয়া মানুষ যদি মনের স্বভাবগতিকে ফুটাইয়া
তুলিতে পারিত, তাহা হইলেও জাতি এতদিনে কথঞ্চিৎ অগ্রসর হইত।

আজ হয়তো প্রয়োজন হইয়াছে সহস্রাধিক ব্রহ্মচারী যুবক, কিন্তু ব্রহ্মচারী
হওয়াই জাতির উদ্দেশ্য নহে। কোন বিশেষ কর্মসাধনের উপকরণস্বরূপ
এইরূপ জীবনের প্রকাশ, আজ প্রাকৃতিক বিধান উল্লঙ্ঘন করিতে
সহস্রাধিক যুবককে জাতির জন্ত যে আত্মযুদ্ধ করিতে হইতেছে, ভবিষ্যতে-
ইহা না করিয়াও জাতির কল্যাণসাধন করা অসম্ভব হইবে না। পতিত
জাতির চৈতন্য জাগাইয়া তুলিতে যতখানি ত্যাগ যতখানি আয়াস স্বীকার
করিতে হয়, জাতির জাগরণের পর তত ত্যাগ ও শ্রমের আবশ্যক নাও
হইতে পারে। কার্যবিশেষে বাহ্য প্রয়োজন হইয়া উঠে, জাতির জাগরণ

আদর্শ নহে;—জাতির আদর্শ অন্তরাআকে জাগাইয়া তোলা। আত্ম-
স্বাধীনতা উঠিলে, তখন আর অন্ধকরণপ্রবৃত্তি স্থান পায় না, স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ-
বেগে জাতির গতি তখন উজ্জ্বল হয়, পুরাতন মাটিতে বিলুপ্ত হয়, নব
সৃষ্টি থরে থরে ফুটিয়া উঠে।

বাঙ্গালীজাতির শোচনীয় অধঃপতনযুগে, আজ সত্যকে অবলম্বন করিয়া
যতো একদল নূতন সাধককে সন্ন্যাসীর মতই কস্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে
হইবে, কিন্তু সন্ন্যাসই হইবে না সমগ্র জাতির আদর্শ, আর এই সন্ন্যাসীর
লব্ধ শক্তির গৈরিকরাগে আপনাদের অঙ্গ আবৃত নাও করিতে পারেন।

দেশের প্রাণশক্তিকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে, এবং ইহার উপকরণ বাহিরের
কোনরূপ অবস্থা নহে, সম্পদ নহে, শিক্ষা নহে, প্রাণ দিয়া প্রাণের স্পর্শ
অনুভব করা চাই, প্রাণের সাহায্যেই দেশের প্রাণ উদ্ধৃত হইবে।

সে প্রাণ উৎসর্গ করিতে হইবে। মানবসত্তার নিকট অসংখ্য প্রাণ
চলিয়া দিতে হইবে। কে আছে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, এই মর্ত্যসাধনার
সাপনাকে বিলাইয়া ফুরাইয়া, জাতির জীবনে বিছাৎশ্রোত প্রবাহিত
করিতে চাও?

কে বলিতে পার মুক্তি চাহি না, স্বর্গ চাহি না, স্বথ চাহি না, সম্পদ চাহি না,
চাহি এই মরাজাতির জীবনশ্রোতকে খরতরপ্রবাহে ফিরাইয়া আনিতে, অগ্রসর
ও, তোমার মত শত শত সাধক তোমায় আলিঙ্গন করিবে, জীবনের দিন কোথা
দগা কাটিয়া যাইবে, বসন্ত সমাগমে শুষ্কতরু যেমন পত্র পুষ্পে সুশোভিত হইয়া
ঠে, তেমনি তোমার সম্মুখে দেশবাসীর ঐ বীভৎস নরকস্থল অপূর্ব ত্রিশক্তি-
মণ্ডিত হইয়া এমমই ভীমরবে গগন বিদীর্ণ করিবে, যে, সে হৃদয়ে
তুর্দৃশ ভুবন কাঁপিয়া উঠিবে। জাতির অপূর্ব জাগরণ আনিবার জ্ঞাত
চপঃসিদ্ধ বাঙ্গালী, তোমাদের নীরব সাধনা সার্থক করিয়া তোল—একত্র
কই ছত্রতলে ধ্যাননিমীলিতনেত্রে উৎসর্গমস্ত জপ করিয়া আপনহারা
ও, আর কি বলিব?

খোলা চিঠি

ব্যবসায় ব্যপদেশে পূর্ববঙ্গে গিয়াছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল, পূর্ববঙ্গ হইতে কোন্‌রূপে এদেশে তাঁতি আনা যায় কিনা তাহার অনুসন্ধান, চাষবাসের অবস্থা পরিদর্শন ও নূতন ব্যবসায়ের সম্ভাবনীয়তা পর্যবেক্ষণ। এতদুপলক্ষে আমি পূর্ববঙ্গের প্রায় সর্বত্রই ভ্রমণ করি, ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকলের সহিত আলাপ ও পরিচয় করি। আজ প্রায় একমাস হইল গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছি। এমন সময়ে হঠাৎ কর্ণগোচর হইল C. I. D. Officerএর নিভৃত তর্কবিতর্ক। গুনিলাম আমি, অনুশীলন সমিতির একজন মুক্ত (Internee) ভূতপূর্ব স্কুল মাষ্টার, আর মালা ফলতানিবাসী দুই একজন যুবক, আমরা সংশ্লিষ্ট বা এক। চাঁদপুর নোয়াখালি হইতে আমি ফলতা মালায় পত্রপ্রেরণ করিয়াছিলাম, হয়ত তাহাদের এই ব্যাপার চিন্তাকর্ষণ করিয়াছে। কোথায় চাঁদপুর আর কোথায় নিভৃত যাদার অজ্ঞাত পল্লী মালা ফলতা! এখান থেকে চিঠি, আবার আমি লিখিতেছি, এতো ভাল কথা নয়—সত্যি ভাল কথা নয়! দেশের লোকে যখন এতদূর হীন হইয়া পড়িয়াছিল, যে ভয়ে আপনার ভাই আপনার পুত্রকেও অস্বীকার করিত, তখন এরূপ সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল। আজ কি দেশ সেই অপদার্থতার স্তরে পড়িয়া আছে? যেখানে আমার আপনার ভাই বোন, আমার পূর্বপিতৃপুরুষ, আমার আত্মীয়স্বজন বা করেন, সে আমার সকলের চাইতে আপনার, সে আমার দেশ। নোয়াখালীই হউক, আর হুগলীই হউক, আমার বাহু অনন্ত দীর্ঘ হইয়া চিরকালই তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া রাখিবে, আমার দ্রুতপদ চিরদিনই তাহাদের পল্লীপথপাথে ভ্রমণ করিবে, আমার নির্দ্বাক্ষুণ্যে তাহাদের প্রেমম্পর্শে চিরদিনই নূতন কথা ফুটিবে—তাদের সঙ্গে যে আমার এক রক্তের অচ্ছেদ্যসম্বন্ধ।

তারপর Internee'র কথা। চাঁদপুরে একদিন একটি নবপরিচিত ভ্রাতৃলোক জিজ্ঞাসা করিলেন—“হারাধন বাবু, আবার কবে আপনার সহিত দেখা হইবে?” আমি বলিলাম “ভগবান্ যবে ইচ্ছা করিবেন।” লোকটি Interneeই হউন আর জেলখালাসই হউন, তিনি যখন সাগ্রহে সম্মুখি আমায়, আবার আসিবেন, এই কথা বলিলেন, তখন যে আশা

যায় সঙ্কোচে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া আসিব, মানুষের এতটা অবমাননা করিতে আমি শিখি নাই, আর আমার মনুষ্যত্বের এতটা অধঃপতন যেন ঘননও না ঘটে, অন্তর্দেবতার নিকট এই প্রার্থনাই করি। অন্তরীণ প্রলোকটিকে মোট একটি প্রশ্ন করিয়াছিলাম, “মহাশয়, আপনারা নাকি অনেক কৰ্ম করিয়াছেন, কিসের অভাবে ব্যর্থকাম হইলেন?” ইত্যাদি—“প্রবর্ত্তকে” এসব কথা বাহির হইয়া গিয়াছে। আমি মানুষের মনের এই ক্রান করিতে বড় ভাল বাসি, আর আমি জানি সকল কৰ্মের যে দীক্ষণ তাহার ভাব (Theory) এক, তাহার অভিজ্ঞতাও এক। যাহারা ব্যবসায়ী, কুলি মজুর ক্রেতা বিক্রেতা লইয়া কৰ্ম করেন, তাহারাও বিগত যুদ্ধে বড় বড় State major এর পদ গ্রহণ করিয়া অদ্ভুত Military organisation এর শক্তি দেখান, তাহারা দেশ শাসন করিতেও সক্ষম। মানুষ, সম্ম, সে নেতাক্রপেই উপস্থিত হউক আর মজুররূপেই উপস্থিত হউক অথবা প্রজা বা সৈন্যরূপেই আসুক তাহাদের মনস্তত্ত্বের ভিত্তি ও তাহাদের পরিচালনকৌশল এক বই দ্বিতীয় নয়। যাহারা বিগত কয়েক দশকের উৎকৃষ্টচিন্তিতে রণচক্ৰীর ভাণ্ড নর্ডনে যোগ দিয়াছিলেন, তাহাদের একটা অভিজ্ঞতা দেশকে দিবার আছে—কৰ্মপদ্ধতি এবং উদ্দেশ্যও কোন কোন দানে ভিন্ন হইলেও তাহাদের অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়াইয়াই আমরা অন্তঃ-কৌশলটির সরল ও সত্য পথটি খুঁজিয়া পাইয়াছি। দেশের মুক্তি যে গুলি দিয়া হয় না, লেকচার দিয়াও হয় না—মুক্তি বাহির হইতে আসে না, যুদ্ধের হইতেই যোগবলে মুক্তি বাহিরে প্রস্ফুট করিতে হয়—ইহা তাহাদেরই রুদ্ধশ্বাস কণ্ঠে সারা দেশে শ্রবণ করিয়াছে। আমার একজন অন্তঃ-সঙ্গীণের (Internee) মুখে গেই ভাগবত বিশ্বাসের কথা শুনিয়া আমি চকিত ও পুলকিত হইলাম।

তারপর মালা ও ফলতা, যেখানে আমি কৃষিকৰ্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি। নুননগরের বড়সাহেব, ফরাসী ভারতের গভর্ণর বাহাদুর, অমৃত বাজার প্রিকার মাননীয় মতিবাবু, সাহিত্যের পণ্ডিত সমাজপতি, বসুমতীর হেমেন্দ্র হাবু, হিতবাদীর যোগেন্দ্র বাবু ইত্যাদি সকলেই আমি যে ফলভায় চাষবাস করিতেছি, তাহা জ্ঞাত আছেন। তাহাদের সহিত কথোপকথন কালে এই সকল বিষয়ের প্রবর্তন হইয়াছিল। আর দেশের শিক্ষিত যুবকদের প্রায় অর্দ্ধেক এ সংবাদ অবগত আছেন। কেন দেশবাসী আমার কুশল সংবাদ রাখেন আমি তাহা জানি না—কিন্তু সত্যটি এইরূপ। আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি, সামর্থ্য, তপস্বী, চরিত্র দিয়া স্বহস্তে দেশীয় পদ্ধতিতে আবাদ করিয়া আশীতিবিক্রিত ফল পাইয়াছি, দেশবাসীর শুভেচ্ছায় ও ভগবানের আশীর্বাদে

আগামী বৎসর এই আবাদ আরও বাড়াইব, চাষের একটু উন্নতি কা
চেষ্টা করিব। সকলেই ইহা জানেন, ইংরাজ গভর্নমেন্টও ইহা অবগত হউ

সারা বৎসর ধরিয়া আমরা আমাদের কর্মের স্পষ্টতা ফুটাইতে

প্রয়াস পাইয়াছি। পূর্ববঙ্গের নোয়াখালিতে যখন দুইটি ওয়াটার,

ছেলে, আসিয়া আমার অবাস্তর প্রশ্ন অভদ্রভাবে জিজ্ঞাসা করেন,

আমি তাঁহাদিগকে পুলিশ এইজ্ঞানে তাঁহাদের Inspector এর

সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক হই। তাহাতে একজন Sub-Inspector আমার

আসিয়া সকল কথা জানিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে চলিয়া যান। সেই অবধি

তারযোগে সংবাদ পাইয়া চাঁদপুরে দুইজন Inspector, শ্রীমদ্বিতে

Sub-Inspector ইত্যাদি আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন। আমি স্বহস্তে

দের সকল কথা লিখিয়া দিয়াছি, তাঁহাদের সহিত আমি যেরূপ ভদ্র

করিয়াছিলাম তাঁহারাও তরুণ আমার সহিত আলাপে কোন ক্রটি প্রদর্শন

নাই। আধুনিক ফরাসী Tourist এর পোষাকে আমার এইরূপ

কালে আমার গতিবিধি সম্বন্ধে কাহারও কোন কথা অজ্ঞাত থা

কারণ নাই। ইংরাজ গভর্নমেন্টের পুলিশবিভাগ যদি আমাদের দিক্

স্পষ্টতার এত প্রচেষ্টা সম্বন্ধে পশ্চাতে একরূপ গুপ্ত আলোচনা করেন

হইলে বুঝিতে হইবে আমাদের ইহা নিতান্ত দুর্ভাগ্য। দেশের প্রাণ

চক্রে আজও নিষ্পেষিত হয় নাই। এখনও শত সহস্র দেশভক্ত

বৃদ্ধ বাংলার কুটীরে কুটীরে তপস্তা করিতেছেন। তাঁহাদিগকে জীবন

শের সত্য পথটি খুলিয়া দেওয়া না দেওয়া ও তরুণগণ দেশের স্বদেশের

অধিকার বিস্তার করা না করা গভর্নমেন্টের ইচ্ছাবীন। এ বিষয়ে আম

কর্তব্য আছে, বিধাতার ইচ্ছায় সে ভার আমরা নিজেদের স্বন্ধে

লইয়াছি। দেশের রুদ্ধ ইচ্ছা ও কর্মপ্রেরণা, দেশের উত্তাল উন্ম

জীবনপ্রবাহকে সংযত করিয়া শুদ্ধ সরল ও যৌগিক উন্নতিপথটি আ

সকল সাধনা দিয়া মুক্ত করিতে আমরা উদ্বুদ্ধ। আমরা

রাজকর্তৃপক্ষের সকল সহায়তাই প্রার্থনা করি। অন্ততঃপক্ষে, দেশের

অনিদ্রা রূপটি ফুটাইয়া তুলিবার জন্ত যে বিরাট সাধনা ভগবান্ আ

ভিতর দিয়া করাইতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের নিরপেক্ষ থাকাই

এতৎপর্যন্ত যদি দেশের রাজা আমাদের পথের কণ্টক হন,

হইলে আমাদের কিছুই বলিবার নাই। আমার ইংরাজরাজের

রাজনৈতিক কোন সম্বন্ধই নাই—আমি ফরাসী citizen, তবু ভার

আমার দেশ, আমার মা। দেশের মুখ চাহিয়া আমি এবং

স্পষ্টতার জন্ত, মিলনের জন্ত যে সাগ্রহ হস্ত বাড়াইয়াছি তাহা

ফুটাইয়া লইব না। হে ভারতের ভগবান্, আমাদের যেন এই ম

হইতে কখনও ব্যর্থ হইরা ফিরিতে না হয়। ইতি—

প্রহারাধন বক্স